মহামতি প্লেটো শিক্ষার সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছিলেন, যে-তথ্য মানুষ জানে না, তাকে সে-তথ্য জানিয়ে দেওয়ার নামই শিক্ষা নয়। পরন্তু যেভাবে আচরণ করা মানুষের কর্তব্য, তাকে সেইভাবে প্রবুদ্ধ এবং প্রবৃত্ত করার নামই শিক্ষা।

'Education does not mean teaching men to know what they do not know, it means teaching them to behave as they do not behave.'

সেণ্ট অগাস্টিনের ভাষায়—যথার্থ শিক্ষা ভগবানের নিজস্ব একটি দান। প্রত্যক্ষভাবে সে-সম্পদটি তিনি দান করেন। মানুষ তারই সাহায্যে নিজ অন্তরটিকে মার্জিত ক'রে থাকে, উজ্জ্বল ক'রে থাকে। ঐ প্রক্রিয়ার নামই শিক্ষা।

অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালে প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্ পেস্টালজি শিক্ষাকে এইভাবে নিরূপিত করেছিলেন :

স্বকীয় বৈশিষ্ট্যকে অব্যাহত রেখে মানুষের সুসমঞ্জস ও সর্বাঙ্গীণ বিকাশের নামই শিক্ষা।

'Education is a harmonious development without ignoring the growth of the individual.'

তারপর একেবারে আধুনিক যুগে যখন বিকাশোন্মুখ শিক্ষাধীন মানবশিশুকে কেন্দ্রে স্থাপন ক'রে শিক্ষা তার নতুন যাত্রাপথে চলতে শুরু ক'রল, তখন মাদাম মন্তেসরি, জন ডিউই প্রমুখ প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্গণ শিক্ষাকে আর এক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নিরূপিত করবার চেষ্টা করলেন। জন ডিউই স্বামী বিবেকানন্দের সমসাময়িক কালের মানুষ ছিলেন। তিনি দীর্ঘজীবী পুরুষ ছিলেন, স্বামীজীর দেহত্যাগের পরেও দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন, ১৮৫৯ থেকে ১৯৫২ খৃঃ পর্যন্ত তাঁর জীবনকাল বিস্তৃত ছিল, তিনি একাধিক গ্রন্থের রচয়িতা। 'Democracy in Education'-নামক বিখ্যাত গ্রন্থটি বিংশ শতাব্দীর শিক্ষা-জগতে তাঁর এক অক্ষয় অবদান। ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর শিক্ষাক্ষেত্রে—কি প্রাচ্য, কি পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে, তাঁর মৌলিক চিন্তার প্রভাব বহুধা স্বীকৃত।

তাঁর মতে শিক্ষা একটি অন্তহীন অভ্রান্ত প্রণালী। মানুষের অতি শৈশব থেকে মৃত্যুদিবস পর্যন্ত তার প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে। শিক্ষা শুধু সাবালক অবস্থা লাভের প্রস্তুতি নয়।

সে যাই হোক, শিক্ষা-সংজ্ঞা এবং শিক্ষা-দর্শনের এই পরিবর্তনশীল পরিপ্রেক্ষিতেই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে মহামনীষী স্বামী বিবেকানন্দ এই বিষয়ে তাঁর সুচিন্তিত এবং গভীর মননশীলতা-প্রসূত অভিমত প্রকাশ করেছিলেন।

* * *

১৮৯১ খৃঃ প্রথম দিকের সে সময়টা। তখনও স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্ববিখ্যাত হননি। বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চে আত্মপ্রকাশ করতে তখনও তাঁর কয়েক বৎসর বাকী। তখনও তিনি প্রায় অজ্ঞাত ও অখ্যাত সাধারণ মানুষ, পরিচয় না দেবার জন্য নানা নামে রিক্তহস্তে সন্ন্যাসীর বেশে বিশাল ভারতের পথে প্রান্তরে নিঃসঙ্গ পরিব্রাজক-জীবন তিনি যাপন ক'রে চলেছেন।

সেই কালে যদৃচ্ছা ভ্রমণ করতে করতে একদা রাজপুতানার খেতড়ি-নামক একটি ক্ষুদ্রায়তন দেশীয় রাজ্যে তিনি প্রবেশ করেছিলেন এবং ঘটনাচক্রে সে রাজ্যের তদানীন্তন রাজা অজিত সিংহের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ও ঘটেছিল। সে পরিচয় উত্তরকালে কি গভীর ও মধুর সম্পর্কে পরিণতি লাভ

করেছিল। প্রথম পরিচয়ের দিনই রাজা অজিত সিংহ স্বামীজীকে দুইটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন। মানবজীবন ও মানবসভ্যতার প্রায় চিরন্তন প্রশ্নের অন্তর্ভুক্ত সে-প্রশ্ন দুটি—উত্তরকালে স্বামী বিবেকানন্দের চরিত্র-আখ্যায়িকায় বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে।

'জীবন কি? শিক্ষা কি?' —What is life, what is education? এই ছিল সেই দুটি প্রশ্ন।

প্রথম প্রশ্নটি দ্বিতীয়টির সঙ্গে প্রায় অঙ্গাঙ্গি-ভাবে সম্পর্কিত হলেও তার বিশদ আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধের অঙ্গীভূত নয়। কাজেই সেটি থাক।

দ্বিতীয় প্রশ্নটির উত্তরে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, কতগুলি ভাব ও চিন্তা যখন আমাদের স্নায়ুর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে একেবারে রক্তধারার সঙ্গে মিশে যায়, একেবারে প্রকৃতিগত হয়ে পড়ে, তখন তাকেই শিক্ষা-নামে অভিহিত করা যেতে পারে। তাঁর নিজের অনন্যকরণীয় ভাষায় 'Education is the nervous association of certain ideas.'—কতকগুলি নির্দিষ্টভাবের স্নায়বিক অনুষঙ্গই শিক্ষা।

এই সংজ্ঞাটির নিহিতার্থ বিশ্লেষণ ক'রে পরবর্তীকালে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন থেকে একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি উল্লেখ করেছিলেন। ঘটনাটি সর্ব-সাধারণের অপরিচিত নয়। তথাপি প্রসঙ্গতঃ তার উল্লেখ প্রয়োজন।

পঞ্চভূতের বিকার টাকা আর মাটি। পরমার্থের বিচারে আত্মোপলব্ধির চরমলক্ষ্যের মাপকাঠিতে উভয়ই সমভাবে তুচ্ছ,—বিঘ্নস্বরূপ। তারা চিত্তকে ভোগমুখী ক'রে দেয়, দেহমুখী ক'রে রাখে। —এই সত্যটি অন্তরে গ্রহণ করবার উদ্দেশ্যে শ্রীরামকৃষ্ণদেব একদিন একহাতে একতাল মাটি, আর অন্যহাতে একখণ্ড রজতমুদ্রা গ্রহণ ক'রে আত্মগতভাবে নিজ মনকে সম্বোধন ক'রে বলেছিলেন: মন, এই টাকা, এই মাটি। যে টাকার জন্য মানুষ এত লালায়িত হয়, এত উন্মাদ হয়ে ছোটে, যার জন্য ভাই ভায়ের গলায় ছুরি দিতে কুণ্ঠিত হয় না—সে শুধু দৈহিক ভোগসুখের উপকরণই সংগ্রহ করতে পারে, আর কিছু পারে না। কিন্তু সে উপকরণের চরম পরিণতিও ঐ মাটি ছাড়া আর কিছু নয়। মাটিতে যেমন সচ্চিদানন্দ লাভ হয় না, ব্রহ্মবস্তু উপলব্ধি করা যায় না, টাকাতেও তেমনি সচ্চিদানন্দ লাভ হয় না, ব্রহ্মবস্তুর সন্ধান মেলে না। অতএব ঐ দুইটিকেই একান্ত অসারজ্ঞানে, সমভাবে মূল্যহীনজ্ঞানে তুমি চিরদিনের মতো ত্যাগ কর।...

তারপর হাতের সে মাটির ঢেলা ও রূপার টাকা একই সঙ্গে দূর-গঙ্গায় নিক্ষেপ ক'রে চিরদিনের মতো তিনি অন্তর থেকে কাঞ্চনাসক্তি মুছে ফেলেছিলেন। উত্তরজীবনে, জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে, নিদ্রায় বা জাগরণে ধাতুমুদ্রা তো দূরের কথা, ধাতুদ্রব্যের স্পর্শমাত্রেও তাঁর দেহ কণ্টকিত হ'ত, অসহনীয় যন্ত্রণায় নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে যেত। কোন ধাতুর স্পর্শই তিনি সইতে পারতেন না। অর্থাৎ কাঞ্চনত্যাগের যে সঙ্কল্পটি, মাটি ও টাকা সমভাবে তুচ্ছ—এই যে আইডিয়াটি, সেটি তাঁর স্নায়ুমণ্ডলীর সঙ্গে এমনভাবে এক হয়ে মিশে গিয়েছিল যে, নিজের অজ্ঞাতসারেও সে-সঙ্কল্পের বিরুদ্ধাচরণে তাঁর সমগ্র ইন্দ্রিয়গ্রাম বিদ্রোহী হয়ে উঠত।

স্বামী বিবেকানন্দ একেই বলতে চেয়েছিলেন, 'Nervous association'—স্নায়বিক অনুষঙ্গ।

প্রাচীন ভারতবর্ষ ব'লত—প্রথমে শ্রবণ কর, তারপর মনন কর এবং সবশেষ ধ্যান ও অভ্যাস দ্বারা তত্ত্বকে জীবনে রূপায়িত কর।

শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারপথে গুরু-কথিত ভাবগর্ভ শব্দতরঙ্গ স্নায়ুতে উপস্নায়ুতে অনুপ্রবিষ্ট হোক, তারপর মানসিক উৎকর্ষের দ্বারা তাদের প্রভাব চিত্তপটে দৃঢ় মুদ্রিত হোক, স্থায়ী হোক এবং সর্বশেষ নিরলস সাধনা এবং তপস্যাযোগে সে চিন্তারাশি জীবনে বাস্তব হয়ে, জীবন্ত হয়ে প্রকাশিত হোক।···

স্বামী বিবেকানন্দও 'নার্ভাস এসোসিয়েশন' শব্দটি দিয়ে অনুরূপ একটি প্রণালীর কথাই প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন।

পরবর্তীকালে পাশ্চাত্য দেশে শিক্ষার স্বরূপ নির্দেশ করতে গিয়ে ব্যাপকতর অর্থবাচক আরও একটি সংজ্ঞা তিনি নির্দেশ করেছিলেন। বলেছিলেন, মানুষের যে শুদ্ধ মুক্ত স্বাধীন সত্তা, —তার অন্তর্নিহিত যে স্বাভাবিক পূর্ণতা, সে মায়ার আবরণে নিথর হয়ে ঘুমিয়ে আছে। মানুষের কঠিন তপশ্চর্যায় সে ঘুম ভাঙে, চতুষ্পার্শ্বের আবরণ ছিন্ন হয়। তখন পূর্ণ মানুষটি ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করে। মানুষের খোলস থেকে শনৈঃ শনৈঃ 'মান-হুঁশ' দেখা দেয়।

পূর্ণতার সে ক্রমিক বিকাশের নামই তিনি সেসময় দিয়েছিলেন শিক্ষা। এ দৃষ্টিভঙ্গির বিচারে শিক্ষা এবং ধর্ম বহুলাংশে একই বস্তুরূপে তাঁর কাছে ধরা দিয়েছিল। আর সেইজন্য তাদের সংজ্ঞা-দুটিও তাঁর কণ্ঠ থেকে মূলতঃ অভিন্নরূপেই ব্যক্ত হয়েছিল। বহুল-প্রচলিত সে সংজ্ঞা-দুটি পাশাপাশি রেখে বিচার করলেই কথাটি পরিষ্কার হবে।

তখন শিক্ষার সংজ্ঞা নির্দেশ ক'রে স্বামীজী বলেছিলেন, 'Education is the manifestation of the perfection already in man.' —মানবের অন্তর্নিহিত পূর্ণত্বকে বিকশিত ক'রে তোলাই শিক্ষা; আর ধর্মের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছিলেন, 'Religion is the manifestation of the divinity already in man.'—মানবের অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশই ধর্ম।

অর্থাৎ যে প্রক্রিয়ার সাহায্যে মানুষের অন্তর্নিহিত পূর্ণতার বিকাশ হয়, সর্বাঙ্গীণ শক্তি-প্রকাশে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে—দেহ মন ও বুদ্ধি, তাকেই আমরা বলি শিক্ষা; আর যাতে আত্মোপলব্ধি আসে, মনুষ্য-সংস্কারের গণ্ডি অতিক্রম ক'রে দেবত্বের গুণাবলীতে ভূষিত হবার শক্তি জাগ্রত হয়, তাকেই বলি ধর্ম। উভয় ক্ষেত্রেই অন্তর্লোক জ্যোতিরুদ্ভাসিত হয়, উভয় ক্ষেত্রেই মনোভূমি দিব্যগন্ধে পূর্ণ হয়। কাজেই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য শুধু প্রকাশগত তারতম্যে, গুণগত তারতম্যে নয়। স্বামীজী আরও বলতেন,—শুচিতা, স্বার্থহীনতা এবং আত্মসংযমই ধর্মের সব। 'Purity, unselfishness and self-control are the whole of religion.'—পবিত্রতা, স্বার্থশূন্যতা এবং আত্ম-সংযমই ধর্মের সমগ্ররূপ। তাই যদি হয়, তবে শিক্ষাই বা তার যথার্থ তাৎপর্যের বিচারে কোন্ স্বতন্ত্র বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করবে?

হিন্দুর চিরন্তন বিশ্বাস, তার বহুযুগব্যাপী তপস্যাসম্ভূত সিদ্ধান্ত : সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ। জীবনের যাত্রাপথে সে যা কিছু করেছে, যা কিছু বলেছে—গীতার ভাষায় 'যৎ করোষি, যদশ্নাসি'—তার সবকিছুই—জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে, তাকে সেই আত্মোপলব্ধির দিকে, ব্রহ্মোপলব্ধির দিকেই নিয়ে চলেছে। তার মন যেন সততই বলছে, —'যৎ করোমি জগন্মাতস্তদেব তব পূজনম্।'

ভারতবর্ষ সেজন্য তার জাতীয় জীবনের দীর্ঘ-বিসর্পিত পথের বিচিত্র ইতিহাসে কোনকালেই শিক্ষাকে বাইরের কোন ব্যাপার ব'লে মনে করতে পারেনি, বাহ্য কোন প্রক্রিয়া ব'লে স্বীকার করেনি। পরন্তু বলেছে, তপস্যায় এবং স্বাধ্যায়ে নিজেকে আবিষ্কার কর; 'আত্মানং বিদ্ধি', তবেই শিক্ষার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। নির্দেশ দিয়েছে 'শ্রোতব্য মন্তব্য নিদিধ্যাসিতব্য'-রূপ ত্রয়ীর অনুসরণের জন্য।

স্বামী বিবেকানন্দ তাই বলতেন: জ্ঞান মানুষের মনে নিহিত রয়েছে। সেখানেই তার চিরন্তন বাসভূমি।

কোন জ্ঞানই বাহির থেকে আসে না, সে ভিতর থেকে উদ্ঘাটিত হয়, শনৈঃ শনৈঃ অভিব্যক্তি লাভ করে। মানুষ যুগে যুগে এক জীবন থেকে জীবনান্তরের নিঃসীম পথে এই আত্মোপলব্ধির অব্যাহত তপস্যাই ক'রে চলেছে। স্বামীজীর নিজস্ব ভাষায়—

'Knowledge is inherent in man, no knowledge comes from outside, it is all inside ··. Man manifests knowledge, discovers it within himself which is pre-existing through eternity.'

একটি ক্ষুদ্র বটের বীজের কোষে কোষে বিরাট মহীরুহের ভাবী পরিণতি যেমন সঙ্গোপনে লুকিয়ে থাকে এবং অনুকূল পরিবেশে তিলে তিলে অঙ্কুরে উদ্গত হয়; বৃক্ষাকারে পরিণতি লাভ করে এবং যথাকালে ফুলে ফলে সমৃদ্ধ হয়ে, ভাবী সৃষ্টির সম্ভাবনা এনে দিয়ে বিলুপ্ত হয়—মানুষের জীবকোষেও তেমনি তার সকল শক্তি ও ব্যক্তিত্বের পরিণতি-সম্ভাবনা প্রসুপ্ত থাকে এবং যথাকালে চকমকি-পাথরের পারস্পরিক সংঘর্ষে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের চকিত উদ্ভবের মতো, বিশেষ বিশেষ উদ্দীপনায়—যাকে সাজেশন্ বা টিচিং বলা হয়, তারই স্পর্শে সেগুলি অভিব্যক্ত হ'তে থাকে, বিকাশ লাভ করতে থাকে। মানুষ জানুক আর নাই জানুক, আত্মাই অনন্ত-শক্তির আকর, শিক্ষার সুদৃঢ় ভিত্তিভূমি।

কাজেই পুঁথিগত যে-শিক্ষা সেটি শিক্ষা নয়। কতগুলি সংবাদ বা তথ্য সংগ্রহের মধ্যেও প্রকৃত শিক্ষা নিহিত নেই। পরন্তু ভাব ও চিন্তার সর্বাঙ্গীণ আয়ত্তীকরণের দ্বারাই যথার্থ শিক্ষা লাভ হয়ে থাকে। বস্তুতঃ এ জগতের জ্ঞানভাণ্ডারে যুগে যুগে যত ঐশ্বর্য সঞ্চিত হয়েছে, যত সম্পদ সংগৃহীত হয়েছে, সবই মনোজগৎ থেকেই এসেছে। মহাবিশ্বের অন্তহীন গ্রন্থমালা মানব-মনে সজ্জিত থাকে।

'All knowledge that the world has ever received comes from the mind, the infinite library of the Universe is in ihe mind.'

—এই ছিল স্বামীজীর উক্তি।

* * *

আবার শিক্ষার লক্ষ্যসম্পর্কে নিজ অভিমত প্রকাশ করতে গিয়েও তিনি নানা প্রসঙ্গে পুনঃপুনঃ অতি দৃঢ়তার সঙ্গে ঐ একই কথার পুনরুল্লেখ করেছেন, বলেছেন, 'A child educates itself, the teacher is only a help ?'—শিশু নিজেই নিজেকে শিক্ষা দিয়ে থাকে। শিক্ষক সহায়ক মাত্র।

কাজেই শিক্ষকের কর্তব্য আর শিক্ষা-ব্যবস্থার লক্ষ্য হবে—শিক্ষার্থীন শিশুকে ততখানি মাত্র সাহায্য দান করা, যাতে সে নিজ বুদ্ধিবৃত্তির যথাযথ প্রয়োগে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের যাবতীয় শক্তিকে কার্যকরী ক'রে তুলতে পারে এবং তাদের সার্থকভাবে প্রয়োগ করতে পারে। স্বামীজীর কথায়—

···'to do so much for the boys that they may learn to apply their own

intellect to the proper use of the hands, legs, ears and eyes.'

আরও বলেছেন—আশিষ্ট, দ্রঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ যুবক-যুবতীর আবির্ভাবে যাতে দেশ যথার্থ কল্যাণের সন্ধান পায়, সত্যিকার উন্নয়নের পথে অগ্রসর হ'তে পারে—আমাদের শিক্ষায়তন এবং শিক্ষাব্যবস্থার তাই হবে চরম লক্ষ্য, বাঞ্ছিত উদ্দিষ্ট ভূমি। ঐ লক্ষ্যে উপনীত হবার স্বপ্নই তাদের উদ্বুদ্ধ করবে, পরিচালিত করবে।

এ-কথা স্মরণ রাখতে হবে,—'The end of all education is man-making' আরও বিশদ ক'রে বলতে গেলে বলতে হবে—মানুষ-প্রস্তুত-সক্ষম, জীবনীশক্তি-প্রদান-সক্ষম এবং চারিত্রিক দৃঢ়তা আনয়ন-পটু যে শিক্ষা, তাকেই প্রকৃত শিক্ষা ব'লে গণ্য করতে হবে। যে শিক্ষার ফলে লৌহদৃঢ় মাংসপেশী গঠিত হবে, ইস্পাত-কঠিন অনমনীয় স্নায়ুমণ্ডলী গঠিত হবে এবং উদ্ভব হবে এমন প্রবল ইচ্ছাশক্তির, যা রুদ্ধকারার পাষাণ-প্রাকার ভিন্ন ক'রে জীবনের পথ সুগম ক'রে নিতে পারবে; অকুতোভয়ে উদ্ঘাটিত করতে পারবে জন্ম-মৃত্যুর নিগূঢ় প্রহেলিকা, সেটি ইতিবাচক প্রকৃত শিক্ষা এবং সেই শিক্ষাই দেশকে গ্রহণ করতে হবে।

'It is man-making theories that we want. It is man-making education all round that we want.'

নানা বিচ্ছিন্ন বিষয়ের কতকগুলি অসংবদ্ধ তথ্য-সংগ্রহের মধ্যে শিক্ষার কোন সার্থকতা নিহিত থাকতে পারে ব'লে তিনি কখনও বিশ্বাস করতেন না।

খ্যাত বা অখ্যাত লেখকগণের গ্রন্থাদি থেকে কতকগুলি উক্তি বা অংশ কণ্ঠস্থ ক'রে তাদের আনুপূর্বিক উদ্গীরণ-সামর্থ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা সার্টিফিকেট বা ডিগ্রি লাভ করা যেতে পারে সত্য, কিন্তু তাতে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না।

অথবা যে-শিক্ষা শিক্ষার্থীকে জীবনযুদ্ধে জয়ী হবার কৌশল শিক্ষা দিল না, পরার্থে স্বার্থত্যাগে প্রণোদিত ক'রল না, সহায়তা ক'রল না সবল চরিত্রের সুন্দর বনিয়াদ গড়ে তুলতে, আত্মোপলব্ধির নিশ্চিত পথে অগ্রসর হ'তে, এনে দিতে সিংহ-সাহসিকতা—তাকে স্বামীজী কোন অবস্থাতেই শিক্ষা-নামে অভিহিত করতে প্রস্তুত ছিলেন না।...

বলতেন, বিশেষ কোন গ্রন্থাদি অধ্যয়ন না করেও কেউ যদি কোন প্রকারে যথার্থ মানসিক শক্তি, চারিত্রিক শুভ্রতা ও আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন করতে পারে, যদি কোন সহজ স্বভাবানুগ পথে নিজ আধ্যাত্মিক প্রকৃতি ও বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ-সাধনে সে সফল হয়, তবে বুঝতে হবে যে, শিক্ষার প্রশস্তবর্ত্মে সে অগ্রসর হচ্ছে।

নিজ মহান্ গুরুর অনুপম জীবন-চিত্র মানসক্ষেত্রে নিয়ত দীপ্যমান থেকেই বোধকরি তাঁকে নিরলসভাবে এই বাক্যটি ঘোষণা করতে প্রবুদ্ধ ক'রত:

'Education is not the amount of information that is put into your brain and runs riot there, undigested all your life—If you have assimilated five ideas and made them your life and character and have more education than any man who has got by heart a whole library'.

বস্তুতঃ ভূতে ভূতে অধিষ্ঠিত যে পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ—তিনি সকল মায়া-আবরণ ছিন্ন ক'রে স্ব-স্বরূপ উপলব্ধির পথে নিত্য গতিশীল। সেবার ভাবে, ব্রতের ভাবে সে গতি-পথকে সুগম ক'রে দিতে হবে, ঋজু ক'রে দিতে হবে। অর্থাৎ বিশেষ সহায়তা-দানে মানবশক্তির

স্বাভাবিক বিকাশকে সহজ ক'রে তুলতে হবে। এ-কথা মনে রাখতে হবে যে, বিপুলা পৃথিবীর বহু বৈচিত্র্যের কেন্দ্রে অবস্থিত যে মানব-সন্তান, সে তার নিজ সংস্কারগত স্বভাবধর্মের প্রেরণাতেই পূর্ণত্বের পথে নিয়ত অগ্রসর হচ্ছে। সে অগ্রগতির দুষ্কর প্রচেষ্টায় সাহায্যদানের সুযোগ-সৌভাগ্য সকলের অদৃষ্টে কি উপস্থিত হয়? হয় না।—যার অদৃষ্টে হয়, বিনম্র অন্তরে সে যেন তা গ্রহণ করে, সার্থক করে। শিক্ষা-ব্রতীদের উদ্দেশ্যে তাই তিনি বলতেন:

বিধির বিধানে তাঁর অগণ্য সন্তান-সন্ততির কাউকে সাহায্য করবার দুর্লভ সুযোগ যদি তোমাদের কাছে এসে থাকে—তুমি ধন্য, তোমার জীবন ধন্য। কারণ যে সুযোগ অপরে লাভ করতে পারেনি, তুমি তা করেছ। শ্রদ্ধানতচিত্তে সে সুযোগের সদ্ব্যবহার কর।

'If the Lord grants that you can help any one of his children—blessed you are. Blessed you are that the privilege was given to you when others had it not. Do it only as worship.'

এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির ফলস্বরূপ, স্বাভাবিক অনুসিদ্ধান্ত-স্বরূপ শিক্ষার ইতিবাচক দিকটির প্রতি স্বামীজী বিশেষভাবে অঙ্গুলিনির্দেশ করেছিলেন।

নেতিবাচক শিক্ষা, অথবা যে শিক্ষা নেতিবাচক তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত তা মৃত্যুসদৃশ অহিতকর, বিষবৎ বর্জনীয়।

'A negative education or any training that is based on negation is worse than death.'

—এই ছিল তাঁর উক্তি এবং সে উক্তি সম্যক্ পরিস্ফুট করবার জন্য, শ্রোতার মনে দৃঢ় মুদ্রিত করবার জন্য গল্পচ্ছলে অনেক সময় তিনি বলতেন:

নিউইয়র্কে দেখতাম, আইরিশ ঔপনিবেশিক দুর্ভাগা, সর্বহারা মানুষগুলো কত ভীত ত্রস্তভাবে সামান্য একটি পুঁটুলি কাঁধে নিয়ে আমেরিকার মাটিতে প্রথম পদার্পণ করে। প্রতি পদক্ষেপে তখন তাদের কত শঙ্কা, কত ভয়! চাহনিতে কত ভীতিবিহ্বল কুণ্ঠা, দুর্বহ জীবনভারে কত অবনমিত ক্ষীণ দেহগুলি···!

তারপর? তারপর খুব দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হ'ত না। পাঁচ ছয় মাস মাত্র সময়ের মধ্যে আর একটি দৃশ্য নয়নগোচর হ'ত। যে আইরিশ স্বদেশের মাটিতে কেবল শুনেছিল, সে কিছু নয়, সে অকর্মণ্য ও অপদার্থ জীব-বিশেষ, স্বাধীন আমেরিকার সরস মাটিতে ও মুক্ত বায়ুতে পা দিয়েই চারিদিক থেকে শুধু এই সঞ্জীবনী মন্ত্রই সে শুনতে লাগলো,—জগতের সকল অসম্ভবকেই মানুষ সম্ভব করতে পারে। প্যাট্, তুমিও মানুষ, তোমার অসাধ্যও কিছু নেই, অতএব তৎপর হও, সাহস অবলম্বন কর। তোমার সামনে বিপুল সম্ভাবনার অনন্ত ভবিষ্যৎ প্রসারিত, ভয় নেই—এগিয়ে চল।···

সে সহানুভূতির বাণী ও উৎসাহের প্রেরণা প্যাটের জীবনে বিপ্লব এনে দিল। সাহসে ভর ক'রে বিস্ময়-বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকাল প্যাট্। মাথা ও মেরুদণ্ড ঋজু ক'রে দৃপ্ত-ভঙ্গিতে দাঁড়াতে শিখল সে। জীবন তার সার্থকতার পথে, পূর্ণতার পথে দ্রুততালে এগিয়ে চ'লল।···

বস্তুতঃ শুধুমাত্র উৎসাহ-উদ্দীপনার জারক-রসে অতি দুর্বল মানুষও সবল হয়ে উঠতে শেখে, আত্মবিশ্বাসে সকল বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করবার শক্তি লাভ করে। আবার ক্রমান্বয়ে ধিক্কার দিলে, 'দূর দূর, ছিঃ ছিঃ' ক'রে উপেক্ষা করলে বিশেষ শুভ-সংস্কার-সম্পন্ন ব্যক্তিরও ব্যর্থ হবার আশঙ্কা থাকে।

অতএব সাহস ও উৎসাহমণ্ডিত, আশা ও উদ্দীপনায় ভরা ইতি-বাচক শিক্ষা বা পজিটিভ এডুকেশন যাতে দেশে প্রসার লাভ করে, সেইজন্য স্বামীজীর ঐকান্তিক আগ্রহ ছিল।

(ক্রমশঃ)

তোমার কল্যাণস্পর্শ

শ্রীশান্তশীল দাশ

সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা :
তোমার কল্যাণস্পর্শ দুয়েরই মাঝারে
রয়েছে—এ-কথা কেন ভুলে ভুলে যাই—
কেন দুঃখ-বেদনার মাঝে বারে বারে
নিজেরে হারাই !

এই ভুল ভেঙে দাও ;
দূর ক'রে দাও এই অজ্ঞতার ঘন অন্ধকার।
আলো আর আঁধারের মাঝে সমভাবে
দেখি যেন প্রসন্ন উদার
তোমার অভয় মূর্তি আর বরাভয় :
সুখ-দুঃখ দুয়ে মিলে এ-জীবন হোক মধুময়।

মুক্তি

শ্রীমতী করুণা ঘোষ

শৃঙ্খল-বাঁধা সংসার মাঝে
বন্দিনী হিয়া কেঁদেছে কত,
মুক্তির পথ খুঁজিয়া খুঁজিয়া
আকুল হৃদয় বেদনাহত।
তব প্রিয় নাম জপিয়া জপিয়া
হতাশার নিশি হয়েছে ভোর,
করুণা-সিন্ধু সহসা উথলি
ভাসাইয়া নিল তরণী মোর।
বিরাটের মাঝে ফেলে দিল যেন
দশ দিশি হেরি অসীম আলো,
জীবন হইতে মুছিয়া লইল
বেদনার যত গভীর কালো।
সে আলোর মাঝে চমকি চাহিনু
থর থর তবু কাঁপিছে হিয়া,
সে জ্যোতির মাঝে রয়েছ দাঁড়ায়ে
ব্যাকুল দু-বাহু বাড়ায়ে দিয়া।

বেদান্ত-সংজ্ঞা-মালিকা

[ত্রিবিধ সংজ্ঞা—পূর্বানুবৃত্তি]

স্বামী ধীরেশানন্দ

জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তানি প্রত্যেকং ত্রিবিধানি বৈ।
আত্মত্রয়ং চ বিজ্ঞেয়ং নাদাদ্যাস্ত্রয় এব হি ॥১১॥

জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তির প্রত্যেকটি[১] অবস্থা ত্রিবিধরূপে খ্যাত। আত্মা[২] ত্রিবিধ জ্ঞাতব্য এবং নাদ[৩] আদিও ত্রিবিধ প্রসিদ্ধ।

১. ত্রিবিধ জাগ্রৎ: জাগ্রৎজাগ্রৎ, জাগ্রৎস্বপ্ন ও জাগ্রৎসুষুপ্তি। প্রমাজ্ঞান-মাত্রকেই **জাগ্রৎজাগ্রৎ** বলা হয়। শুক্তি-রজতাদি ভ্রম **জাগ্রৎস্বপ্ন** এবং পরিশ্রমাদি-হেতু স্তব্ধীভাবকে **জাগ্রৎসুষুপ্তি** বলা হইয়া থাকে।

ত্রিবিধ স্বপ্ন: স্বপ্নজাগ্রৎ, স্বপ্নস্বপ্ন ও স্বপ্নসুষুপ্তি। স্বপ্নে মন্ত্রাদি-প্রাপ্তি **স্বপ্নজাগ্রৎ** নামে কথিত। স্বপ্নকালে 'আমি স্বপ্ন দেখিতেছি' এইরূপ জ্ঞানকে স্বপ্নস্বপ্ন বলে। যাহা স্বপ্নাবস্থায় অনুভূত হয়, অথচ জাগ্রদ্দশাতে স্মরণপূর্বক বলা যায় না, তাহা **স্বপ্নসুষুপ্তি** নামে খ্যাত।

ত্রিবিধ সুষুপ্তি: সুষুপ্তিজাগ্রৎ, সুষুপ্তিস্বপ্ন ও সুষুপ্তিসুষুপ্তি। সুষুপ্তি-অবস্থাতে সাত্ত্বিকী সুখাকারা বৃত্তিকে **সুষুপ্তিজাগ্রৎ** বলে। কারণ তদনন্তর 'আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম' এইরূপ স্মরণ হইয়া থাকে। সুষুপ্তিকালেই যে রাজসী বৃত্তি, তাহাই **সুষুপ্তিস্বপ্ন**, কারণ 'আমি দুঃখে নিদ্রা গিযাছিলাম' এইরূপ পরামর্শ দৃষ্ট হয়। পুনঃ সুষুপ্তি-অবস্থায় যে তামসিক বৃত্তি, তাহাই **সুষুপ্তিসুষুপ্তি** নামে প্রসিদ্ধ, কারণ 'আমি গাঢ় মূঢ় হইযাছিলাম অর্থাৎ গভীর অজ্ঞানে ডুবিয়াছিলাম' লোকে এইরূপ স্মরণও করিয়া থাকে। (যোগবাশিষ্ঠ দ্রষ্টব্য)

২. আত্মত্রয়: জ্ঞানাত্মা, মহানাত্মা ও শান্তাত্মা। ব্যষ্টিবুদ্ধ্যাত্মক চেতন **জ্ঞানাত্মা,** হিরণ্যগর্ভরূপ সমষ্টিবুদ্ধ্যাত্মক চেতন মহানাত্মা এবং সাক্ষীকে **শান্তাত্মা** বলা হইয়া থাকে। অথবা গৌণাত্মা, মিথ্যাত্মা, মুখ্যাত্মা ভেদে আত্মত্রয়। পুত্রাদি **গৌণাত্মা,** দেহেন্দ্রিয়াদি **মিথ্যাত্মা** এবং সাক্ষী **মুখ্যাত্মা**রূপে জ্ঞাতব্য। (পঞ্চদশী-আত্মানন্দ ৩৯-৪২ দ্রঃ) এই মুখ্য আত্মাই পরমানন্দস্বরূপ এবং পরম প্রীতির আস্পদ। এইজন্য আত্মার সন্নিহিত বস্তুতেই ক্রমশঃ অধিক হইতে অধিক প্রীতি দেখা যায়। আভাস দ্বারা সূক্ষ্মশরীরের সহিত আত্মার সম্বন্ধ হয়। সূক্ষ্মশরীর অবলম্বনে স্থূলশরীরের সহিত সম্বন্ধ হয়। স্থূলশরীর অবলম্বনেই পুত্রাদির সহিত সম্বন্ধ হয়। পুত্রদ্বারা পুত্রের মিত্রের সহিত সম্বন্ধ। এইরূপে ক্রমশঃ সম্বন্ধ দূরবর্তী হইয়া পড়ে ও প্রীতিও কম হইতে থাকে। পুত্র-মিত্র অপেক্ষা পুত্রে অধিক প্রীতি দেখা যায়। পুত্রাপেক্ষাও স্বদেহে অধিক প্রীতি হয় এবং স্বদেহ অপেক্ষাও স্বীয় সূক্ষ্মশরীরে অধিক প্রীতি হইয়া থাকে। এইরূপে আত্মার ক্রমশঃ সমীপস্থ বস্তুতে প্রীতির আধিক্য হয়। অতএব যে আত্মার সহিত সম্বন্ধ হওয়াতে অন্য বস্তু প্রীতির বিষয় হয়, সেই আত্মাই মুখ্য প্রীতির আস্পদ, এবং পরম প্রেমের আস্পদ বলিয়াই আত্মা পরমানন্দস্বরূপ।

৩. নাদ, বিন্দু ও কলা—ইহাই নাদাদিত্রয়। মুখবিবর বন্ধ করিয়া কণ্ঠে যে নিনাদ উদ্ভূত হয়, তাহাই **নাদ**। অনুস্বারকেই **বিন্দু** বলে। নাদেরই একদেশ **কলা** নামে খ্যাত। নাদ ওঁকাররূপ। বিন্দু ওঁকারের লক্ষ্যার্থ তুরীয়পদ। নাদের একদেশ অর্থাৎ ওঁকারের 'অ'-কারাদি মাত্রারূপ কলা। স্থূলনাদ শ্রবণেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য। উহা যেখানে লয় পায়, তাহাই বিন্দু। শব্দের বিশেষ বিশেষ রূপ ত্যাগ করিয়া নাদে লক্ষ্য পড়িলে জীবের বুদ্ধি ঊর্ধ্বগামী হয়। এইজন্যই কাঁসর, ঘণ্টা, শঙ্খ প্রভৃতি নাদপ্রধান যন্ত্রই পূজাকালে ব্যবহৃত হয়। মমত্ব-রহিত হইয়া সর্ববস্তু শ্রীভগবচ্চরণে সমর্পণ—ইহাই পূজার শিক্ষা। শব্দের বিশেষ রূপ ত্যাগ করিয়া সর্বব্যাপক বস্তুর ইঙ্গিত করত নাদও ত্যাগই শিক্ষা দিয়া থাকে। এইরূপে নাদপ্রধানযন্ত্র-বাদন ও বাহ্যপূজার সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়।

জহত্যজহতী চৈব ভাগত্যাগা তথৈব চ।
লক্ষণা ত্রিবিধা প্রোক্তা তাপাঃ ক্ষয়াদয়স্ত্রয়ঃ ॥২৩॥

জহৎ[১], অজহৎ[২] ও ভাগত্যাগ[৩] ভেদে লক্ষণা ত্রিবিধ বলা হয়। স্বর্গলোকে ক্ষয়াদি[৪] তাপও ত্রিবিধ ॥২৩॥

১. শক্যার্থ পরিত্যাগপূর্বক তৎসম্বন্ধী অর্থান্তরে পদের বৃত্তি হইলে তাহাকে **জহল্লক্ষণা** বলে। যথা 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ'—এই বাক্যে গঙ্গাপদ গঙ্গা-স্রোতকে না বুঝাইয়া লক্ষণাসহায়ে গঙ্গাতীরকে বুঝাইয়া থাকে।

২. শক্যার্থ অপরিত্যাগপূর্বক তৎসম্বন্ধী অর্থান্তরে পদের বৃত্তি হইলে তাহাকে **অজহল্লক্ষণা** বলে। যথা, 'কাকেভ্যো দধি রক্ষ্যতাম্'—এইবাক্যে কাক-পদে দধির উপঘাতক কাক প্রভৃতি সর্বপ্রাণীকেই বুঝাইয়া থাকে। ইহা অজহল্লক্ষণা।

৩. শক্যার্থের একদেশ পরিত্যাগ করত অন্য অংশ-গ্রহণ **ভাগত্যাগ-লক্ষণা** নামে প্রসিদ্ধ। যথা, 'সোঽয়ং দেবদত্তঃ'—সেই এই দেবদত্ত—এই বাক্যে তদ্দেশ- ও এতদ্দেশ- এবং তৎকাল- ও এতৎকাল-বিশিষ্টরূপে দেবদত্তকে না বুঝাইয়া শুধু দেহধারী দেবদত্তকে বুঝাইয়া থাকে। সেইরূপ 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যেও মায়া-অবিদ্যাদি উপাধি এবং সর্বজ্ঞত্ব অল্পজ্ঞত্ব প্রভৃতি ধর্মসমূহ পরিত্যাগ করত এক অখণ্ড-চিন্মাত্রে ভাগত্যাগ-লক্ষণা হইয়া থাকে।

৪. ত্রিবিধ তাপ : ক্ষয়তাপ, অতিশয় তাপ ও সাহস-পতন তাপ। স্বর্গে পুণ্যকর্মভোগ ক্ষয় হইলে পুনঃ মর্ত্যলোকে পতনভীতি জন্য তাপকে **ক্ষয়তাপ** বলে। স্বর্গলোকে গমনকালে নিজের অপেক্ষা অধিক গুণশালী দেবতাধিষ্ঠিত লোকদর্শনে **অতিশয় তাপ** হইয়া থাকে। স্বর্গলোকে পুণ্যকর্মফলভোগক্ষয়ানন্তর তত্রত্য সুরসংঘকর্তৃক মুদ্গর মুষলাদি প্রহারে কম্পিত-কলেবর হইয়া নিম্নলোকে পতন-জনিত তাপকে **সাহস-পতন তাপ** বলে।

ব্যাবহারিকসত্ত্বঞ্চ প্রাতীতিকং তথৈব চ।
পারমার্থিকমিত্যাহুঃ সত্ত্বত্রয়ং মনীষিণঃ ॥ ২৪ ॥

ব্যাবহারিক[১], প্রাতীতিক[২] ও পারমার্থিক ভেদে[৩] মনীষিগণ ত্রিবিধ সত্তা স্বীকার করিয়া থাকেন।

১. একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারা যাহা বাধিত হয় ও অবিদ্যাই যাহার উপাদান, এইরূপ বিষয়াদি-প্রপঞ্চের **ব্যাবহারিক সত্তা**।

২. ব্রহ্মজ্ঞান ভিন্ন অন্যবস্তুবিষয়ক জ্ঞানদ্বারা যাহা বাধিত হয় ও দোষমোহকৃত অবিদ্যাই যাহার উপাদান, এইরূপ রজ্জু-সর্পাদির **প্রাতীতিক সত্তা**। [অবিদ্যার **মূলা**- ও **তুলা**- নামক দুইটি অবস্থাভেদ আছে। ব্রহ্মে যে জগদ্-ভ্রম, তাহার হেতু **মূলা** অবিদ্যা, এবং জগদন্তর্গত শুক্তিকাদিতে যে রজতাদি-ভ্রম, তাহার কারণ **তুলা** অবিদ্যা ; তুলা অর্থ সাদি। জাগ্রদবস্থার দেহাদি যাবতীয় পদার্থের উৎপত্তিতে দোষশূন্য কেবল অনাদি মূলা অবিদ্যাই উপাদান-কারণ হইয়া থাকে। এইজন্য অন্য দোষরহিত কেবল মূলাবিদ্যাজন্য পদার্থকে ব্যাবহারিক বলা হয়। পুনঃ স্বপ্নাদি পদার্থের উৎপত্তিতে আদি-সহিত নিদ্রাদি-দোষও অবিদ্যার সহায়ক হইয়া থাকে। এইজন্য আদিসহ দোষ-সহিত অবিদ্যাজন্যকে (অর্থাৎ তুলাবিদ্যাজন্য পদার্থকে) প্রাতিভাসিক বলা হয়। অতএব (১) সৃষ্টির প্রারম্ভে ঈশ্বর-সঙ্কল্পদ্বারা সৃষ্ট কেবল অবিদ্যার কার্য পঞ্চভূত ও তাহাদের কার্যগুলির ব্যাবহারিক সত্তা ; (২) দোষ-সহিত অবিদ্যার কার্য স্বপ্ন ও শুক্তি-রজতাদির প্রাতিভাসিক অর্থাৎ প্রাতীতিক সত্তা, এবং (৩) চৈতন্যের পারমার্থিক সত্তা।]

৩. সচ্চিদানন্দস্বরূপ শুদ্ধ নিরুপাধিক ব্রহ্মেরই একমাত্র **পারমার্থিক সত্তা** [জগতের সত্তা সম্বন্ধে তিনটি মতবাদ আছে এবং তদনুসারে কেহ কেহ বেদান্তাধিকারীদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন : অজাতবাদে জগতের কোনরূপ সত্তা নাই, কারণ সত্তা থাকিলে উহা কোনকালেই নিবৃত্ত হইবে না। জগতের প্রতিভাস-মাত্র হয়। অজাতবাদে পূর্ণব্রহ্মজ্ঞানে জগৎ নাই ও তাহা দৃশ্যও হয় না। অর্থাৎ জগতের প্রাতিভাসিক সত্তাও স্বীকৃত হয় না। 'জগৎ আছে', তাই দেখা যায়—ইহা জগতের পারমার্থিক ও **ব্যাবহারিক সত্তাবাদী সৃষ্টিদৃষ্টিবাদী** অথবা অধম অধিকারীর কথা। এই মতে জগৎ অনিত্য, মিথ্যা নহে। কিন্তু 'জগৎ দেখা যায়, তাই আছে'—ইহা **দৃষ্টিসৃষ্টিবাদের** কথা। ইহা মধ্যম অধিকারী বা বিচারশীলের কথা। এই মতেই জগতের প্রাতিভাসিক সত্তা স্বীকার করা হয়। পুনঃ 'জগৎ নাই এবং দেখা যায় না'—ইহা উত্তম অধিকারী **পূর্ণজ্ঞানী অজাতবাদীর** কথা। অজাতবাদে জগতের প্রাতিভাসিক সত্তাও স্বীকৃত হয় না। এই মতে **পারমার্থিক সত্তাবিশিষ্ট** একমাত্র ব্রহ্মই সদা বিদ্যমান। অজাতবাদী বলেন—'জগৎ কোন কালে হয়ই নাই'। এইরূপ উত্তম অধিকারীর জন্ম- ও দুঃখাদি-প্রতিভাসও হয় না। তাহার নিকট জগতের আত্যন্তিক নিবৃত্তি সদা বিদ্যমান।]

দেশকালকৃতশ্চৈব বস্তুকৃতস্তথৈব চ।
পরিচ্ছেদস্ত্রিধা প্রোক্তা বিভুত্বস্য বিবেকিভিঃ ॥ ২৫ ॥

বিবেকিগণ বিভুত্বের[১] দেশকৃত, কালকৃত, ও বস্তুকৃত ত্রিবিধ পরিচ্ছেদ উল্লেখ করিয়াছেন।

১. দেশ- কাল- ও বস্তুপরিচ্ছেদরহিত ব্রহ্মই বিভু। উক্ত ত্রিবিধ পরিচ্ছেদ-বশতই ব্রহ্ম পরিচ্ছিন্নের ন্যায় প্রতীত হইয়া থাকেন। ব্যাপিত্ব, নিত্যত্ব ও সর্বাত্মত্ব বশতঃ ব্রহ্মে এই ত্রিবিধ পরিচ্ছেদ হইতে পারে না।

দেশ-কালরহিত পরমাত্মা হইতেই আকাশাদিক্রমে সৃষ্টি তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে বলা

হইয়াছে। সেখানে দেশকালের সৃষ্টি বলা হয় নাই। অতএব স্বপ্নের ন্যায় যোগ্য দেশ-কালাদি বিনাই প্রপঞ্চ উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়াই প্রপঞ্চ মিথ্যা।

আচার্য মধুসূদন কিন্তু বলেন যে, আকাশাদির ন্যায় দেশকালেরও উৎপত্তি প্রতীত হইয়া থাকে। কার্যবস্তুর সঙ্গেই তাহার প্রতীতি হয়। তাহার উৎপত্তি পূর্বে বা পরে হয় না। শ্রুতিতে সৃষ্টিকথন কেবল অদ্বৈত বোধ করাইবার জন্য। সৃষ্টিতে শ্রুতির তাৎপর্য নাই বলিয়া ক্রম, অক্রম, যুগপৎ—এইরূপ নানাবিধ সৃষ্টির কথা শ্রুতিতে বলা হইয়াছে।

সজাতীয়ো বিজাতীয়ঃ স্বগতশ্চেতি ভেদতঃ।
ভেদত্রয়মিদং প্রোক্তং তন্ন ব্রহ্মণি বিদ্যতে॥ ২৬॥

সজাতীয়,[১] বিজাতীয়[২] ও স্বগত[৩] ভেদে প্রসিদ্ধ ভেদ ত্রিবিধরূপে কথিত হইয়াছে। উক্ত ত্রিবিধ ভেদ ব্রহ্মে নাই।

১. সমান জাতিকৃত ভেদ **'সজাতীয়'**। যেমন, একটি বৃক্ষের বৃক্ষান্তর হইতে ভেদ।

২. বিরুদ্ধ জাতিকৃত **'বিজাতীয়'**। যেমন, বৃক্ষের পাষাণাদি হইতে ভেদ।

৩. স্বাবয়বকৃত ভেদ **'স্বগত-ভেদ'রূপে** প্রসিদ্ধ। যেমন বৃক্ষের পত্র-পুষ্প-ফলাদি-কৃত ভেদ। এই ত্রিবিধ ভেদ ও পূর্বশ্লোকোক্ত ত্রিবিধ পরিচ্ছেদ কোনটিই ব্রহ্মে বস্তুতঃ নাই। (পঞ্চদশী ২।২০।২১ দ্রষ্টব্য)।

আশীর্বাদো নমস্কারো বস্তুনির্দেশভেদতঃ।
মঙ্গলং ত্রিবিধং প্রোক্তং শাস্ত্রাদীনাং মুখাদিষু॥ ২৭॥

শাস্ত্র-গ্রন্থাদির আদি মধ্য ও অন্তে যে মঙ্গলাচরণ করা হইয়া থাকে, তাহা আশীর্বাদ,[১] নমস্কার[২] ও বস্তুনির্দেশ[৩] ত্রিবিধ কথিত হইয়া থাকে।

১. ইষ্টদেবতার নিজের বা শিষ্যগণের জন্য অভিলষিত বস্তুর প্রার্থনা।

২. নিজেতে অপকৃষ্টতাদি-বুদ্ধি ও ইষ্টদেবতাতে উৎকৃষ্টতাদি-বুদ্ধি পূর্বক হস্তমস্তকাদির সংযোগরূপ শারীরিক ব্যবহার-বিশেষ।

৩. সগুণ বা নির্গুণ ব্রহ্মরূপ পরমাত্মবস্তুর নির্দেশ।

[মঙ্গলাচরণ করার উদ্দেশ্য গ্রন্থের নির্বিঘ্নে পরিসমাপ্তি, গ্রন্থের প্রচার, শিষ্টাচার-পালন ও 'গ্রন্থকার নাস্তিক' এরূপ বুদ্ধির খণ্ডন।]

বিরোধে গুণবাদঃ স্যাদনুবাদোঽবধারিতে।
ভূতার্থবাদস্তদ্ধানাদর্থবাদস্ত্রিধা স্মৃতঃ॥ ২৮॥

বক্তব্য বিষয়সহ প্রমাণান্তরের বিরোধ হইলে **গুণবাদ**[১]-রূপ অর্থবাদ, বিষয়টি প্রমাণান্তর দ্বারা অবধারিত অর্থাৎ জ্ঞাত হইলে **অনুবাদ**[২]-রূপ অর্থবাদ এবং পূর্বোক্ত বিরোধ ও মানান্তর-বিষয়তা কোনটিই না থাকিলে **ভূতার্থবাদ**[৩] হইয়া থাকে; এইরূপ অর্থবাদ ত্রিবিধ।

১. স্তুতি- বা নিন্দাপর সাভিপ্রায় বাক্যকে অর্থবাদ বলে। অর্থবাদের সাধারণতঃ স্বার্থে তাৎপর্য থাকে না। ইহা ত্রিবিধ। 'আদিত্যো যূপঃ'—ইত্যাদি বাক্যের প্রত্যক্ষ-সহ বিরোধ দৃষ্ট হয় বলিয়া ইহা গুণবাদ-রূপ অর্থবাদ। ইহার স্বার্থে তাৎপর্য নাই।

২. 'অগ্নির্হিমস্য ভেষজম্'—অগ্নি শীতের নিবারক—ইত্যাদি বাক্যে বক্তব্য বিষয়টি

প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারাই জ্ঞাত, অতএব তদ্বোধক বাক্যটি অপ্রমাণ হইয়া পড়ে। অতএব ইহা **অনুবাদ**-নামক অর্থবাদ। ইহারও স্বার্থে তাৎপর্য নাই।

৩. 'বজ্রহস্তঃ পুরন্দরঃ'—বজ্রধারী ইন্দ্র—ইত্যাদি বাক্যে মানান্তর-বিরোধ বা মানান্তর দ্বারা অবধারণ কোনটিই নাই, কারণ বিষয়টি অলৌকিক, অতীন্দ্রিয়। এইরূপ স্থলে **ভূতার্থবাদ** জ্ঞাতব্য। ইহার স্বার্থে তাৎপর্য থাকে।

বিধিরত্যন্তমপ্রাপ্তে নিয়মঃ পাক্ষিকে সতি।
তত্র চান্যত্র সংপ্রাপ্তে পরিসংখ্যেতি গীয়তে ॥ ২৯ ॥

অত্যন্ত অজ্ঞাত বিষয়-বিধায়ক বেদবাক্যকে অপূর্ববিধি[১] বলে, পক্ষে প্রাপ্ত হইলে অপ্রাপ্তাংশের পূরকবিধি নিয়মবিধি[২] নামে খ্যাত এবং উভয় পক্ষে তুল্যরূপে প্রাপ্তি ঘটিলে পরিসংখ্যাবিধি[৩] স্বীকৃত হইয়া থাকে।

১. যথা, 'স্বর্গকামো যজেত'—স্বর্গকামী যাগ করিবে—এই বাক্যে যাগ-সাধনক স্বর্গ অন্য কোন প্রমাণ-গম্য নহে। একমাত্র বেদগম্য বলিয়া ইহা **অপূর্ববিধি**।

২. যথা, 'ব্রীহীন্ অবহন্যাৎ'—ব্রীহিগুলিকে অবঘাত অর্থাৎ মুষল দ্বারা তুষোন্মোচন করিবে—ইহা একটি বিধি। লৌকিকভাবে তুষ-বিমোচন অবঘাত বা নখবিদারণাদি যে-কোন উপায়ে করা চলে। যে ব্যক্তি নখবিদারণাদি উপায় অবলম্বন করিবে, তাহার পক্ষে অবঘাতটি অপ্রাপ্ত। এই অপ্রাপ্তির পূরণের জন্য অর্থাৎ অবঘাত দ্বারাই তুষবিমোচন করিতে হইবে—ইহা বুঝাইবার জন্য বিধির প্রয়োজন। ইহা **নিয়মবিধি**। নিয়মবিধিদ্বারা অবঘাতের বিধান হইলে ফলতঃ নখবিদারণাদি উপায় পরিত্যক্ত হয়।

৩. যথা, 'অশ্বাভিধানীমাদত্তে'—অশ্ববন্ধনরজ্জু গ্রহণ করিবে। ইহা **পরিসংখ্যাবিধি**। যাগের অঙ্গরূপে পশুবন্ধনরজ্জু-গ্রহণ কর্তব্যরূপে বিহিত হওয়াতে যোগাঙ্গরূপে তুল্যভাবে প্রধান গর্দভের বন্ধনরজ্জু-গ্রহণও শঙ্কা হইতে পারে বলিয়া এই স্থলে 'অশ্ববন্ধনরজ্জু গ্রহণ করিবে' এই বিধিবাক্য গর্দভবন্ধনরজ্জু-গ্রহণের নিবর্তক। নিয়মবিধিতে অন্যতর পক্ষের নিষেধ আর্থিক। পরিসংখ্যাবিধিতে উহা শাব্দিক—ইহাই পার্থক্য।

মলাখ্যঃ প্রথমো দোষো বিক্ষেপস্তু দ্বিতীয়কঃ।
আবৃতিস্তৃতীয়া জ্ঞেয়া মনোদোষা ইমে ত্রয়ঃ ॥৩০॥

মল,[১] বিক্ষেপ[২] ও আবরণ[৩]—চিত্তগত এই তিনটি দোষ জ্ঞাতব্য।

১. **মলদোষ**—চিত্তগত বিষয়ভোগবাসনা ও পাপাদি, নিষ্কামকর্ম দ্বারা দূর হয়।

২. **বিক্ষেপ** অর্থাৎ পুনঃপুনঃ বিষয়ানুসন্ধানরূপ চিত্তচাঞ্চল্য। উপাসনা-সহায়ে একাগ্রতা অভ্যাসদ্বারা ইহা দূর হয়। বিষয়ে দোষভাবনা-সহকারে চিত্তকে অন্তর্মুখ করিলে বিক্ষেপ-নিবৃত্তি হয় বটে, কিন্তু উহা স্থায়ী নহে। বিক্ষেপ-নিবৃত্তির মুখ্য উপায়—বিষয়ের মিথ্যাত্ব-জ্ঞান অর্থাৎ বিষয়কে ইন্দ্রজাল বা স্বপ্নময় জ্ঞান করা। অর্থাৎ বিষয় বস্তুতঃ নাই অথচ দৃষ্ট হয়—এইরূপ বুঝা। এই জ্ঞানের অভ্যাস হইলে চিত্ত আর ইতস্ততঃ ধাবিত হয় না। বিষয়ের মিথ্যাত্ব জ্ঞান ভিন্ন, কেবল অনিত্যতা- ও দোষদুষ্টতাজ্ঞানে বিক্ষেপের নিবৃত্তি করিতে পারা যায় না। অনিত্য-জ্ঞানেও সত্যতা-বুদ্ধি থাকিয়া যায়, কিন্তু মিথ্যা জ্ঞান করিলে সত্যতা-বুদ্ধি থাকে না।

৩. **আবরণ** অর্থাৎ আপন আত্মাদির আবরণের অনুকূল অজ্ঞাননিষ্ঠ সামর্থ্য। ইহা দ্বারা 'অস্তি, প্রকাশতে' এইরূপ ব্যবহারযোগ্য বস্তুতেও 'নাস্তি, ন প্রকাশতে' এইরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে। 'নাস্তি' এইরূপে **অসত্ত্বাপাদিকা আবরণ**-শক্তি পরোক্ষ জ্ঞান দ্বারা এবং 'ন প্রকাশতে' এইরূপে **অভানাপাদিকা আবরণ**-শক্তি অপরোক্ষ জ্ঞান-সহায়ে দূর হইয়া থাকে।

কর্মকাণ্ডং ভক্তিকাণ্ডং জ্ঞানকাণ্ডং তথৈব চ।
কাণ্ডত্রয়মিদং প্রোক্তং ব্যাসাদিমুনিপুঙ্গবৈঃ ॥৩১॥

ব্যাসাদি-মুনিশ্রেষ্ঠগণ কর্মকাণ্ড[১], ভক্তিকাণ্ড[২] ও জ্ঞানকাণ্ড[৩]—এই প্রকারে **কাণ্ড** অর্থাৎ প্রকরণত্রয় (তিনটি) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

১. কর্মের কর্তব্যতা প্রতিপাদক প্রকরণ—বেদের কর্মভাগ। ইহার মীমাংসা অর্থাৎ বিচার যেখানে করা হইয়াছে, তাহাই কর্মমীমাংসা বা ধর্মমীমাংসা বা পূর্বমীমাংসা শাস্ত্র নামে খ্যাত। জৈমিনি ইহার রচয়িতা এবং কর্ম-অনুষ্ঠানের রীতিই এই শাস্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে। বিধি অনুসারে কর্মে প্রবৃত্তি ধর্মমীমাংসার ফল। কিন্তু প্রবৃত্তিতে বেদের তাৎপর্য নহে। নিষিদ্ধ স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হইতে নিবৃত্তি করত জীবকে সন্মার্গগামী করিবার জন্যই বৈদিক কর্মের বিধান। সুতরাং **কর্মকাণ্ড** অর্থাৎ কর্মবোধক বেদভাগও ক্রমশঃ অন্তঃকরণ-শুদ্ধি দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানে পর্যবসিত হইয়া থাকে বলিয়া মোক্ষফলদায়ক। আপাতদৃষ্টিতে বৈদিক কর্মকাণ্ড ঐহিক ও পারলৌকিক অভ্যুদয় বা উন্নতিপ্রদ বলিয়াই প্রতীত হয়। এই ধর্মমীমাংসার দ্বাদশটি অধ্যায়ে কেবল বৈদিক কর্মানুষ্ঠানের রীতিমাত্রই বর্ণিত হয় নাই, ইহাতে বেদার্থ-নির্ণয়ের জন্য এক সহস্র উপায় বা বিচারও লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

২. **ভক্তিকাণ্ড** বেদের উপাসনা-প্রকরণসমূহ। ইহাকে উপাসনা-কাণ্ডও বলা হয়। উপাসনা-পদ্ধতির বিচারাত্মক সংকর্ষণকাণ্ড জৈমিনি মুনি রচনা করিয়াছেন। উহা ধর্মমীমাংসার অন্তর্ভূত। কেহ কেহ বলেন সংকর্ষণকাণ্ড ব্রহ্মসূত্রোক্ত কাশকৃৎস্ন ঋষির রচিত। বেদের কাণ্ড তিনটি। অতএব তিন কাণ্ডের মীমাংসারূপ তিনখানি মীমাংসাগ্রন্থই থাকা উচিত। কিন্তু উপনিষদের মধ্যেই উপাসনাকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড পাওয়া যায়। ছান্দোগ্যোপনিষৎ এবং বৃহদারণ্যকোপনিষদের প্রথমেই উপাসনার কথা বহুল দৃষ্ট হয় এবং বেদান্তদর্শনে তৃতীয় অধ্যায়ে উপাসনার মীমাংসা দেখা যায়। সে যাহা হউক, উপাসনা দ্বারা চিত্তের নির্মলতা ও একাগ্রতা সম্পাদিত হইয়া থাকে। সুতরাং ইহারও তাৎপর্য পরম্পরাক্রমে ব্রহ্মজ্ঞান ও মোক্ষলাভ।

৩. বেদান্ত বা উপনিষৎসমূহকেই বেদের জ্ঞানকাণ্ড বলা হয়। এই জ্ঞানকাণ্ডের মীমাংসা বা বিচার যে গ্রন্থে করা হইয়াছে, তাহাই বেদব্যাস-রচিত ব্রহ্মমীমাংসা, উত্তরমীমাংসা বা শারীরকমীমাংসা। ইহাকে ব্রহ্মসূত্র, শারীরকসূত্র, ব্যাসসূত্র, বেদান্তসূত্র, ভিক্ষুসূত্র বা বেদান্তদর্শনও বলা হয়। প্রত্যগভিন্ন ব্রহ্মাত্মৈকত্বই ইহার প্রতিপাদ্য বিষয়। অদ্বিতীয় ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-জ্ঞান-সহায়ে অবিদ্যা ও তৎকার্য নিবৃত্তিপূর্বক পরমানন্দস্বরূপ ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষই ইহার তাৎপর্য।

এই ব্রহ্মমীমাংসারূপ শারীরক-শাস্ত্রই সর্বশাস্ত্রের মধ্যে প্রধান। অতীব উপাদেয় ও মোক্ষফলপ্রদ এই শাস্ত্র মুমুক্ষুর অবশ্যই শ্রবণযোগ্য। আচার্য ভগবান শ্রীশঙ্কর স্বকৃত ভাষ্যে সূত্রের মর্মার্থ অতীব স্পষ্ট ও সুখবোধ্যরূপে বর্ণন করিয়াছেন। সেই হেতু শঙ্করভাষ্য-সহায়েই সকলের ব্রহ্মসূত্র বা শারীরক-শাস্ত্র পাঠ করা কর্তব্য। (ত্রিবিধ সংজ্ঞা সমাপ্ত)

'শ্রীম' ও সংসারী-ভক্ত

শ্রীশান্তিকুমার মিত্র

জনৈক ভক্ত ৫০নং আমহার্স্ট স্ট্রীটে স্কুল-বাড়িতে দোতলায় সিঁড়ির পাশের ঘরে আসিয়া দেখেন 'শ্রীম' অপর একজন ভক্তের সহিত কথা কহিতেছেন। সন্ধ্যা ৬টা হইবে।

শ্রীম। সংসারে থাকতে গেলে সূর্য উঠবে আবার মেঘও হবে। একেবারে বিমল আনন্দ এখানে পাওয়া যায় না। তাই মাঝে মাঝে নির্জনে গিয়ে সাধন-ভজন করবার কথা তিনি আমাদের বলতেন। ঐটি করতে পারলে তবে কিছু আনন্দ পাবে।

ভক্ত। কখনও বা জপ করতে করতে হয়তো উঠতে ইচ্ছা করে না, মনটা বেশ বসে গেল, আবার কখনও অনেক চেষ্টা করেও মন ঠিক করতে পারি না।

শ্রীম। কাঁচা মন কিনা, শ্রীগুরু-সঙ্গে, সাধু-সঙ্গে দেখবে উপকার পাবে। খুব ভক্তির সঙ্গে জপ করবে। 'তাঁকে' কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করবে, 'তুমি আমার মন ঠিক ক'রে দাও, আমি তো তোমারই শরণাগত, তুমি না দেখলে কে দেখবে?' ভক্তের আকুল প্রার্থনা তিনি শোনেন। দেখবে, ভেতর থেকে সাড়া পাবে।

ভক্ত। এ ছাড়া রাতদিন টাকা-পয়সা ঘাঁটতে হয়, তাই মনে বড় অশান্তি, এ-সব আর ভাল লাগে না।

শ্রীম। তা বটে, তবে টাকা যেমন বন্ধনের কারণ, আবার ঐ টাকাই মুক্তির কারণও হ'তে পারে, তাঁর ভক্তের পক্ষে। শ্রীগুরুর সেবা, সাধুসেবা, তীর্থ, কোন নির্জন স্থানে গিয়ে সাধন-ভজন, দান—এ-সব মুক্তির দিকে নিয়ে যায়। পয়সাকড়ির সচ্ছলতা থাকলে সংসারের ভাবনা-চিন্তা কতকটা কম থাকে, আর মনটা সব তাঁর শ্রীপাদপদ্মে দিতে চেষ্টা করতে পারা যায়। তাঁর উদ্দেশ্যে যদি টাকার ব্যবহার হয় তো আলাদা কথা, নচেৎ টাকাই বন্ধনের কারণ হয়, থাকলেই অহঙ্কার আসবে, তাঁকে ভুলে আরও হয়তো পাঁচটা বাজে কাজে জড়িয়ে পড়বে।

ভক্ত। কিন্তু সাধুরা তো সব ত্যাগ করেন, অনেকে টাকা-পয়সা দিতে গেলে বিরক্ত হন, আবার কেহ বা স্পর্শ পর্যন্ত করতে চান না।

শ্রীম। হ্যাঁ, ঐটাই হচ্ছে Highest ideal (সর্বাপেক্ষা উচ্চ আদর্শ), তবে কোন organisation (সঙ্ঘ) চালাতে গেলে হয়তো টাকা-কড়ির দরকার হয়। নচেৎ নিজে গাছতলায় পড়ে আছি। 'তিনি' যা জোটাচ্ছেন খাচ্ছি, কোন জিনিসে আকাঙ্ক্ষা নেই। সম্পূর্ণ তাঁর উপর নির্ভর। তবে সংসারীর আলাদা কথা। সকলেই কি নির্জলা একাদশী করতে পারে? ফলমূল খেয়ে একাদশী, আবার লুচিছক্কার একাদশীও আছে।

ভক্ত। আর একটি কথা—আমি মঠে যাই, বাড়ির কেহই পছন্দ করেন না।

শ্রীম। মা-বাপ—সাক্ষাৎ ভগবান। কিন্তু ঈশ্বর-লাভের পথে যদি তাঁরা বাধা দেন, সে-কথা কি ক'রে শুনবে? তাঁকে পাওয়ার জন্ত দৈত্যরাজ বলি শ্রীগুরুর কথা শোনেননি, প্রহ্লাদ বাপের কথা শোনেননি, ভরত মায়ের কথা শোনেননি, বিভীষণ বড় ভাই-এর কথা শোনেননি, আর গোপীরা স্বামীদের কথা শোনেননি। তাঁকে পাওয়ার জন্ত সব কিছু

ত্যাগ করা যায়, তাতে দোষ নেই। বাধা-বিঘ্ন—যতই থাকুক, আন্তরিকতা থাকলে তিনিই ও-সব সরিয়ে দেন।

রানাঘাটের '—' বাবু আসিয়াছেন, এইবার তাঁর সহিত কথা কহিতেছেন।

শ্রীম। বাড়িতে লিখবে, 'তোমার চিঠি ইনি পাইয়াছেন, আমি ইঁহার আদেশমত তোমায় চিঠি লিখিতেছি।' দইটুকু খেয়ে, খুরিটা ফেলে দেওয়া তো নয়? সংসার করেছ, ছেলেপুলে হয়েছে, এখন 'আমার বৈরাগ্য হয়েছে' বললে কি হবে? তারা তা হ'লে কোথায় যাবে? মাঝে মাঝে সেখানে গিয়ে তাদের খবর নেবে, তবে তো সকলে জানবে যে, তুমি তাদের দেখাশুনা করছ?

দু-একটি ছেলেপুলে হয়েছে, এখন দু-জনে ভাইবোনের মতো থাকো। নারীমাত্রেই আত্মাশক্তির অংশ। তাদের সেবা করা দরকার। হয়তো বড় বড় 'হাঁড়া' মাজতে গিয়ে অসুখ হয়ে গেল। মেয়েরা রাতদিন কাজ করবে—এ ঠিক নয়। সময়মত সুবিধামত কখনও মহাভারত-রামায়ণ ও শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা শোনাবে। দু-জনেই তাঁর কথা নিয়ে থাকবে। সংসার থেকে এ-পথে আসতে গেলে দুখানা তরোয়াল ঘোরাতে হয়, খুব বেশী শক্তি ও তাঁর বিশেষ কৃপা থাকলে তবে হয়।

জনৈক ভক্ত। মহাশয়, যদি কেউ বিবাহ করে, তবে কি কোন উপায় নেই?

শ্রীম। তা কেন? গৃহী যদি 'এক পা' তাঁর দিকে এগিয়ে যেতে চেষ্টা করে তো, তিনি নিজে 'দশ পা' এগিয়ে আসেন। তিনি জানেন কিনা যে, আমি এদের মাথায় বিশ মণ বোঝা চাপিয়েছি। তুমি যদি 'ঠনঠনে' কালীতলায়, ছড়ি হাতে যেতে যেতে 'মা'কে একটা প্রণাম কর, আর একটা মুটে মাথায় দু-মণ বোঝা, দু-হাতে ঝাঁকাটা ধরা আছে, অতিকষ্টে ভক্তিভরে মাকে একটা প্রণাম করে তো, মা এই মুটের প্রণাম আগে গ্রহণ করেন, সকলেই কি ত্যাগ করতে পারে? যীশুখৃষ্টেরও ত্যাগী ও গৃহী ভক্ত ছিলেন। তিনি তো সকলকেই ত্যাগ করতে বলেননি। কতকগুলি সম্বন্ধে বললেন, 'Some are eunuchs for the sake of God.' (ভগবানের জন্য কতকগুলি ভক্ত স্ত্রী-পুরুষ-ভাববর্জিত অবস্থায় থাকবে) আর কয়েক জনকে বললেন, 'Thou art in the world but not of the world.' (তোমরা সংসারে থাকলেও সংসারের নও)।

তবে বাহিরে ত্যাগ হোক আর নাই হোক, মনে ত্যাগ দরকার। সংসারে রোগ লেগেই আছে। যা থাকবে না—কিনা অসৎ, সেইটিকে সৎ, অর্থাৎ নিত্যবস্তু ব'লে ভুল হচ্ছে। তাই তো এত গোল। সংসারীর সাধুসঙ্গ, গুরুসঙ্গ খুব বেশী দরকার। কারণ নিজের যা প্রকৃত অবস্থা, অর্থাৎ কি করা উচিত আর আমি কি করছি—এটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। যেমন ভুল ঘড়ি, ঠিক ঘড়ির সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া।

কি জানো? Highest Ideal (সর্বাপেক্ষা উচ্চ আদর্শ) যদিও ত্যাগ—তবু যার যে পথ গুরু জানেন। ডাক্তার কি সব রোগেই এক ঔষধ দেন? ভিন্ন ভিন্ন রোগে ভিন্ন ভিন্ন ঔষধ। 'The same coat does not fit Henry, Jack and John alike.' (একই জামা সকলের গায়ে ঠিক লাগে না)। কাউকে সন্ন্যাসের পথে, কাউকে বা সংসারের পথে দিয়ে নিয়ে গিয়ে, শেষে তিনিই ধুলোকাদা ধুয়ে, কোলে তুলে নেন—গুরু কর্ণধার।

(জনৈক ভক্তের প্রতি) কাশীপুরের অ-বাবু কোথায়? আহা, তিনি বড় শোক পেয়েছেন।

কোলে পিঠে টেনে মানুষ ক'রে মৃত্যুর হাতে সঁপে দেওয়া।

(অ-বাবুর প্রতি) রোগ শোক দুঃখ—এ-সব সংসারে আছেই। সমুদ্রের ঢেউ যেমন একটার পর একটা আসে, সেই রকম। সর্বদাই 'ত্রাহি ত্রাহি'। এত বড় যে শোক, এর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ চলবে না—চিঠি লিখলে কোন উত্তরও পাবে না। এই তো আমাদের অবস্থা! তবে মনকে এমন করেও বোঝানো যেতে পারে যে, তিনি হয়তো মেয়েটিকে এর চেয়ে ভাল জায়গায় নিয়ে গেছেন। সবই তাঁর ইচ্ছা। ভক্ত ব'লে যে কোন concession (কমতি) আছে, তা নয়। তবে ভক্ত সম্পূর্ণ তাঁর উপর নির্ভর করে, কারণ সে জানে যে, তিনিই একমাত্র কর্তা। শ্রীরামচন্দ্রের ধনুকে বিঁধে ব্যাঙটি মারা গেছে, তখনও সে নিজেকে রামের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিয়েছে! তাঁর উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায়ই বা কি?

তিনটি parallel straight line (সমান্তরাল রেখা) চলেছে—সৃষ্টি, স্থিতি আর সংহার—তিনিই একরূপে সৃষ্টি, অন্যরূপে পালন ও অপর রূপে সংহার করছেন। এ সবই তাঁর লীলা।

অ-বাবু। এমনটি ক'রে তাঁর লাভ?

শ্রীম। লাভ-লোকসানের কথা নয়। ঐ রকম করা তাঁর ইচ্ছা—তিনি ইচ্ছাময়। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের সঙ্গে সর্বদা রয়েছেন, তবু তাঁদের কত কষ্ট—তাঁর উদ্দেশ্য যে কি, কে বুঝবে?

অ-বাবু। কেউ কেউ বলেন, তিনি দুঃখ দিয়ে ভক্তকে কাছে টেনে নেন—এ-কথা কি সত্য?

শ্রীম। তা হয়তো হবে। কুন্তী শ্রীকৃষ্ণের কাছে দুঃখ চেয়েছিলেন—তাঁকে মনে থাকবে ব'লে।

যুগের কর্ণধার

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

নরদেহে তুমি এলে নারায়ণ
করুণার অবতার!
নমো নমো নমো হে রামকৃষ্ণ
যুগের কর্ণধার!
যে-তুমি লক্ষ তারকা-তপনে,
যে-তুমি রয়েছ জীবনে মরণে,
কামারপুকুরে সেই তুমি এলে!
তোমারে নমস্কার!

আর্তজনেরে দিলে প্রভু চির
শান্তির সন্ধান!
হতাশের কানে শোনালে দয়াল,
নবজীবনের গান!
একের মন্ত্র প্রচার করিলে,
ভেদবুদ্ধিরে তুমি বিনাশিলে,
তব কথামৃত ভব-সাহারায়
অমৃতের পারাবার।

ভক্ত তেজচন্দ্র মিত্র

শ্রীমানবকৃষ্ণ মিত্র*

এমন এক সময় উপস্থিত হইয়াছিল, যখন দেশে কুসংস্কার ও ধর্মে অবিশ্বাস বাড়িয়া গিয়াছিল। বৈদেশিক ধর্ম-প্রচারকেরা পাড়ায় পাড়ায় স্কুল-কলেজের ফটকের সামনে প্রচার করিতে আসিত, সেই অবস্থায় সমগ্র জাতিকে রক্ষা করিয়া পথনির্দেশ করিতে যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তখন যাঁহারা তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার শ্রীচরণে আশ্রয় লইযাছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে তেজচন্দ্র মিত্র একজন।

বাগবাজার বসুপাড়া লেনে ৩০ ও ৩৪নং বাটী তাঁহাদের বসতবাটী ছিল, ঐ স্থানে ১৮৬৩ খৃঃ তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পাঁচ সহোদরের মধ্যে তিনিই ছিলেন জ্যেষ্ঠ। তাঁহার পিতা ভগবতীচরণ মিত্র ধর্মে খুব নিষ্ঠাবান্ ছিলেন, দেবদ্বিজে তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি-বিশ্বাস ছিল। তাঁহার নিকট কেহ কোনরূপ সাহায্যের জন্য আসিলে বিমুখ হইত না, ইহাই তাঁহার অবস্থা-বিপর্যয়ের কারণ হইয়াছিল। শেষ জীবনে তিনি কাশীধামে যাইয়া ৺বিশ্বনাথ-চরণে দেহ রাখেন।

তেজচন্দ্র ছাত্রজীবনে দেহচর্চায় খুব উৎসাহী ছিলেন। তাঁহার পিতা বসুপাড়ার ৩০নং বাটীর বাহিরের অংশ শরীরচর্চার জন্য তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, সেখানে কুস্তি জিমনাস্টিক ও লাঠিখেলা হইত। অনেক বিষয়ে তিনি গিরিশবাবুর বা তাঁহার ভ্রাতা অতুলবাবুর পরামর্শ মত কাজ করিতেন। কোন সময় কেহ দুষ্টামি করিলে গিরিশবাবু বলিতেন, 'তেজুকে ডেকে আন নিষ্পত্তির জন্য।' তেজচন্দ্র সম্মানিত ব্যক্তিদের সম্মান দিতে কখনও ভুল করিতেন না এবং সকলের বিপদেই সাহায্যের জন্য আগাইয়া যাইতেন। তিনি লোকের দুঃখ দেখিলে স্থির থাকিতে পারিতেন না।

তেজচন্দ্রের পিতৃভক্তি ছিল গভীর, পিতার আদেশ সর্বদা বিনা-প্রতিবাদে মানিয়া চলিতেন, সন্তানদের মধ্যে তিনি ছিলেন পিতার অবলম্বন। অল্পবয়সে ছাত্রাবস্থায় তিনি বিবাহ-বন্ধনে জড়িত হন, পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কথা কহিবার ইচ্ছা কখনও প্রকাশ করেন নাই। বিবাহের পর তিনি প্রবেশিকা (Entrance) পরীক্ষা ভালভাবে পাস করেন।

তেজচন্দ্র হরি মহারাজের (স্বামী তুরীয়ানন্দ) সহিত ঠাকুরের নিকট যাইবার সৌভাগ্যলাভ করেন, প্রথম দর্শনেই ঠাকুর তাঁহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বলিয়াছিলেন, 'এখানে আসাযাওয়া ক'রো, যখন আসবে একলা এস, শনি-মঙ্গলবার এস।' বোধ হয় সেই জন্যই তিনি ঐ বারে আমাদেরও দর্শন করিতে যাইবার জন্য উপদেশ দিতেন। তিনি নিজে বাগবাজারে মা-কালীর বাটীতে প্রত্যহ একবার করিয়া যাইয়া বসিতেন ও শ্রীশ্রীকালী-পূজার সময় সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া পূজাদির ব্যাপারে নিযুক্ত থাকিতেন।

তাঁহার শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গলাভ-বিষয়ে শরৎ মহারাজের ডায়েরিতে পাওয়া যায় :—

তেজচন্দ্রের নিকট হইতে প্রাপ্ত : প্রথম দর্শন—১৮৮৩ খৃঃ গ্রীষ্মকালে হরিমহারাজের সঙ্গে ঠাকুরের নিকট যাওয়া।

* লেখক তাঁহার পিতা-সম্বন্ধে কিছু কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, বর্তমান প্রবন্ধটি সেই পাণ্ডুলিপি হইতে সংকলিত।

সেদিন রবিবার, দক্ষিণেশ্বরে বলরামবাবু ও মাস্টার মহাশয় উপস্থিত ছিলেন, ঠাকুর তাঁহার নাম-ধাম জিজ্ঞাসা করেন ও বলেন, 'বেশ বেশ, এখানে আসাযাওয়া ক'রো।'

সেদিন ছিল শনিবার। হরির সাক্ষাৎ না পাইয়া একাই তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট উপস্থিত হন, ঠাকুর তাঁহাকে দেখিয়া খুব আনন্দ প্রকাশ করেন ও তাঁহাকে বারান্দার নিভৃতে লইয়া গিয়া বলিলেন, 'তোমার কোন্ দেবতাকে ভাল লাগে?' তেজচন্দ্র চুপ করিয়া রহিলেন। ঠাকুর বলিলেন, 'তুমি বলবে না বুঝি?' (মা কালীকে দেখাইয়া) 'এঁকে না?' তেজচন্দ্র (ঘাড় নাড়িয়া) জানাইলে ঠাকুর তাঁহাকে মন্ত্র দিলেন। তখন তেজচন্দ্র বলিলেন, 'মহাশয়, আপনি তো এই করলেন, কিন্তু আমাদের পৈতৃক গুরু আছেন যে, তিনি রাগ করলে খারাপ হবে না তো?'

ঠাকুর বলিলেন, 'কেন রে? তাঁর কাছ থেকেও মন্ত্র নিয়ে নিবি। আর যদি মন্ত্র না নিস, তো তাঁর যা পাওনা তা তাঁকে দিবি।'

এই দ্বিতীয় দর্শনের দিন পূর্বদক্ষিণের বারান্দায় ঠাকুর তেজচন্দ্রকে খাওয়াইয়াছিলেন, খাওয়া-দাওয়ার পর সেখানে কিছু সময় থাকিয়া তিনি চলিয়া আসিলেন। তৃতীয় ও চতুর্থ দর্শনের দিন নরেন্দ্রনাথ (স্বামীজী) ও বাবুরামের (স্বামী প্রেমানন্দ) সহিত সাক্ষাৎ হয়। ১৮৮৪ খৃঃ জ্যৈষ্ঠ অমাবস্যা ফলহারিণী কালীপূজার দিন যাওয়াতে ঠাকুর তেজুকে বলিলেন, 'আজ রাত্রে তোকে এখানে থাকতে হবে।' তেজচন্দ্র বলিয়াছিলেন—এদিকে উনি বলছেন, আর তখন বাড়ি ছেড়ে কোথাও কোন দিন থাকি-টাকি নি, মনে একটা বিষম অবস্থা হ'ল, 'কি-করি, কি-করি ভাব', মন তোলপাড় হ'তে লাগল। বললুম, 'মহাশয়, এখানে থাকব, কোথায় খাব?' ঠাকুর বলিলেন, 'সে তোর ভাবতে হবেনি, আমি তোকে খাওয়াব।' কাজেই থেকে গেলুম, হরি ও নারানকে দিয়ে বাড়িতে ব'লে পাঠালুম। রাত-দুপুরের সময় আমায় ডেকে নিয়ে কালী-ঘরে গেলেন। তারপর রাত ১টা-১॥ টার সময় খাওয়ালেন।

প্রথম দর্শনের দিন ঠাকুর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'বে করেছিস?' তেজু—'আজ্ঞে হাঁ'। ঠাকুর—'তা করেছিস, করেছিস।' কালীপূজার দিন ঠাকুর তাঁহাকে বলেন, 'তোকে আর আসতে হবেনি, বেশী ছেলে-পুলেও হবেনি।'

ঘরে আসিয়া সব ছবি দেখাইয়া ঠাকুর তেজুকে ব'ললেন, 'তুই কি চাস?' তেজুর মনে উঠিল—টাকা চাই। তিনি চুপ করিয়া রহিলেন। ঠাকুর বলিলেন, 'আচ্ছা, আচ্ছা বুঝেছি, তুই কি চাস।' (তারপর ঘরের সব ছবি দেখাইয়া) 'এর ভিতর কোন্‌টি নিবি?' তেজু—'আপনার ঘরের জিনিস, আমি নেব না।'

শ্রীশ্রীঠাকুর যখন বসুপাড়ার বসুদের বাটী হইয়া বলরাম মন্দিরে যাইতেন, তখন তাঁহাকে ঐ ৩০ নং বাটীর সামনে দিয়া যাইতে হইত, কারণ উহাই একমাত্র পথ ছিল, শুনা যায়। শ্রীশ্রীঠাকুর ঐ বাটীর দরজার গোড়ায় দাঁড়াইয়া তেজচন্দ্রকে ডাকিয়া খাবার খাওয়াইয়া যাইতেন।

পিতা প্রথম প্রথম ঠাকুরের নিকট তেজচন্দ্রের যাওয়া পছন্দ করিতেন না, কিন্তু যখন ঠাকুর বসুপাড়ায় দীনু বসুদের বাটীতে শুভাগমন করিতে লাগিলেন, তখন হইতে ক্রমশঃ খবর লইয়া তিনি আর আপত্তি করেন নাই। শ্রীশ্রীরঘুনাথ ছিলেন তাঁহার পিতার আরাধ্য দেবতা, তিনি ঐ নাম অহরহ উচ্চারণ করিতেন ও তাঁহাকেই সমস্ত নিবেদন করিতেন।

তেজচন্দ্র মাস্টার মহাশয়ের ছাত্র ছিলেন। ঠাকুর মাস্টার মহাশয়কে বলিয়াছিলেন, 'শুনলাম, তেজচন্দ্র নাকি বড় কথা কয় না, দেখ, তেজুকে শনি-মঙ্গলবার আসতে ব'লো।'

১৮৮৫ খৃঃ ফেব্রুআরি তেজচন্দ্র ঠাকুরের কাছে আসিয়া বসিলেন, কিছু পরে মাস্টার মহাশয়কে ফিস ফিস করিয়া বলিতেছেন, 'আমায় যেতে হবে।' ঠাকুর বলিলেন, 'ও কি বলে হে?' 'বাড়িতে যেতে হবে, তাই বলছে।'

ঠাকুর—'আমি ওদের এত টানি কেন? ওরা নির্মল আধার, বিষয়-বুদ্ধি ঢোকেনি। বিষয়-বুদ্ধি থাকলে উপদেশ ধারণা করতে পারে না। নূতন হাঁড়িতে দুধ রাখা যায়, দই-পাতা হাঁড়িতে দুধ রাখলে দুধ নষ্ট হয়। রশুনগোলা বাটি হাজার ধোও, রশুনের গন্ধ যায় না।'

১৮৮৫ খৃঃ ১৩ই জুলাই: ঠাকুর তেজুকে বলিতেছেন, 'তোকে এত ডেকে পাঠাই, আসিস না কেন? আচ্ছা ধ্যানট্যান করিস, তা হলেই আমি খুশী হবো, আমি তোকে আপনার ব'লে জানি, তাই ডাকি।'

তেজচন্দ্র ৪৯ বৎসর বয়সে বাগবাজার রামকান্ত বসু স্ট্রীটে ৭৫নং ভাড়া বাটীতে সাধু ও ভক্ত পরিবৃত হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম শুনিতে শুনিতে গঙ্গালাভ করেন (তারিখ ১৬.৯.১২)। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব হইতেই তিনি জপ-ধ্যান অত্যন্ত বাড়াইয়াছিলেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের ছবির সামনে বসিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিবাহিত করিতেন, কোন প্রশ্ন করিলে হাসিতেন ও বলিতেন, সময়ে ইহার তাৎপর্য বুঝিতে পারিবে, এই আমার বিশ্বাস। তোমাদের জন্য বিষয়-বৈভব বা অর্থাদি রাখিয়া যাইতে পারিলাম না, কিন্তু একজন তোমাদের পিছনে রহিলেন।

তেজচন্দ্র ও তাঁহার স্ত্রী অনেকবার শ্রীশ্রীমায়ের দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার স্ত্রীকে শ্রীশ্রীমা 'বৌমা' বলিয়া ডাকিতেন।

* * *

ঠাকুরের সঙ্গলাভ হইতেই তিনি তাঁহার নিজের কোন ফটো বা ছবি কখনও রাখিতেন না, বলিতেন, 'এই খাঁচাটার আবার চিহ্ন রাখা কেন? ঘরে থাকলেই সারা জীবন দেখে কেবল শোক-প্রকাশ হা-হুতাশ বই তো নয়? এমন কি যদি অবস্থায় না কুলায়, আমার শ্রাদ্ধাদি কার্যও করবার দরকার নেই, শ্রীশ্রীঠাকুরকে স্মরণ করলেই সমস্ত হবে।'

এখন দু-একটি অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ করিব, একবার তিনি একজনের গচ্ছিত টাকা ফিরাইয়া দিবার জন্য বাহির হন, কিন্তু দৈব দুর্বিপাকে ঐ টাকা পকেট হইতে পড়িয়া যায়, অথচ বাটীতে এমন টাকা সঞ্চিত ছিল না, যাহা হইতে সেইদিনই তাহাকে টাকা ফেরত দেওয়া যায়। অথচ ঐ দিন তাহাকে না দিতে পারিলে বিশেষভাবে অপমানিত হইবে, অন্য কোন উপায় না দেখিয়া তিনি গঙ্গার ধারে বসিয়া ঠাকুরের নিকট ব্যাকুল ভাবে মনোবেদনা জানাইতে লাগিলেন ও মনে মনে সংকল্প করিলেন, বাটীতেও আর প্রবেশ করিবেন না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব্যাকুল প্রার্থনা ও চক্ষের জলে মনোবেদনা নিবেদন করার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বলিয়া দিলেন, 'এই অর্থের জন্য এত কাতর হচ্ছিস কেন? তোর সামনে জলের ধারে কিনারায় ঐ যে সব ইট-পাথর পড়ে আছে, তা সরিয়ে দেখ।' তিনি প্রথম ভাবিলেন, ইহা মনের ভুল, অনেক চিন্তার পর যাহা হউক দেখা যাক, মনে করিয়া যেমন নামিয়া গিয়া সামনের ইট সরাইয়াছেন, দেখেন, সেই টাকার নোট

রহিয়াছে, একটুও জল-কাদার দাগ লাগে নাই, তখনই তাহা উঠাইয়া লইলেন।

পূর্বে বেলুড় মঠে যখন উৎসবাদি হইত, তখন বেলুড় যাইবার জন্য আহিরীটোলা ঘাট হইতে বড় বড় ষ্টীমার ছাড়িত, তাহাতে অসম্ভব ভিড় হইত। সেইরূপ উৎসবের সময় কয়েকজন ভক্তের সঙ্গে তেজচন্দ্র বেলুড় যাইতেছেন। একজন যাত্রীর সঙ্গে ৫।৬ বৎসরের একটি ছেলে ছিল, বাপের হাত ছাড়িয়া ছেলেটি হঠাৎ গঙ্গায় পড়িয়া যাওয়ায় সকলেই 'হায় হায়' করিয়া উঠিল, কিন্তু কেহই সাহস করিল না, প্রায় সকলেই তাহার আশা ছাড়িয়া দিল, দূরে ছেলেটি একবার হাত বাড়াইতেই তেজচন্দ্র নিজেকে সামলাইতে না পারিয়া 'জয় ঠাকুর' বলিয়া জলে ঝাঁপ দিলেন। জুতা জামা ঘড়ি যেমন পড়িয়াছিলেন, সেই অবস্থায় জলে পড়িলেন, সকলেই মনে করিল, হয়তো ইহার খুব আপনার জন, নয় মাথা খারাপ, অন্ততঃ জামা-জুতা খোলা উচিত ছিল। যাহা হউক, তিনি নিরাপদে সেই ছেলেটিকে উদ্ধার করিলেন, এমন কি তাঁহার পকেটের টাকাকড়ি কিছুরই ক্ষতি হয় নাই। সেইরূপ ভিজা অবস্থায় বাটীতে ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় কাপড় ছাড়িয়া রওনা হইলেন। সঙ্গীদের পরে বলিয়াছিলেন, ঠাকুর আমাকে প্রেরণা দিয়াছিলেন, তাই আমার পক্ষে ইহা সম্ভব হইয়াছে।

আর একটি ঘটনা: তিনি একবার অত্যন্ত কঠিন হাঁপানি-রোগে আক্রান্ত হন, রাত্রে নিদ্রা হইত না, রোগ বৃদ্ধি পাইত। শুনিয়াছি, তিনি সমস্ত রাত্রি খোলা ছাদের উপর দৌড়াদৌড়ি করিতেন। অনেক ডাক্তার-বৈদ্যের পরামর্শে কিছুই উপকার হইল না, তখন প্রায় সারা রাত ঠাকুরকে স্মরণ করিতেন, ও তাঁহার চরণে কষ্ট-লাঘবের কথা নিবেদন করিতেন। এইরূপ অবস্থায় দৈবাৎ এক সাধু দরজায় উপস্থিত হইয়া ও তাঁহাকে ইঙ্গিতে ডাকিয়া বলিলেন, 'তুই রোগে কষ্ট পাচ্ছিস, এই ঔষধটি নে, সেবন করলেই আরাম হবে।'

তাহাতে তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি দিতে হবে?' 'কিছুই দিতে হবে না' বলিয়া সাধু তাঁহাকে ঔষধটি দিলেন। তেজচন্দ্র মনে করিয়াছিলেন, পয়সা আদায়ের জন্য সাধু এইরূপ করিতেছে, বলিলেন, 'আবার কবে দেখা পাব?' 'সময় হ'লে দেখা পাবি' বলিয়া সাধু চলিয়া গেলেন। তিনি ঔষধটি রাখিয়া দিলেন ও মনে মনে সন্দেহ হইতে লাগিল, ঔষধটির বিষয়ে ডাক্তার-কবিরাজের মত লইলেন, তাঁহারা একেবারে নিষেধ করিলেন, ও উহাতে আরও খারাপ হইতে পারে বলিলেন। কাজে কাজেই ঔষধটি ঘরে পড়িয়া রহিল, দুই-একদিন পরে ঠাকুর স্বপ্নে দেখা দিয়া বলিলেন, 'এখনও অবিশ্বাস!' এইরূপ আদেশ পাইবামাত্র তিনি লুকাইয়া ঘরের বারান্দায় বসিয়া ঔষধটি খাইলেন। সেই দিন হইতে তাঁহার সেই ব্যারাম একেবারে তিরোহিত হইল।

তাঁহার শেষ নিঃশ্বাস বহির্গত হইবার সময়ে মায়ের বাটীতে শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন, 'আমার এক ভক্তের দেহ যাইতেছে, শীঘ্র চরণামৃত নিয়ে যাও।' অন্তিম কালে তিনিও যেন সেইটুকু পাইবার জন্য অপেক্ষা করিতে-ছিলেন, চরণামৃত গলাধঃকরণ হইবামাত্র সমস্ত দেহ স্থির হইয়া গেল। সেই সময় শ্রীশ্রীমা শরৎ মহারাজকে বলিয়াছিলেন, 'কেন শরৎ তেজচন্দ্রের জন্য তোমরা এত চেষ্টা ক'রছ? ঠাকুর যে তাকে টেনে নিচ্ছেন!'

স্বামী বিবেকানন্দের রাষ্ট্রচিন্তা

শ্রীকল্যাণ সেন

স্বামী বিবেকানন্দের কর্মময় জীবন ও বৈচিত্র্যময় চিন্তারাশি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, স্বদেশচিন্তা স্বামীজীর জীবনে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিল। স্বল্প জীবনের সীমিত পরিধির মধ্যে তিনি দেশের মুক্তি ও মঙ্গল চিন্তা করিয়াছিলেন। এই সৈনিক-সন্ন্যাসীর বিভিন্ন রচনা ও বক্তৃতাবলী অনেক রাজনৈতিক নেতার মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল। স্বামীজী যদিও কোন রাজনীতিক বক্তৃতা দেন নাই, তথাপি তাঁহার রচনাবলী পাঠের ফলে ভারতীয় যুবকগণ দেশের অতীত ঐতিহ্য ও গরিমা বিষয়ে সচেতন হইয়াছিল। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মতে স্বামীজী আধুনিক জাতীয় আন্দোলনের ধর্মগুরু। স্বামীজীর ভয়হীন স্বদেশপ্রেম জাতীয় আন্দোলনে একটি নূতন-ভাবের প্রেরণা দিয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে 'The monk and the patriot were curiously blended in him.'[১]

স্বামীজীর এই দেশপ্রেম তাঁহার বাল্যকাল হইতেই বর্তমান ছিল। সম্প্রতি পরলোকগত ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বর্তমান লেখককে বলিয়াছিলেন, 'স্বামীজী সাত-আট বৎসর বয়স হইতেই নবগোপাল মিত্রের আখড়ায় যাতায়াত করিতেন।' তীব্র দেশপ্রেমের জন্য নবগোপাল 'ন্যাশনাল মিত্র' নামে খ্যাত ছিলেন।

বাল্যকালে তিনি যে সকল পুস্তক পাঠ করিতেন, তাহার মধ্যে 'বঙ্গাধিপের পরাজয়' এবং গ্যারিবল্ডি ও ম্যাৎসিনির জীবনীর বিশেষ প্রভাব ছিল। শৈশবের এই স্বদেশমমতা তাঁহার উত্তর জীবনে স্বাভাবিক ও সহজ ভাবেই বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ধর্ম-জীবনের অনন্যসাধারণ বিকাশ এই দেশপ্রেমকে আচ্ছাদিত করিতে পারে নাই।

তাঁহার একটি পত্রে তিনি শ্রীহরিদাস বিহারীদাসকে লিখিয়াছিলেন, 'my greatest fault is that I love my country only too well.'[২]—অর্থাৎ আমার সবচেয়ে বড় দোষ আমি দেশকে অত্যধিক ভালবাসি। বিভিন্ন স্থানে, উত্তরকালে তাঁহার অনেক ভাষণ ও বক্তৃতায় এই ভারত-প্রীতি উজ্জ্বলভাবে প্রকটিত হইয়াছে। ভগিনী নিবেদিতা মন্তব্য করিয়াছেন, 'the thought of India was to him like the air he breathed.'[৩] অর্থাৎ ভারত-চিন্তা তাঁহার নিকট প্রাণবায়ু-স্বরূপ ছিল। এই উক্তিটিতে স্বামীজীর ঐকান্তিক স্বদেশপ্রীতি বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। উত্তর কালে যখন স্বামীজীর ভক্ত জোসেফিন ম্যাকলাউড তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'স্বামীজী, আমি কিভাবে আপনাকে সাহায্য করিতে পারি ?' স্বামীজী উত্তরে বলিয়াছিলেন, 'ভারতকে ভালবাসো।'[৪]

স্বামীজীর স্বদেশচিন্তার ভাবধারা বিশ্লেষণ করিলে প্রথমেই যে জিনিসটি প্রকটিত হয়, তাহা

---

১ *The Rise and the Growth of the Congress in India.*—C. F. Andrews and Girija Mookherjee—p. 45.

২ *The Complete Works*—Vol. VIII p. 309

৩ *The Master As I Saw Him*—p. 65

৪ *Reminiscences of Swami Vivekananda*—p. 252.

জনসাধারণের উন্নতির জন্য তাঁহার ব্যগ্রতা। বিশাল ভারতভূমির মূল শক্তি ইহার সাধারণ অধিবাসী। যাহাদের উন্নতিতে দেশের মঙ্গল, যাহাদের পতনে দেশের অধঃপতন। এই মহান্ সত্যের নির্ভুল উপলব্ধির প্রমাণ স্বামীজীর রচনায় সর্বত্র বর্তমান। পাশ্চাত্য দেশে তাঁহার ধর্মপ্রচারের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল এই জনপ্রেম। স্বামীজী নিজেই বলিয়াছেন, 'One of the objects of my going to the West to preach religion, was to see if I could find any means for feeding the people of the country'.[৫]—পাশ্চাত্য দেশে ধর্মপ্রচার করিতে যাইবার আমার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল এই দেশের জনগণ যাহাতে ভরপেট খাইতে পায়, তাহার উপায় সন্ধান করা। সাধারণ দরিদ্র দেশবাসীর উপরই তাঁহার বিশ্বাস ছিল সর্বাধিক। দেশের প্রকৃত অধিবাসী এই দরিদ্র জনসাধারণ। ধনী বা অভিজাত সম্প্রদায়ের উপর তাঁহার আস্থা ছিল না। তাহাদের উদ্দেশ্যে তাই তিনি বলিয়াছেন: আর্য-বাবাগণের জাঁকই কর, প্রাচীন ভারতের গৌরব ঘোষণা দিনরাতই কর, আর যতই কেন তোমরা 'ডমমম' ব'লে ডম্ফই কর, তোমরা উচ্চ বর্ণেরা কি বেঁচে আছ? তোমরা হচ্চ দশহাজার বছরের মমি!![৬]

দেশের গঠনমূলক কর্মীদের তাই স্বামীজী গরীব ভারতবাসীর সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করিতে বলিয়াছেন। পাশ্চাত্য দেশেও তিনি বলিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষের জনগণকে শিক্ষিত করিবার, তাহাদের হৃত ব্যক্তিত্ব ফিরাইয়া দিবার উদ্দেশ্যেই তিনি বিদেশে আসিয়াছেন। অপিচ স্বামীজী এ-কথাও বলিতেন যে, পাশ্চাত্য দেশের দরিদ্র সম্প্রদায় অপেক্ষা আমাদের দরিদ্র ব্যক্তিরা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। তাই তাহাদের উন্নতি-সাধনও সহজ। 'The one thing that is at the root of all evils in India is the condition of the poor. The poor in the West are devils, compared to them ours are angels, and it is therefore so much the easier to raise our poor.......It is this idea that has been in my mind for a long time. I could not accomplish it in India, and that was the reason of my coming to this country.'[৭]

এই অগণিত নর-নারায়ণের দুঃখ-আর্তি তাঁহাকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বিচলিত করিয়াছে। তাই তাঁহার স্বপ্নের 'নতুন ভারত' এই সাধারণ শ্রেণীর দুঃখ-নিরসনের উপর প্রতিষ্ঠিত। যে ভারতে দারিদ্র্য বিদূরিত, সেই ভারতই তাঁর কাম্য ছিল।

পদপিষ্ট বিরাট্ জনসাধারণের জাগরণই নতুন ভারত সৃষ্টি করিবে। এই ভারতবর্ষ সম্ভব করিতে হইলে দীর্ঘকালের আবর্জনা ও বিঘ্নের অপসারণ প্রয়োজন। তাই স্বামীজী বলিয়াছেন:

'তোমরা শূন্যে বিলীন হও আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল ধরে, চাষার কুটীর ভেদ ক'রে, জেলে-মালা-মুচি-মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হ'তে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড়-জঙ্গল, পাহাড়-পর্বত থেকে। এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে, নীরবে সয়েছে,—তাতে পেয়েছে অপূর্ব সহিষ্ণুতা। সনাতন দুঃখ ভোগ করেছে,—তাতে পেয়েছে অটল জীবনীশক্তি। এরা একমুঠো

৫ *Complete Works* Vol. VII—p. 243

৬ পরিব্রাজক—পৃঃ ৪১

৭ *Complete Works* Vol. IV—p. 362

ছাতু খেয়ে দুনিয়া উলটে দিতে পারবে; আধখানা রুটি পেলে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরবে না; এরা রক্তবীজের প্রাণসম্পন্ন।...... অতীতের কঙ্কালচয়—এই সামনে তোমার উত্তরাধিকারী, ভবিষ্যৎ ভারত।'[৮]

আলোচ্য ছত্রগুলি স্বামীজী-কল্পিত নব-ভারতের উজ্জ্বল আভাস দেয়। গান্ধীজীর 'রামরাজ্য' ও 'হরিজন' আন্দোলনের প্রেরণা বোধহয় স্বামীজীর এই আদর্শ হইতেই গৃহীত। এই ভারতবর্ষের আদর্শ রূপায়িত করিবার দায়িত্ব স্বামীজী তাঁহার অনুবর্তিগণের উপর দিয়া গিয়াছেন। জনগণের সমর্থন ও সাহায্য না পাইলে রাজনীতিক আন্দোলন সফল হইতে পারে না। যাহারা দীর্ঘকাল অন্যায় ও অসাম্যের শিকার হইয়াছে, তাহাদিগকে স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত না করিলে কোন প্রচেষ্টা সার্থক হয় না। এই সাধারণ সত্য অনেক আন্দোলনের নায়কই বুঝিতে পারেন নাই।

স্বামীজীর এই জনজাগরণের প্রচেষ্টা কাহারও কাহারও মতে সাম্যবাদ-আন্দোলনের অনুরূপ প্রয়াস। এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, স্বামীজীর আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গী রুশীয় সাম্যবাদের অনুরূপ বা অনুকূল নহে।

১৮৮৬ খৃঃ কাশীপুর বাগানবাড়িতে পীড়িত থাকাকালে শ্রীরামকৃষ্ণদেব একটি কাগজে লিখিয়াছিলেন, 'নরেন্দ্র শিক্ষা দেবে'। এই লোকশিক্ষার জন্যই নরেন্দ্রকে তিনি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। গুরুর আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়াই স্বামীজী কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। অদ্বৈত-বেদান্তবাদী সন্ন্যাসী হইয়াও স্বামীজী কেন লোক-শিক্ষায় প্রয়াসী হইয়াছিলেন? এই প্রয়াসের মূলে কি শুধু 'Proletocult' (জন-সংস্কৃতি)-এর অনুপ্রেরণা?

সামান্য চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে বেদান্ত-বিশ্বাসই স্বামীজীর এই কর্মসমূহের মূল কারণ। বেদান্তের মতে প্রতিটি মানুষের মধ্যেই ঐশী শক্তির বিকাশের সম্ভাবনা, প্রত্যেক মানুষই স্বরূপতঃ পরব্রহ্ম। অন্তর্নিহিত ঐ শক্তির বিকাশে সাহায্য করার জন্য শিক্ষা সমাজ প্রভৃতির প্রয়োজন। স্বামীজীর সাম্যবাদ তাই সর্বদা বেদান্ত-ভিত্তিক। একই ব্রহ্ম বিভিন্ন আধারে বিভিন্ন ভাবে প্রকাশিত। তাই অপরের তুষ্টিতে নিজের তুষ্টি, অন্যের প্রীতি সাধনে নিজের হিতসাধন। ভারতবর্ষের সাম্যবাদ-বিষয়ে স্বামীজী নিজেই বলিয়াছেন, 'In India we have Social Communism, with the light of Advaita that is Spiritual individualism'.[৯]

নর-নারায়ণ-বিষয়ে স্বামীজী তাঁহার 'The Living God'-শীর্ষক কবিতায় অতি সুন্দরভাবে নিজের মনোগত ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন; অনাসক্ত কর্মই বেদান্তবাদীর জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। ধর্মকে বাদ দিয়া কর্ম হইতে পারে না, সমাজসেবা তো নয়ই। 'এ দেশের প্রাণ ধর্ম, ভাষা ধর্ম, ভাব ধর্ম; আর তোমার রাজনীতি, সমাজনীতি, রাস্তা ঝেঁটানো, প্লেগ-নিবারণ, দুর্ভিক্ষগ্রস্তকে অন্নদান, এ-সব চিরকাল এ দেশে যা হয়েছে তাই হবে, অর্থাৎ ধর্মের মধ্য দিয়ে হয়তো হবে; নইলে ঘোড়ার ডিম, তোমার চেঁচামেচিই সার, রামচন্দ্র!'[১০] স্বামীজীর রাষ্ট্রচিন্তা তাই বেদান্তাশ্রয়ী। লোক-পালন জীবনের উদ্দেশ্য, কিন্তু ইহা 'Proletocult'র অনুবৃত্তি নয়, শ্রীরামকৃষ্ণের অনুজ্ঞার অনুবর্তন। বড়কে নীচু তলায় লইয়া আসা নয়, নীচুকে উপর তলায় প্রতিষ্ঠিত করা—

৮ পরিব্রাজক—পৃঃ ৪২-৪৩

৯ *Complete Works* Vol VIII—p. 269

১০ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পৃ ২৩

স্বামীজী এই সার সত্য হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। উত্তরকালে ভগিনী নিবেদিতা ও অনেকে এই আদর্শ জীবনে গ্রহণ করিয়াছেন।

স্বামীজী শুধু অভীষ্ট বিষয়ে আলোচনা করিয়া ক্ষান্ত ছিলেন না, উপায়ও নির্ধারণ করিয়াছেন। আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করিবার জন্য তিনি মঠ-স্থাপনের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। ঐ মঠ স্বার্থত্যাগী, আত্মসুখে উদাসীন ব্যক্তিগণের প্রচেষ্টায় চলিবে। এই মঠে শিক্ষাপ্রাপ্ত সন্ন্যাসিবৃন্দ বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ-পূর্বক জনগণকে তাহাদের সমস্যা-বিষয়ে অবহিত করিবে। মঠের সন্ন্যাসিবৃন্দের অন্যতম উদ্দেশ্য হইবে—ধর্মের গুহাহিত সত্য-বিষয়ে সাধারণকে সচেতন করা। তাই সন্ন্যাসিগণ '(will) explain to them as clearly as possible, in very simple and easy language the higher truths of religion.'[১১] 'Proletocult'-আন্দোলনে 'higher truths of religion'-র কোন স্থান আছে কি?

প্রকৃত আন্তরিকতা ব্যতীত কোন কর্মে সিদ্ধি আসে না। তাই স্বামীজী দ্বিতীয় পর্যায়ে সাফল্যের উপায়-বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। স্বামীজীর মতে কোন দেশ বা জাতিকে বড় হইতে হইলে তিনটি জিনিসের প্রয়োজন: (১) সততায় আস্থা, (২) পরস্পর দ্বেষ ও সন্দেহের অভাব, (৩) কল্যাণকামী ও কল্যাণ-কারীর হিতপ্রয়াস। আমাদের দেশবাসীর উন্নতি-বিষয়ে আলোচনা-প্রসঙ্গে স্বামীজী বলিয়াছেন যে, রাজনীতিক সাফল্য অর্জন করিতে হইলে আমাদের বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন ভাব বর্জন করিয়া ঐক্যবদ্ধ ও সংহত হইতে হইবে। আমাদের এই ঐক্যহীনতাই আমাদের পরাধীন করিয়াছে। 'Why was it so easy for the English to conquer India? It was because they are a nation, we are not.'[১২] স্বামীজীর এই উক্তির সঙ্গে কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির ভাষণের বিশেষ সঙ্গতি আছে। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীরাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় মন্তব্য করিয়াছিলেন: 'It has been the dream of my life that the scattered units of my race may someday coalesce and come together; that instead of living merely as individuals we may someday so combine as to live as a nation.'[১৩]

স্বামীজীর রাষ্ট্রচিন্তা আলোচনা করিয়া এই কথাই মনে হয় যে, আমাদের এই বিশাল দেশের দুর্দশা-দৈন্য-বিষয়ে তিনি সদাসর্বদা অবহিত থাকিতেন। দশের মঙ্গলে দেশের মঙ্গল, তাই তিনি পতিত-অবহেলিতের উন্নতিতে ছিলেন আস্থাবান্। সেবাধর্ম সকল ধর্মের সার, আর এই সেবার মাধ্যমেই আত্মোন্নতি ও সকলের উন্নতি। অপিচ আমাদের স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, বিগত শতাব্দীতে ভারতবর্ষের কথা ভারতের বাহিরে যাঁহারা প্রচার করিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেই ইংরেজ-শাসনের অনুরাগী। ইংরেজের সাহায্যেই তাঁহারা দেশের উন্নতি কামনা করিয়াছিলেন। স্বামীজীর স্বপ্ন ছিল স্বাধীন ভারত।

বিদেশে ভারতের কথা স্বামীজী অতিশয় কৃতিত্বের সহিত প্রচার করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডে, আমেরিকায়, ফ্রান্সে সর্বত্র স্বামীজী কিরূপ সাফল্য লাভ করিয়াছেন, তাহা আজ

---

১১ *Complete Works* Vol. V—p. 296

১২ *Complete Works* Vol. VIII—p. 306

১৩ *Indian National Congress*—G. A. Natesan and Co.

সর্বজন-বিদিত। স্বামীজী কোনদিন রাজনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করেন নাই। তদানীন্তন অনেক রাজনীতিক আন্দোলনের নেতা স্বামীজীর কাছে গিয়া দেশের সমস্যা আলোচনা করিতে আসিতেন। এই প্রসঙ্গে একজন বিখ্যাত বিপ্লবী লিখিয়াছেন: 'তিনি নিজে রাজনীতি করেননি, কিন্তু রাজনীতির আত্মদানমূলক আন্দোলনকে গোড়ার দিকটায় তিনি ছেয়ে ছিলেন।'[১৪]

---

১৪ বিপ্লবী-জীবনের স্মৃতি ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়—পৃঃ ১২২-২৩

মেঘদূত

শ্রীমতী প্রীতিময়ী কর

জীবন-আকাশে প্রথম আষাঢ় নামে
নিবিড় আঁধারে ঘনায় বরষা ঘোর,
সেদিন প্রথম শুধাইনু আপনারে,
কোথা প্রিয়তম? শূন্য যে গৃহ মোর!

সাজানো ধরণী ফুলে-ফলে রসে-গানে,
কত ধনে-জনে হাসি-কলরবে ভরা,
চিরবিরহী যে তুমি তারি মাঝখানে
প্রথম আষাঢ়ে এ-কথা পড়িল ধরা।

সেদিন প্রথম বাহিরিলে তুমি পথে,
খুঁজিতে তাহারে তৃষাতুর মনোমেঘ!
করি আরোহণ আশার স্বর্ণরথে,
তোমার চলার অশান্ত সে গতিবেগ।

কত যুগ কাল পার হয়ে গেল তায়
সেই অজানার আজো না মিলিল দিশা,
বকুল-গন্ধে বৃথাই কাঁদিল হায়,—
বরষে বরষে প্রথম আষাঢ়-নিশা।

চরণের ধ্বনি শুনি' গেল দিন,
উতলা বাতাসে বন-মর্মর মাঝে,
বসন্ত-বেলা অবসানে হ'ল লীন
মাধবীর মালা মরমে মরিল লাজে।

বৃথা হয়ে গেল ঘাটে ঘাটে তরী বাঁধা,
হৃদয়-পশরা হেলায় পড়িয়া রহে,
ভুবন ঘুরিয়া সার হ'ল শুধু কাঁদা;
অচেনা বন্ধু কানে কানে আসি কহে।

হতাশ পথিক! আঁখির বাঁধন খোলো,
অন্তর-পুরে গোপন বিজন ঘরে,
ফিরে এস, চির মিলনাভিসারে চলো,
সেথায় বিরহী জাগিছে তোমারি তরে।

বহিতে হবে না হৃদয়-বেদনা বোঝা,
ভিখারীর বেশে ফিরিবে না বারে বারে,
শেষ হয়ে যাবে অন্ধ নয়নে খোঁজা,
শূন্য ভরিবে পূর্ণতা-পারাবারে।

ভারতপ্রসঙ্গে

স্বামী বিবেকানন্দ

ভারতের রীতিনীতি

[বৃহস্পতিবার, ১৫ই ফেব্রুআরি, ১৮৯৪ খৃ: ডেট্রয়েটে প্রদত্ত একটি বক্তৃতার বিবরণী—'ডেট্রয়েট ফ্রী প্রেসের' সম্পাদকীয় মন্তব্য-সহ]

গত রাত্রে ইউনিটেরিয়ান চার্চে হল-ভরতি শ্রোতৃবৃন্দ খ্যাতনামা সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক তাঁর দেশের রীতিনীতি ও প্রথা সম্পর্কে প্রদত্ত ভাষণ শ্রবণ করে। তাঁর বাগ্মিতা ও মধুর ব্যবহারে শ্রোতারা আনন্দিত হয়; তারা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত গভীর মনোযোগের সঙ্গে তাঁর বক্তৃতা শোনে এবং মাঝে মাঝে উচ্চ করতালি-ধ্বনিতে তাদের সমর্থন জ্ঞাপন করে। চিকাগো ধর্মমহাসভায় প্রদত্ত সুবিখ্যাত বক্তৃতার চেয়েও তাঁর এই বক্তৃতাটির বিষয়বস্তু ছিল অধিকতর জনপ্রিয়; ভাষণটি খুবই চিত্তাকর্ষক হয়েছিল, বিশেষত: সেই অংশগুলি, যেখানে বক্তা উপদেশমূলক প্রসঙ্গ ত্যাগ ক'রে তাঁর স্বদেশবাসীদের কতকগুলি আধ্যাত্মিক অবস্থার সুনিপুণ বর্ণনা দিচ্ছিলেন। ধর্মীয় ও দার্শনিক (এবং অবশ্যই আধ্যাত্মিক) প্রসঙ্গেই এই প্রাচ্যদেশীয় ভ্রাতা সর্বাপেক্ষা হৃদয়গ্রাহী এবং যখন তিনি প্রকৃতির মহৎ ও সহজ নৈতিক নিয়মের বিবেকসম্মত কর্তব্যের কথা বলছিলেন, তখন তাঁর নিয়ন্ত্রিত কোমল কণ্ঠস্বর (যা তাঁর জাতির একটি বৈশিষ্ট্য) এবং তাঁর রোমাঞ্চকর ভঙ্গি অনেকটা একজন প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তির মতোই মনে হচ্ছিল। শ্রোতাদের নিকট কোন নৈতিক সত্য উপস্থাপনের সময় ছাড়া তাঁর বক্তৃতায় সুস্পষ্ট চিন্তাশীলতা প্রকাশ পায়, কিন্তু নৈতিক সত্য উপস্থাপনের সময় তাঁর বাগ্মিতায় চরমোৎকর্ষ দেখা যায়।

এটা কিছুটা অদ্ভুত মনে হয়েছিল, প্রাচ্যদেশীয় সন্ন্যাসী ভারতবর্ষে খ্রীষ্টান চার্চের ধর্মপ্রচার-কার্যের এরূপ প্রকাশ্য সমালোচনা ক'রে থাকেন। তিনি দৃঢ়ভাবে বলেন, ভারতে নৈতিকতার মান পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে উঁচুতে। তাঁকে পরিচয় করিয়ে দিলেন বিশপ নিন্‌ডে (Bishop Ninde),—জুন মাসে বিদেশস্থ খ্রীষ্টান মিশনের কাজে তাঁর চীনযাত্রার কথা। বিশপ ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত সেখানে থাকবেন আশা করেন; যদি অধিককাল থাকতে হয়, তা হ'লে তিনি ভারতে যাবেন। সানন্দচিত্তে বিবেকানন্দের পরিচয় প্রদান ক'রে তিনি ভারতবর্ষের বিস্ময়কর বস্তু ও সেখানকার শিক্ষিত শ্রেণীর বুদ্ধির উৎকর্ষ সম্বন্ধে উল্লেখ করেন। পাগড়ি মাথায় ও উজ্জ্বল আলখাল্লা-পরা এবং বুদ্ধিদীপ্ত চক্ষুবিশিষ্ট সেই শ্যামবর্ণ ভদ্রমহোদয় যখন উঠে দাঁড়ালেন, তখন সকলের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল এক মনোমুগ্ধকর মূর্তি। বিশপের সহৃদয় বাক্যের জন্য তিনি তাঁকে ধন্যবাদ জানালেন এবং তাঁর স্বদেশের জাতিভেদ, লোকের আচার-ব্যবহার ও ভাষার বিভিন্নতা সম্বন্ধে আলোচনা করতে প্রবৃত্ত হলেন :

মূলত: উত্তর ভারতে চারটি ভাষা এবং দক্ষিণভারতে চারটি, কিন্তু ধর্ম উভয়ত্র এক। ত্রিশ কোটি লোকের মধ্যে পাঁচ ভাগের চার ভাগই হিন্দু এবং এই হিন্দু জাতিটি কিছুটা অদ্ভুত। ধর্মীয় রীতি অনুসারে হিন্দু সব কাজ

করে; ধর্মনিষ্ঠার সঙ্গে সে আহার করে, প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করে, ধর্মের নির্দেশ অনুসারে সে সৎকর্ম করে এবং অসৎ কাজও করে ধর্মভাবে।

এই সময়ে বক্তা তাঁর ভাষণের শ্রেষ্ঠ নৈতিক সার কথাটি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন: তাঁর স্বদেশবাসীদের বিশ্বাস—সকল স্বার্থশূন্য কাজই সৎ এবং সকল স্বার্থপরতাই অসৎ। এই বিষয়টির উপরই বরাবর জোর দিয়েছেন এবং বলা যায় যে, এটাই ছিল তাঁর ভাষণের মূল বক্তব্য। হিন্দুর মতে গৃহনির্মাণ স্বার্থপরতা: অতএব হিন্দু গৃহনির্মাণ করে ঈশ্বরোপাসনা এবং অতিথিসেবার জন্য। নিজের জন্য আহার্য-রন্ধন স্বার্থপরতা; তাই সে রন্ধন করে দরিদ্রসেবার জন্য; যদি কোন ক্ষুধার্ত আগন্তুক প্রার্থী আসে, তবে আগে তার সেবা ক'রে অবশেষে সে নিজে আহার্য গ্রহণ করে—এই ভাবটি দেশের সর্বত্র বিরাজ করছে। যে কেউ খাদ্য ও আশ্রয়ের প্রার্থী হোক না কেন, সব দরজাই তার জন্য খোলা থাকবে।

জাতিভেদ-প্রথার সঙ্গে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। লোকের বৃত্তি বংশগত—একজন ছুতোর মিস্ত্রীর ছেলে ছুতোর মিস্ত্রী হয়েই জন্মায়; স্বর্ণকারের ছেলে স্বর্ণকার, কারিগরের ছেলে কারিগর, এবং পুরোহিতের ছেলে পুরোহিত। তবে এই সামাজিক দোষ ত্রুটি অপেক্ষাকৃত আধুনিককালের, এ প্রায় এক হাজার বছর ধরে চলে আসছে মাত্র, কালের এই পরিমাণ ভারতে খুব দীর্ঘ ব'লে বিবেচিত হয় না, যেমন মনে করা হয় এদেশে বা অন্য সকল দেশে।

দু-রকমের দান বিশেষভাবে সমাদৃত—শিক্ষাদান এবং জীবনদান। কিন্তু শিক্ষাদানই অগ্রাধিকার লাভ করে। একজন মানুষের জীবন রক্ষা করা খুব ভাল; তাকে শিক্ষাদান করা তার চেয়ে ভাল। অর্থের জন্য শিক্ষা দেওয়া গর্হিত কাজ এবং যে ব্যক্তি ব্যবসার সামগ্রীর মতো শিক্ষার বিনিময়ে কাঞ্চন গ্রহণ করে, তার উপর ধিক্কার বর্ষিত হয়। সরকার মাঝে মাঝে শিক্ষকদের সাহায্য ক'রে থাকে, তার ফলে তথাকথিত সভ্যদেশগুলিতে যে পরিবেশ বজায় আছে, এখানে তার অনুরূপ পরিবেশ সৃষ্ট হ'লে যা হ'তে পারত, নৈতিক ফলাফল তার চেয়ে শুভকর হয়েছে।

বক্তা দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত জিজ্ঞাসা ক'রে বেড়িয়েছেন, সভ্যতার সংজ্ঞা কি? প্রশ্নটি তিনি আরও বহু দেশে জিজ্ঞাসা করেছেন। কখনও উত্তর পেয়েছেন: 'আমরাই হলাম সভ্যতার মাপকাঠি।' তিনি সবিনয়ে জানান যে, শব্দটির সংজ্ঞা সম্বন্ধে তাঁর মত অন্য রকম। কোন জাতি হয়তো প্রাকৃতিক শক্তিকে বশীভূত করতে পারে, জনহিতকর প্রয়োজনীয় সমস্যাগুলির প্রায় সমাধান ক'রে ফেলতে পারে, তথাপি এ-কথা তার বোধগম্য না হ'তে পারে যে, যে ব্যক্তি নিজেকে জয় করার শিক্ষালাভ করেছে, সেই ব্যক্তি-বিশেষের মধ্যেই সর্বোৎকৃষ্ট সভ্যতা পরিস্ফুট। পৃথিবীর যে-কোন দেশের চেয়ে এই পরিবেশটি ভারতে অধিক বর্তমান, কারণ সেখানে বস্তুগত পরিবেশ আধ্যাত্মিক পরিবেশের অধীন এবং প্রত্যেকেই সকল প্রাণীর মধ্যে আত্মার প্রকাশ দেখতে সচেষ্ট এবং প্রকৃতিকেও একই ভাবে দেখে। এখানেই দেখা যায়—ভাগ্যের নির্দয় পরিহাসকে অবিচল ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করার মতো ধীর মনোভাব; এই অবস্থায় অন্য যে-কোন জাতির চেয়ে এখানে অধিক আধ্যাত্মিক শক্তি ও জ্ঞানের অধিকতর উন্মেষ ঘটেছে। এই দেশ ও জাতির ভেতর থেকে একটি

অক্ষুরন্ত স্রোতের ধারা বয়ে চলেছে, যা দেশ-বিদেশের বহু চিন্তাশীল মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, এরা সহজেই ঘাড় থেকে পার্থিব বোঝা ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

খ্রীষ্টপূর্ব ২৬০ অব্দে যে প্রাচীন রাজা আদেশ করেছিলেন আর কোন রক্তপাত বা কোন যুদ্ধ করা চলবে না এবং যিনি সৈনিকের বদলে পাঠিয়েছিলেন একদল শিক্ষক, তিনি জ্ঞানীর মতোই কাজ করেছিলেন, যদিও বাস্তবতার দিক থেকে দেশকে তার ফলে খুব ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে হয়েছে। কিন্তু বল-প্রয়োগকারী বর্বর জাতিগুলির অধীনতা স্বীকার করলেও ভারতবাসীর আধ্যাত্মিকতা চিরকাল বেঁচে আছে এবং কারও সাধ্য নেই, তা কেড়ে নেয়। নিষ্ঠুর ভাগ্যের আঘাত সহ্য করার মতো ঈশাসুলভ নম্রতা আছে ভারতের মানুষের, এবং সেই সঙ্গে তাদের আত্মা উজ্জ্বলতর লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছে। এরূপ দেশে 'ভাব প্রচারের' জন্য কোন খ্রীষ্টান মিশনরীর প্রয়োজন নেই, কারণ ভারতের ধর্ম মানুষকে ধীর, মধুর, বিবেচক এবং মানুষ ও পশু নির্বিশেষে ভগবানের সৃষ্ট সকল প্রাণীর প্রতি প্রীতিসম্পন্ন ক'রে তোলে। বক্তা বলেন, নৈতিকতার দিক থেকে যুক্তরাষ্ট্র কিংবা পৃথিবীর যে-কোন দেশ অপেক্ষা ভারত উচ্চে। মিশনরীরা যদি কেবল সেখানকার পবিত্র বারি পান করতে বা এই মহান্ জাতির উপর বহু পবিত্র জীবনের কী অপূর্ব প্রভাব পড়েছে তা দেখতে যান, তবেই ভাল করবেন।

তারপর তিনি বিবাহের রীতিনীতি ও প্রাচীন কালে যখন সহশিক্ষা-প্রথার প্রচলন ছিল, তখন নারীদের যে-সকল সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হ'ত তার বর্ণনা করেন। ভারতের ঋষিদের লেখায় প্রত্যাদিষ্ট নারীর অপূর্ব চিত্র পাওয়া যায়। খ্রীষ্টধর্মে প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তিরা সকলেই পুরুষ, কিন্তু ভারতের পূত-চরিত্র নারীগণ ধর্মগ্রন্থসমূহে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার ক'রে আছেন। গৃহস্থদের উপাসনার অঙ্গ পাঁচটি। তার মধ্যে একটি অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনা। আর একটি হ'ল মূক প্রাণীর সেবা। শেষ উপাসনাটি আমেরিকানদের পক্ষে বোঝা শক্ত। ইওরোপীয়দের পক্ষেও এই ভাবটিকে উপলব্ধি করা সহজ নয়। অন্যান্য জাতি পাইকারি হারে প্রাণী হত্যা করে এবং নিজেরাও পরস্পর হানাহানি ক'রে মরে, রক্তের সমুদ্রে তারা বাস করে।

একজন ইওরোপীয় বলেছিল, ভারতবাসীরা যে প্রাণী হত্যা করে না, তার কারণ তারা মনে করে যে, প্রাণীদের মধ্যে পূর্বপুরুষের আত্মা বিদ্যমান। পশুর স্তর থেকে বেশী দূর অগ্রসর হয়নি, এমন জাতির পক্ষেই এ ধরনের যুক্তি সাজে। এটা আসলে ভারতের এক শ্রেণীর নাস্তিকের উক্তি—এভাবে তারা বেদের 'অহিংসা ও পুনর্জন্মবাদের' দোষ দর্শন ক'রে থাকে। এ-রকম ধর্মীয় মতবাদ কোনকালে ছিল না। এটা বস্তুতান্ত্রিক ধর্মের মতবাদ। মূক প্রাণীর উপাসনার একটি উজ্জ্বল চিত্র বক্তা তুলে ধরেন।

ভারতের অপূর্ব বিধি অতিথি-পরায়ণতা—একটি গল্পের মাধ্যমে তিনি চিত্রিত করেন। একদা দুর্ভিক্ষের দরুন এক ব্রাহ্মণ, তাঁর স্ত্রী, পুত্র এবং পুত্রবধূকে কিছুকাল অনাহারে কাটাতে হয়। গৃহস্বামী খাদ্যের অন্বেষণে বাইরে গিয়ে সামান্য পরিমাণ ছাতু সংগ্রহ ক'রে আনেন। বাড়িতে এনে তিনি তা চার ভাগে ভাগ করেন এবং যখন সেই ছোট্ট পরিবারটি আহার করতে যাচ্ছে, এমন সময় দরজায় করাঘাত শোনা গেল। আগন্তুক একজন

ক্ষুধার্ত অতিথি। ভাগগুলি তখন অতিথির সামনে দেওয়া হ'ল এবং সে ক্ষুন্নিবৃত্তি ক'রে চলে গেল, আর এদিকে অতিথি-সেবাপরায়ণ সেই চারজন মৃত্যুকে বরণ ক'রল। আতিথেয়-তার পবিত্র নামে ভারতে যা আশা করা যায়, এই গল্পটি তারই আদর্শ-স্বরূপে বলা হয়ে থাকে।

সুনিপুণ বাগ্মিতার সঙ্গে বক্তা তাঁর ভাষণ শেষ করেন। তাঁর বক্তব্য আগাগোড়া সহজ সরল; কিন্তু যখনই তিনি কোন চিত্র বর্ণনায় রত হন, তখন তা অপূর্ব কাব্যের মতো শোনায়, তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, পূর্বদেশীয় ভ্রাতা প্রকৃতির সৌন্দর্য কত গভীর ও নিবিড় ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। তাঁর অপরিমিত আধ্যাত্মিকতার স্পর্শ শ্রোতাগণ অনুভব করেন, কারণ তা চেতন ও অচেতন সকল বস্তুর প্রতি ভালবাসারূপে এবং সমন্বয়ের ঐশী বিধান ও কল্যাণকর অভিপ্রায়ের বিচিত্র কার্যরীতির গভীরে প্রবেশ করবার প্রখর অন্তর্দৃষ্টিরূপে স্বতঃপ্রকাশিত।

ভারতের মানুষ

[সোমবার ১৯শে মার্চ, ১৯০০ 'ওকল্যাণ্ড এন্-কোয়ারার'-পত্রের সম্পাদকীয় মন্তব্য-সহ]

সোমবার রাত্রে স্বামী বিবেকানন্দ নূতন পর্যায়ে 'ভারতের মানুষ' সম্পর্কে যে ভাষণ দান করেন, তা শুধু সে দেশের লোকের সম্বন্ধে তথ্য বর্ণনার জন্যেই নয়; এরূপ কোন উদ্দেশ্য না নিয়েও তাদের মানসিক দৃষ্টিভঙ্গী ও সংস্কার-সম্পর্কে যে অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন, তার জন্যেই মনোজ্ঞ হয়েছিল। এটা স্পষ্ট যে, একজন শিক্ষিত ও চিন্তাশীল ব্যক্তি হয়েও স্বামীজী পাশ্চাত্য সভ্যতায় মোটেই মুগ্ধ নন। বস্তুতঃ বালবিধবা, নারী-পীড়ন এবং ভারতীয়দের বিরুদ্ধে এরূপ নানা বর্বরতার অভিযোগের আলোচনা শুনে শুনে তিনি স্পষ্টতই অনেকটা বিরক্ত হয়েছেন এবং উত্তরে পাল্টা অভিযোগ করার কিছুটা প্রবণতা তাঁর মধ্যে দেখা যায়।

ভাষণের প্রারম্ভে তিনি শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট ভারতবাসীর জাতিগত বৈশিষ্ট্যের পরিচয় প্রদান করেন। তিনি বলেন যে, এশিয়ার অন্যান্য দেশের মতো ভারতে ঐক্যের বন্ধন হ'ল *ধর্ম—ভাষা বা গোষ্ঠি (race) নয়।* ইওরোপে গোষ্ঠি (race) নিয়েই জাতি (nation)। কিন্তু এশিয়ায়, যদি ধর্ম এক হয়, তবে বিভিন্ন বংশোদ্ভূত এবং বিভিন্ন ভাষা-ভাষীদের নিয়ে এক একটি জাতি গড়ে ওঠে।

উত্তর ভারতের মানুষকে চারটি বৃহত্তর শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, কিন্তু উত্তর ভারতের থেকে দক্ষিণ ভারতের ভাষাগুলি এতই স্বতন্ত্র যে, কোন সম্পর্কই খুঁজে পাওয়া যায় না। উত্তর ভারতের লোকেরা মহান্ আর্যজাতি-সম্ভূত—যা থেকে পিরেনিজ পর্বতমালার (Pyrenees) বাস্‌ক্ জাতি (Basques) এবং ফিন্‌জাতি (Finns) ভিন্ন সমগ্র ইওরোপের মানুষ উদ্ভূত ব'লে অনুমিত হয়। দক্ষিণ ভারতের আদিম অধিবাসিগণ প্রাচীন মিশর বা সেমিটিক জাতির সমগোত্রীয়। ভারতবর্ষে পরস্পরের ভাষা-শিক্ষার অসুবিধার কথা বোঝাতে গিয়ে স্বামীজী বলেন যে, যখন তাঁর দক্ষিণ ভারতে যাবার সুযোগ হয়েছিল, তখন সংস্কৃত-জানা মুষ্টিমেয় কয়েকজনকে বাদ দিয়ে তাঁকে স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে ইংরেজীতেই কথা বলতে হ'ত।

জাতিভেদ-প্রথার আলোচনাতেই বক্তৃতার অনেকাংশ নিয়োজিত হয়েছিল। এর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা ক'রে স্বামীজী বলেন, প্রথাটি অবশ্যই এখন খারাপ দিকে যাচ্ছে, পূর্বে অসুবিধার

চেয়ে সুবিধাই ছিল বেশি, অপকারিতার চেয়ে উপকারিতা ছিল বেশি। সংক্ষেপে বলা চলে, পুত্র সর্বক্ষেত্রে পিতার বৃত্তি গ্রহণ করবে—এই রীতি থেকেই এর উৎপত্তি। কালক্রমে এই বৃত্তিগত সম্প্রদায় বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং প্রত্যেক শ্রেণী নিজ নিজ গণ্ডির মধ্যে দৃঢ়বদ্ধ হয়। মানুষকে যেমন বিভক্ত করেছে, আবার সম্মিলিতও করেছে তেমনি, কারণ এক শ্রেণী বা জাতিভুক্ত ব্যক্তি তার স্বজাতিকে প্রয়োজনের সময় সাহায্য করতে দায়বদ্ধ, এবং যেহেতু কোন ব্যক্তিই তার নিজের শ্রেণী বা জাতির গণ্ডির উর্ধ্বে উঠতে পারে না, সেজন্য অন্যান্য দেশের মানুষের মধ্যে সামাজিক ও ব্যক্তিগত প্রাধান্য বিস্তারের যে সংগ্রাম দেখতে পাওয়া যায়, হিন্দুদের মধ্যে তা দেখা যায় না।

জাতিভেদের সবচেয়ে মন্দ দিক হ'ল এই যে, এ প্রতিযোগিতাকে দমিত ক'রে রাখে এবং এই প্রতিযোগিতার অভাবই বাস্তবিক পক্ষে ভারতের রাজনৈতিক অধঃপতন ও বিদেশী জাতি কর্তৃক ভারত-বিজয়ের কারণ।

বহু-আলোচিত বিবাহের ব্যাপারে হিন্দুরা সমাজতান্ত্রিক; সমাজের কল্যাণের কথা চিন্তা না ক'রে যুবক-যুবতীর পরস্পরের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ব্যাপারটা তারা মোটেই ভাল ব'লে মনে করে না, কারণ যে-কোন দুটি মানুষের কল্যাণের চেয়ে সমাজের কল্যাণ অবশ্যই বড়। 'আমি জেনীকে ভালবাসি এবং জেনী আমাকে ভালবাসে—অতএব আমাদের এই বিবাহ করতে হবে'—এ যুক্তির কোন সঙ্গত কারণ নেই।

বালবিধবাদের শোচনীয় অবস্থার যে চিত্র আঁকা হয়ে থাকে তার সত্যতা অস্বীকার ক'রে তিনি বলেন যে, ভারতে সাধারণভাবে বিধবাদের বিস্তর প্রতিপত্তি, কারণ সে-দেশে সম্পত্তির বড় অংশ বিধবাদের করায়ত্ত। বস্তুতঃ বিধবারা এমন একটা স্থান অধিকার ক'রে আছে যে, মেয়েরা এবং হয়তো পুরুষরাও পরজন্মে 'বিধবা' হবার জন্য সম্ভবতঃ প্রার্থনাও ক'রে থাকে।

বালবিধবা বা যে-সব মেয়ে বিবাহের পূর্বেই মৃত বালকদের সঙ্গে বাগদত্তা, তাদের প্রতি করুণা প্রদর্শন সাজত তখনই, বিবাহই যদি জীবনের একমাত্র বা মূল উদ্দেশ্য হ'ত। কিন্তু হিন্দুর চিন্তাধারা অনুসারে বিবাহ বরং একটি কর্তব্য, কোন বিশেষ অধিকার বা সুযোগ নয় এবং বালবিধবাদের পুনর্বিবাহে অনধিকার বিশেষ একটা কষ্টকর ব্যাপার নয়।

সমালোচনা

The Spiritual Heritage of India—Swami Prabhavananda, Published by George Allen & Unwin Ltd., Ruskin House, Museum Street, London. Pp. 374 ; price 35 s. net.

স্বামী প্রভবানন্দ-রচিত 'ভারতের আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার' শিরোনামে নবপ্রকাশিত গ্রন্থখানি ভারতের ধর্ম দর্শন ও আধ্যাত্মিকতার সংক্ষিপ্তসার। ভারতের আধ্যাত্মিক সম্পদ্ এতই বিশাল যে, একখানি পুস্তকে তাহার সম্যক্ পরিচয় দেওয়া অত্যন্ত কঠিন কাজ। আলোচ্য পুস্তকে এই অসাধ্য সাধনের স্বাক্ষর বর্তমান।

গ্রন্থটি পাঁচভাগে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে বেদচতুষ্টয়ের আলোচনা। সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক এবং উপনিষৎ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্য। দ্বিতীয় অধ্যায়ে রামায়ণ-মহাভারত, ভগবদ্গীতা, স্মৃতি-পুরাণতন্ত্র আলোচিত। তৃতীয় অধ্যায়ে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। চতুর্থ অধ্যায়ে ষড়্দর্শন : ন্যায়-বৈশেষিক, সাংখ্য-পাতঞ্জল, পূর্বমীমাংসা ও বেদান্ত আলোচিত। পঞ্চম অধ্যায়ে বেদান্ত ও বেদান্তের আচার্যগণের মত। আচার্য গৌড়পাদ, শংকর, ভাস্কর, যামুন, রামানুজ, নিম্বার্ক, মধ্ব, বল্লভ প্রভৃতির মত আলোচনা করা হইয়াছে। শেষাংশে শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন-দর্শন-পরিচিতি। গ্রন্থের মুখবন্ধ ও উপসংহার উভয়ই মূল্যবান্।

বিশেষ করিয়া পাশ্চাত্যবাসীদের জন্যই এই গ্রন্থ লিখিত, তাঁহারা ইহা পাঠে উপকৃত হইবেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু যাঁহারা ভারতের জ্ঞানভাণ্ডারে প্রবেশ করিতে চান, তাঁহারাও এই পুস্তকে যথার্থ দিগ্দর্শন পাইবেন; একখানি পুস্তক অধিগত করিতে পারিলেই বিভিন্ন যুগের আধ্যাত্মিক চিন্তাধারা ও মহত্তম আচার্যগণের বৈশিষ্ট্য ও সাধনপদ্ধতি সম্বন্ধে ধারণা হইবে। চমৎকার মুদ্রণ, উৎকৃষ্ট বাঁধাই, সুন্দর প্রচ্ছদ পুস্তকটিকে আকর্ষণীয় করিয়াছে। ভাষার স্বচ্ছতা, রচনাশৈলী, প্রকাশভঙ্গির স্পষ্টতা, প্রয়োজনীয় মন্তব্য—কোন দিকেই ত্রুটি নাই। প্রয়োজনীয় ব্যক্তিপরিচিতি ও নির্ঘণ্ট দ্বারা ইহার মর্যাদা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই গ্রন্থ প্রত্যেক গ্রন্থাগারের সম্পদ্রূপে গৃহীত হইবে বলিয়া মনে হয়।

রাষ্ট্র সাহিত্য জীবন যৌবন—বসুধা চক্রবর্তী, জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা ১৩। ১২৯ পৃষ্ঠা, মূল্য তিন টাকা।

এই গ্রন্থ কয়েকটি প্রবন্ধের সঙ্কলন। এ সকল প্রবন্ধে লেখক প্রধানতঃ ভারতের স্বাধীনতা এবং তার সঙ্গে জড়িত অন্যান্য বিষয়-সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। লেখকের মতে আর্থনীতিক স্বাধীনতা ছাড়া প্রকৃত স্বাধীনতা অসম্ভব। অথচ আমাদের দেশে রাজনীতিক স্বাধীনতার উপরেই বেশী জোর দেওয়া হয়েছে। প্রকৃত স্বাধীনতা-লাভের জন্য ভারতীয় শ্রমিকদের মধ্যে এখনও কোন ব্যাপক আন্দোলন দেখা দেয়নি। তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর লোকেরাই ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে অগ্রণী হয়েছেন, আর স্বাধীনতার নামে নিজেদের শ্রেণীগত স্বার্থরক্ষার চেষ্টা

করেছেন। ফলে স্বাধীনতার নামে একটি বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার চেষ্টা করা হয়েছে মাত্র, প্রকৃত স্বাধীনতা-আন্দোলন হয়নি।—ইহাই সমস্ত গ্রন্থটির মূল কথা ব'লে মনে হয়।

লেখকের মতে সামাজিক বিবর্তনের পথে আমাদের দেশ অনেক পিছিয়ে আছে। আমাদের সমাজব্যবস্থায় এখনও সামন্ততন্ত্রের বহু বৈশিষ্ট্য বর্তমান। ভারতবাসীদের ধর্ম-প্রবণতা এই ধরনের একটি বৈশিষ্ট্য। তাঁর মতে 'যে দার্শনিক তত্ত্বের পিপাসা ভারতীয় সমাজের সকল স্তরে ব্যাপ্ত বলিয়া রবীন্দ্রনাথ দার্শনিক সভাতে বলিয়াছিলেন, তাহাকেই সাধারণভাবে পরমার্থ-ধ্যান বলা হইয়া থাকে; এবং তাহা ভারতবর্ষের একচেটিয়া নহে। ঐতিহাসিক বিকাশের বিশেষ পর্যায়ে—বিশেষতঃ সামন্ততন্ত্রের আওতায় এবং আধুনিক বিজ্ঞানের ছোঁয়াচ পাইবার পূর্বে প্রতিদেশেই ইহলোকাতীতের চিন্তাকে প্রবল হইতে দেখা গিয়াছে।' (১০৫ পৃ.) লেখক মার্ক্সীয় মতবাদ দ্বারা অনেকটা প্রভাবিত হয়েছেন। এই মতবাদের মধ্যে অনেক সত্য নিহিত আছে, কিন্তু ধর্ম মানুষের এক বিশেষ সমাজব্যবস্থার প্রতিফলন—এ-কথা স্বীকার করা যায় না। সামাজিক বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মচিন্তা ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান অনেকাংশে পরিবর্তিত হয়, কিন্তু ধর্মের মধ্যে কালজয়ী শাশ্বত একটা দিক্ আছে, যা পরিবেশের উর্ধ্বে। ধর্ম মানুষের চিরন্তন জিজ্ঞাসা ও সত্যানুসন্ধিৎসার প্রতীক—লেখক এ-কথা অস্বীকার করেছেন।

গ্রন্থটিতে ভারতের গ্রাম্য জীবনের সমস্যা, মহাত্মা গান্ধীর অহিংসানীতি, ভারতে 'বামপন্থা' ইত্যাদি বিষয়ও আলোচিত হয়েছে। এ-সকল বিষয়ে অনেক বিতর্কের অবকাশ আছে এবং সকল পাঠক লেখকের সঙ্গে একমত হবেন না। কিন্তু তাঁর যুক্তিপূর্ণ আলোচনা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর আলোকপাত করেছে। এই আলোচনা আগ্রহশীল পাঠকের চিন্তার সামগ্রী হবে, সন্দেহ নেই। গ্রন্থটির নামকরণের সার্থকতা উপলব্ধি করতে পারা গেল না।

—রাজেন চক্রবর্তী ঠাকুর

শক্তিসারদম্ (সংস্কৃত-নাটিকা)—ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী, প্রাচ্যবাণী-মন্দির, ৩ ফেডারেশন স্ট্রীট, কলিকাতা ৯। (পুস্তিকা)

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর পুণ্য জীবন অবলম্বনে রচিত 'শক্তিসারদম্' সংস্কৃত নাটিকাটি বহু স্থানে অভিনীত হইয়া সুধী জনগণের বিশেষ প্রশংসা লাভ করিয়াছে। সম্প্রতি ইহা দিল্লী সাহিত্য আকাদামির সংস্কৃত মুখপত্র 'সংস্কৃত প্রতিভা'য় প্রকাশিত হইয়াছে। সহজ সংস্কৃতে রচিত কোন বিষয় দুর্বোধ্য নয়, আলোচ্য নাটিকাটি তাহাই প্রমাণ করে। জনসাধারণের মধ্যে সংস্কৃত ভাষা-প্রচারে ডক্টর চৌধুরীর প্রচেষ্টা অভিনন্দন-যোগ্য।

সুবর্ণজয়ন্তী পত্রিকা (Golden Jubilee Souvenir, 1962)—বরানগর, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম। প্রকাশক: স্বামী নিরন্তরানন্দ। পৃষ্ঠা ৮০।

বরানগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের পঞ্চাশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে সুবর্ণজয়ন্তী পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছে। 'আশ্রমের ইতিহাস স্মরণে' লেখাটির মধ্যে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া এই প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতি সুচিত্রিত।

Swami Vivekananda's Vision of a New India, Vivekananda and Service to man, বৈদান্তিক বিবেকানন্দ, স্বামী বিবেকানন্দ ও বাংলা গদ্য, অদ্বৈত-বেদান্ত-মতে

নিত্যসিদ্ধ স্বামীজীর জন্ম সম্ভব কি? —স্বামীজী-সম্বন্ধে এই লেখাগুলিতে চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। সুন্দর প্রচ্ছদ ও কয়েকটি চিত্র দ্বারা পত্রিকাটি আকর্ষণীয় হইয়াছে।

(১) জয়গুরু, সাধন-জীবনে, (৩) হরিদাসের বিজয়োৎসব—স্বামী সত্যানন্দ প্রণীত। পৃষ্ঠা: ১২, ২৭, ৪৩। মূল্য: ·২৫, ·৫০, ১৲। প্রাপ্তিস্থান: মহেশ লাইব্রেরি, ২।১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২।

(১) পুস্তিকাটিতে 'গুরু' শব্দের বিশ্লেষণ ও মহিমা খ্যাপন করা হইয়াছে। (২) সাধন-জীবনের পথনির্দেশক এই গ্রন্থ। (৩) শ্রীচৈতন্যদেবের লীলাসহচর ভক্তপ্রবর হরিদাসের দিব্য জীবন চিত্রিত হইয়াছে এই পুস্তকে।

ব্রহ্মানন্দগিরি—শ্রীমদনগোপাল মুখোপাধ্যায় প্রণীত। ১৭।১, বিন্দুবাসিনী রোড, ভাটপাড়া হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৭৪; মূল্য ১·২৫।

আলোচ্য পুস্তকে শ্রীশ্রীনিগমানন্দ পরমহংসদেবের পূর্বজন্ম ও সাধনকথা বিবৃত হইয়াছে। নিগমানন্দই ছিলেন ব্রহ্মানন্দগিরি—ইহাই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়। এরূপ প্রমাণ করার প্রয়োজন কি তাহা বুঝিলাম না।

অমৃত-আশ্বাস—শ্রীপরমশরণানন্দ সঙ্কলিত। পৃষ্ঠা ৩০। প্রাপ্তিস্থান: বিবেকানন্দ পাঠচক্র, পোঃ পাণ্ডু, জিলা কামরূপ, আসাম।

বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণী ও মহাপুরুষদের কথা-সঙ্কলনটিতে আত্মবিশ্বাস জাগাইবার প্রয়াস আছে।

উপদেশামৃত—অনুবাদক: শ্রীভূপেন্দ্রনাথ রায়। প্রাপ্তিস্থান: ৭।১।এ, বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা ৯। পৃষ্ঠা ৫২; মূল্য ১৲।

আলোচ্য পুস্তিকায় যোশীমঠের (বদরিকাশ্রম) ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী মহারাজের কতকগুলি মূল্যবান্ উপদেশের বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইয়াছে। মূল উপদেশগুলি হিন্দীভাষায় প্রদত্ত।

জপযোগ—স্বামী শিবানন্দ। অনুবাদক ও প্রকাশক: শ্রীরজনীমোহন চক্রবর্তী, ১১।১ আর, গোপাল ব্যানার্জি লেন, কলিকাতা ২৬; পৃষ্ঠা ১৮।

'জপযোগ' পুস্তিকায় জপ-সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হইয়াছে, যথা: জপতত্ত্ব, নামের মহিমা, জপের উপকারিতা, জপের সময়, মালাজপের নিয়ম, সংখ্যা রাখিবার প্রণালী, তিন প্রকার জপ, জপে কুম্ভক। এ সকল তত্ত্ব গুরুমুখেই জ্ঞাতব্য; মুদ্রিত পুস্তকপাঠে অবশ্য কিছুটা কৌতূহল নিবৃত্ত হইতে পারে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

কার্যবিবরণী

রেঙ্গুন : রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম ব্রহ্মদেশে জাতিধর্মনির্বিশেষে মানব-সাধারণের সেবারত। ১৯৬০ খৃঃ বার্ষিক কার্যবিবরণীতে প্রকাশ : বর্তমানে অন্তর্বিভাগীয় হাসপাতালে বিভিন্ন ওআর্ডের মোট শয্যাসংখ্যা ১৬২। সার্জিক্যাল ও মেডিক্যাল ওআর্ড ছাড়া পৃথক্ ক্যান্সার, চক্ষু ও E. N. T. ওআর্ড আছে। বহির্বিভাগে প্রতিদিন বহুসংখ্যক রোগী চিকিৎসিত হয়; আলোচ্য বর্ষে এই বিভাগে মোট চিকিৎসিতের সংখ্যা ২,১২,৩৮১ (নূতন ৬৬,৩১৬); সাধারণ অস্ত্র-চিকিৎসা ৭,১২৪। অন্তর্বিভাগে ৪,০৩০ রোগী চিকিৎসা লাভ করে, তন্মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যা ১,১৫৮। বিশেষ অস্ত্র-চিকিৎসা ২,৫৩৫। শিশুবিভাগে আলোচ্য বর্ষে ৪০,৬৯৭ শিশু চিকিৎসিত হয়। ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরিতে ১১,৩১৪ নমুনা পরীক্ষা করা হয়।

১৯৬০ খৃঃ নার্সিং (final) পরীক্ষায় সেবাশ্রমের নার্সিং কেন্দ্র হইতে ১৪ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে।

শ্যামলাতাল : শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের বার্ষিক কার্যবিবরণী (জানুআরি'৬০—মার্চ'৬১) আমাদের হস্তগত হইয়াছে। ৪,৯৪৪ ফুট উচ্চে হিমালয়ের সৌন্দর্যমণ্ডিত পরিবেশে সেবাশ্রমটি ১৯১৪ খৃঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৫ মাইলের মধ্যে কোন হাসপাতাল বা চিকিৎসালয় না থাকায় প্রতিষ্ঠাকাল হইতেই এই সেবাশ্রমটি অসহায় ও দরিদ্র পার্বতীয়দের একমাত্র চিকিৎসার স্থান।

সেবাশ্রমের দুইটি বিভাগ : বহির্বিভাগ ও অন্তর্বিভাগ। অন্তর্বিভাগে ১২টি শয্যা (bed) আছে; কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় ইহা কিছুই নয়, এ-বিষয়ে সহৃদয় বদান্য ব্যক্তিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইতেছে।

এ পর্যন্ত সেবাশ্রমের উভয় বিভাগে মোট ২,০২,৬১৪ রোগী চিকিৎসিত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে বহির্বিভাগে চিকিৎসিতের সংখ্যা ৯,০৬৭ (নূতন ৭,৬৩৬); অন্তর্বিভাগে ১৮২ জন রোগী চিকিৎসা লাভ করে।

পশুচিকিৎসালয় : গৃহপালিত মূক প্রাণীদের চিকিৎসার জন্য এই বিভাগটি ১৯৩৯ খৃঃ খোলা হয়। এ পর্যন্ত ৫৩,০৭৮ পশুর চিকিৎসা করা হইয়াছে। অস্ত্র-চিকিৎসারও ব্যবস্থা আছে। আলোচ্য বর্ষে ১,৮৮৭ পশু চিকিৎসিত হয়।

টাকী : রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের (জানু. '৬০—মার্চ '৬১) বার্ষিক কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। টাকী গ্রামে স্বল্পপরিসর ভূখণ্ডে এই আশ্রম প্রতিষ্ঠিত। আশ্রমের পরিচালনায় আছে তিনটি উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটি উচ্চ বিদ্যালয়, একটি হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয় ও একটি ছাত্রাবাস। একটি উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় নিকটবর্তী গ্রামে অবস্থিত, বাকীগুলি আশ্রম-ভূমিতে অবস্থিত। ছাত্রাবাসের বর্তমান ছাত্রসংখ্যা ৫০। আশ্রম-প্রাঙ্গণে অবস্থিত প্রাথমিক বিদ্যালয ও উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা যথাক্রমে ১৫৮ এবং ৩৫০। দাতব্য চিকিৎসালয়ে দৈনিক রোগীর সংখ্যা দেড়শতের অধিক।

সর্বসাধারণের মধ্যে ধর্মভাব-প্রচারের উদ্দেশ্যে সাময়িক উৎসবাদির যথাযথভাবে আয়োজন করা হয়।

আশ্রমবাসীদের দৈনিক সমবেত প্রার্থনাদির জন্ম নাটমন্দির-সহ একটি মন্দির নির্মাণের পরিকল্পনা করা হইয়াছে। ইহা নির্মাণ করিতে আনুমানিক ব্যয় হইবে ৬০,০০০৲। সহৃদয় দেশবাসীর নিকট প্রয়োজনীয় অর্থ-সাহায্যের জন্ম আশ্রম-কর্তৃপক্ষের আবেদন— তাঁহারা যেন যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া আশ্রমবাসীদের এই অভাবটি দূর করেন।

আমেরিকায় বেদান্ত

হলিউড বেদান্ত-সোসাইটি : স্বামী প্রভবানন্দ, সহকারী স্বামী বন্দনানন্দ।

রবিবারের বক্তৃতা :

ফেব্রুআরি : শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যগণ; আমার আচার্যদেব; পথ অনেক, লক্ষ্য এক; ধর্মের সাধন।

মার্চ : আধ্যাত্মিক ঐক্য; নৈর্ব্যক্তিক জীবন; বিশ্বাস ও স্বাধীন ইচ্ছা; শ্রীরামকৃষ্ণ।

এতদ্ব্যতীত মঙ্গলবারে শ্রীমদ্ভাগবত ও বৃহস্পতিবারে নারদীয় ভক্তিসূত্রের ক্লাস হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব উপলক্ষে গত ২৫শে মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণ-সম্বন্ধে বক্তৃতার পর দ্বিপ্রহরে সোসাইটির সভ্য ও বন্ধুবর্গকে ভারতীয় ভোজনে আপ্যায়িত করা হয়।

সাণ্টা বারবারা শাখাকেন্দ্রে

রবিবারের বক্তৃতা :

ফেব্রুআরি : স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁহার বাণী; ঈশ্বর ও ঈশ্বরতুল্য মানব; আমার আচার্যদেব; দৃশ্য জগৎ ও প্রকৃত সত্তা।

মার্চ : ধর্মাচরণ; যোগ ও সাধারণ জ্ঞান; নৈর্ব্যক্তিক জীবন; মন কি মুক্ত? সপ্তাহ-অন্তর মঙ্গলবারে গীতা ক্লাস হয়।

বেদান্তানুরাগী ভক্তগণের জন্ম সাণ্টা বারবারা শাখা-কেন্দ্রে বিশ্রাম-ভবন (Retreat-House) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যাঁহারা দৈনন্দিন কর্মব্যস্ততা হইতে দূরে আধ্যাত্মিক পরিবেশের মধ্যে সময় কাটাইতে চান, তাঁহাদের পক্ষে ইহা উপযুক্ত স্থান। মন্দিরে দিনে তিনবার ধ্যানের ক্লাসেও তাঁহারা ইচ্ছা করিলে যোগদানের সুযোগ পাইতে পারেন।

উৎসব-সংবাদ

মালদহ : শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ৫ই হইতে ১০ই জুন পর্যন্ত আশ্রমের বার্ষিক উৎসব সুচারুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে ৫ই জুন সন্ধ্যায় 'শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাগীতি' ও পরদিন 'বিবেকানন্দ-জীবনগীতি', কথায় ও সঙ্গীতে সুন্দরভাবে পরিবেশিত হয়। ৭ই, ৮ই ও ৯ই জুন তিন দিবস রাত্রিতে নৈহাটি হইতে আগত 'আনন্দম্ কীর্তন-সমাজ' শ্রীগৌরাঙ্গ-গীতিকথা ও শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-গীতিকথা মধুরকণ্ঠে পরিবেশন করেন। স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ, অধ্যাপক শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার ও শ্রীঅমূল্যভূষণ সেন শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্রীমায়ের সম্বন্ধে যুক্তিপূর্ণ ও সময়োপযোগী ভাষণ দেন।

১০ই জুন প্রভাতফেরী, বিশেষপূজা, হোম, চণ্ডী- ও 'কথামৃত'-পাঠ হয়। মধ্যাহ্নে ২,০০০ নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন।

বাগেরহাট : শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ২৮শে বৈশাখ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাৎসরিক জন্মোৎসব বিশেষ আনন্দ-সহকারে অনুষ্ঠিত হয়। এতদুপলক্ষে মঙ্গলারতি, ঊষাকীর্তন, চণ্ডী- ও গীতাপাঠ, ভজন-কীর্তন প্রভৃতি হইয়াছিল। ২,৫০০ নরনারী বসিয়া এবং অনেকে হাতে হাতে প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্ণে আয়োজিত ধর্মসভায় বিশিষ্ট বক্তাগণ শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্য জীবন ও বাণী অবলম্বনে বক্তৃতা দেন। প্রায় চার হাজার শ্রোতার সমাগম হইয়াছিল।

জয়রামবাটী : গত অক্ষয়তৃতীয়া তিথিতে শ্রীশ্রীমাতৃমন্দির-প্রতিষ্ঠার চত্বারিংশ বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হয়। মঙ্গলারতি, ঊষাকীর্তন, সমবেতভাবে ভজনগান, প্রভাতফেরী, লীলাকীর্তন, ষোড়শোপচারে পূজা, হোম, গীতা- ও চণ্ডীপাঠ প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল। ২,৫০০ নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন। সন্ধ্যারতির পর মাতৃমন্দির-প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত ও শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্য জীবন আলোচিত হয়।

বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী-প্রস্তুতি

মাদ্রাজ প্রদেশে বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠানের জন্য গত ৭ই জানুআরি মাদ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে ডক্টর সি. পি. রামস্বামী আয়ারের সভাপতিত্বে বিশিষ্ট জনসমাবেশে এক সভা হয়। এতদুদ্দেশ্যে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি লইয়া একটি শক্তিশালী কমিটি গঠিত হইয়াছে।

ডক্টর আয়ার তাঁহার ভাষণে বলেন, স্বামী বিবেকানন্দ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন-সেতু। জগতের আধ্যাত্মিক শক্তিকে সর্বসাধারণের মধ্যে সঞ্চারিত করিবার অপূর্ব উপায় তিনি উদ্ভাবন করিয়াছিলেন; তাঁহার প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সমন্বয়-বাণীর শ্রেষ্ঠ প্রচারক। আধুনিক জগৎ স্বামীজীর বাণী দ্বারা বিশেষ উপকৃত।

ট্রিপলিকেনে অবস্থিত 'Ice-House'-নামে পরিচিত বাড়িটিতে স্বামীজী অবস্থান করিয়াছিলেন, দাক্ষিণাত্যে রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের প্রথম শাখা এখানেই প্রতিষ্ঠিত হয়। ডক্টর আয়ার এই বাড়িটি 'বিবেকানন্দ-ভবন' নামকরণের প্রস্তাব করেন।

প্রস্তাবিত কর্মসূচী :

শিশুবিভাগ-সহ পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থাগার পাঠাগার ও বক্তৃতা-গৃহ প্রতিষ্ঠা, তামিল ও তেলুগু ভাষায় ১০ খণ্ডে স্বামীজীর গ্রন্থাবলী প্রকাশন, তামিলে স্বামীজীর জীবনী প্রকাশ, স্বামীজীর জীবন- ও বাণী-সম্বলিত পুস্তিকা এবং ছবির কার্ড বিনামূল্যে বিতরণ, মাদ্রাজ জর্জটাউনে স্থিত রামকৃষ্ণমঠ-পরিচালিত প্রাথমিক বালিকা-বিদ্যালয়টি উচ্চ বিদ্যালয়ে উন্নয়ন ও বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী বালিকা-বিদ্যালয় নামকরণ, 'Ice-House'-এর সম্মুখে স্বামীজীর পরিব্রাজক ব্রোঞ্জ মূর্তি-প্রতিষ্ঠা, স্বামীজীর জীবনের স্মরণীয় ঘটনাবলী অবলম্বনে প্রদর্শনী, জনসভা, ধর্মসম্মেলন, বক্তৃতা- ও রচনা-প্রতিযোগিতা, সঙ্গীত-সম্মেলন, শোভাযাত্রা, দরিদ্রনারায়ণ-সেবা, বস্ত্রবিতরণ, শিশুদের ও হাসপাতালে রোগীদের ফল ও খাবার বিতরণ, দরিদ্র ও মেধাবী বিদ্যার্থীদের জন্য ছাত্রবৃত্তি এবং অসহায় রোগীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা, মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বামী বিবেকানন্দ-সম্বন্ধে স্থায়ী বক্তৃতার ব্যবস্থা।

মাদ্রাজে স্বামীজীর শতবার্ষিক উৎসবের প্রস্তাবিত কর্মসূচী যথাযথ রূপায়িত করিতে ১০,১২,০০০ টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে।

বক্তৃতা-সফর

বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী কমিটির সম্পাদক স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ ৩০শে মে হইতে ১৭ই জুন নিম্নলিখিত স্থানসমূহে বক্তৃতা দেন এবং বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠানের জন্য অনেক স্থলে শক্তিশালী কমিটি গঠন করেন :

রাঁচি : হিনু; দুর্গাবাড়ি; টি. বি. স্যানাটোরিয়াম। **দমদম :** আনন্দ আশ্রম; মতিঝিল হাইস্কুল। **মালদহ :** রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম। **পূর্ণিয়া :** রামকৃষ্ণ আশ্রম। **কাটিহার :** রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম। **ডিগবয় :** ইণ্ডিয়া ক্লাব; সারদাসঙ্ঘ; রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম; স্কুল-হল; বিবেকানন্দ-হল। **নাহারকাটিয়া।** মার্গারেটা সেবাসমিতি। **ডিব্রুগড় :** রামকৃষ্ণ সেবাসমিতি।

জার্মানিতে

স্বামী বিবেকানন্দের শতবার্ষিকী সুষ্ঠুভাবে প্রতিপালনের জন্য জার্মানির (German Democratic Republic) বার্লিনস্থ হামবোল্ড (Humboldt) বিশ্ববিদ্যালয়ের ইণ্ডোলজি ইনস্টিট্যুটে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত অধ্যাপক ডক্টর ওয়াটার রুবেনের (Dr. Watter Ruben) সভাপতিত্বে শক্তিশালী কমিটি গঠিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে 'Neus Deutschland'-নামক সংবাদপত্রে লিখিত হইয়াছে :

ভারতের জাতীয় আন্দোলনে ও স্বাধীনতা-যুদ্ধে স্বামী বিবেকানন্দকে অগ্রগামী দূত ও যোদ্ধা বলিয়া ভাবা উচিত।

(H. S.)

পরলোকে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়

পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সুবিখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় গত ১লা জুলাই রবিবার বেলা ১২টা ৩ মিঃ তাঁহার ৮১ তম জন্মদিবসে কলিকাতায় নিজ বাসভবনে পরলোক গমন করেন। গত ২৩শে জুন ডাঃ রায় হঠাৎ হৃদ্‌রোগের আক্রমণে অসুস্থ হইয়া পড়েন। চিকিৎসকগণ তাঁহাকে পূর্ণ বিশ্রাম লইবার নির্দেশ দিলেও কর্মযোগী তিনি তাঁহাদের নির্দেশ সম্পূর্ণ পালন করিতে পারেন নাই, দেশের উন্নতিকল্পে তিনি মৃত্যুর পূর্বদিন পর্যন্ত তাঁহার মন্ত্রিগণের সহিত বিবিধ বিষয়ে আলোচনা করেন। তিনি ক্রমশঃ সুস্থ হইয়া উঠিতেছিলেন, কিন্তু রবিবার বেলা ১১টায় হঠাৎ বুকে তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করেন; বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণের চিকিৎসা সত্ত্বেও কিছুক্ষণ পরেই তাঁহার দেহাবসান হয়। তাঁহার মৃত্যুতে বাংলার আপামর সাধারণ শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়ে। পরদিন প্রাতঃকালে তাঁহার শবদেহ বিরাট শোভাযাত্রা-সহকারে কেওড়াতলা শ্মশানঘাটে লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে বৈদ্যুতিক চুল্লীতে তাঁহার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

ডাঃ রায় ১৮৮২ খৃঃ ১লা জুলাই পাটনায় জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে পাটনার স্কুল-কলেজে তিনি পড়াশুনা করেন। ১৯০১ খৃঃ গণিতে অনার্স-সহ পাটনা কলেজ হইতে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কলিকাতা মেডিকেল কলেজে চিকিৎসা-বিদ্যা অধ্যয়ন করিতে থাকেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এল-এম-এস ও এম-ডি ডিগ্রি লাভ করিয়া তিনি ইংলণ্ডে চিকিৎসা-বিদ্যা অধ্যয়ন করিতে যান। সেখানে তিনি অসাধারণ কৃতিত্ব-সহকারে একই বৎসরে এম-আর-সি-পি (লণ্ডন) এবং এফ-আর-সি-এস (ইংলণ্ড) ডিগ্রি লাভ করেন।

কি ছাত্রজীবনে, কি কর্মজীবনে সর্বত্রই তিনি স্বীয় দীপ্ত প্রতিভার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। ভারতে চিকিৎসক-হিসাবে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। ১৯২২ খৃঃ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে তিনি রাজনীতিতে প্রবেশ করিয়া তদানীন্তন আইন-সভার সদস্য হন। কলিকাতা করপোরেশনের মেয়র, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার, নিখিল ভারত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য, পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ পদে তিনি তাঁহার বিশেষ যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছেন। অশীতিপর বয়সেও তিনি যুবকের ন্যায় কর্মশক্তিসম্পন্ন ছিলেন।

সকলেই তাঁহার বিচার-শক্তি, কর্মনিষ্ঠা ও স্থৈর্যের প্রশংসা করিতেন। পশ্চিমবঙ্গের শিল্পায়ন-পরিকল্পনা ও তাহার রূপায়ণে তাঁহার অলৌকিক কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রশাসনিক দায়িত্বের ক্ষেত্রেও তিনি দৃঢ়তা ও বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করেন, মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাহার বহুমুখী আত্মপ্রকাশে ছেদ পড়ে নাই। তাঁহার পরলোক-গমনে বাংলা তথা ভারতে একজন বলিষ্ঠ নেতার অভাব ঘটিল, ইহা সহজে পূর্ণ হইবার নয়!

তাঁহার দেহমুক্ত আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক। ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

বিবিধ সংবাদ

এলুমিনিয়ম ইলেকট্রোপ্লেটিং

জামসেদপুরে জাতীয় ধাতুবিদ্যা-পরীক্ষাগারে বিশিষ্ট জনসমাবেশে তিন দিন ধরিয়া এলুমিনিয়ম ইলেকট্রোপ্লেটিং প্রদর্শিত হয়।

পিতল বা ইস্পাতের প্লেটিং করা জিনিস অপেক্ষা প্লেটেড এলুমিনিয়ম ব্যবহারে কতগুলি সুবিধা আছে। ইহা হালকা, অনায়াসে নাড়াচাড়া করা যায় এবং সহজে ক্ষয় হয় না। সৈন্যদের অঙ্গাবরণ, সাইকেল মোটরগাড়ি ও বিমানের অংশসমূহ এবং গৃহস্থালির বাসন প্রভৃতি নির্মাণে ইহা ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসারের জন্য ইহা ট্যাক্স-মুক্ত করা হইয়াছে। ভারতের তাম্র-সম্পদ অত্যন্ত অল্প, অনেক ক্ষেত্রে তামার পরিবর্তেও ইহার ব্যবহার হইতে পারে। —P. T. I.

মাথাপিছু শক্তির খরচ

সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য-মতে ভারতে মাথাপিছু শক্তির খরচ ১৪০ কে-জি (140 kg. of coal equivalent), সেই তুলনায় পৃথিবীতে মাথাপিছু গড়ে শক্তির ব্যয় ১,৪০৫।

শিল্পে অগ্রসরশীল দেশগুলিতে মাথাপিছু শক্তির ব্যয় :

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র—	৮,০০০
যুক্তরাজ্য (U. K.)—	৪,৯০০
ফ্রান্স—	২,৪০০
জাপান—	১,৬০০

১৯৫১ খৃঃ পৃথিবীতে শক্তির ব্যয় ছিল ২,৭১০ মেট্রিক টন, ইহা বাড়িয়া '৬১ খৃঃ ৪,২৩৬ মেট্রিক টন হয়, অর্থাৎ ৫৬% বৃদ্ধি।

দেশজাত ও আমদানিকৃত গ্যাসের ব্যবহার ৯৪% বৃদ্ধি পাইয়াছে, '৫১ হইতে '৬০ খৃঃ মধ্যে ইহা ৩১.৮ কোটি মেট্রিক টন হইতে ৬১.৮ কোটি মেট্রিক টন হইয়াছে।

তরল জ্বালানি এবং জলবিদ্যুৎ ও আমদানিকৃত বিদ্যুতের ব্যবহার সাধারণ হার অতিক্রম করিয়াছে। '৫১ খৃঃ ইহাদের ব্যবহার যথাক্রমে ৭০.৫ ও ৪.৭ কোটি মেট্রিক টন ছিল, ইহা বৃদ্ধি পাইয়া ১৩১.৮ ও ৮.৬ মেট্রিক টন হইয়াছে।

কঠিন জ্বালানির ব্যবহার বৃদ্ধি পাইয়াছে ৩৫%; ১৯৫১-৬০ খৃঃ মধ্যে ১,৬৪০ হইতে ২,২১৪ মেট্রিক টন হইয়াছে; '৫১ খৃঃ ইহা সাধারণ হারের নিম্নেই ছিল।

মাথাপিছু শক্তির ব্যয় ১,০৭৫ হইতে ১,৪০৬ কে-জি উঠিয়াছে। —সঙ্কলিত

ভারতে ট্রাক্টর-ব্যবহার

ভারতে ট্রাক্টরের ব্যবহার গত ৫ বৎসরে ৬০% বাড়িয়াছে। ১৯৫৬ খৃঃ ২১,০০০ ট্রাক্টর ব্যবহৃত হইয়াছিল, '৬১ খৃঃ ৩৪,০০০-এরও বেশী। পঞ্জাবে সর্বাপেক্ষা অধিক-সংখ্যক ট্রাক্টর ব্যবহার করা হয়। নিম্নে বিভিন্ন প্রদেশের ব্যবহৃত ট্রাক্টরের সংখ্যা প্রদর্শিত হইল :

পঞ্জাব	৭,৮৪০
উত্তরপ্রদেশ	৭,১১৫
রাজস্থান	৪,১৮৩
অন্ধ্রপ্রদেশ	২,৪৬০
মধ্যপ্রদেশ	২,০৪৭
গুজরাত	১,৮৬২
বিহার	১,৭৯৩
মহারাষ্ট্র	১,৪৫০
মাদ্রাজ	১,৩৯০
মহীশূর	৯৩৪

১৯৬০ খৃঃ পর্যন্ত ভারতে নিয়মিত ট্রাক্‌টর-সরবরাহের কোন প্রতিষ্ঠান ছিল না, প্রধানতঃ বিদেশ হইতে আমদানি করিয়াই চাহিদা মেটানো হইত।

ঐ বৎসর হইতে একটি ভারতীয় ফার্ম ট্রাক্‌টর নির্মাণ করিতে আরম্ভ করে; বৎসরে ৬,০০০ ট্রাক্‌টর নির্মিত হইতেছে। এখনও বিদেশ হইতে আমদানির উপর নির্ভর করিয়া ট্রাক্‌টর ব্যবহারের চাহিদা মেটানো হয়।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ১৯৬১-৬৬ খৃঃ মধ্যে প্রতি বৎসর ১০,০০০ ট্রাক্‌টর নির্মিত হইবে বলিয়া করা আশা যায়। ৫টি ফার্মকে অনুমতি দেওয়া হইয়াছে, এই ফার্মগুলিতে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষে বার্ষিক ১৪,৫০০ ট্রাক্‌টর নির্মিত হইবে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে। —P. T. I.

শয্যায় সন্তরণ

বায়ুপূর্ণ তরঙ্গায়িত নরম গদির শয্যায় সাঁতার কাটা খুব উপভোগ্য, এই প্রলোভন দমন করা কঠিন।

শয্যাশায়ী রোগীদের স্বাচ্ছন্দ্যবিধানের জন্ত নিউইয়র্ক Westinghouse ইলেক্‌ট্রিক করপোরেশন ইহার পরিকল্পনা করেন। কোমল শয্যাটি ধীরে ধীরে তরঙ্গভঙ্গিতে আন্দোলিত হয় এবং রোগীর আশ্রয়-স্থল (point of support) ক্রমাগত পরিবর্তিত হইতে থাকে। ইহা ব্যবহারে অধিক দিন শয্যাশায়ী থাকিয়াও রোগীর শয্যাক্ষত হইবে না এবং ঠিকমত রক্তসঞ্চালন হইবে। —A. P.

নানাস্থানে উৎসব

নিম্নলিখিত স্থানসমূহ হইতে আমরা উৎসব-সংবাদ পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি :

দুর্গাপুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম; **তারকেশ্বর** শ্রীসারদেশ্বরী-রামকৃষ্ণ আশ্রম; **সংগ্রামপুর** (বাঁকুড়া) সংগঠনী সঙ্ঘ।

বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী

জাতীয় শান্তি-কমিটি, ইউনেস্কো ন্যাশন্যাল কমিশন এবং রুমানীয় সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে বুখারেস্ট বিশ্ববিদ্যালয়-ভবনে বিশিষ্ট জনসমাবেশে স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম-শতবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে স্বামীজীর জীবন ও ব্যক্তিত্ব অবলম্বনে ভাষণ প্রদত্ত হয়। বুখারেস্ট-স্থিত ভারতের অস্থায়ী সহকারী রাষ্ট্রদূত শ্রীকন্নাপিল্লী (Mr. Kannapilly) এই সভায় যোগদান করেন। — P. T. I.

উৎসব-সংবাদ

কল্যাচক : শ্রীরামকৃষ্ণ-সেবাসমিতির উদ্যোগে গত ১৯শে মে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব পূজা ও বাণী আলোচনার মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। স্বামী গোপেশ্বরানন্দের সভাপতিত্বে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনাদর্শ ও ভাবধারা অবলম্বনে বক্তৃতা হয়। সভার পর ভজন হয়।

কোমড়া (বর্ধমান) : গত ২৪শে জ্যৈষ্ঠ স্থানীয় রামকৃষ্ণ আশ্রমে নবনির্মিত শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে পূজা, হোম, রামনাম, কীর্তন, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে সারাদিনব্যাপী আনন্দানুষ্ঠান হয়। বাঁকুড়া শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সাধুগণ এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। ধর্মসভায় স্বামী মহানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমায়ের জীবন অবলম্বনে বক্তৃতা দেন। রাত্রে যাত্রাভিনয় হয়। পরদিন অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপিত হয়।

ভ্রম-সংশোধন

গত জ্যৈষ্ঠসংখ্যার ২৭৩ পৃঃ ৩২ পঙ্‌ক্তিতে ১.৮০ ন.প. স্থলে ·৮০ ন. প. হইবে।

শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দ মহারাজ

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নবনির্বাচিত অধ্যক্ষ

নব-নির্বাচিত অধ্যক্ষ

শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দ মহারাজ

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অষ্টম অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ মহারাজের মহাসমাধি লাভের পর গত ৪ঠা অগস্ট শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দ মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নবম অধ্যক্ষ (President) নির্বাচিত হইয়াছেন।

স্বামী মাধবানন্দজী ১৮৮৮ খৃঃ ১৫ই ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। বৈরাগ্যের প্রেরণায় ভগবৎসন্ধানে গৃহত্যাগ করিয়া তিনি ১৯১০ খৃঃ বেলুড় মঠে যোগদান করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাসঙ্গিনী শ্রীশ্রীসারদাদেবীর নিকট হইতে তিনি দীক্ষালাভ করেন।

১৯১০ খৃঃ মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের কর্মিরূপে প্রেরিত হইয়া সেখানে তিনি দুই বৎসর কাল অবস্থান করেন। ১৯১৩ খৃঃ শেষভাগ হইতে আড়াই বৎসর তিনি 'উদ্বোধন'-সম্পাদনায় স্বামী সারদানন্দের সহায়ক ছিলেন। ১৯১৭ খৃঃ তিনি পুনরায় মায়াবতী গমন করিয়া পর বৎসর অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষ হন; ১৯২৭ খৃঃ পর্যন্ত তিনি ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষ থাকাকালে 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় তাঁহার বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ১৯১৮ খৃঃ তিনি অদ্বৈত আশ্রমের অন্যতম পরিচালক (Trustee) নিযুক্ত হন। তাঁহারই সময়ে ১৯২০ খৃঃ অদ্বৈত আশ্রমের কলিকাতা শাখাকেন্দ্র স্থাপিত হয়। 'সমন্বয়'-নামে অধুনালুপ্ত একটি হিন্দী পত্রিকা তাঁহার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়।

আমেরিকার স্যানফ্রান্সিস্কো বেদান্ত সোসাইটির অধ্যক্ষ স্বামী প্রকাশানন্দজীর দেহত্যাগ হইলে তিনি উক্ত কেন্দ্রের কর্মভার গ্রহণের জন্য প্রেরিত হন। ১৯২৭ মে মাস হইতে ১৯২৯ জুন মাস পর্যন্ত তিনি ঐ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ-পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। ১৯২৯ খৃঃ ভারতে প্রত্যাবর্তন করিলে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯৩৮ খৃঃ তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক (General Secretary) হন এবং ১৯৬১ পর্যন্ত ঐ পদ অলংকৃত করেন। বিশ্রামের জন্য মাঝে দুই বৎসর (১৯৪৯-৫১) তিনি অবসর যাপন করেন। ১৯৬২ খৃঃ মার্চ মাসে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহাধ্যক্ষ (Vice-President) নির্বাচিত হন।

সংস্কৃত ও ইংরেজী ভাষায় স্বামী মাধবানন্দের পাণ্ডিত্য অসাধারণ, তিনি বহু সংস্কৃত ধর্মগ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ করিয়াছেন; আচার্য শঙ্করের 'বিবেকচূড়ামণি' ও সভাষ্য বৃহদারণ্যক উপনিষদের ইংরেজী অনুবাদে তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের গঠনমূলক কার্যে তাঁহার দান অপরিসীম।

চতুঃশ্লোকী ভাগবত

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্‌যৎ সদসৎপরম্‌ ।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্‌ ॥
ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি ।
তদ্‌বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ ॥
যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু ।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেষ্বহম্‌ ॥
এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ ।
অন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্বত্র সর্বদা ॥

[শ্রীমদ্ভাগবত—২।৯।৩২-৩৫]

সৃষ্টিকালে ব্রহ্মার নিকট শ্রীভগবান ভাগবত উপদেশ করেন, যাহাতে তিনি সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ও নিরহঙ্কারভাবে জগৎ সৃষ্টি করিতে পারেন। ইহাই 'চতুঃশ্লোকী ভাগবত' নামে প্রসিদ্ধ। এই চারিটি শ্লোকের মধ্যেই সমগ্র শ্রীমদ্‌ভাগবতের সারমর্ম নিহিত। আসন্ন-মৃত্যুপ্রতীক্ষারত পরমভক্ত মহারাজ পরীক্ষিৎকে শ্রীশুকদেব ইহা বলিয়াছিলেন।

শ্রীভগবান ব্রহ্মাকে বলেন : সৃষ্টির পূর্বে কেবল আমিই ছিলাম। সৎ ও অসৎ ছিল না, সূক্ষ্ম ও স্থূল পদার্থ এবং তাহাদের কারণভূত 'প্রধান' বলিয়া কিছুই ছিল না, কারণ তখন প্রধানও আমাতেই বিলীন ছিল। এক্ষণে এই বিশ্বরূপে আমিই আছি। ইহার পর যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাও আমি। অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বে যাহা কিছু ছিল, সৃষ্টিতে বর্তমানে যাহা কিছু আছে, এবং প্রলয়ের পরে যাহা কিছু থাকিবে, তাহা আমারই সত্তা, দ্বিতীয় কোন সত্তা কখনও ছিল না, নাই ও থাকিবে না। ফলতঃ আমি অনাদি, অনন্ত, অদ্বিতীয় এবং সর্বদাই পূর্ণস্বরূপ।

আত্মবস্তুর যে প্রতীতি হয় না এবং অবস্তুর যে প্রতীতি হয়, তাহা আমারই মায়াজনিত জানিবে। এই প্রতীতির কোন সত্তা নাই, ইহা 'আভাস', অর্থাৎ এইরূপ মনে হয় মাত্র। ইহা অন্ধকার, সত্যদৃষ্টিকে আবৃত করিয়া রাখে।

ভূতমাত্রের আদিকারণ যেমন ভৌতিক পদার্থের অন্তরে বাহিরে অনুপ্রবিষ্ট আছে, দেখা যায় না বলিয়া অপ্রবিষ্ট বলিয়া মনে হয়, আমিও সেইরূপ সকল পদার্থের অন্তরে আছি, কিন্তু মনে হয় যেন 'নাই'।

তত্ত্বজিজ্ঞাসুকে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, অন্বয় ও ব্যতিরেকে, অর্থাৎ ইতিমুখে ও নেতিমুখে—যাঁহার অস্তিত্বে সব কিছুর অস্তিত্ব এবং যাঁহার অভাবে সব কিছুরই অভাব—এই ভাবেই আমিই লভ্য। আমিই বস্তু, অন্য যা কিছু সবই অবস্তু। যিনি সর্বদা সর্বস্থানে বিরাজমান, তিনিই আত্মা।

কথাপ্রসঙ্গে

'যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণঃ—'

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণঃ যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতি র্ধ্রুবা নীতি র্মতি র্মম ॥

—যেখানে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বন্ধু গুরু ও সারথি-রূপে উপস্থিত, যেখানে ধনুর্ধর পার্থ তাঁহার অনুগত শিষ্য ও সহচর, সেখানে সম্পদ সাফল্য উৎকর্ষ অভ্যুদয় নিশ্চয়, সেখানে সুনীতিও অবশ্যম্ভাবী—ইহাই আমার অভিমত। এই শ্লোকের দ্বারাই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মহর্ষি বেদব্যাস মহাভারতের ভীষ্মপর্বে সপ্তশত-শ্লোকী শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার উপসংহার করিয়াছেন।

বিদ্যুদ্‌গর্ভ এই শ্লোকের অক্ষরে অক্ষরে যে মহাশক্তি পুঞ্জীভূত রহিয়াছে, যুগ যুগ ধরিয়া তাহা বিকশিত হইয়াছে। ঐ একটি শ্লোকের মধ্যে এক একটি জাতির পতন-অভ্যুদয়ের ইতিহাস লুক্কায়িত রহিয়াছে। মহাভারতের মহামনা রচয়িতার দিব্যচক্ষে মনুষ্যজাতির ভূত ভবিষ্যতের যে ভাবরূপ ধরা পড়িয়াছে, তাহাই তিনি এই শ্লোকে অতি সংক্ষেপে ব্যক্ত করিয়াছেন।

যখনই কোন জাতির মধ্যে দিব্যশক্তির আবির্ভাব ঘটিয়াছে এবং সেই জাতি ঐ দিব্য প্রেরণা কার্যে পরিণত করিতে সমর্থ হইয়াছে, তখনই সেই জাতির যথার্থ উন্নতি দেখা দিয়াছে, সদ্‌ভাবে সাধুভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সেই জাতি নিজের উন্নতিসাধন করিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর অন্যান্য জাতির নিকট কল্যাণের বাণী—প্রেম ও প্রাণের বাণী লইয়া উপস্থিত হইয়াছে, কারণ বিস্তারই জীবনের লক্ষণ। তবে এ বিস্তার ধ্বংসমূলক নয়—গঠনমূলক, এ বিস্তার সামরিক, রাজনীতিক বা বাণিজ্যিক সংঘর্ষ-মুখর নয়, এ বিস্তার হৃদয়ের বিস্তার—আধ্যাত্মিক প্রীতি-সিঞ্চিত, যেন এক মহীরুহের স্বাভাবিক বিস্তার। মনে হয় এই অপূর্ব শ্লোকের মধ্যে মানুষের ইতিহাস অধ্যয়ন করিবার মূলসূত্রটি পাওয়া যায়—একটি গভীর রহস্য উদ্‌ঘাটন করিবার কুঞ্চিকা গীতার এই শেষ শ্লোক।

নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্ম বিশ্বব্যাপ্ত করিয়া সচ্চিদানন্দ-রূপে বিরাজ করিতেছেন; 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' 'অবাঙ্‌মনসো গোচরম্' —ইতিমুখে নেতিমুখে শ্রুতি তাঁহাকে এই ভাবে বর্ণনা করিয়া মৌন অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে সাধারণ মানুষ কতটুকু কি বুঝিল? কিছু বুঝিল কি? হইতে পারে উহা উচ্চতম সত্য, কিন্তু সপ্তসুরের উচ্চতম গ্রামে—'নি'-তে কি সারাক্ষণ থাকা যায়? সকলেই কি 'নি' পর্যন্ত উঠিতে পারে?

ব্রহ্মই সত্য, জগৎ মিথ্যা—জীব মিথ্যা?—তবে শাস্ত্রাদিও মিথ্যা—ব্রহ্ম ব্যতীত সবই মিথ্যা?—না, তা নয়, ব্রহ্ম ব্যতীত কিছুই নাই। ব্রহ্মের সত্তায় সব কিছুর সত্তা। যতক্ষণ 'সব কিছু' দেখিতেছ, ততক্ষণ সব কিছুকে ব্রহ্মভাবে দেখিতে চেষ্টা কর, শেষে বুঝিবে 'সব কিছু' নাই—ব্রহ্মই আছেন।

শ্রুতির উক্তি ও সাধারণ অনুভূতির এই যে বিষম পার্থক্য, ইহাই পরম রহস্য। এই রহস্য দূর করিতেই, অজ্ঞানের অন্ধকার বিদূরিত করিয়া জ্ঞানের আলোক বিস্তার করিতেই যুগে যুগে দেশে দেশে ভগবৎশক্তির অবতরণ প্রত্যক্ষ সত্য। তখন পার্থিব ঘটনাকে কেন্দ্র

করিয়াই রচিত হয় ইতিহাস পুরাণ। শ্রীভগবান উচ্চতম ভাব হইতে যেন অবতরণ করেন—মনুষ্যলোকে—মানুষের বুঝিবার মতো করিয়া সত্যকে প্রকাশ করিয়া যান। মানুষকে নূতন শাস্ত্র দিয়া যান, যাহার সহায়ে সে ধীরে ধীরে উঠিতে পারে ইন্দ্রিয় হইতে অতীন্দ্রিয়ে। এই যে উপায়-নির্দেশ ইহাকেই বলা হইয়াছে 'যোগ'। গীতার প্রতিটি অধ্যায়কে 'যোগ' নামে অভিহিত করা হইয়াছে; এই যোগের সহায়েই জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত মিলিত হয়, শরীরমন-যুক্ত মানুষ জানিতে পারে—তাহার স্বরূপ। শ্রীকৃষ্ণ যোগধর্মের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা, তিনি যোগেশ্বর, সকল প্রকার যোগের পথ তিনি প্রস্তুত করিয়াছেন, যাহাতে মানুষ যে-কোন পথ দিয়া তাঁহার কাছে আসিতে পারে।

শুধু জ্ঞানযোগ কর্মযোগ ভক্তিযোগই নয়—বিষাদও একটি পরম যোগ। আত্মীয়-স্বজনের আসন্ন মৃত্যুর ভয়াবহ কল্পনাই বিষণ্ণ অর্জুনকে ভগবৎ-পদতলে শিষ্যরূপে—কাতর জিজ্ঞাসুরূপে উপনীত করিয়াছিল। অপরাজেয় বীরের দৃঢ় হস্ত হইতে গাণ্ডীব খসিয়া পড়িল—অপ্রতিদ্বন্দ্বী যোদ্ধার মন হইতে যুদ্ধসংকল্প তিরোহিত হইল! ক্ষত্রিয় অর্জুন ভাবিলেন—কাজ নাই যুদ্ধ করিয়া, 'অহিংসাই পরম ধর্ম'—আমি ভিক্ষাব্রত অবলম্বন করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইব, রাজধর্মে ক্ষত্রিয়-ব্রতে আর কাজ নাই!

সর্বসাক্ষী জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণ নীরবে সব দেখিতেছেন—দেখিতেছেন এই ধর্মগ্লানি; অন্তর্যামী ভগবান দেখিতেছেন—অর্জুনের মনের সূক্ষ্ম যুক্তিজাল, ধর্মের ধুয়া ধরিয়াই এত বড় বীরপুরুষ অর্জুন ধর্মচ্যুত হইতেছেন। ধর্মের ধুয়া ধরিয়াই দেশ জাতি মানুষ ধর্ম হইতে চ্যুত হয়। নিম্নগতি স্বাভাবিক! ঊর্ধ্বগতি সাধন-সাপেক্ষ। ঊর্ধ্বমুখী গতি সঞ্চার করিবার জন্য, ধর্ম স্থাপন করিবার জন্য, উন্মার্গগামী মানুষকে সুপথে ফিরাইয়া আনিবার জন্যই অবতার-শক্তির আবির্ভাব।

চরম অবনতির মুহূর্তে ভগবৎশক্তি গুরু-শক্তির রূপ ধারণ করিয়া শ্রুতিমন্ত্ররূপ সিংহ-গর্জনে সুপ্তচিত্ত জাগ্রত করেন। উপযুক্ত আধারের মাধ্যমে স্বীয় শক্তি সমাজে সঞ্চারিত করিয়া একটি দেশ—একটি জাতিকে উন্নতির পথে তুলিয়া দিয়া যান। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের প্রথম দৃশ্যে এইরূপই একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল। পূর্ণব্রহ্ম 'নারায়ণ' শ্রীকৃষ্ণের শক্তি 'নরশ্রেষ্ঠ' অর্জুনের মাধ্যমে মনুষ্য-সমাজে সঞ্চারিত হইয়াছিল, ভারত 'মহাভারতে' পরিণত হইয়াছিল। যুগ-যুগান্তের জন্য জাতীয় আদর্শের ধ্রুবতারা স্থির আলোক লইয়া মেঘমুক্ত আকাশে দেখা দিয়াছিল।

সংসারের বাস্তব সত্য শ্রীকৃষ্ণ অস্বীকার করেন নাই। তিনি জানেন মানুষের দুর্বলতা, অর্জুনকে বলিতেছেন: 'স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ'—সেই মহান্ যোগ, সেই সেই পুরাতন চিরন্তন যোগ মাঝে মাঝে নষ্ট হইয়া যায়, যোগসূত্র মাঝে মাঝে ছিন্ন হইয়া যায়! ইহাই সংসারের রীতি—মায়ার প্রকৃতি। আমি জানি, তাই আমি আসি—মাঝে মাঝে আসি যখন যেখানে প্রয়োজন। যখন যেখানে মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের যোগ নষ্ট হইয়া যায়, যখন মানুষের ঊর্ধ্বমুখী গতি রুদ্ধ হয়—মানুষ যখন দেহগত জীবনের স্রোতে গা ভাসাইয়া দেয়, তখনই ভগবৎশক্তি আসিয়া নূতনতম আদর্শ স্থাপন করিয়া যান—নূতন সাধনপথ নির্মাণ করিয়া যান, পুরাতন সাধনমার্গ প্রশস্ত করিয়া যান!

সাধনার পথেরই অপর নাম 'যোগ', যাহার মাধ্যমে সাধক ঈশ্বরের সহিত যুক্ত হয়, জীবাত্মা পরমাত্মায় লীন হয়, জীব স্বীয় ব্রহ্মত্ব উপলব্ধি করিতে পারে।

এই যোগ বিভিন্ন শাস্ত্রে বিভিন্ন নামে উক্ত হইয়াছে, বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যোগসূত্রে 'যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ' এইটুকু মাত্র বলিয়া পতঞ্জলি যোগের প্রধান লক্ষণ নির্ণয় করিয়াছেন। চিত্তবৃত্তি যতক্ষণ বিক্ষুব্ধ, ততক্ষণ যোগ অসম্ভব। যোগাবস্থার প্রথম ও শেষ প্রয়োজন চিত্তের স্থিরতা। চিত্ত স্থির হইলেই মানুষের জীবভাব দূর হয়। বাসনা-কামনা থাকিতে চিত্ত স্থির হয় না। তাই তো যোগাবস্থা লাভ করিতে গেলে বাসনাজয়ের জন্য এত উদ্যম! ইহাই মৌলিক সাধনা, সকল সাধনার ভিত্তি, ইহাকে কেন্দ্র করিয়াই প্রধান চারিদিকে চারিটি পথ বিস্তৃত হইয়াছে—ইহারাই 'যোগচতুষ্টয়' নামে বিখ্যাত।

এগুলি মানুষের প্রবৃত্তির বা প্রবণতার পথ ধরিয়া নিবৃত্তির লক্ষ্যে যাত্রা ব্যতীত আর কিছু নয়। যদি মনুষ্য-প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা যায়, দেখা যাইবে প্রধানতঃ চারি প্রকার প্রকৃতির মানুষ রহিয়াছে। কর্মপ্রবৃত্তি মানুষের স্বাভাবিক, সুখপ্রচেষ্টায় এবং দুঃখদূরীকরণের জন্য মানুষকে কর্ম করিতেই হইবে। মানুষ কর্মশীল। আবার মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি অস্বীকার করা যায় না, মানুষ সব জিনিস বুঝিতে চায়, সব কিছুর কারণ অন্বেষণ করে। জিজ্ঞাসা মানুষকে জ্ঞানের পথে লইয়া যায়। মানুষ জানিতে চায়: এই জগতের কারণ কি? এ জীবন কেন? এ-সব প্রশ্ন মানুষ করিবেই, আবার মানুষ বিশ্বাস-প্রবণ। বিচার করিয়া মানুষ যখন থই পায় না, কূল-কিনারা পায় না, তখন বিশ্বাসযোগ্য কাহারও কথায় বিশ্বাস করিয়া মানুষ নিশ্চিন্ত হয়। সর্বশক্তিমান্ কাহারও উপর নির্ভর করিয়া, তাঁহাকে ভালবাসিয়া—মানুষ হৃদয়ের শূন্যতাকে পূর্ণ করিতে চায়। সর্বশেষে কর্মক্লান্ত মানুষ চায় একটু শান্তি, চিরবিশ্রাম, ধীর স্থির শান্তভাব, কোথায় তাহা পাওয়া যায়? তখন মনে হয়, এই অবস্থাটি লাভ করিতে পারিলেই চরম লাভ হইবে।

মানব-মনে এই চারিপ্রকার প্রবণতাকে কেন্দ্র করিয়াই প্রধান চারিটি 'যোগ' সাধনা-জগতে চিরপ্রচলিত: কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও ধ্যানযোগ! এগুলির মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নাই, বিরোধ নাই, বরং এগুলি পরস্পর-পরিপূরক। কাহার জীবনে কোন্‌টি সর্বাপেক্ষা উপযোগী, তাহাই সমস্যা।

শ্রীভগবানের মুখনিঃসৃত গীতায় অর্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া এই সমস্যাগুলিই আলোচিত হইয়াছে, দর্শনের মতো শুধু আলোচিত হয় নাই, উপনিষদের মতো ইহাদ্বারা জীবনের পথ আলোকিত হইয়াছে—তাই গীতা উপনিষদের সম্মান পায়, স্মৃতি হইয়াও ইহা শ্রুতির মতো শিরোধার্য।

এখন দেখা যাক, শ্রীভগবান্ ব্যষ্টি- ও সমষ্টি- মানুষের জীবন-সমস্যার কি সমাধান করিতেছেন? সর্বপ্রথম তিনি কর্মকে অবশ্য-স্বীকার্য বলিয়াছেন। কর্ম করিতেই হইবে। নিজের দৃষ্টান্ত দিয়া বলিতেছেন: আমার কোন বাসনা নাই, প্রাপ্তব্য কিছু নাই, তথাপি আমি অতন্দ্রিত হইয়া কাজ করি, আমি যদি কাজ না করি, আমার দেখাদেখি সকলে কাজ ছাড়িয়া দিবে, সংসার উৎসন্নে যাইবে।

কর্ম করিতেই হইবে। কিন্তু কিভাবে? সাধারণতঃ মানুষ কর্ম করে সকামভাবে, প্রতি কর্মের মূলে থাকে বাসনা বা কামনা এবং শেষে থাকে তাহার ফুল ও ফল। এই ফল

সুখ হইতে পারে, দুঃখও হইতে পারে ; সুখ সকলে চায়, দুঃখ কেহ চায় না ; কিন্তু কর্মফল লইতে গেলে সুখের সহিত দুঃখও লইতে হইবে। যদি কেহ বলে, আমি দুঃখ চাই না, তবে তাহাকে সুখের আশাও ছাড়িতে হইবে অর্থাৎ দ্বিবিধ ফলাকাঙ্ক্ষাই ত্যাগ করিতে হইবে। আকাঙ্ক্ষাই চিত্তকে বিক্ষুব্ধ করে। আকাঙ্ক্ষা-বর্জিত হইলেই চিত্ত স্থির হয়। ফল যখন অনিবার্য, তখন আকাঙ্ক্ষা-বর্জনের উপায় কি? —ভাল মন্দ ফলে সমবুদ্ধি, লাভ-ক্ষতি জয়-পরাজয় মান-অপমানে সমবুদ্ধি, তাই গীতার পরম উক্তি—যোগের নূতন সংজ্ঞা—'সমত্বং যোগ উচ্যতে'। যদি কেহ কায়মনোবাক্যে এই 'সমত্বে'র সাধনা করিতে পারেন, এবং এই সাধনায় সিদ্ধ হন, তবে অবশ্যই তাঁহার চিত্ত স্থির হইবে এবং পতঞ্জলি-উক্ত চিত্তবৃত্তি-নিরোধ-রূপ যোগেরও তিনি অধিকারী হইবেন।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ যোগের আর একটি সংজ্ঞা দিয়াছেন, তাহাও অর্থগৌরবে পরিপূর্ণ 'যোগঃ কর্মসু কৌশলম্'। 'যোগ' অর্থে এখানে চক্ষু বুজিয়া ধ্যান করা নয়!—যোগ কর্ম করিবার কৌশল। সাধারণ মানুষ সকামভাবে কাজ করে—সুখদুঃখের জালে জড়াইয়া ছটফট করে, উহা কর্মের কৌশল নয়, উহা নির্বোধের মতো কাজ করা। বুদ্ধিমানের মতো কাজ করিতে চাও তো, কৌশল অবলম্বন কর। যোগরূপ কৌশল! কি সেই কৌশল? কি সেই যোগ? পূর্বেই বলা হইয়াছে, ভাল-মন্দ ফলে সমত্ববুদ্ধি—অর্থাৎ কর্মফলে অনাসক্তি; কিন্তু কর্ম করিতে হইবে ; অবিদ্বান্ ব্যক্তি আসক্ত হইয়া যেমন আগ্রহে কাজ করে, অনাসক্ত কর্মযোগী সেই আগ্রহ লইয়াই কাজ করিবেন।

এইভাবে কাজ করিলে ফলের বৈচিত্র্য বা বৈষম্যহেতু চিত্ত বিক্ষুব্ধ হইবে না, চিত্ত স্থির থাকিবে। স্থির জলে যেমন তটস্থ বৃক্ষাদি ও আকাশস্থ চন্দ্রাদি অবিকল প্রতিফলিত হয়, স্থিরচিত্তেও সেইরূপ আত্ম-তত্ত্ব স্বতই প্রতিফলিত হইবে, জ্ঞান প্রকাশিত হইবে। স্থিরচিত্ত শুদ্ধচিত্ত একই কথা! বাসনা-কামনার মালিন্য-বর্জিত শুদ্ধচিত্তে শ্রীভগবানের আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী, অথবা বলা যায় শুদ্ধচিত্তই ভগবানের পাদপীঠ। কুণ্ঠাবিহীন হৃদয়ই বৈকুণ্ঠ। সেই 'ভক্তের হৃদয়ই ভগবানের বৈঠকখানা'—সেখানে তিনি আসেন সৃষ্টিস্থিতিলয়-কর্তা ঈশ্বররূপে নয়,—আসেন আনন্দ করিতে, গল্প করিতে, লীলা করিতে, ভালবাসিতে! —'স ঈশ্বরোঽনির্বচনীয়প্রেমস্বরূপঃ।'

এখন প্রশ্ন—কে কোন্ পথে যাইবে? তাহার সহজ সরল উত্তর—যে যেখানে আছে, সেখান হইতে লক্ষ্য যেদিকে, সেদিকেই যাইতে হইবে উত্তরে বা দক্ষিণে, পূর্বে বা পশ্চিমে,—স্বল্পতম বাধার পথেই সহজ গতি। কোন স্থানে যাইবার একটি মাত্র পথ আছে—বালকেও আজকাল এ-কথা বলে না ; কিন্তু দুঃখের বিষয় ধর্মজগতে বড় বড় পণ্ডিতেরা আজও চীৎকার করিয়া বলিয়া থাকেন : আমার বা আমাদের প্রদর্শিত পথই একমাত্র পথ। আমার পথ স্বর্গের, অন্য পথ নরকের।

গীতায় আমরা পাই উদার সমন্বয়-পথের ঘোষণা : 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্'—যে আমাকে যেভাবে চায়—আমিও তাহাকে সেইভাবে ধরা দিই। হে অর্জুন, সোজা পথে হউক, বাঁকা পথে হউক, প্রবৃত্তির পথে হউক, নিবৃত্তির পথে হউক, সকলেই আমাকে চাহিতেছে, আমার দিকেই—আমার পথেই আসিতেছে। জীবনের মহান্ উদ্দেশ্য ও তাহা লাভের বহুবিধ উপায় গীতামুখে ব্যক্ত হইয়াছে। 'ভারত'কে

আহ্বান করিয়া ভারতাত্মা শ্রীকৃষ্ণ যে কথাগুলি বলিয়াছিলেন, সেগুলি চিরদিনের জন্য ভারতের শ্রেষ্ঠ সম্পদ হইয়া রহিয়াছে। ভারতের রাজা গিয়াছে, রাজ্য গিয়াছে, বেদ গিয়াছে, যাগযজ্ঞ গিয়াছে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-প্রদত্ত এই অধ্যাত্ম-সম্পদের উত্তরাধিকার ভারত আজও বহন করিতেছে, এবং চিরকাল করিবে, যদি বা কখনও ক্লান্তি আসে, ভ্রান্তি আসে, শ্রীভগবান্ প্রতিশ্রুত আছেন—তিনিই এ ভুলভ্রান্তি দূর করিয়া দিবেন, তিনিই নবজীবনের সূচনা করিবেন।

ভারতে যখনই ধর্মগ্লানি দেখা দিয়াছে, তখনই ভারতের ভগবান্ নিজ শক্তিকে সময়োপযোগী করিয়া আবির্ভূত হইয়াছেন এবং সে-যুগের সমস্যার সমাধান করিয়া গিয়াছেন। আর প্রতি যুগেই দেখা যায়, ভগবৎশক্তিকে কার্যকরী করিয়া তুলিবার জন্য উপযুক্ত সহকারীর আবির্ভাবও হইয়াছে। যেখানে এরূপ হইয়াছে, সেখানে উন্নতি উৎকর্ষ দেখা দিয়াছে; যেখানে ভগবৎশক্তি ধারণ করিবার উপযুক্ত শক্তি সমাজে ছিল না, সে-সমাজ ছিন্নভিন্ন হইয়া যায় এবং ভগবৎশক্তি দূর-দূরান্তরে উপযুক্ত আধারের সন্ধান করে। সে শক্তি অমোঘ—অব্যর্থ। যদি সেই কল্যাণ-শক্তির সহায়ে ব্যষ্টি ও সমষ্টির জীবন উন্নত করিতে হয়, তবে নিজেদিগকে কিছু পরিমাণে সেই শক্তির যোগ্য করিয়া লইতে হইবে, যোগেশ্বরের সহিত ধনুর্ধরের মিলন হইলে তবেই শ্রী বিজয় ভূতি নীতি দেখা দিবে আমাদের ব্যক্তিগত ও সমাজগত জীবনে।

ভগবৎশক্তি সর্বদাই লীলা করিতেছে, তাহা আমাদের ধরা-ছোঁয়ার ও বোঝার বাহিরে। কিন্তু যখন সেই অসীম শক্তি সীমা স্বীকার করিয়া ধরা দেন, ছোঁয়া দেন, তখনও মানুষ তাঁহাকে ঠিক ধরিতে পারে না, বুঝিতে পারে না। এইখানেই প্রয়োজন মানুষের কিছুটা প্রস্তুতি। গুণাতীত ব্রহ্ম বাক্যমনের অগোচর; সর্বগুণান্বিত ঈশ্বরাবতারও যদি বাক্যমনের অগোচর থাকিয়া যান, তবে তাঁহার অবতীর্ণ হইবার সার্থকতা কোথায়? তাই তিনি নিজেই উন্নত ধরনের মানুষ সঙ্গে করিয়া লইয়া আসেন; শুদ্ধসত্ত্ব ভক্তের মাধ্যমে, সত্ত্বমিশ্রিত রজোগুণান্বিত জ্ঞানী কর্মীর মাধ্যমে তাঁহার মহিমা সংসারে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যান।

একটি ছোট ডাক *

শ্রীদিলীপকুমার রায়

(কীর্তন)

নীল যমুনায় উঠল বেজে বাঁশের বাঁশি তার—
ছোট্ট সে-ডাক শুনে ভেসে গেল এ-সংসার!
(জীবন ভুবন অমনি আমার হ'ল একাকার।)

খুঁজিনি সই, তাকে আমি পর্বতে কি বনে,
মন্দিরে কি তীর্থেও তার ধাইনি অন্বেষণে,
তপ-সাধনে চাইনি তাকে জ্ঞানের অভিমানে,
পাইনি দরশন তার বেদ তন্ত্র কি পুরাণে,
রাধার প্রেমের কথা শুনেছিলাম মুখে কার—
সেই ছোট্ট ডাকেই ভেসে গেল এ-সংসার!

শুনেছিলাম—গুণ কত তার—নিত্য নব রূপ!
সে দেবদেব, আদিকারণ, মহান্, অপরূপ।
তিন ভুবনের শুনেছিলাম নাথ সে,—লোকপাল,
পাইনি ভেবে পার, জেনেছি শুধু—সে গোপাল।
দেখেছিলাম শুধু মোহন মুখটি সখী, তার—
সেই ছোট্ট দেখায় ভেসে গেল এ-সংসার!

তার একটি ছোট্ট ডাকে কেন যে মন গায়ঃ
'যা আছে তোর সব বিকিয়ে দে তার রাঙা পায়!'
মুক্তিকামী নইলো আমি, চাই না অগাধ জ্ঞান,
তাকে পেয়ে ছেড়েছি লোকলাজ ভয় কুল মান।
মীরা পাগল হ'ল শুধু নাম শুনে সই, তার—
সেই ছোট্ট গানেই ভেসে গেল এ-সংসার!

* ইন্দিরা দেবীর গানের অনুবাদ

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ মহারাজের স্মরণে

স্বামী পবিত্রানন্দ

আমার যতটা মনে পড়ে স্বামী বিশুদ্ধানন্দ মহারাজকে আমি প্রথম দর্শন করি ১৯২৪ খৃঃ মাদ্রাজ মঠে। তাঁহাকে আমরা সকলেই 'জিতেন মহারাজ' বলিয়া ডাকিতাম—পূর্বাশ্রমের নাম অনুসারে। পরে তিনি যখন আমাদের মঠ ও মিশনের সহাধ্যক্ষ (Vice-President) হন, তখন 'জিতেন মহারাজ' বলিতে ও চিঠি লিখিতে বাধ-বাধ ঠেকিত, তবু যে-নামের সহিত এতদিনের ঘনিষ্ঠতা ও শ্রদ্ধা জড়িত ছিল, তাহা পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা হইত না—তাঁহাকে 'জিতেন মহারাজ'ই বলিতাম।

মাদ্রাজ মঠে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবার খুব সম্ভবতঃ প্রথম দিনেই কি পরদিন তিনি দুপুরবেলা বাহিরে একটি কাঁচা উনুনে নিজের স্নানের জন্য জল গরম করিতেছিলেন, ধোঁয়া উঠিতেছিল বলিয়া কাঠগুলি ঠিক করিয়া দিতেছিলেন। আমি সেই দিক দিয়া যাইতেছিলাম, আমাকে দেখিয়া বলিলেন, 'প্রচুর জল হইবে, তুমিও ইহা হইতে স্নানের জন্য গরম জল নিতে পারিবে।' সেই সময় মাদ্রাজে শীত ছিল না—মাদ্রাজে তো শীত নাই বলিলেই চলে, নয় মাস গরম, বাকী তিন মাস অধিকতর গরম। স্নানের জন্য যে গরম জলের প্রয়োজন হইবে, সে-কথাই আমার মনে উঠে নাই, কিন্তু পূজনীয় জিতেন মহারাজ, যিনি বয়সে আমা হইতে অনেক বড় ও প্রাচীন সাধু—আমাকে এইরূপভাবে গরম জল লইতে বলায় আমি অবাক্ হইয়া ভাবিলাম—তিনি এত স্নেহপ্রবণ!

মাদ্রাজ মঠে একজন সাধুর নিকট শুনিয়াছিলাম, শ্রীশ্রীমহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) নাকি জিতেন মহারাজ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, 'একজন সাধু পাঠাইতেছি, সে সর্বক্ষণ ভগবানের চিন্তায় বিভোর।' মাদ্রাজ মঠে জিতেন মহারাজকে দেখিতাম, সব সময় নিজের ভাবেই থাকিতেন। তবে কেহ তাঁহার ঘরে বা নিকটে গেলে বেশ আলাপাদি করিতেন, কিছুমাত্র বিরক্তির ভাব তাঁহার ছিল না। সুতরাং যে-কোন সময়ে আমরা তাঁহার ঘরে যাইতাম, কোন সঙ্কোচ হইত না। কোন কোন সময়ে কথাবার্তা বেশ জমিয়া উঠিত, হাসি-তামাসাও হইত; কিন্তু তাহার মধ্যে অমূল্য ধর্মপ্রসঙ্গ অনেক হইত, সুতরাং তাহার আকর্ষণও ছিল।

ধর্মপ্রসঙ্গ করিতে তিনি ভক্তির কথাই বেশী বলিতেন। সত্যিকার ধর্মজীবন গঠন করিতে হইলে ধ্যানজপ, পূজাপাঠ, প্রার্থনারই বিশেষ প্রয়োজন—তাহাতে চুলচেরা দার্শনিকতত্ত্ব-বিচারের কোন স্থান নাই, ইহাই ছিল তাঁহার দৃঢ় মত। আমরা ইহা জানিয়া তাঁহার ঘরে বা নিকটে দার্শনিক বাদানুবাদ বেশী করিতাম না, কিন্তু তাঁহার ঘরের বাহিরে অন্য ঘরে থাকিলে আমরা এই নিয়মটি তত মানিয়া চলিতাম না। তাহাতে তিনি মাঝে মাঝে মন্তব্য প্রকাশ করিতেন যে, আমরা বৃথা শক্তিক্ষয় করিতেছি, সময় নষ্ট করিতেছি, এইরূপ বাদানুবাদে বেশী কোন কাজ হয় না। তাঁহার এইরূপ মন্তব্যে তাঁহার মানসিক উচ্চ অবস্থারই নিদর্শন পাওয়া যাইত, সেইজন্য আমরা তাঁহাকে অধিকতর শ্রদ্ধা করিতাম।

পরে যখন তাঁহার সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে মিলিবার সুযোগ লাভ করিলাম, এবং তিনিও আমাকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দিলেন, তখন আমি তাঁহার সঙ্গে ধর্মের দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনা করিতে বিরত হই নাই। ধর্মবিষয়ক কোন প্রশ্নের জবাব আমি মনে মনে একটা ঠিক করিলেও তাঁহাকে সেই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করিতাম, শুধু দেখিতে তাঁহার কি অভিজ্ঞতা এবং তাহা হইতে আমি কি শিক্ষা লাভ করিতে পারি। বিচারবুদ্ধি-বিরহিত ভক্তিমূলক আচার-অনুষ্ঠানে অনেক সময় অপকার হইতে পারে, তাহা হইতে সাবধান থাকা উচিত; যাঁহারা খুব ভাগ্যবান্, নিরবচ্ছিন্ন ভক্তিভাব লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের কথা আলাদা, কিন্তু সাধারণ লোকের পক্ষে বিচারবুদ্ধি লইয়াই চলা উচিত—, এইরূপ প্রশ্নও মাঝে মাঝে তাঁহার নিকট উত্থাপন করিয়াছি, এবং সুন্দর জবাব পাইয়াছি।

সাধারণতঃ তিনি খুব সহানুভূতির সহিতই জবাব দিতেন এবং আলোচনা করিতেন, কিন্তু একবার আমার ঐ ধরনের কোন প্রশ্নে বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিলেন, 'তোমার ভিতরে ভক্তি-ভাব আছে, তুমি বাহিরে অন্যরকম দেখাও।' আমি তাঁহার বিরক্তির কারণ হইয়াছি বলিয়া দুঃখিত হইয়া জবাব দিলাম, 'সাধারণতঃ লোকের ভিতরে ভক্তি নাই, বাহিরে ভক্তির ভান করে, এই অভিযোগ; আপনি বলছেন, আমার ভিতরে ভক্তি আছে, বাহিরে প্রকাশ করিতেছি তাহা নাই। আপনার কথা যদি সত্যসত্যই ঠিক হয়, তবে তো আমার বিশেষ সৌভাগ্য বলিতে হইবে।' তিনি বুঝিতে পারিলেন, আমি আন্তরিকভাবেই প্রশ্ন করিয়াছি।

মাদ্রাজ মঠে বেশীদিন তাঁহার সঙ্গে থাকিতে পারি নাই, বাংলাদেশে চলিয়া আসি; পরে আমাকে মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের কর্মী করিয়া পাঠানো হয়। অনেক বৎসর আমি মায়াবতী আশ্রমে অথবা তাহার কলিকাতা শাখাকেন্দ্রে কাজ করিয়াছি।

১৯২৭ খৃঃ জিতেন মহারাজ রাঁচি রামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষ হইয়া যান। বেলুড় মঠ হইতে রাঁচি রওনা হইবার দিন তাঁহাকে হাওড়া স্টেশনে তুলিয়া দিয়া আসিয়াছিলাম। মাঝে মাঝে কলিকাতা অদ্বৈত আশ্রমে থাকিতাম বলিয়া তিনি যখন বেলুড় মঠে আসিতেন, সেই সময়ে কলিকাতায় কয়েকদিন কাটাইয়া যাইতেন। তখন তাঁহার সহিত সময় সময় একত্র থাকা যাইত। ইহা ছাড়া অনেকবার রাঁচি আশ্রমে গিয়াও বাস করিয়াছি। তাহার মধ্যে দুইবার কম-বেশী ছয়মাস করিয়া ছিলাম। এইরূপে তাঁহাকে খুব ঘনিষ্ঠভাবে জানিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল।

তিনিই রাঁচি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম আরম্ভ করেন। যেরূপ হইয়া থাকে, প্রথম প্রথম আশ্রমে প্রায় কিছুই ছিল না। স্বর্গত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রাঁচি-স্থিত ভবনের 'বহির্বাটী' রামকৃষ্ণ মিশনকে দান করা হয়—উহাতেই আশ্রম শুরু হয়। গৃহটির অবস্থাও বিশেষ ভাল ছিল না—আসবাব-পত্রও সামান্যই ছিল। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই জিতেন মহারাজ আশ্রমটিকে ছবির মতন সুন্দর করিয়া তুলেন। অল্পপরিসর স্থান—তাহার মধ্যেই চমৎকার ফুলের বাগান, সমগ্র আশ্রমটি ভিতর বাহিরে অতিমাত্রায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আশ্রমের সুরুচিসম্পন্ন সৌন্দর্য আশ্রমের অর্থকৃচ্ছ্রতাকে সম্পূর্ণভাবে ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল। যে দেখিত, সেই মুগ্ধ হইয়া যাইত। বাহিরের সৌন্দর্য প্রীতিকর হইলেও একমাত্র উহা দ্বারা কোন আশ্রমের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয় না।

পূজনীয় জিতেন মহারাজ রাঁচি আশ্রমের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রাণঢালা তপস্যা দ্বারা। প্রথম অবস্থায় আশ্রমটি খুবই নির্জন ছিল। এখন আর সেখানে তত নির্জনতা নাই, নিকটে অনেক ঘরবাড়ি হইয়াছে। যাহা হউক তখন ওখানে দিনের বেলাতেই গভীর নীরবতা বিরাজ করিত। তাহার সুযোগ গ্রহণ করিয়া জিতেন মহারাজ ঐস্থানে খুব তপস্যা করিয়াছেন। ঐ তপস্যার মধ্যে তপঃক্লিষ্টতা ছিল না—অতি পরিমাণে আনন্দ ছিল।

আমি অনেকদিন তাঁহাকে দেখিয়াছি, সকালবেলা যখন ধ্যান শেষ করিয়া তিনি ঘর হইতে বাহির হইয়াছেন, তখন তাঁহার মুখচোখ দেখিলেই বোঝা যাইত, তাঁহার গভীর ধ্যান হইয়াছে। তখন কোন কথা বলিয়া তাঁহার অন্তর্মুখীন অবস্থাকে নষ্ট করিতে আমার ইচ্ছা হইত না। সেই অবস্থা অনেকক্ষণ চলিত। দিনের পর দিন এইভাবে তিনি সাধন-ভজন করিয়াছেন। এক সময়ে ধ্যানজপের মাত্রা বিশেষভাবে বাড়াইয়া দিয়াছিলেন। আশ্রমের বাহিরে বিশেষ এক নির্জন স্থানে গিয়া প্রত্যহ সকালবেলা একটানা ৪।৫ ঘণ্টা সাধন ভজন করিতেন।

আমি যখন রাঁচি গিয়াছি, তখনই তাঁহার ঘরের পাশে অন্য একটি ঘরে আমার বাস করিবার স্থান হইত। তাহাতে দিনরাত্রি তাঁহাকে ভাল করিয়া দেখিবার সুযোগ আমার হইয়াছিল। যখন আসনে বসিয়া ধ্যান করিতেন না, তখনও দেখিতাম তিনি একা একা চুপ করিয়া গভীরভাবে কিছু চিন্তা করিতেছেন অথবা কোন ধর্মগ্রন্থ সামান্য কিছু পাঠ করিয়া বারান্দায় পায়চারি করিতেছেন ও ঐসব যেন মনে মনে বিচার করিতেছেন।

আশেপাশের লোকেরা মনে করিত, জিতেন মহারাজ একা একা থাকিতেই ভালবাসেন, লোকজনের সঙ্গে বেশী কথা বলা পছন্দ করেন না। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ সত্য নয়। রাঁচি শহর হইতে ভক্তেরা আসিলে যে-কোন সময়ে খুব কথাবার্তা বলিতেন, তবে তাহা ধর্মপ্রসঙ্গ। শনিবার রবিবার অথবা কোন ছুটির দিন যখন ভক্তেরা আসিতেন, তিনি অনেকক্ষণ ধরিয়া তাঁহাদের সঙ্গে আলাপ করিতেন।

ধর্মপ্রসঙ্গ করিবার সময় ঠাকুরের কথা ও মায়ের কথা খুব বলিতেন। 'কথামৃত' হইতে ঠাকুরের বাণী খুব উদ্ধৃত করিতেন। 'কথামৃত' তাঁহার যেন মুখস্থ ছিল, আর তাহার এক একটি বাক্যের মৌলিক ব্যাখ্যা দিতেন—ঐগুলি খুব উপভোগ্য ছিল।

রাঁচিতে থাকাকালে এক সময় তাঁহাকে দেখিয়াছি, তিনি নিয়মিতভাবে 'কথামৃত' পাঠ করিতেন ও ঐগুলি চিন্তা করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের কোন নূতন কথা কোথাও পাইলেই পাঠ করিতেন, তিনি যেন উহা অমূল্য রত্ন মনে করিতেন—উহা তাঁহার মনে চিরতরে গ্রথিত হইয়া থাকিত। এইভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ ও বাণী তাঁহার চিন্তার ধারার সঙ্গে যেন মিশিয়া গিয়াছিল।

জিতেন মহারাজ গীতা-উপনিষদ্ হইতেও খুব শ্লোক উদ্ধৃত করিতেন। অনেকদিন রাঁচিতে গীতা ও উপনিষদের ক্লাস করিয়াছিলেন। ক্লাসের জন্য তিনি ভাষ্য পড়িতেন, কিন্তু আমার মনে হইত, ভাষ্য-পাঠের চেয়েও এ-বিষয়ে তিনি খুব গভীরভাবে চিন্তা করিতেন। ক্লাসে তিনি শুধু মস্তিষ্ক-প্রসূত কথা বলিতেন না, নিজে হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে যাহা বোধ করিতেন, তাহাই বলিতেন। ফলে তাঁহার ক্লাসগুলি সাধারণ ক্লাস বলিয়া গণ্য করা চলিত না—ঐগুলি যেন জীবন্ত উপদেশ মনে হইত।

আমি কয়েকবার তাঁহার ক্লাসে যোগ দিয়াছি। ক্লাসে বেশী লোক হইত, বলা চলে না। আমার দুঃখ হইত, এইরূপ মূল্যবান্ ক্লাসে আরও বেশী লোক হয় না কেন? তাহা হইলে তো আরও অনেক লোক উপকৃত হইত। হয়তো জিতেন মহারাজের ক্লাসের উচ্চ স্তরের কথা শুনিবার জন্য তখন বেশী লোক তৈয়ার ছিল না।

পূঃ জিতেন মহারাজ ধ্যানজপ ধর্মপ্রসঙ্গ ইত্যাদি লইয়াই থাকিতে চাহিতেন। কাজের বেশী হাঙ্গামা পছন্দ করিতেন না, কাজ বেশী বাড়াইবার দিকে তাঁহার আগ্রহ ছিল না। ফলে কাগজে বা রিপোর্টে ছাপাইবার জন্য রাঁচি আশ্রমের কাজ তেমন বেশী কিছু ছিল না—আশ্রমটিও তেমন কিছু বড় হয় নাই। কিন্তু আসল কাজ—লোকের মনে শান্তি প্রদান করা—লোকের জীবন গঠন করিতে সাহায্য করা—তিনি অনেক করিয়াছিলেন।

কলিকাতা বা অন্য স্থান হইতে অবসর সময়ে অনেকে রাঁচি যাইত। শুধু জিতেন মহারাজের পূত সঙ্গে কিছু দিন বাস করিতে পারিবে বলিয়া। 'Can'st thou not minister to a mind diseased?'—মনের পীড়া আরোগ্য করাই তো প্রধান এবং সব চেয়ে কঠিন কাজ? জিতেন মহারাজ তাহা করিতে খুব সক্ষম ছিলেন। আমি তাঁহাকে সময় সময় কৌতুকচ্ছলে বলিয়াছি, 'কোথায় রাঁচির ছোট শহরে পড়িয়া আছেন, যদি কোন বড় শহরে থাকিতেন, তবে কত বেশীসংখ্যক লোক আপনার সংস্পর্শে আসিয়া উপকার লাভ করিত।'

১৯৪৭ খৃঃ তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহাধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। ১৯৫১ খৃঃ হইতে কয়েক বৎসর তিনি ভারতবর্ষের নানাস্থানে গিয়াছিলেন ও অক্লান্তভাবে বহু লোকের মধ্যে ধর্মভাব প্রচার করিয়াছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে শরীর অপটু হইলেও যুবকসুলভ উৎসাহ লইয়া তিনি ঐ কাজ করিয়াছেন। তিনি বলিতেন, 'ভগবান এই শরীর দ্বারা যাহা করাইতে চান, করাইয়া নিন।'

রাঁচিতে তাঁহার সঙ্গে বাস করিবার কালে সব চেয়ে আমার উপভোগ্য সময় ছিল যখন রাত্রিতে আহারের পর নয়টা হইতে প্রায় দশটা পর্যন্ত বারান্দায় পায়চারি করিতে করিতে বা বসিয়া আলাপ করিতাম। তখন তিনি নিজে হইতেই অনেক কথা বলিতেন। সময় সময় এত মূল্যবান্ কথা বলিয়া যাইতেন যে, আমার কখন কখন মনে হইত ঐগুলি নোট করিয়া লইলে বেশ সুন্দর প্রবন্ধ হইতে পারে।

আলাপের বিষয় সাধারণতঃ ছিল ধর্মজীবনের সমস্যা ও সমাধানের কথা—শ্রীরামকৃষ্ণ ও মাতাঠাকুরানীর জীবনের ঘটনা, শ্রীরামকৃষ্ণের পার্ষদদের স্মৃতি। কোন কোন সময় তিনি নিজের জীবন, সাধনভজন-প্রণালী ও উপলব্ধির কথাও বলিয়াছেন। অবাধভাবে সব কথা বলিয়া যাইতেন। এইভাবেই বলেন:

কেমন করিয়া তিনি ম্যাক্সমূলরের বই পড়িয়া দক্ষিণেশ্বরে যান, সেখানে শ্রীশ্রীমায়ের কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য মনে প্রবল তৃষ্ণা উদিত হয় এবং অল্পদিনের মধ্যে পথে অনেক কষ্ট সহ্য করিয়া কামারপুকুর হইয়া জয়রামবাটী গমন করেন। এইভাবে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর দর্শনলাভ ঘটে। প্রথম দর্শনেই শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীকে তাঁহার অত্যন্ত আপনার বলিয়া মনে হইল।—'মনে হ'ল যেন জন্মজন্মান্তরের আপনার মা।'

জিতেন মহারাজ আমাকে বলিয়াছিলেন, জয়রামবাটীতে এক দিন ভোরবেলায় জাগ্রত অবস্থায় তাঁহার একটি দিব্য দর্শন লাভ হয়। তাঁহার অন্য একটি উপলব্ধির কথাও তিনি এক সময়ে বলিয়াছিলেন। কোন্ স্থানে এবং কবে এই উপলব্ধি হইয়াছিল বলিয়াছিলেন, ঠিক স্মরণ করিতে পারিতেছি না। তিনি বলিয়াছিলেন একদিন চুপ করিয়া বসিয়া আছি, হঠাৎ মনে হইল, সবই মধুময়। আকাশ বাতাস সব যেন মধুময়; গাছ পাতা হইতে যেন মধু ঝরিতেছে; যেদিকে তাকাই, সব মধুময়—সবই মধুময়! আর তাহার দর্শনে কি আনন্দ! তখন হঠাৎ আমার মনে হইল, ঋগ্বেদে তো এমন একটি সূক্ত আছে—'মধুমতী-সূক্তম্'।[১]

বাতাস মধু বহিয়া আনিতেছে,—নদনদী হইতে মধু প্রবাহিত হইতেছে, সমস্ত বনরাজি আমাদের পক্ষে মধুময় হউক। দিবস-রজনী আমাদের পক্ষে মধুময় হউক। পৃথিবীর ধূলিকণা মধুময় হউক। আমাদের রক্ষাকর্তা দ্যৌঃ মধুময় হউক। সূর্য মধুময় হউক। আমাদের ধেনু-সকল মধুপ্রদায়ী হউক।

কেহ সাধারণতঃ নিজের আধ্যাত্মিক অনুভূতির কথা সহজে বলিতে চাহেন না। তাই জিতেন মহারাজ যখন এই সব বলিতেন, আমি অবাক্ হইয়া শুনিতাম। তিনি নিজেই দুই-এক বার বলিয়াছিলেন, 'কি জানি, তোমার নিকট আমি সব বলিয়া ফেলি।' আমি মনে করিতাম, ইহা আমার মহা সৌভাগ্য ও আমার প্রতি তাঁহার অশেষ প্রীতির নিদর্শন।

পূজনীয় জিতেন মহারাজ শ্রীশ্রীমহারাজের কথা সময় সময় বেশ আবেগভরে বলিতেন। একবার বলিয়াছিলেন:

একদিন মহারাজের গা টিপিতেছি, অনেকক্ষণ ধরিয়া। ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি, আর যেন পেরে উঠছি না। পরে হঠাৎ আমার মনে হইল, সাধু না হইয়া সংসারে থাকিলে তো মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া পরিশ্রম করিতে হইত; এখন মহারাজের একটু সেবা করিবার অধিকার পাইয়াছি, তাহাতে আবার ক্লান্তি বোধ করিতেছি? যেই এইরূপ মনে হওয়া, অমনি ভিতর থেকে যেন অসম্ভব একটা বল লাভ করিলাম। সব ক্লান্তি কোথায় চলিয়া গেল। তখন দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত মহারাজের গা টিপিতে লাগিলাম। কি আশ্চর্য, ঠিক সেই মুহূর্তেই মহারাজ আমাকে বলিলেন, 'থাক্, বেশ হইয়াছে, আর করিতে হইবে না।' মহারাজ অন্তর্যামী ছিলেন, অন্তর দেখিতে পাইতেন। আমাকে পরীক্ষা করিতেছিলেন।

মহারাজের কিছু দিন খুব সেবা করিয়াছি। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে গেলে বলিতে পারিব, আর কিছু করিয়াছি বা না করিয়াছি, তোমার ছেলের সেবা করিয়াছি। অন্ততঃ এক ছিলিম তামাক ভরিয়া দিয়াছি। যখন মহারাজের জন্য সামান্য একটু তামাকও সাজাইয়াছি, সমস্ত মনটা যেন তাহাতে দিয়াছি। কি আগ্রহ ও ভালবাসা তাহাতে ছিল!

*   *   *   *

জিতেন মহারাজের নিকট শুনিয়াছি, কলিকাতা বলরাম-মন্দিরে মহারাজ যেন তাঁহার নিজের অভিজ্ঞতাই একদিন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, 'ধ্যানজপ করিতে করিতে কিছু উন্নতি হইল, তারপর আসে dryness (শুষ্কতা), মনে হয় দরজা যেন বন্ধ হইয়া আছে। তখন

[১] 'মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাধ্বীর্ন সন্ত্বোষধীঃ।'

অসীম ধৈর্য সহকারে পড়িয়া থাকিতে হয়। পড়িয়া থাকিতে থাকিতে একদিন হঠাৎ দরজা খুলিয়া যায়, তখন কি আনন্দ! ধর্মজীবনে এরূপ অনেক দরজা অতিক্রম করিতে হয়।'

জিতেন মহারাজকে একবার কালিফর্নিয়াতে বেদান্ত-কেন্দ্রে কাজ করিবার জন্য পাঠাইবার কথা হয়। তখন মহারাজের শরীর চলিয়া গিয়াছে। মঠ ও মিশনের সাধারণ সচিব সারদানন্দ মহারাজ জিতেন মহারাজকে লিখিয়াছিলেন, 'আমরা যদি তোমাকে আমেরিকা যাইতে বলি, তুমি যাইতে রাজি হইবে কি?' পরিষ্কারভাবে যাইতে আদেশ করেন নাই, শুধু ইঙ্গিত করিয়া জিতেন মহারাজের অভিমত জানিতে চাহিয়াছিলেন। জবাবে জিতেন মহারাজ কাকুতি-মিনতি করিয়া জানান, আমেরিকা গিয়া কাজ করিতে তাঁহার নেহাত অনিচ্ছা। জিতেন মহারাজের মুখ হইতে এই ঘটনা শুনিয়া আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, 'যাইতে রাজি হইলেন না কেন? ঐখানে গেলে কত বড় কাজ করিতে পারিতেন।' জিতেন মহারাজ বলিলেন, 'যাইতে সাহস পাই নাই। মহারাজ থাকিলে হয়তো যাইতে সাহস পাইতাম।'

জিতেন মহারাজ সারা ভারতবর্ষে অনেক তীর্থস্থান দর্শন করিয়াছেন, কিন্তু শেষ বয়সে দেখা গিয়াছে সমস্ত তীর্থস্থানের মধ্যে কাশী, কামারপুকুর জয়রামবাটী ও দক্ষিণেশ্বরের উপর তাঁহার বিশেষ আকর্ষণ ছিল। একাধিকবার কামারপুকুর, জয়রামবাটীতে গিয়া তিনি তপস্যা করিয়াছেন। সহাধ্যক্ষ হইবার পর তিনি যখন লোকজনকে দীক্ষা দেওয়া, ধর্মোপদেশ প্রদান করা, বিভিন্ন শাখাকেন্দ্রে যাওয়া প্রভৃতি কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত, আর শরীরও ক্রমশঃ দুর্বল হইয়া আসিয়াছে, তখনও বোধ হয় একবার কয়েকমাস তপস্যা-হিসাবে কামারপুকুর-জয়রামবাটীতে বাস করিয়াছিলেন।

সারাজীবনই দক্ষিণেশ্বর দর্শনের জন্য তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। বাংলা নূতন বৎসরের প্রথম দিনে মঠে থাকিলে তাঁহার দক্ষিণেশ্বরে যাওয়া চাই। কয়েকবার দয়া করিয়া আমাকেও সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছেন। আমার মনে হয়তো তত আগ্রহ হয় নাই। কিন্তু তাঁহার সঙ্গে গেলে তিনি এত শ্রদ্ধা-ভক্তির সহিত মন্দিরাদি দর্শন করিতেন যে, তাহা দেখিয়া আমারও কিছু উপকার হইবে মনে করিয়াই অত্যন্ত আনন্দের সহিত অনেকবার তাঁহার সঙ্গে দক্ষিণেশ্বর গিয়াছি এবং তাহা সৌভাগ্যের বিষয় মনে করিয়াছি। যেবার নববর্ষে দক্ষিণেশ্বর তিনি যাইতে পারিতেন না, সেবার অস্বস্তিবোধ করিতেন। ১৯৫৯ খৃঃ এপ্রিল মাসে নিউইয়র্কের ঠিকানায় এক চিঠিতে আমাকে লিখিয়াছিলেন, 'কয়েক বৎসর শুভ নববর্ষে আর দক্ষিণেশ্বর যাওয়া হয় না, ইহার কারণ কতকটা শারীরিক অসামর্থ্য এবং কতকটা নূতন খাতার ভিড়ের জন্য।'

বর্তমান বৎসর ১লা বৈশাখে দক্ষিণেশ্বর যাইতে পারিয়াছিলেন। আমাকে লিখিয়াছিলেন, 'হাঁ, মার কৃপায় গত ১লা বৈশাখ মাতা ভবতারিণীর দর্শনে যেতে সক্ষম হয়েছিলাম এবং গর্ভ-মন্দিরে দাঁড়িয়ে তাঁর দর্শন ও প্রণামাদি ক'রে এসেছিলাম। কিন্তু বসিতে পারি নাই। এবারে একটি নূতন জিনিস অর্থাৎ সেই দিনে মার ভোগাদিরও ব্যবস্থা করেছিলাম তাঁর ইচ্ছায়।'

তখন আমি কলিকাতা ৪ নং ওয়েলিংটন লেনের আশ্রমে। একদিন বিকালবেলা হঠাৎ জিতেন মহারাজ আসিয়াছিলেন অল্পক্ষণের জন্য। তিনি দক্ষিণেশ্বর-দর্শনে যাইতেছেন একজন ভক্তের গাড়িতে। আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমিও যাইতে ইচ্ছা করি কিনা। আমার যতটুকু মনে পড়িতেছে, আমার জরুরি কাজ ছিল বলিয়া তাঁহার সঙ্গে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু আমি তাহা না বলিয়া কৌতুক করিয়া বলিলাম, 'দক্ষিণেশ্বর গিয়া লাভ কি ? মা-কালীর প্রস্তর-মূর্তি—তাহা কোন কথা কয় না।' জিতেন মহারাজ আমার আপাত-প্রগল্‌ভতা সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করিয়া অতি সহানুভূতি ও স্নেহভরে বলিলেন, 'আর যা কর, দক্ষিণেশ্বর-সম্বন্ধে ঐরূপ কথা বলিও না। সেখানে মা-ভবতারিণী জাগ্রতা দেবী।'

গাড়ি অপেক্ষা করিতেছিল, জিতেন মহারাজ তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলেন, কিন্তু তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাসমূলক কথাগুলি আমার মনের কোণে দাগ রাখিয়া গেল।

অনেক বৎসর ধরিয়া পূজনীয় জিতেন মহারাজ পূজার সময় কাশীতে আসিতেন ও ২।৩ মাস বাস করিতেন। কাশীমাহাত্ম্য ও কাশী-বিশ্বনাথের উপর ছিল তাঁহার অগাধ ভক্তি। প্রথম কয়েক বৎসর কেদার বাবা (স্বামী অচলানন্দ) কাশীতে ; তাঁহার সঙ্গলাভেরও আকর্ষণ ছিল। আমায় তখন প্রত্যেক বৎসরই মায়াবতী হইতে কলিকাতা আসিতে হইত। পরে কাশীতে নামিতাম ও জিতেন মহারাজের সঙ্গে দেখা হইত। তখন রাত্রিতে দেখিতাম, আহারের পর জিতেন মহারাজ ও কেদার বাবা—দুই জনে কাশী সেবাশ্রমে পূজনীয় হরি মহারাজের ঘরে বসিতেন ও অনেক সদালাপ করিতেন। কাশীতে আমাদের দুই আশ্রমের কোন কোন সাধু তাহাতে যোগদান করিতেন। আমি যত দিন কাশীতে থাকিতাম, আমিও আসিয়া বসিতাম। সৎপ্রসঙ্গ শুনিয়া আনন্দ ও উপকার দুই-ই লাভ করা যাইত।

১৯৫১ খৃঃ আমি আমেরিকা চলিয়া আসি। বিজয়ার চিঠিতে আমি কাশী হইতে সংবাদ পাইতাম, পূজার সময় জিতেন মহারাজ কাশীতে আছেন, অনেক সাধু ব্রহ্মচারী ও ভক্ত তাঁহার নিকট যাইয়া আনন্দ পাইতেছে। চিঠিতে সংবাদ পাইয়াছি, দুর্গাপূজা ও কালীপূজার সময় জিতেন মহারাজ পূজার মণ্ডপে গিয়া বসিতেন ও রীতিমত অনেকক্ষণ ধরিয়া ধ্যান করিতেন। কালীপূজার সময় পূজা শেষ না হওয়া পর্যন্ত, প্রায় সারা রাত্রি বসিয়া থাকিতেন। তখন তাঁহার শরীর অসুস্থ ও দুর্বল—তবু তিনি ধ্যান করিতে পারিতেন ও করিতেন। জিতেন মহারাজকে অনেকবার বলিতে শুনিয়াছি, ষাট বৎসর বয়সের পর আর ধ্যান-ভজন করা চলে না—স্মরণ-মনন করা যায় মাত্র। জিতেন মহারাজের পক্ষে দুই-ই সম্ভবপর হইত।

১৯৬১ খৃঃ ৺বিজয়ার চিঠিতে কাশী হইতে আমাকে লিখিয়াছিলেন : 'এখানে মা-মহামায়ার পূজাদি মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া গেল অদ্বৈতাশ্রমে। মার প্রতিমাখানি অতি সুন্দর হইয়াছিল এবং ভক্তবৃন্দের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিল। তুমি উহা দর্শন করিলে খুব আনন্দ পাইতে। রোজ বিশ্বনাথের এই আনন্দকাননে মহাশ্মশানে কাশীধামে জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি আনন্দে কেটে যাচ্ছে তাঁর অসীম কৃপায়। শরীর তিনি একপ্রকার চালাইয়া নিতেছেন। এখন তো জীবনের পঞ্চম অধ্যায়ে এসে পৌঁছিয়াছি। এর পরেই তো 'নশ্যতি'—সেই দিনেরই অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছি—নিষ্কর্ম অবস্থায়।' তিনি নিষ্কর্ম ছিলেন না—প্রত্যহ লোকজনের

সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিতেন ও তাহাদের ধর্মজীবনের সমস্যার সমাধান করিতেন ও উদ্দীপনা দিতেন।

১৯৫৮ খৃঃ আমি দেশে গিয়াছিলাম। তখন মাস-দেড়েক সময় পূজনীয় জিতেন মহারাজের সঙ্গে একত্র বেলুড় মঠে বাস করিয়াছিলাম। তিনি গেস্টহাউসের উপরতলায় থাকিতেন, আমার ঘর ছিল নিচের তলায়। বৃদ্ধ বয়স এবং শরীরও তত শক্ত নয়, কিন্তু তথাপি অনেকক্ষণ ধরিয়া নিয়মিতভাবে ধ্যানজপ করিতেন, দুইবেলা ভক্তদের সঙ্গে ধর্মালোচনা করিতেন, সারাদিনের সময় নিয়মে বাঁধা, অল্প সময়ই বৃথা কাটাইতেন। রোজই রাত্রি ৯টার সময় তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে যাইতাম, কারণ তখন আর লোকজনের ভিড় থাকিত না—তাঁহাকে একাকী পাওয়া যাইত। সাধারণতঃ ঘণ্টাখানেক সময় তাঁহার সঙ্গে কথাবার্তা হইত। কিন্তু কোন কোন দিন তিনি কথা বলিতে বলিতে রাত্রি প্রায় এগারটাও করিয়া ফেলিতেন। আমি সচেতন ছিলাম যে, তাঁহার শুইতে যাইবার সময় হইয়াছে, কিন্তু এত মূল্যবান্ কথা নিজ হইতেই তিনি বলিতে থাকিতেন যে, আমি তাঁহাকে সময়ের কথা জানাইয়া দিতে পারিতাম না বা চাহিতাম না।

দেশে চারিমাস কাল ছিলাম। তার মধ্যে বেলুড মঠে যতদিন ছিলাম, তাহাতেই সবচেয়ে বেশী আনন্দ ও উপকার হইয়াছিল। তার মধ্যে জিতেন মহারাজেব সঙ্গে রাত্রির নিস্তব্ধতার মধ্যে এইরূপ আলাপ-আলোচনা বিশেষ স্মরণীয় হইয়াছিল। তিনি নিঃসঙ্কোচে ও অবাধভাবে সাধুজীবনে তাঁহার সকল প্রকার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার কথা বলিয়া যাইতেন। আমি বিদেশে থাকি, কবে আর দেখা হইবে ঠিক নাই, মনে করিয়া যেন তিনি যাহা দেখিয়াছেন, শুনিয়াছেন, বুঝিয়াছেন—কোন কিছু গোপন না করিয়া সব কথা বলিয়া যাইতেন। আমি কৃতজ্ঞতাভরে চুপ করিয়া শুনিয়া যাইতাম। কি কি বলিয়াছেন, সব কথা স্মরণ নাই। সবগুলি মিলিয়া মনের উপর যে দাগ রাখিয়া গিয়াছে, তাহার মূল্য অনেক।

একদিন কথায় কথায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তাঁহার ধ্যানজপ কিরূপ গভীর হয়? তিনি বলিয়াছিলেন, 'পূর্বে ধ্যান করিতে বসিয়া ভগবানের দিকে অগ্রসর হইতে অশেষ চেষ্টা করিতে হইত, এখন ভগবান আমার দিকে নিজেই যেন অগ্রসর হইয়া আসেন, তাহা অনুভব করি।'

বোধ হয় এই সময়েই শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতের লেখক মাস্টার মহাশয়ের কথা বলিতে যাইয়া তাঁহার নিরভিমানতার উদাহরণস্বরূপ একটি ঘটনা বলিয়াছিলেন। বেলুড় মঠের বয়োজ্যেষ্ঠ বা বয়ঃকনিষ্ঠ যে-কোন সাধু-ব্রহ্মচারীর উপর মাস্টার মহাশয়ের ছিল অসীম শ্রদ্ধা। সে অনেক কালের কথা, পূজনীয় জিতেন মহারাজ তখন অল্পবয়স্ক। তিনি মাস্টার মহাশয়ের সঙ্গে কলিকাতা আমহার্স্ট স্ট্রীটের বাড়িতে সাক্ষাৎ করেন। আলাপাদির পর যখন জিতেন মহারাজ ফিরিয়া আসেন, তখন মাস্টার মহাশয়ও কতদূর পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে বেচু চাটার্জি স্ট্রীটের কালাবাড়ি পর্যন্ত আসেন। সেখানে মাস্টার মহাশয়কে রাখিয়া জিতেন মহারাজ চলিয়া আসেন। মাস্টার মহাশয় মন্দিরে প্রণাম করিতেছিলেন। কতদূর আসিয়া জিতেন মহারাজ পিছনের দিকে তাকান, মাস্টার মহাশয় চলিয়া গিয়াছেন কিনা তাহা দেখিতেছেন।

তখন তিনি দেখেন, তিনি যেস্থানে দাঁড়াইয়াছিলেন, সেই স্থানের ভূমি মাস্টার মহাশয় স্পর্শ করিতেছেন। তাহা দেখিয়া তো জিতেন মহারাজ অবাক্ হইয়া গেলেন। মাস্টার মহাশয়ের এইরূপ অভাবনীয় নিরহংকারের কথা ভাবিতে ভাবিতে তিনি যথাস্থানে ফিরিয়া আসেন।

অল্পদিন মাত্র দেশে থাকিয়া আমি নিউইয়র্কে ফিরিয়া আসি। জিতেন মহারাজ অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে আমাদের খবরাদি লইতেন। আমি ফিরিয়া আসিবার পর বৎসর এক চিঠিতে তিনি আমাকে লিখেন, "প্রভু তোমাকে সতত সুস্থ, আনন্দে ও শান্তিতে রাখুন। 'বহুজনহিতায় ও বহুজনসুখায়' তাঁহার বাণী জগতে প্রচার করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হও এবং মানবজন্ম ধারণ সার্থক কর।…গত বৎসর এই সময়ে তুমি এখানে। কত আনন্দে তোমার সহিত মঠে কয়েকদিন অতিবাহিত হইয়াছিল!" বিদেশে নানা প্রকার প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে কাজ করিতে হয়, ভারতবর্ষ হইতে এইরূপ চিঠি আসিলে দূরত্বের জন্য ঐ চিঠির কথাগুলির মূল্য অনেক পরিমাণে বর্ধিত হইয়া থাকে।

গত দুই বৎসরে তাঁহার নিকট হইতে আমি যে-সব চিঠি পাইয়াছি, যদিও তাহা সংখ্যায় খুব বেশী নয়, তবু সেগুলি হইতে তাঁহার মানসিক চিন্তারাজ্যের ছবি পরিষ্কারভাবে প্রকাশ পায়। আমাকে ১৯৬১ খৃঃ নভেম্বর মাসে লিখিয়াছিলেন, "আমি এখন কাজ হইতে একবারে ছুটি নিয়ে বার্ধক্যে বারাণসীতে আছি। প্রভুর কৃপায় বর্তমান অসুখটা আমার পক্ষে এখন blessing in disguise (শাপে বর) ব'লে মনে হচ্ছে। মোটের উপর মানসিক খুবই ভাল আছি, প্রভুর অপার করুণা! এই বৃদ্ধ শরীর ক্রমশঃ ক্ষয়ের দিকে যাচ্ছে, বেশ বুঝতে পারছি। শ্রীশ্রীঠাকুর যেমন রাখবেন সেইভাবে থাকতে হবে। নান্যঃ পন্থাঃ।"

গত জানুআরি মাসে সঙ্ঘের অধ্যক্ষ স্বামী শঙ্করানন্দের দেহরক্ষা হইলে সহাধ্যক্ষ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ অধ্যক্ষ হইবেন, ইহাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু ঐ দায়িত্বপূর্ণ পদ গ্রহণ করিতে তিনি অনেক ওজর আপত্তি করেন, কাশীতে ধ্যানজপ করিয়াই আপন মনে জীবনের বাকী সময় কাটাইবেন—কোন কাজের হাঙ্গামায় আর আসিবেন না—ইহাই ছিল তাঁহার তীব্র আকাঙ্ক্ষা। অনেক পীড়াপীড়ির পর তিনি মত পরিবর্তন করেন ও যথানিয়মে অধ্যক্ষ হন।

১৫ই মার্চ বেলুড় মঠ হইতে আমাকে যে চিঠি দিয়াছিলেন, তাহাতে লিখেন, "প্রভু আমাকে কাশী হ'তে টেনে প্রেসিডেন্টের পদে বসিয়েছেন। আমি সম্পূর্ণ অসহায়। তাঁর ইচ্ছাই বলবৎ। এখন দেখি, জীবনের এই শেষ অধ্যায়টা আমাকে দিয়ে কিভাবে অভিনয় করান। এখন আমি সম্পূর্ণ তাঁর হাতের যন্ত্রস্বরূপ। 'নাহং নাহং তুঁহু তুঁহু'।"

আমি হঠাৎ তাঁহার নিকট হইতে ৬ই জুন তারিখের এক চিঠি পাই। তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন, অস্ত্রোপচারের জন্য তিনি ১১ই জুন কলিকাতা এক Nursing home-এ যাইতেছেন—'এখন শ্রীশ্রীঠাকুর যা করেন!'

নিউইয়র্কে বসিয়া ১৮ই জুন এক চিঠি পাই—তাহাতে লিখা ছিল: '১৩ই জুন পূজনীয় জিতেন মহারাজের অস্ত্রোপচার হইয়াছে ঠিক ভাবেই। তাঁহার অবস্থা ভাল।' চিঠি

পাঠ করিবার আধঘণ্টা পরেই এক টেলিগ্রাম পাই, তাহাতে আছে: '১৬ই জুন স্বামী বিশুদ্ধানন্দ শান্তিপূর্ণভাবে মহাসমাধি লাভ করিয়াছেন।' সময় অত্যন্ত দ্রুতগতিতে চলিয়াছিল।

জিতেন মহারাজ অনেকদিন যাবৎই চলিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিয়াছিলেন। আমাদের হয়তো এ-বিষয়ে আপত্তি ছিল। কিন্তু জগতের সমস্ত জিনিস যিনি নিয়ন্ত্রণ করেন, তাঁহার নিকট সেই আপত্তি টিকে নাই। চির-আনন্দময় বিশুদ্ধানন্দ—পূজনীয় জিতেন মহারাজ এখন যেখানেই থাকুন, অত্যন্ত আনন্দেই আছেন। ইহা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস—ইহাই আমাদের সান্ত্বনা।

নিউইয়র্ক
২৫শে জুন, ১৯৬২

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ-কথিত 'সৎপ্রসঙ্গ'

'কথামৃত' গীতার সার—উপনিষদের সার। খুব 'কথামৃত' পড়বে। এতে কত সহজ সরল দৃষ্টান্তের ভেতর দিয়ে কত কথা বলা হয়েছে। বড় বড় পণ্ডিতও এ-সব কথায় মুগ্ধ হয়ে যেতেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঠাকুরের কথা শুনে বলেছিলেন: একটা নূতন কথা শুনলুম—"ব্রহ্ম কখনও উচ্ছিষ্ট হয় না"। যতই তাঁকে ভালবাসবে, ততই মনে হবে সবই তাঁর। যতই তাঁর কাছে যাচ্ছি, ততই কামনা-বাসনা দূরে চলে যাচ্ছে ব'লে মনে হবে। ঠাকুরের কি keen observation (সূক্ষ্মদৃষ্টি) ছিল। তাই 'চাল-কলা বাঁধা বিদ্যা'—অর্থকরী বিদ্যা শিখলেনই না। তাঁর দৃষ্টান্তগুলি সাধারণ সংসারের দৃষ্টান্ত থেকে নেওয়া। আর কত সুন্দর!

একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—একটি চাষী আখের ক্ষেতে জল দিচ্ছে—ডোঙা দিয়ে। জল না দিলে আখ শুকিয়ে যায়। আখের ক্ষেতে জল দিয়ে চাষী নিশ্চিন্ত। সেই ডোঙা থেকে জল গিয়ে দশ গজ দূরে আখের ক্ষেতে পড়বে। সকাল আটটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত জল ছেঁচে সে উঠল। ক্ষেতে গিয়ে দেখে এক ফোঁটাও জল ক্ষেতে প্রবেশ করেনি। কি ব্যাপার! রাস্তায় এসে দেখে বড় বড় গোটা কয়েক ইঁদুরের গর্ত। তাই দিয়ে সব জল বেরিয়ে গিয়েছে। চাষীর এত পরিশ্রমের ফল সবই ব্যর্থ হয়ে গেল। কামনা-বাসনারূপ ঘোগ (গর্ত) দিয়ে আমাদেরও সব পরিশ্রম বেরিয়ে যাচ্ছে। তাই আসল জায়গায় পৌঁছাচ্ছে না। কাজেই এই গর্তগুলো বন্ধ করতে হবে। এ-জন্যও তাঁর শরণাগত হ'তে হবে। তাঁকে বলতে হবে—তুমি এসে আমায় সাহায্য কর। তাঁর দিকে এক পা এগুলে, তিনি এক-শ পা এগিয়ে আসেন। কিন্তু ভাবের ঘরে চুরি থাকলে চলবে না। তাঁর শরণাগত হয়ে সংসারের কর্তব্য করতে হবে—তাঁর সংসার জেনে সব কাজ করতে হবে।

শিক্ষাপ্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

শ্রীতামসরঞ্জন রায়

এখন থেকে অর্ধশতাব্দীরও পূর্বে এদেশে শিক্ষাসংস্কার-প্রসঙ্গে স্বামীজী এই কথা বলেছিলেন :

পরাধীনতার বন্ধনদশা থেকে মুক্ত হয়ে জ্ঞানের প্রশস্ত পথে স্বাধীনভাবে আমরা অগ্রসর হবো। বিজ্ঞানের নানা তথ্য, যা আমাদেরই দেশে আবিষ্কৃত হয়েছিল, যা আমাদেরই নিজস্ব সম্পদ, তা আমরা সর্বপ্রথম শিক্ষা ক'রব। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজী ভাষা, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এবং কারিগরি-শিক্ষাও আমরা গ্রহণ ক'রব। শিল্পোৎকর্ষের জন্য যা কিছু প্রয়োজন, তারও কিছু আমরা প্রত্যাখ্যান ক'রব না, করা সঙ্গত হবে না।

'What we need is to study, independent of foreign control, different branches of knowledge that is our own and with it the English language and western science; we need technical education and all else that will develop industries, so that men, instead of seeking for service, may earn enough to provide for themselves and save something against a rainy day.'

আমাদের দেশে অধুনা-প্রচলিত যে পুঁথি-প্রধান শিক্ষা শাসকবর্গের প্রয়োজনের তাগিদে মুখ্যতঃ গৃহীত হয়েছে, তাতে কি হয়? কতগুলি কেরানী, না হয় উকিল—বড় জোড় দুটি চারটি ডেপুটি, আর কিছু নয়। সুতরাং মানুষের বহুমুখী রুচি ও প্রকৃতি অনুসারে নানা ধরনের কারিগরি-শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য স্বামীজীর ঐকান্তিক আগ্রহ ছিল। বস্তুতঃ শিক্ষার ক্ষেত্র একটি সুন্দর ও সুসমঞ্জস সমন্বয়-ক্ষেত্ররূপে গড়ে উঠবে। সেখানে একদিকে যেমন মানসিক উৎকর্ষের মধ্য দিয়ে ধর্মনিষ্ঠ ও শ্রদ্ধাবান্ মানুষ গড়ে তোলবার ব্যবস্থা থাকবে, অন্যদিকে তেমনি ইন্দ্রিয়সমূহের যথাযথ পরিচালনার দ্বারা শিক্ষার্থিগণ নিরলস ও প্র্যাক্‌টিক্যাল—কাজের লোক হয়ে উঠবার পর্যাপ্ত সুযোগ পাবে।

অবশ্য সেজন্য শুধু কারিগরি-শিক্ষার (technical education) মধ্য দিয়েই যে-কোন জাতি জাতি-হিসাবে বড় হয়ে উঠতে পারে—এমন কথা স্বামীজী মনে করতেন ব'লে মনে হয় না।

প্রাক্‌স্বাধীনতার যুগে, ইংরেজ আমলে আমাদের দেশে যে শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, তার বিবিধ ত্রুটিবিচ্যুতি-সম্পর্কে কোন চিন্তাশীল মনীষী অপেক্ষা স্বামী বিবেকানন্দ কম সচেতন বা উদ্বিগ্ন ছিলেন না, কিন্তু ঐগুলি নিরাকরণের জন্য অধুনা প্রায় সকলেই যেমন বুনিয়াদী শিক্ষা বা কারিগরি-শিক্ষার অমোঘ শক্তির বিপুল মাহাত্ম্য-কথা শতমুখে প্রচার ক'রে থাকেন, এবং তাদের অভাবকেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে সর্ব অনিষ্টের মূল কারণ ব'লে উল্লেখ করতে চান,—স্বামীজীর কোন উক্তি থেকে তেমন অভিমতের সন্ধান আমরা খুঁজে পাই না। কারিগরি-শিক্ষার অতি-প্রয়োজনীয়তা তিনি অস্বীকার করতেন না, কিন্তু তাকে সর্বরোগহর ব'লে মনে করতেন না। বরঞ্চ এ-কথাই তিনি বলতেন যে, অতি-মাত্রায় শিল্পমুখী যে-শিক্ষা সে-শিক্ষার সমগ্র

দৃষ্টি অর্থোপার্জনের সঙ্কীর্ণ লক্ষ্যে নিবদ্ধ। সে-শিক্ষা মানুষকেও সঙ্কীর্ণ করে, স্বার্থপর ক'রে তোলে। এ-কথা ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে যেমন সত্য, বৃহত্তর সামাজিক এবং জাতিগত ক্ষেত্রেও তেমনি সত্য। সেজন্য আজকের পৃথিবীতে প্রগতিশীল শিক্ষাবিদ্‌গণের অনেকেরই ধারণা যে, বৈজ্ঞানিক শিক্ষা আর মানবপ্রেমের সার্থক সমন্বয় ভিন্ন সভ্যতাকে রক্ষা করবার আর কোন উপায় নেই। ঐ সমন্বয়ের উপরই তার ভবিষ্যৎ কল্যাণ নির্ভর করে।

'There is only one road to progress in education as in other human affairs ; Science weilded by love,...

Without science love is powerless, without love science is destructive.'—এই তাঁদের ঘোষণা।

কারিগরি-শিক্ষা সম্বন্ধে স্বামীজীর অভিমতও বহুলাংশে অনুরূপ ছিল, কিন্তু তাঁর সূক্ষ্ম দূরদৃষ্টির সম্মুখে আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার যে ত্রুটি অত্যন্ত গুরুতররূপে প্রতীত হয়েছিল, যার জন্য সমগ্র জাতি বিশ্বাসহীন, নমিত-মেরুদণ্ড অথচ উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠেছে ব'লে তিনি মনে করেছিলেন, সেটি কারিগরি-শিক্ষার অভাব নয়, সমাজসেবার (social activity) অভাবও নয়, পরন্তু সেটি ছিল, তাঁর মতে—প্রথমতঃ এবং প্রধানতঃ, জীবনের সেই মূল উপাদানটির অভাব, সেই প্রাণশক্তিটির অনুপস্থিতি, যাকে তিনি 'শ্রদ্ধা' শব্দে অভিহিত করতেন। যার ইংরেজী প্রতিশব্দ নেই বলেই তাঁর বিশ্বাস ছিল।

'শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ'—গীতার এই মহাবাক্যে তাঁর অটল গভীর বিশ্বাস ছিল ; এবং শ্রদ্ধাহীন প্রীতিহীন কোন ব্যক্তি বা জাতি যে কখনও শিক্ষার পথে, উন্নতির পথে অগ্রসর হ'তে পারে না—সে-বিষয়ে তিনি এককালে নিঃসংশয় ছিলেন। সেইজন্য আমাদের দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার মূলে শ্রদ্ধার অমৃতরসধারা সিঞ্চন করবার জন্য দেশবাসীর কাছে পুনঃ পুনঃ তিনি অতি-ব্যাকুল আবেদন জানিয়েছিলেন, বলেছিলেন, শ্রদ্ধাহীন এবং আত্মবিশ্বাসহীন হয়েই জাতি উচ্ছৃঙ্খলতা ও অপটুতার পিচ্ছিল পথে ও ধ্বংসমুখে ছুটে চলেছে। পিতামাতার উপর সন্তান শ্রদ্ধাহীন হয়েছে, শিক্ষক ও অধ্যাপকের প্রতি ছাত্র-ছাত্রীর দল শ্রদ্ধাহীন হয়েছে, প্রাচীন যুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি নবযুগ বিরূপ হয়ে উঠেছে। ভারতের সমাজ-ব্যবস্থা ও শিক্ষা-ব্যবস্থা—দুই-ই বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে—এই বিঘ্ন থেকে, এই বিসময় অবস্থা থেকে 'অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি'—এই বাক্য যেন আমাদের দেশে মূর্ত হ'তে চলেছে। তাই স্বামীজীর কথাই ছিল :

'To preach the doctrine of Sraddhā or genuine faith is the mission of my life.'

পাশ্চাত্যদেশে যে পার্থিব শক্তিবিকাশ দেখে আমরা বিস্মিত হই, বিমূঢ় হই, সেটি তাদের দৈহিক সামর্থ্যের উপর গভীর বিশ্বাসেরই ফলস্বরূপ এবং তা যদি সত্য হয়, তবে আত্মিক শক্তির উপর শ্রদ্ধাবান্ হ'লে আরও কত ব্যাপক ও বিস্তৃত ফললাভের অধিকারীই না আমরা হ'তে পারি।

'Whatever of material power you see manifested by western races is the outcome of this Sraddha, because they believe in their muscles ; and if you believe in the spirit, how much more will it work ?'

আবার এই শ্রদ্ধার ভাবটি, আত্মবিশ্বাসের অক্ষয় মন্ত্রটি কোন্ প্রণালীতে আমাদের শিক্ষায় চিন্তায় ও জীবনে জাগ্রত করতে পারব,

দ্ব্যর্থ-হীন ভাষায় তারও নির্দেশ তিনি রেখে গেছেন, আমাদেরই কল্যাণকল্পে।

আমাদের সুপ্রাচীন অমূল্য ধর্মগ্রন্থগুলি বিশেষ ক'রে শক্তি-উৎস উপনিষদ্‌গুলি—যাদের পত্রে পত্রে 'অভীঃ'-মন্ত্রের বজ্রনির্ঘোষ মুহুর্মুহুঃ ধ্বনিত হচ্ছে—সেই বলপ্রদ বীর্যপ্রদ শাস্ত্রাংশ-সমূহ শিক্ষার মূল উপাদান-রূপে গৃহীত হোক এবং সর্বভাবে যুগোপযোগী ক'রে সেগুলিকে তরুণ-সমাজের সম্মুখে তুলে ধরা হোক। তাঁর নিজের ভাষায়—'আমাদের যুবকগণ যাহাতে বেদসমূহ, বিভিন্ন দর্শন ও ভাষ্যসকল সম্পূর্ণ শিক্ষা করিতে পারে তাহা করিতে হইবে; উহার সহিত অবৈদিক অন্যান্য ধর্মসমূহের তত্ত্বও তাহাদিগকে শিখাইতে হইবে।'

ভারতবাসী-রচিত ভারতবর্ষের যে সুপ্রাচীন ইতিহাস ও ইতিকাহিনী, তাকে পাঠ্যতালিকায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিতে হবে। সে-ইতিহাস শুধু বাহ্য ঘটনানিচয়ের বা রাজনৈতিক ধুরন্ধরগণের কীর্তি বা কুকীর্তির ইতিহাস হবে না। পরন্তু সভ্যতার প্রগতির পথে মানবের যথার্থ কল্যাণকামী পুণ্যশ্লোক মহাপুরুষগণের যে অবদান, পরার্থে উৎসর্গীকৃত জীবনসমূহের যে অপ্রতিরোধ্য প্রভাব, তারই নিখুঁত ও সজীব বর্ণনা হবে এবং সেগুলিই ছাত্র-সমাজের সম্মুখে জীবন্তরূপে উপস্থিত করতে হবে, তাছাড়া দেশের যারা সত্যিকারের মানুষ, মাটির অত্যন্ত কাছাকাছি যারা বাস করে, যাদের রুধিরস্রাবে জাতির যাবতীয় প্রয়োজন সংগৃহীত হয়েছে, অভাব মিটেছে—সেইসব অতি সাধারণ নরনারীর দৈনন্দিন জীবনের সুখদুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতির যে অনাড়ম্বর ইতিকথা, তাও নিখুঁতভাবে শিক্ষার্থীদের সম্মুখে তুলে ধরতে হবে। কারণ স্বামীজী বলতেন, ঐ ইতিহাসই দেশের সত্যিকারের ইতিহাস। জীবনগঠনের পক্ষে অকৃত্রিম, পরম উপযোগী ও দুর্লভ উপাদান।

দ্বিতীয়তঃ স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীনতার মুক্ত পরিবেশ বিধ্বস্ত হয়ে দেশে যে একটি নিরুদ্ধ এবং প্রতিকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে, প্রকৃত শিক্ষার পক্ষে সেটি প্রচণ্ড বাধাস্বরূপ। উন্নতির জন্য স্বাধীনতার প্রয়োজন অপরিহার্য, সেটিই উন্নতির মুখ্য সহায়। আমাদের পূর্বপুরুষগণ আত্মার স্বাধীনতা দিয়েছিলেন; কাজেই এদেশের ধর্মের অদ্ভুত বিকাশ সম্ভব হয়েছিল অতীত যুগে। আজ যদি শিক্ষাক্ষেত্রেও সে স্বাধীন সুযোগ প্রদত্ত হয়, তবে সেখানেও বহুমুখী বিকাশ সম্ভব হবে—এই ছিল স্বামীজীর অভিমত। আজ বহুলাংশে এই অভিমতেরই অনুকৃতিতে পাশ্চাত্য দেশের শিক্ষা-পরিকল্পনায় উদারনীতিক শিক্ষা (Liberal education)-ও একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে এবং বাস্তবিকপক্ষে সেটি যে স্বাধীন চিন্তাবিকাশের একটি অনুকূল ক্ষেত্র ভিন্ন আর কিছু নয়—সে-কথাও স্বীকৃত হচ্ছে।

'Liberal education is fundamentally an education, for the intelligent use of freedom in a free society.'

* * *

শিক্ষার মাধ্যম কি হবে? আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় কোন্ কোন্ ভাষা অবশ্য শিক্ষণীয় হবে, কোন্‌গুলিই বা গৌণস্থান লাভ করবে, সে-বিষয়েও সংক্ষিপ্তাকারে স্বামীজী নিজ অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন। আজ স্বাধীনতা-প্রাপ্তির এতদিন পরেও ভাষা-সমস্যার সঠিক এবং সর্ববাদি-সম্মত কোন সিদ্ধান্তে আমরা পৌঁছাতে পারিনি। সুতরাং স্বভাবতই এ-বিষয়ে স্বামীজীর অভিমত কি ছিল, তার আলোচনা আবশ্যক মনে হয়।

স্বামীজী বলতেন : সংস্কৃত ভাষাই আমাদের সকল সাহিত্য ও শাস্ত্রগ্রন্থের ধাত্রীদেবতা। তারই গর্ভগৃহ থেকে যাবতীয় ভাষাগোষ্ঠী জন্মলাভ করেছে। সে-ভাষার শব্দধ্বনির বিচিত্র গাম্ভীর্যের মধ্যে জাতির মর্যাদাবোধ তেজস্বিতা ও আত্মবিশ্বাস নিহিত আছে, সুতরাং আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় সংস্কৃত ভাষার একটি বিশেষ গৌরবময় স্থান নির্দিষ্ট থাকা প্রয়োজন।

সেটি যদি না করা হয়, তবে একদা বুদ্ধদেব সংস্কৃত ভাষা বর্জন ক'রে যে ভুল করেছিলেন, সে ভুলেরই পুনরাবৃত্তি হবে। বুদ্ধদেব তৎকালে প্রচলিত পল্লীভাষা বা পালিভাষায় নিজ বাণী প্রচার করেছিলেন। ফলে জনসাধারণ অতি অল্পকালে বৌদ্ধধর্মের শিক্ষার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল। কিন্তু সংস্কৃত ভাষার মর্যাদা লাভ করতে পারেনি ব'লে তার প্রচলনও যেমন অল্পকালে হয়েছিল, বিলুপ্তিও ঘটেছিল তেমনি অপ্রত্যাশিত কম সময়ের মধ্যে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে মাতৃভাষার বিশেষ স্থান থাকবে। সেটিই হবে শিক্ষার মাধ্যম। ইংরেজী ভাষার যে অতি-প্রাধান্য ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভিক যুগ থেকেই এদেশে শিক্ষা-ব্যবস্থায় স্বীকৃত হয়েছিল, স্বামীজী সেটিকে অহিতকর মনে করতেন। সেইজন্য রাজা রাম-মোহনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা সত্ত্বেও এ-কথা তিনি বলেছিলেন যে, এদেশে শিক্ষার্থীর জন্য ইংরেজী ভাষাকে মাধ্যমরূপে গ্রহণ করা সঙ্গত হয়নি। এর ফলে জাতীয় অগ্রগতি বহুলাংশে ব্যাহত হয়েছে, শিক্ষা তার স্বকীয়তা থেকে বিচ্যুত হয়েছে।

* * *

শিক্ষা-ব্যবস্থার আর একটি একান্ত অপরিহার্য উপাদানের কথা বলতে গিয়ে স্বামীজী বলেছিলেন :

যেরূপেই হোক এবং যে প্রণালীতেই হোক শিক্ষার্থীর একাগ্রতা-শক্তির (power of concentration) উৎকর্ষ অবশ্য করতে হবে। মনের একাগ্রতার সঙ্গে সঙ্গে আত্মবিশ্বাস এবং শ্রদ্ধার ভাব স্বতই জাগ্রত হবে, সুতরাং আজকের নব-জাগ্রত যুগের তরুণ শিক্ষার্থী যারা, তারা আত্মসংযম ও ব্রহ্মচর্যের উৎকর্ষের মধ্য দিয়ে একাগ্রতা-শক্তি অর্জন করতে তৎপর হোক, সে-পথেই তাদের শিক্ষা-শকট পরিচালিত হোক। তবেই যথাকালে শ্রদ্ধায় আত্মবিশ্বাসে ও প্রভূত মানসিক শক্তিতে শক্তিশালী নরনারীর অভ্যুদয়ে দেশ সমৃদ্ধ হবে, বড় হবে—এই ছিল স্বামীজীর সুচিন্তিত অভিমত।

কখন কখন অনেকটা আত্মগতভাবেই যেন বলতেন : আমার জীবনে নূতন ক'রে শিক্ষালাভের সুযোগ যদি আসত, তবে ঘটনা বা তথ্যের অনুশীলনের জন্য আমি চেষ্টা করতাম না, আমি চেষ্টা করতাম, যাতে মনের একাগ্রতা-শক্তি ও অনাসক্তি যুগপৎ বর্ধিত হয়, তারই জন্য, এবং পরে যথাসময়ে ঐ শক্তিশালী যন্ত্রটি দিয়ে আমি ইচ্ছামত সংবাদাদি সংগ্রহ করতাম।

'If I had to do my education once again, I would not study facts at all. I would develop the power of concentration and detachment and then with a perfect instrument collect facts at will.'

* * *

জগতের নানা দেশ থেকে, দূর-দূরান্তর থেকে জ্ঞানের শুভ্র আলোক-রশ্মিসমূহ যাতে অজস্রধারায় এবং অব্যাহত স্রোতে ভারতবর্ষের শিক্ষা-দেউলে প্রবেশ করতে পারে, শিক্ষার্থীদের

আয়ত্তের মধ্যে আসতে পারে, সেজন্য এদেশের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহের সকল দিকের সকল বাতায়ন অহর্নিশি উন্মুক্ত রাখা হোক, বহু প্রসঙ্গে বহুভাবে সে-কথা উল্লেখ করেও কিন্তু স্বামীজী তাদের শান্ত শুচিতা ও স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখবার জন্য যথাযথ ব্যবস্থার একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন এবং সে-সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশ দিতে কখনও কার্পণ্য করেননি। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে শ্রদ্ধাপ্রীতির অনুকূল স্রোতে শিক্ষাকার্য অগ্রসর না হ'লে উচ্চজীবন গঠন তো বহু দূরের কথা, শিক্ষার সাধারণ উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হ'তে পারে না। প্রদীপ্ত বহ্নিশিখার মতো যুগপৎ আলো ও উত্তাপ বিকীর্ণ করবার শক্তিতে সমৃদ্ধ শিক্ষাব্রতী যাঁরা, তাঁদের ভাস্বর-জীবনের প্রত্যক্ষ প্রভাবের মধ্যে থেকে ছাত্রদল শৈশব-জীবনের প্রসন্নমধুর দিনগুলি যাপন করবে, তাঁদের সাহচর্যেই ধীরে ধীরে তারা বড় হবে। বাইরের বিরুদ্ধ তরঙ্গাভিঘাত সেখানে কোন ভাবে কোন বাধাবিঘ্নের সৃষ্টি করতে পারবে না—এই ছিল স্বামীজীর কথা। কারণ এ-কথা অনস্বীকার্য যে—

'One can not analyse the power of an unselfish character, but there can be no doubt about its reality, and there seems to be no limit to its range also.'

স্বামীজীর নিজস্ব ভাষায়—'গুরুগৃহবাসই আমার মতে শিক্ষার প্রশস্ত অনুকূল ব্যবস্থা। শিক্ষকের ব্যক্তিগত জীবনের প্রভাব না থাকলে শিক্ষা ব্যর্থ হয়। জলন্ত পাবকশিখার মতো যাঁদের চরিত্র-দীপ্তি, তাঁদেরই সাহচর্যে শিশু তার জীবনের আদি শৈশব থেকে বাস করবে।'

'My idea of education is Gurugriha-vasa. Without the personal life of the teacher there would be no education.··· ···One should live from his very boyhood with one whose character is blazing fire.'

বর্তমান শিক্ষাযুগকে মনস্তাত্ত্বিক পরিভাষায়—'শিশুকেন্দ্রিক যুগ' ব'লে উল্লেখ করা হয়ে থাকে, পদ্ধতিকে বলা হয় 'শিশুকেন্দ্রিক পদ্ধতি'। ডাঃ জি. এস. হল একে 'Paedo-centric' ব'লে অভিহিত করেছিলেন। এ-মত অনুসারে আজকের শিক্ষা-ক্ষেত্রের যা-কিছু প্রয়াস-প্রযত্ন, নব নব যত কিছু পদ্ধতি-উপকরণ তাদের সব কিছুরই কেন্দ্রস্থলে আছেন একই দেবতা, তিনি নরদেবতা—শিশুদেবতা। কিন্তু অতি-সাম্প্রতিক কালে ধীরে ধীরে, সে-কেন্দ্রবিন্দু কিঞ্চিৎ স্থান পরিবর্তন করতে শুরু করেছে ব'লে অনেকে মনে করছেন। শুধু বীজের ভালোমন্দই নয়, যদিও তারই মূল্য প্রথম বিচার্য—আলো, বাতাস, জল, মাটি অঙ্কুরোদ্গম-কালে উপযুক্ত সংরক্ষণী ব্যবস্থার ন্যায় অপরিহার্য, সে-কথা শিক্ষা-জগতের কর্ণধারগণ আজ শনৈঃ শনৈঃ উপলব্ধি করছেন।

বাস্তবক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে, শিক্ষকের আত্যন্তিক প্রয়োজন এবং প্রভাব ধীরে ধীরে উপলব্ধি ক'রে এবং ঘটনার অনিবার্যতায় সভ্যতার এক অতি-সঙ্কটময় ক্ষণের সম্মুখীন হয়ে আজ জগতের প্রগতিশীল বহু দেশেই শিক্ষার্থীর সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকের প্রাধান্যও স্বীকৃত হচ্ছে। উপাদানের মূল্যায়নের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পীর মর্যাদাও নির্ণীত হচ্ছে। কিন্তু এখনও এর আরম্ভ মাত্র, অতি-সাম্প্রতিক কালের একটি সূচনামাত্র। অথচ এখন থেকে কতকাল কত বৎসর পূর্বে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সমতুল প্রাধান্যের কথা সম্যক্ উপলব্ধি ক'রে উভয়ের সম্মিলিত প্রয়াসকে জাতি-গঠনের কল্যাণকর্মে নিয়োজিত করবার জন্য স্বামীজী পুনঃ পুনঃ নির্দেশ দিয়েছিলেন।

দুর্ভাগ্য আমাদের, দুর্ভাগ্য আমাদের ক্ষীণ কল্পনার। সে অব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণীতে আমরা তখন যথোচিত কর্ণপাত করিনি। কিন্তু আজ? আজ তাঁর শতবার্ষিকীর শুভলগ্নে তাঁর সে অভ্রান্ত নির্দেশ আমরা স্মরণ করি। আমাদের জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে অতুলনীয় অবদান-শতকের অপরিশোধ্য ঋণ অকুণ্ঠিত কৃতজ্ঞতায় স্বীকার করি। আর ভূয়োভূয়ঃ প্রণাম করি সে আজন্ম-সর্বত্যাগী মহামনীষীকে—

'নমো বিবেকানন্দ মহামন,
ভারতের ভারতীর প্রাণধন।'

জীবন-কবিতা

শ্রীইন্দ্রমোহন চক্রবর্তী

অত্যুজ্জ্বল মধ্যাহ্ন-তপন
অন্ধ যবে করে দু-নয়ন,
ভাবি আমি,—হে সবিতা,
ছন্দহারা এ কবিতা
যাবে না কি আলোকের সপ্তাশ্ব বাহনে
ছন্দাতীত ছন্দোময় তোমার ভুবনে ?
কী জানি কেন যে আজি স্বপ্নাবিষ্টপ্রায়
কাহার সঙ্কেত শুনি চিত্ত মোর ধায়
অজানার কোন্ এক রহস্য-সন্ধানে
সীমাহীন শূন্যতার দুর্নিবার টানে !
দিগন্তে মিলায়ে যায় পদচিহ্নরাশি,
ধ্বনি তার হ'য়ে লয় নিষ্ফলতা আসি।

অগ্নিময় তারল্যের প্রস্রবণ হ'তে
প্রাণের কল্যাণ-দীপ জ্বালি নিজ হাতে
অপূর্ব সৃজন করি পাঠাইলে নরে
রূপ-রস-গন্ধময় ধরণীর 'পরে।
সেদিন কি ভেবেছিলে, হে আদি-জনক,
মর্ত্যের নন্দন মাঝে দুঃখের স্তবক
মহেশের কণ্ঠলগ্ন হলাহল সম
আপন সৌন্দর্যে জেগে রবে অনুপম ?
আকস্মাৎ বুঝি কোন্ আলোর ক্রন্দনে
ঘনঘোর অমানিশা জাগিয়া গোপনে
প্রাণের অমৃত-পাত্রে মিশাইল বিষ
অভিশাপে সাথে ক'রে লইতে আশীষ !
ক্ষীরোদ-সাগর-বক্ষে তুল্য শতদল—
বিশ্বের বিচিত্রপটে হে শান্ত প্রোজ্জ্বল,
যেমনি রেখেছে স্বর-সপ্তকের গ্রামে
আপন মণ্ডল মাঝে ঋক্-যজুঃ-সামে,
জীবন-কবিতা মোর অনন্ত গগনে
···তেমনি গ্রথিত থাক্ আলোকের সনে।

গীতা-জ্ঞানেশ্বরী

[দ্বাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ]

শ্রীগিরীশচন্দ্র সেন

হে সিদ্ধ[১] (পূর্ণতাপ্রাপ্ত), হে উদার, নিরন্তর আনন্দে[২] বর্তমান গুরুকৃপাদৃষ্টি, আপনার জয় হউক। অহো বিষয়-সর্প দংশন (আলিঙ্গন) করিলে আপনি মাতার ন্যায় রক্ষা[৩] করেন এবং জীব মূর্ছা (মোহ)-গ্রস্ত হয় না। আপনার কৃপামৃত-তরঙ্গের বন্যা আসিলে (সংসার-) তাপে কেই বা দগ্ধ হয়, শুষ্কত্ব[৪] (রসহীনতা)-ই বা কি করিয়া আসে? আপনার স্নেহে আপনার সেবকগণ যোগসুখের আনন্দ প্রাপ্ত হয়, আপনিই তাহাদের 'সোঽহং সিদ্ধি'র (ব্রহ্মপ্রাপ্তির) আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেন; আধারশক্তির অঙ্গে (মূলাধারে) তাহাদের কৌতুকে লালন করেন, এবং হৃদয়াকাশরূপী পালঙ্কে[৫] তাহাদের (আত্মজ্ঞানের) দোলা[৬] দেন, হে মাতঃ, আপনি আত্ম-জ্যোতির দ্বারা আরতি করিয়া তাহাদের মন ও প্রাণবায়ুকে খেলার[৭] বস্তু করিয়া দেন, ঋদ্ধি-সিদ্ধিরূপ বালকের অলঙ্কার পরাইয়া দেন; সপ্তদশ কলার অমৃত-রূপ স্তন্য দান করেন, অনাহত ধ্বনির গান শুনাইয়া সমাধিজ্ঞান-রূপ নিদ্রায় শান্ত করিয়া ঘুম পাড়াইয়া দেন: অতএব আপনি সাধকের মাতা, আপনার চরণ হইতেই সারস্বত বিদ্যা উৎপন্ন হয় এবং পক্বতা লাভ করে, এইজন্য আমি আপনার ছায়া ত্যাগ করি না; হে সদ্‌গুরুকৃপাদৃষ্টি, আপনার করুণা যাহাকে আশ্রয় দেয়, সে ব্রহ্মার ন্যায় সকল বিদ্যার সৃষ্টিকর্তা হয়; অতএব হে ভক্তজনের (কামনাপূর্ণকারী) কল্পলতা-সদৃশ শ্রীযুক্তা মাতঃ, আপনি আমাকে গ্রন্থ-নিরূপণে আজ্ঞা করুন। (১০)

[**পাঠান্তর: ১ শুদ্ধ, নির্মল; ২ আনন্দবর্ধনকারী, ৩ নির্বিষ; ৪ শোক; ৫ হৃদয়-পালঙ্কে; ৬ দোল দিয়া নিদ্রিত করেন; ৭ আত্মসুখের।**]

হে মাতঃ, নিরূপণের দ্বারা নবরসের সাগর ভরাইয়া দিন; উত্তম রত্নের খনি দিন, ভাবার্থের পর্বত উঠাইয়া দিন; দেশী (মারাঠী) ভাষার অঙ্গনে সাহিত্য-অলঙ্কার-রূপ স্বর্ণখনি উদ্‌ঘাটিত করুন, আর চতুর্দিকে বিবেক-লতার আবাদ করা হউক; নিরন্তর গুরুশিষ্য-সংবাদ-ফলসমৃদ্ধ মহাসিদ্ধান্তরূপী গহন (ঘন) উদ্যান রচনা করিয়া দিন; পাষণ্ড (নাস্তিক)-মতবাদের গর্ত ও বাগ্‌বিতণ্ডার কুটিল মার্গ ভাঙিয়া কুতর্করূপ দুষ্ট শ্বাপদকে তাড়াইয়া দিন, হে মাতঃ, আমাকে শ্রীকৃষ্ণচরণে সর্বদা পূর্ণভাবে লাগাইয়া রাখুন, শ্রোতাগণও শ্রবণসুখের সাম্রাজ্য লাভ করুন; এই মারাঠী ভাষারূপ নগরে ব্রহ্মবিদ্যার সুকাল আনয়ন করুন, আর জগতে শুধু এই ব্রহ্মবিদ্যারূপ আনন্দ আদান-প্রদান হউক; আপনি যদি আপন স্নেহ-পল্লব (কৃপারূপ অঞ্চল) দ্বারা আমাকে আচ্ছাদন করিয়া ভাগ্যবান্ করেন, তবে আমি এখনই এই সমস্ত নির্মাণ করিতে সক্ষম হইব!

এই প্রকার বিনতি শ্রবণ করিয়া গুরুদেব কৃপাদৃষ্টি পাত করিয়া কহিলেন, 'আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই, এখন গীতার্থ নিরূপণ করিতে আরম্ভ কর।' তখন জ্ঞানদেব আনন্দিত হইয়া বলিলেন, 'প্রভু, ইহা আপনার মহাপ্রসাদ, এখন গ্রন্থ নিরূপণ করিতেছি, অবধান করুন।'

অর্জুন উবাচ—

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ ॥ ১ ॥

সকলবীরশিরোমণি সোমবংশের বিজয়ধ্বজ পাণ্ডুরাজপুত্র অর্জুন (২০) শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন : আপনি কি (আমার কথা) শুনিয়াছেন ? আমাকে আপন বিশ্বরূপ দেখাইলেন, ইহা অদ্ভুত বলিয়া আমার চিত্তে ভয় হইল ; আর এই কৃষ্ণমূর্তির সহিত পরিচয় থাকায় আমার অন্তঃকরণ ইহার প্রতি আকৃষ্ট হইল (ইহাকেই আশ্রয় করিল), পরন্তু আপনি উহার দিকে মন দিতে আমাকে নিষেধ করিলেন ; ব্যক্ত (সাকার, সগুণ) ও অব্যক্ত (নিরাকার, নির্গুণ) এই উভয়ই নিশ্চিত আপনারই স্বরূপ—ভক্তি দ্বারা ব্যক্ত ও যোগ দ্বারা অব্যক্ত স্বরূপপ্রাপ্তি হয় : হে বৈকুণ্ঠ, এই দুটি মার্গে আপনাকে পাওয়া যায়, ব্যক্ত ও অব্যক্ত ইহাদের প্রবেশদ্বার ; দেখুন, একশত ভরি স্বর্ণখণ্ডের যে বানি (কস), তাহা হইতে পৃথক্ করা এক রতি সোনারও সেই কস, সুতরাং ব্যাপক ও একদেশী বস্তুরও সমান যোগ্যতা (যোগ্যতার বিচার করা উচিত নহে) ; অমৃত-সাগরের সামর্থ্যের যে মহিমা তাহা অমৃত-লহরীর এক গণ্ডুষেও প্রাপ্ত হওয়া যায় ; ইহাই নিশ্চিতভাবে আমার চিত্তের দৃঢ় প্রতীতি, পরন্তু হে যোগপতি, এ-সম্বন্ধে আপনাকে এইজন্য প্রশ্ন করিতেছি ; আমি জানিতে চাই, হে দেব, আপনি ক্ষণকালের জন্য যে ব্যাপকমূর্তি অঙ্গীকার (ধারণ) করিলেন, তাহাই কি আপনার সত্য স্বরূপ, না কৌতুক করিয়া ইহা দেখাইলেন : আপনার প্রীতির) জন্য যে সর্বদা অন্তরে[১] কামনা করে, আপনি যাহার পরম (সর্বশ্রেষ্ঠ), যে ভক্তির কাছে আপন মনোধর্ম বিকাইয়া দিয়াছে, এই ভাবে হে শ্রীহরি, যে ভক্ত (সর্বপ্রকারে) আপনাতেই প্রাণমন বাঁধিয়া আপনার উপাসনা করে (৩০)

আর আপনার যে স্বরূপ ওঁকারের ওপারে, বৈখরী বাণী দ্বারাও যাহা বর্ণনা করা দুর্ঘট—যে বস্তুকে কোন উপমা দ্বারা প্রকাশ করা যায় না, অক্ষয় (অবিনাশী) অব্যক্ত অনির্দেশ্য সর্বব্যাপক স্বরূপকে যে যোগী 'সোঽহং'ভাবে উপাসনা করে ; এই যোগী ও ভক্ত উভয়ের মধ্যে হে অনন্ত, কে যথার্থভাবে যোগের রহস্য জানিতে পারে, তাহাই বলুন। কিরীটীর এই বাক্যে বিশ্বব্যাপক শ্রীকৃষ্ণ সন্তোষলাভ করিলেন ও বলিলেন, তুমি ভালই প্রশ্ন করিয়াছ।

[পাঠান্তর : ১ যে সমস্ত কর্ম আপনাকে অর্পণ করে।]

শ্রীভগবানুবাচ—

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥ ২ ॥

হে কিরীটী, রবি অস্তাচলের উপকণ্ঠে গেলে তাহার বিম্বের পশ্চাতে যেমন তাহার রশ্মিও যায়, তেমনি সর্বেন্দ্রিয়ের সহিত আমাতে চিত্ত নিবদ্ধ করিয়া রাত্রিদিন না মানিয়া যে আমাকে উপাসনা করে, সমুদ্র প্রাপ্ত হইবার পরও যাহার পশ্চাতের প্রবাহ অনিবার্যভাবে আসিতে থাকে, সেই গঙ্গার ন্যায় যাহার প্রেমভাবের তীব্রতা বাড়িতে থাকে ; হে পাণ্ডুসুত, বর্ষাকালে যেমন নদী বাড়িতে থাকে, তেমনি যাহার ভজনের শ্রদ্ধা দ্বিগুণভাবে বাড়িতেছে দেখা যায় ; এই ভাবে যে ভক্ত নিজেকে আমাতেই সমর্পণ করে, তাহাকে আমি পরম যোগযুক্ত বলিয়া মানি।

যে ত্বক্ষরমনির্দেশ্যমব্যক্তং পর্যুপাসতে।
সর্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্ ॥ ৩ ॥

আর হে পাণ্ডব, অন্য যাহারা 'সোঽহং' ভাবে আরূঢ় হইয়া নিরাকার অক্ষর (ব্রহ্ম)-কেই ধরিয়া থাকে ; (৪০) যাহাকে মন দ্বারা কল্পনা করা যায় না, যাহাতে বুদ্ধির দৃষ্টি প্রবেশ করে না, তাহা কি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রাপ্ত হইবার যোগ্য ? শুধু ইহাই নহে—যাহা ধ্যানেরও অগম্য, এই জন্য যাহাকে কোন একস্থানে পাওয়া যায় না, তাহা কোন ব্যক্ত বস্তুর মধ্যে থাকে ? যাহা সর্বত্র সর্বস্বরূপে সর্বকালে বিদ্যমান, যাহা কল্পনা করিতে চিন্তাশক্তিও খিন্ন হয় ; যাহার সম্বন্ধে বলা যায় না—ইহা হয় বা হয় না, অথবা ইহা আছে বা নাই, সুতরাং যাহা প্রাপ্তির জন্য কোন উপায়ই করা যায় না ; যাহা অচঞ্চল অটল, যাহার অন্ত নাই, যাহা দূষিত হয় না —এইরূপ বস্তুকে যিনি আপন সামর্থ্যে আয়ত্তে আনিয়াছেন ;

সংনিয়ম্যেন্দ্রিয় গ্রামং সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ৪ ॥

যিনি বৈরাগ্যের প্রখর অগ্নিতে বিষয়সমূহকে জ্বালাইয়া ঝলসানো ইন্দ্রিয়গুলিকে ধৈর্যের সহিত বশীভূত করিয়াছেন, ইন্দ্রিয়সংযমের পাশে বাঁধিয়া ইন্দ্রিয়গুলিকে ঘুরাইয়া[১] তাহাদের গতি ফিরাইয়া হৃদয়ের গুহায় আবদ্ধ করিয়াছেন ; হে মিত্র অর্জুন, যিনি অপান বায়ুর দ্বারে আসন-মুদ্রা রচনা করিয়া মূলবন্ধের দুর্গপ্রাকার নির্মাণ করিয়াছেন, আশাপাশের বন্ধন ছিন্ন করিয়া ধৈর্যের পর্বত[২] সাফ করিয়া (অজ্ঞান) নিদ্রার অন্ধকার নাশ করিয়াছেন ; বজ্রাগ্নির জ্বালায় শরীরস্থ ধাতুসমূহ একেবারে জ্বালাইয়া (ষট্‌চক্র-রূপ) যন্ত্রের দ্বারা ব্যাধির শিরচ্ছেদ করিয়া (যন্ত্রের) পূজা করিয়াছেন ; (৫০)

[পাঠান্তর : ১ উলটা দিকে ঘুরাইয়া ; ২ অধৈর্যের পর্বত উড়াইয়া।]

কুণ্ডলিনীর মশাল জ্বালাইয়া আধার-চক্রের উপর খাড়া করিয়াছেন, যাহার প্রভা মস্তক পর্যন্ত সারা শরীরকে প্রদীপ্ত করিয়াছে ; নবদ্বারের কপাটে ইন্দ্রিয়-নিগ্রহরূপ অর্গল লাগাইয়া সুষুম্নানাড়ীর প্রান্তদ্বার খুলিয়া দিয়াছেন, প্রাণ-শক্তিরূপা চামুণ্ডা-দেবীর সম্মুখে সঙ্কল্পরূপ ছাগ বধ করিয়া মনোরূপী মহিষাসুরের মস্তক বলি দিয়াছেন, যিনি চন্দ্র সূর্য (ইড়া ও পিঙ্গলা) নাড়ীকে একত্র করিয়া, অনাহত ধ্বনিকে জাগাইয়া অতিশীঘ্রই সপ্তদশকলার চন্দ্রামৃত (অমৃত-সরোবরের জল) প্রাপ্ত হন, তদনন্তর মধ্যমা (সুষুম্না) নাড়ীর মধ্যবিবরে ক্ষোদিত সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া যিনি ব্রহ্মরন্ধ্রের শিখরে গিয়া পৌঁছেন, পরে ম-কারের শেষ গহন সোপানশ্রেণী ভাঙিয়া মহদাকাশকে কুক্ষিগত করিয়া ব্রহ্মে গিয়া মিলিত হন, এইরূপ সমবুদ্ধি-বিশিষ্ট যিনি 'সোহংসিদ্ধি'-লাভের জন্য নিরন্তর যোগ-দুর্গের আশ্রয় করিয়া থাকেন, আপনাকে সমর্পণ করিয়া তাহার বিনিময়ে শীঘ্রই নিরাকার শূন্যে (অব্যক্ত ব্রহ্মে) মিলিত হন, হে কিরীটী, তিনি আমাকেই প্রাপ্ত হন ; তবে যোগবলের জন্য তাঁহার যে অধিক কিছু লাভ হয়, তাহা নহে, বরঞ্চ কষ্টই অধিক হয়।

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥ ৫ ॥

যিনি সকল প্রাণীর কল্যাণের জন্য ভক্তি বিনাই নিরালম্ব ব্রহ্মপদে প্রবেশ করিবার ইচ্ছা

করেন ; (৬০) তাঁহার পথে মহেন্দ্রাদি পদ মারক-স্বরূপ হয়, আর ঋদ্ধিসিদ্ধির দ্বন্দ্বও পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করে, কাম-ক্রোধরূপ অনেক উপদ্রব উপস্থিত হয়, আর শরীর দ্বারা শূন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে হয়, তৃষ্ণা দ্বারা তৃষ্ণা মিটাইতে হয়, ক্ষুধাই ক্ষুধাকে ভক্ষণ করে, অহোরাত্র হস্তদ্বারা বায়ু মাপিতে হয় ; অনিদ্রায় শয়ন, নিরোধের (সংযমের) সুখভোগ আর বৃক্ষের সহিত মিত্রতা করিতে হয় ; শীতকে পরিধানের বস্ত্র ও উষ্ণতাকে উত্তরীয় করিতে হয়, বর্ষার ঘরে বাস করিতে হয় ; কিংবহুনা, হে পাণ্ডব, ভর্তা বিনাই সতীর নিত্য নব সহমরণে যাওয়ার ন্যায় এই যোগ অত্যন্ত কঠিন ; ইহাতে কোন স্বামীর কার্য করিতে হয় না বা কোন কুলাচার ধর্মপালনের নিমিত্তও ইহা করিতে হয় না, পরন্তু নিত্য নূতন করিয়া মরণের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হয় ; মৃত্যু হইতেও তীক্ষ্ণ জ্বলন্ত বিষ কি গলাধঃকরণ করা যায় ? পাহাড় গিলিতে কি মুখ ফাটিয়া যায় না ? এইজন্য হে বীর অর্জুন, যে যোগের পথে চলিতে চায়, তাহার ভাগ্যে দুঃখেরই ভাগ থাকে ; দেখ দন্তহীন লোককে যদি লোহার চানা চিবাইতে হয়, তবে তাহাতে তাহার পেট ভরে, কি মৃত্যু হয়, বলো। (৭০)

বাহুদ্বারা সাঁতরাইয়া কি কেহ সমুদ্র পার হইতে পারে ? আকাশে কি পায়ে হাঁটিয়া চলা যায় ? রণক্ষেত্রে গিয়া অঙ্গে কোন আঘাত না লাগিলেও কি স্বর্গলোকপ্রাপ্তি হয় ? এইজন্য হে পাণ্ডব, পঙ্গু যেমন বায়ুর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারে না, তেমনি (নিরাকার) অব্যক্ত ব্রহ্মের উপাসক দেহধারী জীবেরও গতি ; ইহা সত্ত্বেও যদি কেহ ধৈর্য বাঁধিয়া আকাশের সহিত যুঝিতে চেষ্টা করে, তবে সে ক্লেশেরই পাত্র হয় ; হে পার্থ, অন্য যাহারা ভক্তিমার্গকে অবলম্বন করে, তাহাদের কথা শুন ; তাহাদের এই অবস্থা[১] হয় না।

[পাঠান্তর : ১ এই ক্লেশ সহন করিতে হয় না।]

যে তু সর্বাণি কর্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাংধ্যায়ন্ত উপাসতে॥ ৬ ॥

বর্ণাশ্রম-ধর্মানুসারে যে কর্ম তাহার ভাগ্যে পড়ে, সেই সমস্ত কর্ম যে কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা সুখে সম্পাদন করে, বিধি পালন করে, নিষিদ্ধ কর্ম ত্যাগ করে এবং আমাকে কর্মার্পণ করিয়া কর্মফল জ্বালাইয়া দেয়, এই ভাবে হে অর্জুন, যে আমাকে অর্পণ করিয়াই কর্মের নাশ করে ; আর যাহার কায়িক, বাচিক ও মানসিক সর্ব ভাবের গতি আমা ভিন্ন অন্য দিকে যায় না ; এই ভাবে যে মৎপরায়ণ হইয়া নিরন্তর আমাকে উপাসনা করে এবং ধ্যানের নিমিত্ত যে আমার মন্দির-স্বরূপ হইয়াছে ; (৮০)

যাহার প্রেম শুধু আমার সহিত ব্যাপার করে এবং ভোগ ও মোক্ষরূপ ফল দরিদ্রকে ছাড়িয়া দেয় ; এই প্রকার একনিষ্ঠ ভক্তিযোগে যাহার প্রাণ ও শরীর আমার কাছে বিক্রীত হইয়াছে, তাহার জন্য আমি কি না করি ?

তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্॥ ৭ ॥

আর অধিক কি বলিব ? হে ধনুর্ধর, যে সন্তান মাতার গর্ভে আসে, সে মাতার কত আপনার ; হে ধনঞ্জয়, আমার ভক্তও আমার তেমনি প্রিয়—সে যতখানি আমাকে ভক্তি করে, সেই পরিমাণে আমি তাহার[১] কর্মের ভার বহন করি ; আর আমার ভক্তের কি সংসারের কোন

চিন্তা আছে? সম্পন্ন ব্যক্তির স্ত্রী কি ক্ষুধায়[২] কষ্ট পায়? তেমনি আমার ভক্ত আমারই কলত্র জানিবে, তাহার কোন লজ্জা কি আমার নহে? সে সঙ্কটে পড়িলে কি আমার লজ্জা হইবে না? এই সৃষ্টি জন্মমৃত্যুর তরঙ্গে ডুবিতেছে, ইহা দেখিয়া আমার মনে হইল যে, এই ভবসিন্ধুর উত্তাল তরঙ্গ দেখিয়া কে না ভীত হয়? আমার ভক্তও হয়তো ভয় পাইতে পারে; এই জন্য হে পাণ্ডব, আমি অবতারের মূর্তি গ্রহণ করিয়া ভক্তের দ্বারে ছুটিয়া আসি;

[পাঠান্তর: ১ কলিকালকে রোধ করিয়া আমি তাহাকে রক্ষা করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি।
২ চাউল ভিক্ষা করিতে বাহির হয়?]

যাহারা সঙ্গহীন (আসক্তিশূন্য), তাহাদিগকে ধ্যানের মার্গে লাগাইয়া দিই; যাহারা গৃহস্থ, তাহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন কর্মমার্গে প্রবৃত্ত করাই। (৯০)

শুন, এই সংসারে (রাম, কৃষ্ণ আদি) সহস্র নামের নৌকা তৈয়ারি করিয়া আমি তাহাদের ত্রাণকর্তা হইয়া যাই; কাহারও সহিত প্রেমের ভেলা বাঁধিয়া সাযুজ্যের তীরে আনিয়া ফেলি; শুধু ইহাই নহে, যাহারা আমার ভক্ত, তাহারা চতুষ্পদাদি জীবই হউক, তাহাদের সকলকে আমি বৈকুণ্ঠরাজ্যে বাস কবিবার যোগ্য করিয়া লই; এই জন্য আমার ভক্তের কোন চিন্তা নাই, আমিই সর্বদা তাহাদের সমুদ্ধর্তা হইয়া আছি, আর যখনই আমার ভক্ত আপন চিত্তবৃত্তি আমাকে অর্পণ করে, তখন হইতেই আমিও তাহার কল্যাণ সাধন করি; এই জন্য হে ধনঞ্জয়, তুমি এই মার্গ অবলম্বন করিয়াই আমার ভজনা করিবে—ইহাই তোমার (উপাসনার) মন্ত্র করিয়া লও।

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্ধ্বং ন সংশয়ঃ ॥ ৮ ॥

তোমার মনোবৃত্তি আমার স্বরূপে লাগাইয়া দাও, আর আমাতেই তোমার বুদ্ধি নিবিষ্ট কর; এই দুটি যদি একসঙ্গে প্রেমের সহিত আমার মধ্যে প্রবেশ করে, তবে তুমি নিশ্চিত আমাকে প্রাপ্ত হইবে; মন ও বুদ্ধি যদি আমার স্বরূপে স্থির হইয়া যায়, তবে বল তো, 'তুমি' এইরূপ দ্বৈতভাব কি অবশিষ্ট থাকিতে পারে? সুতরাং প্রদীপ নিবিলে যেমন তাহার তেজও সঙ্গে সঙ্গে নিবিয়া যায়, কিংবা রবিবিম্বের সঙ্গে যেমন তাহার প্রকাশও চলিযা যায়; (১০০)

প্রাণ বহির্গত হইবার সঙ্গে সঙ্গে যেমন ইন্দ্রিয়শক্তিও (শরীর হইতে) বাহির হইয়া যায়, তেমনি মন ও বুদ্ধি যেখানে যায়, অহঙ্কারও তাহাদের অনুগমন করে; অতএব মন ও বুদ্ধি আমার স্বরূপেই সন্নিবিষ্ট করিযা রাখো, ইহাতেই তুমি সর্বব্যাপী মৎস্বরূপ হইয়া যাইবে; আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, এই বাক্যের কোন অন্যথা হইবে না।

অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয় ॥ ৯ ॥

অথবা যদি মন ও বুদ্ধির সহিত তোমার চিত্ত সর্ব সময়ের জন্য আমার হস্তে অর্পণ করিতে অসমর্থ হও; তবে এমন কর যে, অষ্টপ্রহরের মধ্যে কিছুক্ষণের জন্যও আমাতে চিত্ত সমর্পণ কর; ইহাতে যে যে সময়ে আমাতে সুখ অনুভব করিবে, সেই সময়েই বিষয়ে অরুচি আসিবে; শরৎ কালের প্রারম্ভে যেমন নদীর জল কমিতে থাকে, তেমনি উহা (আমার প্রতি অনুরাগ) শীঘ্রই চিত্তকে প্রপঞ্চ হইতে বিমুখ করিবে; পূর্ণিমা হইতে চন্দ্রবিম্ব যেমন দিন দিন ক্ষীণতর হইয়া

অমাবস্থায় বিলীন হইয়া যায়, তেমনি হে পাণ্ডুসুত, বিষয়ভোগের মধ্য হইতে বাহির হইয়া চিত্ত আমাতে প্রবেশ করিলে তুমি ধীরে ধীরে মদ্রূপ হইয়া যাইবে ; যাহাকে অভ্যাস-যোগ বলে তাহা ইহাই জানিবে, এমন কোন কোন বস্তু নাই, যাহা ইহা দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না (১১০)।

এই অভ্যাস-যোগের বলে কেহ আকাশে ভ্রমণ করে, কেহ ব্যাঘ্র ও সর্পকে বশীভূত করে ; বিষ হজম করে, সমুদ্রের মধ্যে পথ তৈয়ারি করে, অভ্যাসে শব্দব্রহ্মকে জয় করে—বেদবিদ্যায় পারদর্শী হয় ; সুতরাং অভ্যাসের দ্বারা কোন বস্তুই দুষ্প্রাপ্য নহে, এইজন্য তুমি অভ্যাস-যোগে আমার সহিত মিলিত হও।

অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্মপরমো ভব।
মদর্থমপি কর্মাণি কুর্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥ ১০ ॥

অভ্যাস করিবার শক্তি তোমার শরীরে যদি না থাকে, তবে যেমন আছ তেমনি থাকো ; *ইন্দ্রিয় নিরোধ করিতে হইবে না, বিষয়ভোগও ত্যাগ করিতে হইবে না,* স্বজাতির অভিমানও ছাড়িতে হইবে না ; বিধি-নিষেধ পালন করিয়া নিজের কুলধর্মের অনুষ্ঠান করিতে থাকো, এই ভাবে তোমাকে সুখে থাকিবার অনুমতি দিতেছি ; পরন্তু কায়মনোবাক্যে যে ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইবে (যে কর্ম করিবে), তাহা আমি করিতেছি—এরূপ মনে করিও না ; করা বা না করা—এ-সমস্ত বিশ্বের চালক যিনি, তিনিই জানেন, এই ভাবে চিন্তা করিবে ; (কর্মের) ন্যূনতা বা পূর্ণতা সম্বন্ধে নিজের মনে কোন চিন্তা আসিতে দিও না ; জীবন স্ব-স্বভাবানুযায়ী যেমন চলে, তেমনি চলুক ; মালী জলকে যেদিকে লইয়া যায়, সেইদিকেই জল নিঃশব্দে যায়, তেমনি তুমিও অভিমানশূন্য হইয়া ঐ জলের ন্যায় হইবে। (১২০)

হে বীর অর্জুন, বাস্তবিক *দেখিতে গেলে পথ সরল কি বাঁকা, সে-সম্বন্ধে বৃথাই চিন্তা করা* হয় ; প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির বোঝা বুদ্ধির মাথায় চাপাইও না। চিত্তবৃত্তি নিরন্তর আমাতেই লাগাইয়া রাখ ; যে যে কর্মের অনুষ্ঠান করা হয়, তাহা স্বল্প কি অধিক, তাহার বিচার করিবে না, নীরবে তাহা আমাকে অর্পণ করিবে ; হে অর্জুন, মদ্‌ভাবনা দ্বারা অনুপ্রেরিত হইয়া কর্ম করিলে তনু ত্যাগ করিয়া তুমি আমারই সাযুজ্যের সিদ্ধভবনে নিশ্চয় আসিয়া পৌঁছিবে।

(ক্রমশঃ)

প্রেমাভক্তি

শ্রীবিনয়কুমার সেনগুপ্ত

যে প্রেমে চিরমুক্ত ভগবান নিজে বদ্ধ, তাকে শ্রীরামকৃষ্ণ 'কথামৃতে' বলেছেন, 'অব্যভিচারিণী ভক্তি', 'নিষ্ঠাভক্তি' ও 'প্রেমাভক্তি'। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়ঃ 'ব্যভিচারিণী ভক্তি কাকে ব'লে জানো? জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি। যেমন কৃষ্ণই সব হয়েছেন—তিনিই পরব্রহ্ম, তিনিই রাম, তিনিই শিব, তিনিই শক্তি। কিন্তু ও-জ্ঞানটুকু প্রেমাভক্তির সাথে মিশ্রিত নেই'। জ্ঞান ছাড়া প্রেম সম্ভব নয়। প্রেমাস্পদকে না জানলে তাকে ভালবাসা যায় না। 'গোপীদেরও ব্রহ্মজ্ঞান ছিল, কিন্তু তারা সে জ্ঞান চাইত না।' ভালবাসা তত্ত্বানুরাগ নয়; প্রেমাস্পদ একটি দার্শনিক সত্য নন। তাই ভগবান জ্ঞানস্বরূপ হয়েও গোপীর চোখে প্রেমময়। প্রাণের দেবতাকেই লোকে ভালবাসে, আধ্যাত্মিক নীতিকে নয়। জজ-সাহেবের স্ত্রী জজ-সাহেবকে নিজের প্রিয়তম স্বামী-রূপেই গ্রহণ করেন, ন্যায়বিচারক-হিসাবে নয়।

এ প্রশ্নের অন্য একটি দিকও আছে। আমরা সাধারণতঃ দেবতাকে পূজা করি সচন্দন পুষ্প দিয়ে। ভক্তি-পুষ্পের গায়ে জ্ঞান-চন্দন মাখিয়ে তাকে নিবেদন করাই আমাদের রীতি। কিন্তু চন্দন ছাড়াও ফুলের তো নিজস্ব একটি গন্ধ আছে। ভক্তির নিজের সৌরভও কম নয়, তার বিশিষ্টতাও অস্বীকার করবার কোন উপায় নেই। রাগভক্তির এই স্বকীয় গন্ধই অব্যভিচারিণী ভক্তির অঙ্গসৌরভ।

অব্যভিচারিণী ভক্তি একনিষ্ঠ। ভগবানের একটি রূপ বই দুইটি রূপকে সে ভজনা করে না। মহাবীর হনুমানের রামমূর্তি ছাড়া অন্য মূর্তি ভাল লাগত না। মথুরায় 'পাগড়িবাঁধা শ্রীকৃষ্ণকে দেখে গোপীরা হেঁটমুখ হয়ে রইল। পরস্পর বলতে লাগলো, এ পাগড়িবাঁধা আবার কে? এর সঙ্গে আলাপ ক'রে আমরা কি শেষে দ্বিচারিণী হবো? আমাদের পীতধড়া মোহনচূড়া-পরা সে প্রাণবল্লভ কোথায়? দেখেছ এদের কি নিষ্ঠা!' মহাপ্রভুর অনুরোধঃ

'কৃষ্ণকে বাহির নাহি করিহ ব্রজ হইতে,
ব্রজ ছাড়ি কৃষ্ণ কভু না যান কাহাতে।'

ভালবাসা স্বভাবতই একমুখী; বিশেষতঃ ইষ্টের দুইটি রূপকে ভালবাসলে সাধকের হয় 'রসাভাস'। নন্দ-নন্দনের ভাব-রূপ তাঁর বৃন্দাবন-লীলা থেকে অবিচ্ছেদ্য। তাই তাকে মথুরায় কিংবা দ্বারকায় স্থানান্তরিত করা যায় না। শিবভাব কিংবা শক্তিতত্ত্বের সাথে তাকে মিশ্রিত করলে ঘটে ভাব-সংঘাত, যার ফলে হয় রসভঙ্গ। শ্রীরামকৃষ্ণ সমস্ত রসেরই পৃথক্ ভাবে সাধন করেছেন, কিন্তু একটি রসের সাথে আর একটি রসের সংযোগ করেননি। একদিন নীলাচলে মহাপ্রভু ভগবানকে দেখেছিলেন রথের উপর বন্ধু অর্জুনের সারথির বেশে। আনন্দে সেদিন তিনি উঠেছিলেন নেচে—

'সেইতো পরাণ-নাথে পাইনু
যার লাগি মদন-দহনে ঝুরি গেনু।'

কিন্তু এ পরাণ-নাথ তো মুরলী-বদন নন? তাঁর অঙ্গের পীতধড়া কোথায়? কোথায় শিরে সেই মোহন-চূড়া? এক হাতে তাঁর বলগা, আর এক হাতে চাবুক। মহাপ্রভুর ভাবান্তর

হ'ল। গভীর বেদনায় তিনি উঠলেন কেঁদে—

'যঃ কৌমারহরঃ স এব হি
বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা-
স্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ
প্রৌঢ়াঃ কদম্বানীলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র
সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে
চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে॥'

—আমার প্রথম জীবনের সবটুকু প্রেম যাঁর পায়ে নিঃশেষে নিবেদন ক'রে দিয়েছি, সেই তিনি আমার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে—সেদিনের মতো আজও বরণীয়। সেদিনের মতো আজও তো মধুমিলনের চৈত্র-রাতে ফোটা মালতীফুলের গন্ধে কদম্ববন উতলা হয়ে উঠেছে। আর আমিও সেই নায়িকা। তবু এই মিলনের শুভক্ষণে সেই রেবানদীর তীরে, সেই বেতস-তরুতলে আমাদের যে প্রথম প্রণয় হয়েছিল, তারই কথা মনে ক'রে প্রাণ যে আমার উৎকণ্ঠ হয়ে রইল! এ শ্লোকের অর্থ করলেন রূপ গোস্বামী:

'প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি! কুরুক্ষেত্র মিলিত-
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।
তথাপ্যন্তঃ খেলন্মধুরমুরলী পঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দী-পুলিন-বিপিনায় স্পৃহয়তি॥'

—'প্রিয় বিশাখা সখি, এ সেই কৃষ্ণ। আজ তাঁর সাথে মিলন হ'ল কুরুক্ষেত্রে। আমিও সেই রাধা। দু-জনার মিলনে আজ সুখ যে না হয়েছে, তাও নয়। তবু যে কালিন্দীকূলের বনে উপবনে একদিন পঞ্চমস্বরে তাঁর বেণু বেজে উঠেছিল, তারই কথা মনে ক'রে মন যে আমার আজ তাকেই চাইছে!'

রসনিষ্ঠা প্রেমিকের ধর্ম; কিন্তু সাধনার ক্ষেত্রেও তার প্রয়োজন কম নয়। ইষ্টের রূপ কেবলই পরিবর্তন করলে স্বভাবতঃ চঞ্চল মন আরও বিক্ষিপ্ত হয়, তপস্যার পথে ঘটে বিঘ্ন।

এ নিষ্ঠা ধর্মান্ধতা নয়, কিংবা অসহিষ্ণুতাও নয়। 'কি রকম জানো? যেমন বাড়ির বৌ! দেওর, ভাসুর, শ্বশুর, স্বামী সকলকে সেবা করে, পা ধোবার জল দেয়, গামছা দেয়, পিঁড়ে পেতে দেয়, কিন্তু এক স্বামীর সঙ্গেই অন্যরকম সম্বন্ধ।' ভগবানের প্রত্যেকটি রূপকেই গোপী শ্রদ্ধা করে, কিন্তু প্রাণের বেদীমূলে সে প্রতিষ্ঠা করে একটিমাত্র মূর্তিকে। প্রিয়তম দু-জন হয় না।

"এই প্রেমাভক্তিতে দুটি জিনিস আছে: 'অহংতা' আর 'মমতা'। যশোদা ভাবতেন, 'আমি না দেখলে গোপালকে কে দেখবে? তা হ'লে গোপালের অসুখ করবে।' কৃষ্ণকে ভগবান ব'লে যশোদার বোধ ছিল না। আর মমতা—আমার জ্ঞান, আমার গোপাল। উদ্ধব বললেন, 'মা, তোমার কৃষ্ণ সাক্ষাৎ ভগবান, তিনি জগৎ-চিন্তামণি। তিনি সামান্য নন।' যশোদা বললেন, 'ওরে তোদের চিন্তামণি নয়, আমার গোপাল কেমন আছে জিজ্ঞাসা করছি। চিন্তামণি নয়—আমার গোপাল' ..."

গোপীপ্রেম মধুর অহমিকায় পূর্ণ। যে পরম পুরুষের আশ্রয়ে মানুষ নিজেকে নিরাপদ মনে করে, তাঁকেই নিজের স্নেহের আঁচলে ঢেকে রাখতে চায় গোপবালা। শুধু বাৎসল্য রসের প্রেরণাতেই যে গোপী ভগবানকে তার ভালবাসার আড়ালে রাখে, তা নয়। প্রেমিকার কাছে তার প্রেমোন্মাদ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অসহায় পুরুষ মাত্র। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় 'শ্রীকৃষ্ণের চলার পথে সে তার সূক্ষ্ম দেহ বিছিয়ে দেয়, পাছে ভগবানের পায়ে কাঁটা ফোটে, পাছে তার পায়ে আঘাত লাগে।' মানুষের অহংকারের মধ্যে কুশ্রী আত্মম্ভরিতা,

আর গোপীর 'অহংতা'র মধ্যে আছে এক দিব্য সুষমা, এক অপার্থিব মাধুর্য। এ আত্মগৌরবের অর্থ প্রিয়তমের কল্যাণে আত্মদান, স্বার্থপ্রতিষ্ঠা নয়।

প্রেম সেবাধর্মী। মাতৃস্নেহের প্রকাশই হয় সন্তানের সেবায়, আর ভক্তের ভালবাসা ফুটে ওঠে ইষ্টের শুধু স্তবগানে নয়, ইষ্টের সুখ-বিধানে। তাই শ্রীমদ্‌ভাগবতে ভগবান বলছেন যে, সাযুজ্য সালোক্য এবং অন্যান্য প্রকার মুক্তি ভক্তদের দিলেও তারা সহজে গ্রহণ করে না—'বিনা মৎসেবনং জনাঃ'—'শুধু নেয় আমাকে সেবা করবার অধিকার।'

ভালবাসার সার্থকতা হয় দানে, গ্রহণে নয়। 'প্রিয়, তোমার কাছে যে হার মানি, সেইতো আমার জয়!' মানুষ ভগবানের কাছে চায়। সে গ্রহীতা আর ভগবান দাতা। গোপী-প্রেমের পদ্ধতি কিন্তু ঠিক বিপরীত। এখানে ভগবানই ভালবাসার ভিখারী, আর গোপী প্রেমের রানী। গোপী দান করে; ভগবান গ্রহণ করেন।

স্নেহ স্বভাবতই নিম্নগামী। প্রধানতঃ সেই কারণেই বৃন্দাবনের কৃষ্ণ ছোট, গোপবালা বড়। 'ভক্ত মোরে দেখে হীন, আপনাকে দেখে বড।' প্রেমের দেবতা বিরাট হ'তে পারেন না। ভগবান বালক বলেই তো যশোদার ও অন্যান্য গোপীর তাঁর জন্য অত মমতা। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, 'প্রেমের স্বভাবই এই যে, সে আপনাকে বড় মনে করে, আর প্রেমের পাত্রকে ছোট মনে করে।'

এ প্রীতি আধ্যাত্মিক তত্ত্বানুরাগ নয়। গোপী শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান ব'লে জানতেন, কিন্তু ঈশ্বর-ভাবে ভালবাসতেন না। যে ষড়ৈশ্বর্য ঈশ্বরের বিভূতি, তার পূজা বৃন্দাবনে হয় না। পরমপুরুষের বিরাট রূপের প্রতি আসক্তিও গোপীধর্মের প্রকৃতিবিরুদ্ধ। বিরাটের সাথে ক্ষুদ্রের প্রেম সম্ভব নয়। কুরুক্ষেত্রে ভগবানের বিশ্বরূপ দেখে অর্জুনও ভয় পেয়েছিলেন। পাপপুণ্যের ফলদাতা, অদৃষ্টের নিয়ন্তা, মানুষের দণ্ডমুণ্ডের কর্তাকেও গোপী ভালবাসতে শেখেননি। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বিচারকের প্রতি প্রণয়াসক্ত হওয়া আসামী কিংবা ফরিয়াদীর পক্ষে অসম্ভব। ভয় থেকে ভালবাসা হয় না। গোপীর ভগবান তার প্রাণের দেবতা, প্রেমের ঠাকুর মাত্র—সাধারণ জীবের ঈশ্বর নন।

গোপীর প্রাণ 'মমতা'য় ভরা। ভগবানকে গোপী নিতান্ত আপনার জন ব'লে মনে করে, এবং আপনবোধের উপরই তার প্রেমের বেদী রচনা করে। শ্রীশ্রীমা সারদাকে কোন ভক্ত প্রশ্ন করলেন, 'তুমি আমার কেমন মা?' উত্তর এল, 'আমি তোমার আপনার মা, পাতানো মা নই, ধর্ম-মা নই—তুমি আমার নিজের ছেলে।' মহামায়ার মুখ থেকে শুধু এই কথাটুকু শোনবার জন্য মাটির মানুষ যুগ যুগ ধরে অপেক্ষা করছিল। আপনবোধ না হ'লে কি ভালবাসা যায়? তাইতো গোপী বললেন, 'তোদের চিন্তামণি নয়, আমার গোপাল কেমন আছে, জিজ্ঞাসা করছি।'

ব্রজের রস-সাধনার ক্রমবিকাশে দেখা দেয় 'ভাব'। 'ভাবেতে মানুষ অবাক্ হয়ে যায়, বায়ু স্থির হয়ে যায়। যার হয়, সে জানতে পারে না। আপনি কুম্ভক হয়।' মানুষের চিন্তা বহুমুখী; ভাবে সেই চঞ্চলতার হয় অবসান। প্রদীপের একটি শিখার মতো 'ভাব' দেয় আলো নীরব নিঝুম রাতে। সেই ভাবের আলোতেই সাধকের জীবন উজ্জ্বল।

'মহাভাব' আরও উঁচু স্তরের অনুভূতি। সে রসোপলব্ধির প্রকাশ হয় 'অষ্টসাত্ত্বিক'

বিকারে। বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে সে আটটি লক্ষণের উল্লেখ আছে, আর 'চৈতন্যচরিতামৃত' ও 'কথামৃতে' আছে সেই 'স্বেদ', 'অশ্রু', 'পুলক', 'কম্প' প্রভৃতির বাস্তব ছবি। এই মহাভাবের প্রেরণাতেই একদিন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের গায়ের জামা করেছিলেন শতছিন্ন, আর মহাপ্রভুর অঙ্গের গ্রন্থি হয়েছিল শিথিল। 'কথামৃতে' আছে : 'মহাভাব ঈশ্বরের ভাব। এতদূর তোমাদের দরকার নেই। আমার অবস্থা নিজিরের জন্য।'

'প্রেম হওয়া অনেক দূরের কথা! চৈতন্যদেবের প্রেম হয়েছিল। ঈশ্বরে প্রেম হ'লে বাহিরের জিনিস ভুল হয়ে যায়। জগৎ ভুল হযে যায়। নিজের দেহ যে এত প্রিয় জিনিস, তাও ভুল হয়ে যায়।' এই প্রেম সম্পূর্ণ বিদেহ-অনুভূতি। দেহ জড, সেজন্য তার উপলব্ধির কোন প্রশ্ন নেই। প্রেম স্থূল পদার্থ হ'লে কাঠের সাথে কাঠেরও প্রণয় হ'ত। চরম ভালবাসা আত্মার ধর্ম, তাই সেখানে কোন পদার্থের সংযোগের সম্ভাবনা নেই। আচার্য বলদেবের মতে সচ্চিদানন্দের আনন্দদায়িনী কিংবা 'হ্লাদিনী' শক্তির সাথে অচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত এই প্রেম। প্রেমই আনন্দের কারণ, আবার আনন্দই প্রেমের হেতু। ভগবানের হ্লাদিনী শক্তিকেই শ্রীমতী রাধা বলা হয়। তিনি প্রেমময়ী। রাধাকৃষ্ণের মিলন অর্থ ভগবানের নিজেরই আনন্দরূপের সাথে প্রেমসম্ভোগ। ভগবানের এই আত্মরতি পূর্ণভাবে আস্বাদ করা জীবের পক্ষে সম্ভব নয়। দেহাত্মজ্ঞানের অবসানের সাথে সেই দিব্যানুভূতির একটু আভাস মাত্র পায় মাটির মানুষ, কিন্তু তার যথার্থ পরিচয় সে পায় না।

শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়, 'অবতার কিংবা ঈশ্বরকোটি না হ'লে এ প্রেম লাভ করা যায় না।' এ চরম উপলব্ধির মধ্যে পার্থিব সমস্ত জ্ঞান হয় অবলুপ্ত। জগৎ চলে; সে অস্থির, পরিবর্তনশীল। চরম প্রেম ধ্রুব; সে নিত্য ও স্থির। স্থির ও অস্থিরের একই সাথে অনুভূতি হয় না। তাই প্রেমের আবির্ভাবে জগৎ বিদায় নেয়। অচিন্ত্যভেদাভেদবাদীদের মতে বাইরের প্রকৃতি সচ্চিদানন্দের 'বহিরঙ্গা' 'মায়াশক্তি'র প্রকাশ। আর প্রেম তাঁর 'স্বরূপশক্তি'র আশ্রিত। সে কারণেও প্রেমের স্থান জগতের বহু ঊর্ধ্বে। সেই অপার্থিব প্রীতিরই জয়গান মহাপ্রভুর কণ্ঠে :

'অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম যেন জাম্বনদহেম
এই প্রেম ত্রিলোকে না হয় ;
যদি হয় তার যোগ, না হয় তার বিয়োগ ;
বিয়োগ হইলে কেহ না জীয়য়।'

'কথামৃতের' প্রেম শ্রীরামকৃষ্ণের নিজেরই রূপ—'স ঈশ অনির্বচনীয়ঃ প্রেমস্বরূপঃ'। তাঁকে আমরা প্রণাম করতে পারি, পরিপূর্ণভাবে আয়ত্ত করতে পারি না। সেই প্রণামই 'বৈধীভক্তি'; সেই বন্দনাই সাধারণ মানুষের ধর্ম। নিয়মিত পূজা, জপ, ব্রত, উপবাস -এ সবই বিধিবাদীয় অনুরাগ এবং রাগভক্তিলাভের উপায়। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের কথায়, 'ঈশ্বরে ভালবাসা আসবে ব'লে জপ, তপ, উপবাস। ...হাওয়া পাবে ব'লে পাখা করা।' 'সন্ধ্যাদি কতদিন? যতদিন না তাঁর পাদপদ্মে ভক্তি হয়। ...যখন একবার হরি বা একবার রাম-নাম করলে রোমাঞ্চ হবে, অশ্রুপাত হবে, তখন নিশ্চয় জানবে যে, সন্ধ্যাদি কর্ম আর করতে হবে না।'

এ-কথা সত্য যে, অনুরাগের কষ্টিপাথরে যাচাই করলে বৈধীভক্তির মূল্য খুব বেশী হবে না। তবু কিন্তু সে নিরর্থক কিংবা মূল্যহীন নয়। ধূলাকাদামাখা মনকে পরিষ্কার ক'রে

ভাগবত রঙে রঙিন করবার শক্তি বৈধীভক্তির আছে। সাধনা অর্থই নিয়মিত অনুষ্ঠান। জপের সংখ্যাপূরণ অকৃত্রিম দিব্য অনুরাগের পরিচয় না হ'তে পারে, কিন্তু এ নিয়ম-পালন মানসিক শৃঙ্খলা-বিধানের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। সামাজিক জীবনের মতো আধ্যাত্মিক জীবনেও নিয়মানুবর্তিতার বিশেষ স্থান আছে। বৈধীভক্তি সাধন-জীবনের প্রাথমিক নিয়ম। স্বেচ্ছাচারী এবং উচ্ছৃঙ্খল মনকে বশে আনবার সে এক অপূর্ব কৌশল। নিয়ম মনের অরাজকতা দূর করে এবং তার স্থানে প্রতিষ্ঠিত ক'রে সুশাসন, ছন্দহারা জীবনে সে আনে এক নূতন সঙ্গতি। নিয়মিত শাস্ত্র-পাঠ এবং নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম না ক'রে কেউ বেদান্ত-সাধনারও অধিকারী হ'তে পারে না। বেদান্তের ভাষায় অধিকারীর লক্ষণ: 'বিধি-বদধীতবেদবেদাঙ্গত্বেন আপাততোঽধিগতাখিল-বেদার্থোঽস্মিন্ জন্মনি জন্মান্তরে বা কাম্য-নিষিদ্ধবর্জনপুরঃসরং নিত্যনৈমিত্তিকপ্রায়শ্চিত্তো-পাসনানুষ্ঠানেন নির্গতনিখিলকল্মষতয়া নিতান্ত-নির্মলস্বান্তঃ সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নঃ প্রমাতা।' তাই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ 'প্রবর্তক'কে দীক্ষিত করেছেন বিধির মন্ত্রে।

বৈধীভক্তি শুধু নিয়মিত পূজা, জপ ও ব্রতের বাহ্য অনুষ্ঠান নয়; সে এক কঠোর মানসিক চর্চা। ধর্মজীবনে পল্লবগ্রাহিতার স্থান খুব উঁচুতে নয়; সেখানে সৎচিন্তা ও শুভকর্মের অভ্যাস অনেক বেশী মূল্যবান্। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ এই অধ্যবসায়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। এই অভ্যাসের ফলে মনে অসাধারণ শক্তি এসে পড়ে। শক্তিই সিদ্ধির প্রধান উপায়।

শক্তি কিন্তু একমাত্র অভ্যাস থেকেই আসে না। দিব্যপূজা ও কীর্তনের মধ্যেও একটা ক্ষমতা আছে। ভগবানের নাম-মন্ত্র উচ্চারণ করা আর মানুষকে তার নাম ধরে ডাকা—এক কথা নয়। ভাগবত নামের ভিতরেই তার শক্তি ও মাধুর্য লুকিয়ে থাকে। তাই তো ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, 'ঈশ্বরের নামের ভারি মাহাত্ম্য। শীঘ্র ফল না হ'তে পারে, কিন্তু কখন না কখন এর ফল হবেই হবে।'

প্রকৃতিভেদে বৈধী ভক্তিকে ভাগ করা হয়েছে তিনটি পর্যায়ে। তার সাত্ত্বিক রূপটি সাধারণতঃ চোখে পড়ে না। 'যে ভক্তের সত্ত্বগুণ আছে, সে ধ্যান করে অতি গোপনে··· এদিকে শরীরের উপর আদর কেবল পেট-চলা পর্যন্ত; শাকান্ন পেলেই হ'ল···সত্ত্বগুণী ভক্ত কখনও তোষামোদ ক'রে ধন লয় না।' এ প্রীতি প্রেমাভক্তির পূর্বরাগ। সাত্ত্বিক ভক্তের ধ্যান-ধারণা হয়তো নিয়মিত ভাবেই অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু তার মধ্যে কৃত্রিমতার বিশেষ কোন স্থান নেই। এ চেষ্টা আন্তরিক। সত্ত্বগুণী সাধক সম্পূর্ণ দেহবুদ্ধির উর্ধ্বে উঠতে পারেনি সত্য, কিন্তু দৈহিক সুখের লালসাও তার নেই। তার প্রীতি ত্যাগের পথে দ্রুত এগিয়ে চলেছে আর বিষয়াসক্তি হয়ে আসছে ক্রমশই ক্ষীণ। যে শান্ত নীরবতা ভাগবত চেতনার রূপ তারই অনুরাগী সাত্ত্বিক ভক্ত। সেই অনুভূতির আলোতেই ধীরে ধীরে তার সমস্ত বিধির হয় অবসান।

'ভক্তির রজঃ থাকলে সে ভক্তের হয়তো তিলক আছে রুদ্রাক্ষের মালা আছে।' রাজসিক ভক্তি বাহ্যবস্তুর সাহায্যে অন্তরের উন্নতি করতে চায়। কর্মে তার বিশ্বাস আছে; কোলাহল থেকে সে নিজেকে মুক্ত করতে পারে নি। তার সাধনাও অকৃত্রিম নয়, কিন্তু তার উদ্যম প্রশংসনীয়। ধর্মের নামে সে জড়তা কিংবা ক্লীবতার উপাসনা করে না—শক্তির চর্চা করে।

'ভক্তির তমঃ যার হয়, তার জলন্ত বিশ্বাস। ঈশ্বরের কাছে সেরূপ ভক্ত জোর করে। যেন ডাকাতি ক'রে ধন কেড়ে লওয়া···কি, আমি তাঁর নাম করেছি, আমার আবার পাপ! আমি তাঁর ছেলে, তাঁর ঐশ্বর্যের অধিকারী। এমন রোক হওয়া চাই।' তামসিক ভক্তি মহাবীর্যের প্রকাশ। পূজার বিধি এ ভক্তির মধ্যেও আছে, কিন্তু সেই বিধি-নিষেধের মধ্যে ভক্ত নিজেকে হারিয়ে ফেলেনি। তামসিক অনুরাগের মধ্যে অধিকারবোধ এত প্রবল যে, সে সামান্য আচার কিংবা অনুষ্ঠানের কাছে আত্মসমর্পণ করে না। যাঁর জন্য ধর্মানুষ্ঠান, তাঁর প্রতি আস্থাই এই ভক্তির স্বরূপ। এ প্রীতি প্রেমাস্পদের কাছে যতটা বশ্যতা স্বীকার করে, তার চেয়ে তাকে বেশী বশ্যতা স্বীকার করায়। তামসিক ভক্তি ভগবান লাভের একটা যান্ত্রিক উপায়মাত্র নয়। যন্ত্র এখানে বিশ্বাস-মন্ত্রপূত।

এই বিশ্বাসই ধীরে ধীরে রূপান্তর ঘটায় বৈধীভক্তির; অনুরাগের রঙে তাকে করে রঙিন। প্রেমাস্পদের প্রতি আস্থা স্থাপন করা অর্থই প্রেমের শক্তি স্বীকার করা। যে যাকে ভালবাসে না, সে তাকে বিশ্বাসও করে না। তাই এবার 'কথামৃতের' ভগবান প্রীতির সাথে বিধির মিলন করেছেন বিশ্বাসের রাখীবন্ধনে। ভগবানে নির্ভরতার ফলে বৈধীভক্তি রূপান্তরিত হয়েছে প্রেমাভক্তিতে; আর পার্থিব চেতনা পরিণত হয়েছে এক অপার্থিব অনুভূতিতে।

'কথামৃত' ব্রত-উপবাসের আরম্ভ-গীতি নয়। সে বৈধীভক্তির সমাপ্তি-সঙ্গীত। নিয়মিত উপাসনার সে চিরপ্রচলিত যন্ত্র নয়, নিষ্কাম প্রেমের সে মোহন-মন্ত্র। কামনার সোনার খাঁচায় সে কাউকে বাঁধে না, উদার প্রীতির আকাশে সে সকলকে মুক্তি দেয়। 'সন্ধ্যাকে' সে 'গায়ত্রীতে লয় করে', আর 'গায়ত্রীকে লয় করে ওঙ্কারে।' জপের সংখ্যাকে সে রূপ দেয় ভাগবত আকাঙ্ক্ষায়, পূজার ফুলকে সে করে চোখের জল। তারই সুরে সন্ধ্যার আরতির দীপশিখা ভোরের প্রেমের আলো হয়ে দেখা দেয়; তারই ছোঁয়ায় মর্ত্যের বেদনা অমর্ত্যের চেতনা হয়ে ফুটে ওঠে।

সে নবচেতনার পরিণতি ভুলে-ভরা মানুষ সহজে বুঝতে শেখেনি। সে উদ্বোধন-সঙ্গীত আজ থেমে গিয়েছে। তবু সে 'কথামৃতের' সুরের মূর্ছনায় দক্ষিণেশ্বরের আকাশ-বাতাস হয়ে আছে মধুময়, আর ভাগীরথার চঞ্চল বুকে লেগে আছে শাশ্বত এক প্রেমের দোলা। কবি শেলীর দুটি লাইন মনে পড়েঃ

And so they thought,
when thou art gone,
Love itself shall slumber on ?

—ঠিক এমনি ক'রে তুমি যখন চলে যাবে প্রিয়, তোমার চিন্তার উপর ঘুমোবে ভালবাসা।

সেই ভালবাসা এখনও ঘুমাচ্ছে দক্ষিণেশ্বরের ভগবানের স্মৃতিটি ঘিরে পুণ্য পঞ্চবটীমূলে। 'শুদ্ধাভক্তি' 'রাগভক্তি' লাভ করতে হয়তো মানুষ আজও পারেনি, কিন্তু 'কথামৃতে' প্রীতি তার হয়েছে! অনাগত যুগের পরে সেই প্রীতি এ-যুগের ভগবানের প্রথম এবং শেষ আশীর্বাদ।

শ্রীমন্মহাপ্রভু-কৃত শিক্ষাষ্টকের রূপায়ণ

[পূর্বানুবৃত্তি]

শ্রীমতী সুধা সেন

চতুর্থ শ্লোক :

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥ চৈঃ চঃ

—হে জগদীশ। আমি তোমার চরণে ধন কামনা করি না, জন কামনা করি না, সুন্দরী পত্নী কিংবা কবিতা অর্থাৎ কাব্য-প্রতিভা বা পাণ্ডিত্য—কিছুই কামনা করি না, আমার একমাত্র প্রার্থনা এই যে, হে ঈশ্বর, তোমাতে যেন আমার জন্মে জন্মে অহৈতুকী ভক্তি থাকে। এই পৃথিবীতে যখনই যে অবতার-পুরুষ বা মহাপুরুষ অবতীর্ণ হইয়াছেন, তখনই তাঁহার আহ্বানে ছুটিয়া আসিয়াছেন কত শত শত ধনীর দুলাল, কত পণ্ডিত—ঐশ্বর্য, পাণ্ডিত্য, জননীর বক্ষবিদারী আর্তনাদ, যুবতী-পত্নীর বিচ্ছেদ-জ্বালা—সমস্তই অগ্রাহ্য করিয়া!

মহাপ্রভুর পদতলেও সমবেত হইয়াছেন, রূপ, সনাতন, রঘুনাথ, গোপীনাথ, গদাধর, জগদানন্দ, স্বরূপ—কত ঐশ্বর্যবান্, বিত্তবান্, বিদ্বান্; ঐশ্বর্য ও আরামের মোহ তাঁহাদিগকে বাধা দিতে পারে নাই, সংসার তাহার শত বাহুডোরেও তাঁহাদের বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই!

দাস-রঘুনাথ যখন সংসারের শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া বারেবারেই পালাইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন, তখন তাঁহার জননী একমাত্র প্রাণধনটিকে হারাইবার ভয়ে স্বামীর কাছে কাঁদিয়া পড়িয়াছিলেন—'ওগো, উহাকে বাঁধিয়া রাখো, তবু ঘরে থাকুক সেই নিষ্ঠুর!' ম্লান হাসি হাসিয়া রঘুনাথের পিতা বলিয়াছিলেন, 'ইন্দ্র-সম ঐশ্বর্য, অপ্সরা-সম স্ত্রী যাহার মন বাঁধিতে পারিল না, তুচ্ছ দড়ির বাঁধনে তাহাকে কেমন করিয়া ধরিয়া রাখিবে বলো!'

* গৌরের রঘুনাথকে কেহই বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই। শ্রীসনাতন গৌড়ের বাদশাহের মন্ত্রী এবং কেবল মন্ত্রণাদাতাই নহেন, বাদশাহের বল-ভরসা, এক কথায় বাদশাহের দক্ষিণহস্ত-স্বরূপ। শ্রীরূপও রাজসরকারে বড় কর্মচারী, তাঁহাদের জমিদারির তৎকালীন আয় বার্ষিক ছাপ্পান্ন লক্ষ টাকা—এই অপার সম্মান ও ঐশ্বর্যের আরাম অবহেলায় ত্যাগ করিয়া যখন দুই ভাই প্রভুপদে আশ্রয় গ্রহণের আশায় দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া দণ্ডবৎ হইলেন, তখন প্রভু পরম সমাদরে, পরম আনন্দে দুই ভাইকে একেবারে অন্তরঙ্গ করিয়া লইলেন। কিছুকাল দুই ভাইকেই নিজের কাছে রাখিয়া ধীরে ধীরে আপন ভক্তিরত্ন-ভাণ্ডার রক্ষা করিবার উপযুক্ত আধার-রূপে গড়িয়া তুলিলেন। তারপর এক শুভক্ষণে জ্ঞান ভক্তি ও প্রেমের অমূল্য রত্নগুলি সেই আধারের নিভৃত মণিকোঠায় সযত্নে রক্ষা করিলেন। রত্নের দীপ্তিতে প্রাণ জ্যোতির্ময় হইয়া উঠিল—পূর্ণ ভাণ্ডার বক্ষে করিয়া

* উদ্বোধন-পত্রিকায় (ভাদ্র, '৬৫ ও বৈশাখ, '৬৬) প্রকাশিত লেখিকার মহাপ্রভু-চরণে রূপ-সনাতন ও রঘুনাথ দাস সম্বন্ধে প্রবন্ধদ্বয় দ্রষ্টব্য।

প্রভুর আদেশে দুই ভাই চলিয়া আসিলেন বৃন্দাবনে।

কুসুমকোমল দুগ্ধফেননিভ শুভ্র শয্যা গৃহে যাঁহাদের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিত—বৃন্দাবনের কঙ্কর-মিশ্রিত রুক্ষ ধুলায় আজ তাঁহারা শয়ন রচনা করিলেন! দীর্ঘ দিনের অভ্যস্ত আরাম ও সুখের নেশা জীর্ণ বস্ত্রের মতোই অনায়াসে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন—তথাপি হয়তো অবচেতন মনের অজ্ঞাতে কোথায় রহিয়াছে বিন্দুতম সুখ-অভ্যাসের রেশ। যমুনাতীরে অনভ্যস্ত উপাধানবিহীন বালুকা-শয্যায় সনাতনের চোখে কিছুতেই নিদ্রা আসিতেছে না—হঠাৎ এক উপায় আবিষ্কৃত হইল। কতগুলি কোমল বালুকা একত্র করিয়া উপাধানের মতো হইলে পরম স্বস্তিতে সনাতন সহজেই নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। সহসা কাহার যেন কলকণ্ঠের হাস্যধ্বনিতে নিদ্রা ভাঙিয়া গেল, চাহিয়া দেখেন—নীল বসনে হেম-তনু ঢাকা, কুঞ্চিত কালো কেশপাশে ঘিরিয়া আছে বদনকমল, অঙ্গসৌরভে আকাশ-বাতাস হইয়া উঠিয়াছে মধুময়; এক নবীনা কিশোরী বিদ্রূপের হাসিতে ওষ্ঠ অধর কুঞ্চিত করিয়া ডাকিতেছেন অদূরবর্তিনী সখীকে—'সখী দেখ্! এই দেখে যা, সংসার ত্যাগ ক'রে এসেছেন সাধু! আবার বিলাসিতা কত! বালিশ ছাড়া যাঁর ঘুম হয় না, তাঁর আবার বৃন্দাবন-বাসের সাধ কেন, তপস্যারই বা দরকার কি?'

'কে? ইনি কে, কেমন করিয়া জানিলেন, আমার বৃন্দাবন-বাসের সঙ্কল্প?

—তবে কি ইনিই 'বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীমতী?' চমকিত সনাতন ফিরিয়া চাহিয়া দেখেন, কোথায় কে? চারিদিকে শুধু গভীর রাত্রির নৈঃশব্দ্য, আকাশ অন্ধকারে ঢাকা, কেবল কালো যমুনা বহিয়া চলিয়াছে কলকল ছলছল রবে।

'জয় হোক বৃন্দাবনেশ্বরী—জয় রাধারানী—অধমের প্রতি কত তোমার করুণা!'

আরাম ও সুখনেশার ক্ষীণতম অভ্যাসটুকুও যমুনার কালো জলস্রোতে মিলাইয়া দিয়া সনাতন ডুবিয়া গেলেন ধ্যানের গভীরে।

বৃন্দাবনের বহু লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার করিলেন নিঃসম্বল দুই ভাই। গোবিন্দ, গোপীনাথ, মদন-মোহনের প্রতিষ্ঠা হইল রাজসমারোহে; ভোগরাগ উপচারেরই বা কত আয়োজন!

কিন্তু নিষ্কিঞ্চন অযাচক-বৃত্তি দুই ভাই দূরে দূরে দুই বনে সাধন-ভজন ও গ্রন্থাদি-রচনায় নিমগ্ন রহিলেন।

পিতৃহীন ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীজীবও আসিয়া বৃন্দাবনে দুই জ্যেষ্ঠতাতের স্নেহ-পক্ষচ্ছায়ায় আশ্রয় লাভ করিয়া ধন্য হইলেন। শ্রীরূপের হস্তেই তাঁহার শিক্ষাদীক্ষার ভার অর্পিত হইল। শ্রীরূপ আপন সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়া শ্রীজীবকে ক্রমেই প্রকৃত বৈষ্ণব গড়িয়া তুলিতে লাগিলেন।

মহাপ্রভু শ্রীরূপ-সনাতনকে একদিকে যেমন বৃন্দাবনের লুপ্ত তীর্থ উদ্ধারের ভার দিয়াছিলেন, অপরদিকে তেমনই মানুষের হৃদয়-গুহার অন্ধকারাবৃত সম্পদ্ উদ্ধারের ভারও দিয়াছিলেন। সুযোগ্য দুই ভাই বহু অমূল্য গ্রন্থ-রচনার মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণ-লীলামৃতের প্রকাশ করিতে লাগিলেন, ভক্ত বিদগ্ধ-সমাজ সেই সমস্ত গ্রন্থের সৌন্দর্যে ও মাধুর্যে মুগ্ধ হইলেন।

পাণ্ডিত্যের খনি দুই ভাই, কিন্তু বাহিরে তাহার বিন্দুমাত্র প্রকাশও নাই। পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন তাঁহাদের কাছে ততখানিই, যতখানি কৃষ্ণলীলা-রচনার কাজে লাগে। অন্যথা পাণ্ডিত্যের কোন মূল্যই তাঁহাদের কাছে নাই।

বৃন্দাবনে এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত আসিয়াছেন, সঙ্গে অশ্ব, হস্তী, বাদ্যভাণ্ড-কোলাহল, বিজয়-গর্বের নিশানা। শ্রীজীব যমুনায় স্নান করিতেছিলেন, হঠাৎ তুমুল কোলাহলের ধ্বনি শুনিয়া কিছুটা কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া যমুনার তীরে উঠিয়া আসিলেন।

সরব হুঙ্কারে দিগ্বিজয়ী চলিয়াছেন পথ বাহিয়া—কণ্ঠে বিলম্বিত জয়মাল্য, হস্তে জয়পত্র। শুনিয়াছিলেন শ্রীরূপ-সনাতন অপরাজেয় পরম পণ্ডিত, তাঁহাদের পরাজিত করা দিগ্বিজয়ীর সাধ্যের বাহিরে। হয়তো বা কিছুটা ভীতি, কিছুটা বা কৌতূহলের বশবর্তী হইয়াই দিগ্বিজয়ী শ্রীরূপ-সনাতনের কাছে গিয়া বিচারে তাঁহাদের আহ্বান করিয়াছিলেন। এখন হাস্য সংবরণ করাই কঠিন হইয়া উঠিতেছে—এই কি এত নাম, এত খ্যাতি? বিচার করা দূরে থাকুক, দিগ্বিজয়ীর আহ্বান শোনামাত্র ভয়ে পরাজয় স্বীকার করিলেন রূপ-সনাতন—তথাকথিত অপরাজেয় পণ্ডিতদ্বয়!

শ্রীজীব বিস্মিত হইলেন, তাঁহার গুরু—তাঁহার পরমজ্ঞানী জ্যেষ্ঠতাতদ্বয় সত্যই কি পরাজিত হইয়াছেন এই দাম্ভিক পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তির কাছে? শ্রীজীবের ললাটের রেখায় জাগিল কুঞ্চন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মনে মনে বুঝিলেন—কেন শ্রীরূপ-সনাতনের স্বেচ্ছাকৃত এই পরাজয়-স্বীকার!

তথাপি মন অশান্ত হইয়া উঠিল—'আমি তো তাঁহাদের পুত্র—শিষ্য! অধম হইতে পারি, কিন্তু আমি থাকিতে তাঁহাদের অসম্মান—তাহা কেমন করিয়া হইবে? গুরুনিন্দা শ্রবণ করিয়াও যদি তাহার প্রতিকার না করিলাম, তবে বৃথাই আমার শিষ্যত্বাভিমান!'

শ্রীজীব অগ্রসর হইলেন—দিগ্বিজয়ীকে বচারে আহ্বান করিয়া বলিলেন, 'আপনি মানীর মান এবং পাণ্ডিত্যের মর্যাদা দিতে জানেন না বলিয়াই গর্বিত হইয়াছেন। আমি শ্রীরূপ-সনাতনের এক অধম অক্ষম শিষ্য, তথাপি আপনাকে বিচারে আমি আহ্বান করিতেছি, আমাকে পূর্বে পরাজিত করুন, তারপর শ্রীরূপ-সনাতনকে পরাজিত করিবার স্বপ্ন দেখিবেন।'

তরুণের ঔদ্ধত্যে ও সাহস দেখিয়া দিগ্বিজয়ী একটু বিরক্ত এবং একটু বিস্মিত হইলেন। অবজ্ঞামিশ্রিত হাস্যে বলিলেন, 'এস বালক! তোমার তর্কের নেশা চূর্ণ করিয়া দিই।'

কিন্তু চূর্ণ হইল দিগ্বিজয়ীর অহঙ্কার—তাঁহার অভ্রংলিহ দাম্ভিকতা ধূলিসাৎ করিতে শ্রীজীবের অধিক ক্ষণ লাগিল না। জয়পত্র, জয়মাল্য ও জয়ের সমস্ত উপঢৌকন শ্রীজীবের করে সমর্পণ করিয়া দিগ্বিজয়ী বৃন্দাবন ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন। শুধুমাত্র জয়পত্রখানি লইয়া শ্রীজীব চলিয়া গেলেন যমুনার ঘাটে—গুরুর গৌরব রক্ষা করিতে পারিয়াছেন, ইহাই তাঁহার পুরস্কার, আপন গৌরবের বিন্দুমাত্র স্পৃহাও নাই মনে।

কমণ্ডলুতে শ্রীরূপের জন্য পূজার জল ভরিয়া লইয়া শ্রীজীব ভজন-কুটিরের দিকে দ্রুত চলিয়া গেলেন।

'পূজার সময় অতিক্রান্তপ্রায়; জীবের আজ এত বিলম্ব কেন?' রূপ গোস্বামী একটু বা অধীর চিত্তেই জীবের প্রতীক্ষা করিতেছেন—কমণ্ডলুহস্তে এতক্ষণে জীব প্রবেশ করিলেন। শ্রীরূপ বিলম্বের কারণ জানিতে চাহিলে গুরুর পাদবন্দনা করিয়া জীব বিলম্বের কারণ জানাইলেন। তিনি যে দাম্ভিক পণ্ডিতের মিথ্যা অহঙ্কার নাশ করিয়া গুরুর সম্মান রক্ষা করিতে পারিয়াছেন—সে আনন্দের সামান্য প্রকাশ হইয়া পড়িল তাঁহার বাক্যে।

নির্বাক্ শ্রীরূপ কিছুক্ষণ জীবের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, ধীরে ধীরে রুক্ষ কঠোর হইয়া উঠিল ললাটের রেখা। কঠিন স্বরে বলিলেন—'বৃন্দাবনে বাস করিতে আসিয়া আজও যাহার অহঙ্কার-অভিমান ত্যাগ হয় নাই, বৃন্দাবনে তাহার স্থান নাই। যাও—বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া পুনরায় সংসারেই ফিরিয়া যাও, আজ হইতে আমি আর তোমার মুখ দর্শন করিব না।'

কত মিনতি, কত অশ্রু ঝরিয়া পড়িল বজ্রকঠোর গুরুর পদতলে, কিন্তু পাষাণে রেখা পড়িল না—শ্রীরূপ অবিচল!

ধীরে ধীরে শ্রীরূপের সম্মুখ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন—পিতৃহীন তরুণ জীব—অপরিমেয় বেদনার ভারে মুহ্যমান—জ্যেষ্ঠতাত একবার ফিরিয়া ডাকিলেন না।

বৃন্দাবনের এক নিভৃত বনে গিয়া জীব ধূলিশয্যায় পড়িয়া রহিলেন। দিনের পর দিন—মাসের পর মাস কাটিতে লাগিল, অর্ধাশনে-অনশনে দেহ ক্রমেই ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমালাভের আশাও!

পিতৃহীন তরুণ জীবের সুকুমার জীবনটি যাঁহাদের নিশ্চিন্ত সুখময় আশ্রয়ে ধীরে ধীরে বিকশিত হইয়া উঠিতেছিল, আজ যদি সেই পরম আশ্রয় হইতেই বিচ্যুত হইতে হইল, তবে বঞ্চিত বুভুক্ষু এই জীবন থাকিয়াই বা কি লাভ? অনাহারে জীবন-ত্যাগের জন্যই শ্রীজীব কৃতসংকল্প হইলেন।

এতদিনে শ্রীসনাতনের কাছে যখন এই খবর পৌঁছিল, তখন তিনি দ্রুত আসিয়া জীবের কাছে উপস্থিত হইলেন। অতিকষ্টে কোন মতে শীর্ণ দেহখানি টানিয়া আনিয়া জ্যেষ্ঠতাতের চরণে জীব মাথা ঠেকাইলেন। অবরুদ্ধ মৌন বেদনার দুঃসহ ভার এতদিনে আপনাকে প্রকাশ করিবার পথ পাইয়া যেন বাঁচিয়া গেল। পরমস্নেহাস্পদ জীবের দশা দেখিয়া শ্রীসনাতনের হৃদয় হাহাকার করিয়া উঠিল। কঠোর ত্যাগী সনাতন—হৃদয় পাষাণ—কিন্তু পাষাণের নীচেও কি স্নিগ্ধ শীতল নির্ঝরিণী-ধারা লুকাইয়া থাকে না, পাষাণেও কি রেখা পড়ে না, আর সে-রেখা বিদীর্ণ করিয়া দেখা দেয় না অমৃতরস-ধারা?

দুই ব্যাকুল বাহু বাড়াইয়া শ্রীসনাতন পুত্রোপম প্রাণাধিক জীবকে বক্ষে তুলিয়া লইলেন, আপন কল্যাণ দক্ষিণহস্তখানি জীবের মাথায় রাখিলেন, সর্বাঙ্গে বুলাইয়া দিলেন সেই স্নেহ-শীতল স্পর্শ!

কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল মৌন নীরবতায়—ধীরে শ্রীসনাতন উঠিয়া দাঁড়াইলেন, জীবকে আরও একটু ধৈর্য ধরিয়া প্রতীক্ষা করিবার উপদেশ দিয়া রূপের ভজন-কুটিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সসম্ভ্রমে অগ্রজের অভ্যর্থনা করিয়া শ্রীরূপ সনাতনের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। পরস্পর কুশল-প্রশ্ন-বিনিময়, গ্রন্থাদি-সম্পর্কে যথাবিধি দুই-চারিটি আলোচনা হইল। সনাতন আর উদ্বেগ চাপিতে পারিতেছেন না, তথাপি শান্ত কণ্ঠেই জিজ্ঞাসা করিলেন, 'খুব সংক্ষেপে আমাকে বলো দেখি ভাই, বৈষ্ণবের প্রধান কর্তব্য কি কি?'

শ্রীরূপ একটু বিস্মিত হইলেন—'বৈষ্ণব-শিরোমণি আজ আমাকে বৈষ্ণবের কর্তব্য জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন, তবে কি আমার কোন ত্রুটি ঘটিল?'

তথাপি অগ্রজের প্রশ্নের উত্তরে সবিনয়ে নিজ সিদ্ধান্ত জানাইলেন, 'বৈষ্ণবের প্রধান কর্তব্য তিনটি—নামে রুচি, বৈষ্ণব-সেবন ও

জীবে দয়া।' 'তাহাই যদি হয়, তবে 'জীবে' এত অ-দয়া কেন ভাই?'—আকুল মর্মবিদারী সুরে যখন শ্রীসনাতন এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন সমস্তই বুঝিলেন শ্রীরূপ! অগ্রজের কাছে মার্জনা চাহিয়া তখনই শ্রীরূপ জীবের কাছে উপস্থিত হইলেন। প্রিয়তম পুত্রাধিক ভ্রাতুষ্পুত্রের দশা দেখিয়া এবার বজ্রাদপি কঠোর হৃদয়ও কাঁদিয়া উঠিল। পদতলে লুণ্ঠিত জীবকে নিবিড় আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া শ্রীরূপ আপন কুটিরে লইয়া আসিলেন। বর্ষণসিক্ত ফুল্ল যূথীর মতোই শ্রীজীবের দেহ-মন স্নিগ্ধ সুরভিত হইয়া উঠিল।

ত্যাগ করিতে হয় ধন, জন, মান, প্রতিষ্ঠা, পাণ্ডিত্য; কিন্তু গ্রহণ করিতে হয় কি? —ভালবাসা, প্রেম? না—তাহাও নয়, ভালবাসিতেও হয় শুধু দেওয়ার জন্যই, শুধুই দেওয়া—চাওয়া নয়, পাওয়া নয়—নিষ্কাম অহৈতুকী ভালবাসা!

কেমন সেই ভালবাসা—মহাপ্রভু তাহা শ্রীরূপ-সনাতনকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, হৃদয়-মন পূর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন সেই প্রেম-পরশমণির ছোঁয়ায়, শ্রীরূপ-সনাতন অহৈতুকী ভালবাসার সাধনাই করিতেছিলেন বৃন্দাবনে।

শ্রীসনাতনের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ মদনমোহন জীবন্ত জাগ্রত এক ভুবনমোহন বালক যেন, তাঁহার মান-অভিমান আদর-আবদার সমস্তই সনাতনকে সহিতে হয়। সাধিয়া আসিয়াছে সত্য, তাই বলিয়া সেবা না করিয়া তো আর পারা যায় না?

সনাতনের এক শিষ্যের উপরে মদন-মোহনের সেবার ভার। একদিন মদনমোহনের পুষ্প-শৃঙ্গার সমাপন করিয়া দীপ-ধূপ আরতির পরে শিষ্যটি চামর ব্যজন করিতেছেন, বিচিত্র পুষ্প মাল্য আভরণে সজ্জিত মদনমোহনের আজ একি নয়ন-ভোলানো রূপ, অপলক নেত্রে শিষ্য বিগ্রহের দিকে চাহিয়া আছেন, কখন তাঁহার হাতে চামর থামিয়া গিয়াছে তাহা খেয়াল নাই।

পাশেই ধ্যানে বসিয়াছিলেন সনাতন। বৃন্দাবনের প্রখর মধ্যাহ্ন-জ্বালার তাপে বোধ করি মদনমোহনের অঙ্গে ঘর্ম দেখা দিল—আর সেই তাপ গিয়া লাগিল সনাতনের ভাবঘন তনুতে। চমকিত সনাতন চাহিয়া দেখেন—তন্ময় শিষ্য মদনমোহনের রূপের নেশায় বিভোর, ব্যজন কখন থামিয়া গিয়াছে, তাহা বোধ নাই।

সনাতন শিষ্যের হাত হইতে চামর টানিয়া লইলেন, কতক্ষণ ব্যজন করিয়া শ্রীঅঙ্গের তাপ শীতল করিয়া শিষ্যের দিকে ফিরিলেন। গুরু চামর টানিয়া লইতেই শিষ্যের সম্বিত ফিরিয়া ছিল—এখন গুরুর কঠোর মুখের দিকে চাহিয়াই ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিলেন। গম্ভীর কঠিন স্বরে সনাতন শিষ্যকে বলিলেন, 'যাহার নিজের আনন্দ ভগবৎসেবার কাজে বাধা জন্মায়, ঈশ্বরের সেবক হওয়ার অধিকার বা যোগ্যতা তাহার নাই। যাও, আজ হইতে তোমাকে আর বিগ্রহসেবা করিতে হইবে না।'

একে সেবা-অপরাধ, তাহাতে গুরুর বিরক্তি—শিষ্য বিভ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। আর এইরূপ অপরাধের পুনরাবৃত্তি হইবে না বলিয়া গুরুর পদতলে লুটাইয়া পড়িয়া কাতর চিত্তে ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন।

কিন্তু গুরু প্রসন্ন হইলেন না—কঠোর স্বরে বলিলেন, 'আজও তোমার আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা দূর হয় নাই, কৃষ্ণ-প্রীতির বাসনা মনে জাগে নাই। তোমার এই স্বার্থময় ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র ভালবাসায় কৃষ্ণসেবা হয় না; যাও! দূর হও আমার সম্মুখ হইতে।'

গুরুর কঠোর তিরস্কারে ও নিজের অপরাধের গুরুত্ব বুঝিয়া নতমস্তকে শিষ্য বাহির হইয়া গেলেন। কৃষ্ণসেবা ও গুরুসেবার কাজে আর তাঁহার প্রয়োজন হইবে না শুনিয়া শিষ্যের অন্তর বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। সারাদিন কাটিল অনাহারে, অশ্রুজলে সিক্ত হইল ধুলি।

ধ্যানাবসানে গভীর রাত্রিতে ক্ষণিক বিশ্রামের অবকাশে সনাতন সামান্য তন্দ্রাভিভূত হইয়াছেন মাত্র, হঠাৎ কাহার ভূষণ-শিঞ্জন-ধ্বনি যেন কানে আসিয়া প্রবেশ করিল, সনাতন জাগিয়া উঠিলেন। চাহিয়া দেখেন, অঙ্গের শুচিশুভ্র জ্যোৎস্নায় চারিদিক আলোকিত করিয়া এক তরুণী আসিয়া সনাতনের শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়াছেন—রাজরাজেশ্বরীর মতোই মহিমান্বিতা! চমক ভাঙিতেই সনাতন বুঝিলেন—শ্রীমতী রাধারানী বৃন্দাবনেশ্বরী।

কণ্ঠে করুণা, কিছুটা বা বেদনা! শ্রীমতী বলিলেন, 'হ্যাঁ গা গোঁসাই! ছোট একটি বালক, না হয় একদিন সামান্য একটি ভুলই করিয়াছে, আর ভুলই বা কি, ভুবনমোহন রূপ দেখিয়া সে ভুলিয়াছিল, তা কাহার নয়নই বা ঐরূপে না ভোলে, তাহার জন্য কি এত কঠোর হইতে হয়? আহা রে! সারাদিন গেল, রাত্রি গেল, না খাইয়া কাঁদিতেছে, তোমার কি একটু দয়াও হয় না?'

সনাতন ততক্ষণে প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন, গম্ভীর গুরু-গৌরবে বলিয়া উঠিলেন, 'ঠাকুরানী! শত হইলেও গোয়ালার কন্যা আপনি, গোয়ালিনী। দধি-দুগ্ধের ব্যবসা করিতে জানেন, তাহাই করুন গিয়া। শিষ্যকে কি করিয়া শাসন করিতে হয়, আপনি তাহার জানেন কি? ঐ ভারটুকু অনুগ্রহ করিয়া আমার উপরই ছাড়িয়া দিন।'

শ্রীমতী লজ্জিতা হইলেন, রাগও হইল মনে মনে 'শিষ্য শাসন করিতে হয়—কর না গিয়া বাপু? তা আবার মানুষের জাত তোলা কেন?'

শ্রীমতীর চরণের নূপুর একটু যেন বেসুরা বাজিতে বাজিতেই বিলীয়মান হইয়া গেল।

সনাতন মৃদু হাসিয়া উঠিয়া গেলেন অনুতপ্ত শিষ্যের কাছে—'শাসন করা তারেই সাজে সোহাগ করে যে'—শিষ্যের মাথাটি আপন ক্রোড়ে সস্নেহে টানিয়া লইলেন, ক্ষমার মাধুর্যে ও আনন্দে শিষ্য অভিষিক্ত হইয়া গেলেন!

গুরুর কৃপা ও অহৈতুকী ভালবাসার মধ্যে আপনাকে ঢালিয়া দিয়া ক্রমে শিষ্যও নিষ্কাম শুদ্ধাভক্তির অধিকারী হইয়া উঠিলেন—কৃষ্ণসেবার আর কোন বাধা রহিল না।

(ক্রমশঃ)

ভারত কি তমসাচ্ছন্ন দেশ?

স্বামী বিবেকানন্দ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডেট্রয়েট শহরে একটি ভাষণের বিবরণী ১৮৯৪ খৃঃ ৫ই এপ্রিল তারিখের 'বোস্টন ইভনিং ট্রান্সক্রিপ্ট' নামক সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় মন্তব্যসহ নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে:

সম্প্রতি স্বামী বিবেকানন্দ ডেট্রয়েট শহরে আসিয়া বিপুল প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন। সর্বশ্রেণীর নরনারী তাঁহার ভাষণ শুনিতে আসিত, বিশেষতঃ ধর্মযাজকগণ তাঁহার অভিমতের অকাট্য যুক্তিজালদ্বারা অতিশয় আকৃষ্ট হইতেন। শ্রোতৃবর্গের সংখ্যা এত বেশি হইয়াছিল যে, একমাত্র স্থানীয় নাট্যশালাটিতেই তাহাদের স্থান সঙ্কুলান হইত। তিনি অতি বিশুদ্ধ ইংরেজী বলেন, দেখিতে যেমন সুপুরুষ, তাঁহার স্বভাবও তেমনই সুন্দর। ডেট্রয়েট শহরের সংবাদপত্রগুলি তাঁহার বক্তৃতার বিবরণী প্রকাশ করিবার জন্য যথেষ্ট স্থান দিয়াছে।

'ডেট্রয়েট ইভনিং নিউজ' পত্রিকা একদিনের সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলেন: বেশির ভাগ লোকই মনে করিবেন যে, গত সন্ধ্যায় নাট্যশালায় প্রদত্ত বক্তৃতায় স্বামী বিবেকানন্দ এই নগরে প্রদত্ত অন্য বক্তৃতা অপেক্ষা অনেক অধিক দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি যথার্থ এবং বিকৃত খ্রীষ্টধর্মের মধ্যে পার্থক্য প্রদর্শন করিয়া তাঁহার শ্রোতৃবর্গকে স্পষ্টভাষায় জানাইয়া দেন, কোন্ অর্থে তিনি নিজেকে একজন খ্রীষ্টান বলিয়া মনে করেন এবং কোন্ অর্থে করেন না। তিনি যথার্থ ও বিকৃত হিন্দুধর্মের মধ্যেও পার্থক্য প্রদর্শন করিয়া বুঝাইয়া দেন। প্রকৃত অর্থেই তিনি নিজেকে হিন্দু মনে করেন। তিনি সর্বপ্রকার সমালোচনার সীমা অতিক্রম করিয়াই বলিতে পারিয়াছিলেন:

আমরা যীশুর প্রকৃত বার্তাবহদের চাই। তাঁহারা দলে দলে হাজারে হাজারে ভারতে আসুন, যীশুর মহৎ জীবন আমাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরুন এবং আমাদের সমাজের গভীরে তাহার ভাব অনুস্যূত করিতে সহায়তা করুন। যীশুকে তাঁহারা ভারতের প্রত্যেক গ্রামে, প্রতি প্রান্তে প্রচার করুন।

যখন কোন ব্যক্তি মুখ্য বিষয়ে অতখানি নিশ্চয়, তখন তিনি আর যাহা বলুন না কেন, তাহা গৌণ বিষয়ের বিশদ উল্লেখমাত্র। যাঁহারা এতদিন যাবৎ গ্রীনল্যাণ্ডের তুষারাচ্ছন্ন পার্বত্যদেশ এবং ভারতের প্রবালাকীর্ণ সমুদ্রতটে আধ্যাত্মিক বিষয় তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের উদ্দেশে আচার ও জীবন-নীতি ব্যাপারে একজন পৌত্তলিক ধর্মযাজকের এই উপদেশ-বর্ষণ এক দারুণ অপমানকর দৃশ্যের অবতারণা করিয়াছিল। অপমান-বোধই বিশ্বের অধিকাংশ সংশোধনের পক্ষে অপরিহার্য। খ্রীষ্টধর্মের প্রবর্তকের মহিমান্বিত জীবন-সম্পর্কে আলোচনার পর সুদূর বিদেশী জাতিগুলির সম্মুখে যাঁহারা খ্রীষ্ট-জীবনের প্রতিনিধিত্ব করেন বলিয়া নিজেদের ঘোষণা করেন, তাঁহাদের নিকট ঐরূপ উপদেশ দিবার অধিকার তাঁহার জন্মিয়াছিল। এবং তাঁহার উপদেশ অনেকাংশে সেই নাজারেথবাসী যীশুখ্রীষ্টের উক্তির মতোই শুনাইয়াছিল:

'তোমার অর্থপেটিকায় স্বর্ণ-রৌপ্য বা তাম্র

সংগ্রহ করিও না, পরিধানের নিমিত্ত পোষাক ও জুতার সংখ্যা বৃদ্ধি করিও না, এমন কি নিজের নিমিত্ত একখানি ভ্রমণ-যষ্টিও সংগ্রহ করিও না ; কারণ প্রত্যেক শ্রমিকই তাহার আহার্য পাইবার অধিকারী।'

যাঁহারা বিবেকানন্দের আবির্ভাবের পূর্বেই ভারতীয় ধর্ম-সাহিত্যের সহিত কিছুমাত্র পরিচিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা প্রতীচ্যদেশীয়-গণের সকল প্রকার কর্মানুষ্ঠানের মধ্যে এমন কি ধর্মাচরণের ক্ষেত্রেও ব্যবসায়ের মনোভাব—যাহাকে বিবেকানন্দ 'দোকানদারি মনোবৃত্তি' আখ্যা দিয়াছেন, তাহার প্রতি প্রাচ্যদেশীয়গণের ঘৃণার কারণ বুঝিতে পারিবেন।

বিষয়টি ধর্মপ্রচারকদের পক্ষে আদৌ উপেক্ষণীয় নয়। যাঁহারা পৌত্তলিক প্রাচ্য জগৎকে ধর্মান্তরিত করিতে চান, পার্থিব জগতের সাম্রাজ্য এবং বৈভবকে ঘৃণাসহকারে পরিহারপূর্বক তাঁহাদিগকে নিজ-প্রচারিত ধর্মানুযায়ী জীবন যাপন করিতে হইবে।

ভ্রাতা বিবেকানন্দ নৈতিক দিক হইতে ভারতকে সর্বাপেক্ষা উন্নত দেশ বলিয়া মনে করেন। পরাধীনতা সত্ত্বেও তাহার আধ্যাত্মিকতা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। ডেট্রয়েটে প্রদত্ত তাঁহার বক্তৃতা-সম্পর্কে প্রকাশিত কয়েকটি বিবরণীর অংশবিশেষ এখানে প্রদত্ত হইল :

নিরহঙ্কারভাবই পুণ্য এবং সকল প্রকার 'অহং'ই পাপ—এই মর্মে ভারতীয়দের যে বিশ্বাস বর্তমান, এইখানে তাহার উল্লেখ করিয়া বক্তা তাঁহার আলোচনার মূল নৈতিক সুরটি ধ্বনিত করেন। গত সন্ধ্যার বক্তৃতায় উক্ত ভাবেরই প্রাধান্য অনুভূত হয় এবং ইহাকেই তাঁহার বক্তৃতার সারমর্ম বলা যাইতে পারে।

হিন্দু বলেন, নিজের জন্য গৃহ-নির্মাণ করা স্বার্থপরতার কাজ, সেইজন্য তিনি উহা ঈশ্বরের পূজা ও অতিথিসেবার উদ্দেশ্যে নির্মাণ করেন। নিজের উদর-পূর্তির জন্য আহার্য প্রস্তুত করা স্বার্থপরতার কাজ, সুতরাং দরিদ্র-নারায়ণ-সেবার জন্য আহার্য প্রস্তুত করা হয়। ক্ষুধার্ত অতিথির আবেদন পূর্ণ করিবার পর হিন্দু স্বয়ং অন্নগ্রহণে প্রবৃত্ত হন। এই মনোভাব দেশের সর্বত্র প্রকট। যে-কোন ব্যক্তি গৃহস্থের নিকট আসিয়া আহার ও আশ্রয় প্রার্থনা করিতে পারে এবং সকল গৃহের দ্বারই তাহার জন্য উন্মুক্ত থাকে।

জাতিভেদ-প্রথার সহিত ধর্মের কোনও সম্পর্ক নাই। কোন ব্যক্তি তাহার বৃত্তি প্রাপ্ত হয়—উত্তরাধিকারসূত্রে ; সূত্রধার সূত্রধার-রূপেই জন্মগ্রহণ করে, স্বর্ণকার স্বর্ণকার-রূপে, শ্রমিক শ্রমিক-রূপেই এবং পুরোহিত পুরোহিত-রূপেই।

দুই প্রকার দান বিশেষ প্রশংসার্হ, বিদ্যাদান আর প্রাণদান। বিদ্যাদানের স্থান সর্বাগ্রে। অপরের জীবন রক্ষা করা উত্তম কর্ম, বিদ্যাদান অধিকতর উত্তম কর্ম। অর্থের বিনিময়ে শিক্ষাদান পাপ, পণ্যের ন্যায় অর্থের বিনিময়ে যিনি বিদ্যা বিক্রয় করেন, তিনি নিন্দার্হ। সরকার মধ্যে মধ্যে এই সকল শিক্ষাদাতাদের সাহায্য প্রদান করেন এবং তাহার নৈতিক ফল তথাকথিত কোন কোন সুসভ্য দেশে যে ব্যবস্থা বর্তমান, তাহা অপেক্ষা উত্তম।

বক্তা এ-দেশের সর্বত্র সভ্যতার সংজ্ঞা-সম্পর্কে প্রশ্ন করিয়াছেন। এ-প্রশ্ন তিনি অন্যান্য দেশেও করিয়াছেন। অনেক সময়ই উত্তরের মর্ম হইত : 'আমরা যাহা, তাহাই সভ্যতা।' তিনি উক্ত সংজ্ঞা মানিয়া লইতে পারেন নাই।

তাঁহার মতে : কোন জাতি জলে স্থলে

এমন কি সমস্ত পঞ্চভূতের উপর আধিপত্য লাভ করিতে পারে এবং জীবনের হিত-সংক্রান্ত সমস্যাগুলির আপাত পূর্ণ বিকাশ করিতে পারে, তথাপি ইহা ব্যক্তি-জীবনে বাস্তব হইয়া উঠে না। সভ্যতার পরাকাষ্ঠা তাহারই মধ্যে পরিস্ফুট, যে আপন আত্মাকে জয় করিতে পারিয়াছে। জগতে অন্য দেশ অপেক্ষা ভারত-ভূমিতেই এইরূপ অবস্থা অধিক দৃষ্ট হয়—কারণ সেখানে ঐহিক বিষয় আধ্যাত্মিকতার নিয়ন্ত্রণাধীন। ভারতীয়গণ প্রাণসত্তায় উজ্জীবিত সকল বস্তুর মধ্যে আত্মার বিকাশ দর্শন করেন, এবং প্রকৃতি-সম্বন্ধে জ্ঞান তাঁহারা এই দৃষ্টিকোণ হইতেই অর্জন করেন। সুতরাং অদম্য ধৈর্যের সহিত কঠিনতম দুর্ভাগ্য সহ্য করিবার মতো ধীর প্রকৃতির এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য দেশবাসী অপেক্ষা অধিকতর শক্তি ও জ্ঞান সম্পর্কে পূর্ণ সচেতনতা ভারতে রহিয়াছে। সেইজন্য সেখানে এমন একটি দেশ ও জাতি রহিয়াছে, যাহার নিরবচ্ছিন্ন এই জীবনধারা দূরদূরান্তের চিন্তানায়কদের আকৃষ্ট করিয়াছে এবং তাহাদের স্কন্ধ হইতে পীড়াদায়ক জাগতিক বোঝা লাঘব করিতে আহ্বান জানাইয়াছে।

এই বক্তৃতার উদ্বোধনী মুখবন্ধে বলা হয় যে, বক্তাকে বহু প্রশ্ন করা হইয়াছে, তন্মধ্যে কতগুলির উত্তর তিনি ব্যক্তিগতভাবে দিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু তিনটি প্রশ্নের উত্তর তিনি বক্তৃতা-মঞ্চ হইতেই দিলেন। এই তিনটিকে নির্বাচন করিবার কারণ ক্রমশঃ জানা যাইবে। এই তিনটি প্রশ্ন হইল : (১) ভারতবাসীরা কি তাহাদের সন্তানদের কুমীরের মুখে সমর্পণ করে ? (২) তাহারা কি নিজেদের জগন্নাথের রথচক্রের নিম্নে নিক্ষেপ করে ? (৩) তাহারা কি বিধবাদের মৃত স্বামীর সহিত একত্র অগ্নিদগ্ধ করিয়া হত্যা করে ?

প্রথম প্রশ্নের উত্তর তিনি সেই সুরে দিলেন, যে-সুরে একজন আমেরিকাবাসী বিদেশে ভ্রমণকালে—নিউইয়র্কের রাস্তায় রাস্তায় রেডইণ্ডিয়ানরা যথেচ্ছ ঘুরিয়া বেড়ায় কিনা, অথবা ইওরোপে আজও অনেকে বিশ্বাস করেন—এইরূপ উপকথা-সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দেন! স্বামী বিবেকানন্দের নিকট উক্ত প্রথম প্রশ্নটি অত্যন্ত হাস্যকর এবং উত্তর-দানের অযোগ্য বলিয়া মনে হইয়াছে।

যখন কতিপয় সদাশয় অথচ অজ্ঞ ব্যক্তির নিকট হইতে তিনি এই প্রশ্নের সম্মুখীন হন, 'কি কারণে কেবলমাত্র বালিকাদের কুমীরের মুখে সমর্পণ করা হয় ?' তিনি বিদ্রূপ করিয়া উত্তর দেন, 'বোধহয় তাহারা অধিকতর নরম ও কোমল বলিয়া সেই তমসাচ্ছন্ন দেশের জলাশয়সমূহের অধিবাসিগণ দন্তদ্বারা সহজেই তাহাদের চর্বণ করিতে পারিবে বলিয়া এইরূপ করা হয়।'

জগন্নাথ-সম্পর্কিত গল্প-সম্বন্ধে বক্তা জগন্নাথ-পুরীর পবিত্র নগরের প্রাচীন রথযাত্রা-উৎসব বর্ণনা করিয়া এই মন্তব্য করেন যে, সম্ভবতঃ রথের রজ্জু ধরিবার ও টানিবার আগ্রহাতিশয্যে কিছুসংখ্যক পুণ্যকামী ব্যক্তি পা পিছলাইয়া পড়িয়া গিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকিবে। এই ধরনের কিছু দুর্ঘটনা অতিরঞ্জিত হইয়া এমন বিকৃত আকার ধারণ করিয়াছে যে, অন্যান্য দেশের সহৃদয় ব্যক্তিগণ তাহা শ্রবণ করিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠেন।

বিধবাদের অগ্নিদগ্ধ করিয়া হত্যা করিবার কথা বিবেকানন্দ অস্বীকার করেন, এবং সত্য তথ্য উদ্‌ঘাটিত করিয়া বলেন, হিন্দু বিধবাগণ অগ্নিতে আত্মাহুতি দিতেন স্বেচ্ছায়।

যে অল্পসংখ্যক ক্ষেত্রে এই ঘটনা ঘটিয়াছে, সেখানে মহাপ্রাণ ব্যক্তিরা, যাহারা সর্বকালে

আত্মহত্যার বিরোধী, তাঁহারা বিধবাদের উক্ত কার্য হইতে বিরত হইবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছেন; এবং যে-সকল ক্ষেত্রে সাধ্বী বিধবাগণ লোকান্তরে স্বামীর সহগামী হইবার জন্য ঐকান্তিক আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাদেরই এই অগ্নিপরীক্ষা দিতে অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ যদি তাঁহারা হস্ত-দুইখানি অগ্নিতে সমর্পণ করিয়া দগ্ধ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের ঐকান্তিক বাসনা-পূরণে আর কোন বাধা দেওয়া হইত না। কিন্তু ভারতই একমাত্র দেশ নহে, যেখানে নারী প্রেমবশতঃ স্বামীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তাঁহার অনুগমন করিয়া অমরলোকে গমন করিয়াছেন। এরূপ ক্ষেত্রে পৃথিবীর সর্বদেশেই কিছু লোকে প্রাণবিসর্জন দিয়াছে। যে-কোন দেশেই এই ধরনের আবেগ বিরল, এবং ভারতবর্ষেও ইহা অন্যান্য দেশের মতোই নিত্যকার সাধারণ ব্যাপার নয়।

বক্তা পুনরাবৃত্তি করিয়া বলেন, ভারতীয়েরা নারীগণকে অগ্নিদগ্ধ করিয়া হত্যা করেন না, এবং তাঁহারা কখনও ডাইনী হত্যা করেন নাই।

বক্তার শেষোক্ত শ্লেষটি অতি তীব্র। এই হিন্দু সন্ন্যাসীর দার্শনিক মতবাদ বিশ্লেষণের কোন প্রয়োজন এখানে নাই, শুধু এইটুকু বলিলেই হইবে যে, ইহার সাধারণ ভিত্তি হইল—অনন্তের উপলব্ধির জন্য আত্মার যে প্রয়াস তাহারই উপর। একজন পণ্ডিত হিন্দু এ-বৎসর লাওয়েল ইন্স্টিটিউটের পাঠক্রমের উদ্বোধন করেন। শ্রীযুক্ত মজুমদার যাহার সূচনা করিয়াছিলেন, ভ্রাতা বিবেকানন্দ যোগ্যতার সহিত তাহারই উপসংহার করিলেন।

এই নূতন পর্যটকের ব্যক্তিত্ব অধিক আকর্ষণীয়, যদিও হিন্দু দার্শনিক মতানুযায়ী ব্যক্তিত্বকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত নহে। ধর্ম-মহাসম্মেলনের উদ্যোক্তাগণ বিবেকানন্দকে কার্যসূচীর শেষের দিকে রাখিতেন, যাহাতে শ্রোতাগণ তাঁহার ভাষণ শুনিবার জন্য অধিবেশনের শেষ পর্যন্ত বসিয়া থাকেন। বিশেষ করিয়া কোন গরম দিনে যখন কোন বক্তা দীর্ঘ নীরস বক্তৃতা আরম্ভ করিতেন, এবং শ্রোতাগণ দলে দলে সভাস্থল পরিত্যাগ করিয়া যাইতেন, তখন সম্মেলনের সভাপতি উঠিয়া ঘোষণা করিয়া দিতেন, সমাপ্তিসূচক স্বস্তিবাচনের পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিবেন। তখনই শ্রোতারা শান্ত হইত। চার সহস্র নরনারী অসহ্য গরমে পাখা ব্যজন করিতে করিতে স্মিতমুখে ও সাগ্রহে বিবেকানন্দের পনেরো মিনিট বক্তৃতা শুনিবার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপর বক্তাদের বক্তৃতার সময় অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতেন। সভাপতি সর্বাপেক্ষা উত্তম বস্তুটিকে শেষে পরিবেষণ করিবার পুরাতন রীতি-সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ছিলেন।*

* 'Is India a benighted Country ?' শীর্ষক নিবন্ধ : অধ্যাপিকা শ্রীমতী সান্ত্বনা দাশগুপ্ত কর্তৃক অনূদিত।
দ্রষ্টব্য : The Complete Works of Swami Vivekananda—Vol. IV, Pp. 194—198.

সমালোচনা

The Cultural of Heritage of India—Vol. II—Itihasas, Puranas, Dharma and other Sastras. Introduction by Dr. C. P. Ramaswami Aiyar, Published by Swami Nityaswarupananda, Secretary, The Ramakrishna Mission Institute of Culture Gol Park, Calcutta 29. Pp 738 + 28, price Rs. 35/-.

শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকীর অব্যবহিত পরেই ১৯৩৭ খৃঃ এই গ্রন্থাবলী (ভারত-কৃষ্টির উত্তরাধিকার) তিনখণ্ডে প্রকাশিত হয়। বর্তমানে উহারই পরিবর্ধিত ও সংশোধিত সংস্করণ বাহির হইতেছে। ইতিপূর্বে প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড বাহির হইয়াছে। প্রতিটি খণ্ড স্বয়ংসম্পূর্ণ। বর্তমান খণ্ডে ইতিহাস, পুরাণ, ধর্মশাস্ত্র এবং অন্যান্য শাস্ত্র আলোচিত হইয়াছে। প্রতিটি অধ্যায় বিশেষজ্ঞ দ্বারা লিখিত। এই খণ্ড পাঁচটি ভাগে বিভক্ত।

প্রথম ভাগে—রামায়ণ ও মহাভারত দুই মহাকাব্য। আটটি সুনির্বাচিত প্রবন্ধে ইহাদের ইতিহাস, বৈশিষ্ট্য, কৃষ্টি, ধর্ম, দর্শন, ভারতীয় জীবনে ও সাহিত্যে যুগান্তকারী প্রভাব, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রভাব আলোচিত। দ্বিতীয় ভাগে ছয়টি প্রবন্ধে ভগবদ্গীতা সম্বন্ধে আলোচনা: বিভিন্ন প্রবন্ধে গীতোক্ত ধর্ম, গীতার সমন্বয়-বাণী, শিক্ষা, ইতিহাস, প্রাচীন টীকা, পরবর্তী কালে গীতার অনুকরণে রচিত সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে।

তৃতীয় ভাগে পুরাণ ও উপপুরাণ সম্বন্ধে চারটি প্রবন্ধ। চতুর্থভাগে ধর্মশাস্ত্র-বিষয়ে আটটি প্রবন্ধ। এইভাগে স্মৃতিশাস্ত্র মনুসংহিতা বিশেষভাবে আলোচিত। হিন্দুর দশবিধ সংস্কার, হিন্দু আইন সম্বন্ধে মূল্যবান্ প্রবন্ধ।

পঞ্চম ভাগে অর্থশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, প্রাচীন রাজনীতি, সমাজনীতি, নারীজাতির আদর্শ, সমাজসংস্কার প্রভৃতি ১৭টি প্রবন্ধে প্রতিফলিত।

প্রয়োজনীয় পুস্তকসূচী ও বিষয়সূচী সমন্বিত তথ্যমূলক এই প্রামাণ্য গ্রন্থখানি প্রত্যেক গ্রন্থাগারের বিশেষ সম্পদ্‌রূপে গৃহীত হইবে।

শ্রীরাধা-মাধব-চিন্তন (হিন্দী)—শ্রীহনুমান-প্রসাদ পোদ্দার। গীতা প্রেস, গোরখপুর হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৬৪৭ + ১৬, মূল্য টাকা ৩·৫০।

হিন্দী ভাষার মাধ্যমে ধর্মসাহিত্য-প্রচারে গীতা প্রেসের নাম সুপরিচিত। বিষয়বস্তুর স্বচ্ছতা, ভাষার পারিপাট্য ও সুন্দর মুদ্রণ এখান হইতে প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের বৈশিষ্ট্য, আলোচ্য গ্রন্থখানিতেও এই বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ আছে।

এই গ্রন্থে রসস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার হ্লাদিনী শক্তি শ্রীরাধা সম্বন্ধে বিশেষ অনুধ্যানের পরিচয় পাওয়া যায়। বিভিন্ন পরিচ্ছেদে শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধা, শ্রীরাধা-মাধব, ভাবরাজ্য, লীলারহস্য, প্রেমতত্ত্ব প্রভৃতি বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে উদ্ধৃতি-সহকারে আলোচনা করা হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে সুললিত কবিতা ও রঙিন চিত্র (১১টি) থাকায় পুস্তকটি আকর্ষণীয় হইয়াছে।

যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার শক্তি সম্বন্ধে বিশেষভাবে জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা এই গ্রন্থপাঠে লাভবান্ হইবেন, সন্দেহ নাই।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও দেশ ঃ ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ রায়। কিতাব মহল, ৪৯ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬। মূল্য টাকা ৩·৫০, পৃঃ ১৮৩।

শ্রীরামকৃষ্ণজীবন ও বাণী অবলম্বনে স্বদেশের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানচিন্তার প্রচেষ্টা-হিসাবে এই গ্রন্থটি সুধীসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। অধ্যাত্ম-জ্ঞানপিপাসুদের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণবাণীর যে তাৎপর্য রয়েছে, তা সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু স্বদেশ, সমাজ, স্বাধীনতা প্রভৃতি নিয়ে যাঁরা চিন্তা করেন, তাঁরাও যে এই যুগমানবের চিন্তাধারায় জীবনের অনেক মৌলিক সমস্যার সমাধানসূত্র খুঁজে পেতে পারেন, সে-কথাটি এমন সুগ্রথিতভাবে গ্রন্থাকারে প্রকাশ ক'রে লেখক আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে শ্রীগদাধর, শিক্ষা, স্বাধীনতা, লোকশিক্ষা ও নারীজাগরণ থেকে আরম্ভ ক'রে রামকৃষ্ণদর্শন, ব্রহ্মজ্ঞান ও সমদর্শন প্রভৃতি ষোলটি পরিচ্ছেদে লেখক শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবধারার নানা দিক নিয়ে সাবলীল ভঙ্গীতে আলোচনা করেছেন। এই আলোচনাকে অবলম্বন ক'রে ভবিষ্যতে আরও ব্যাপক ও গভীরতর মনন-সাহিত্য গড়ে উঠবে, এই আশা নিয়ে আমরা গ্রন্থটির বহুল প্রচার প্রার্থনা করি।

শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণী ব'লে যে-সব উক্তি লেখক সন্নিবেশিত করেছেন, সেগুলির আকর-গ্রন্থের নাম ও পৃষ্ঠা-সংখ্যা এ-গ্রন্থের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় ছিল। ছাপা, বাঁধাই, অঙ্গসজ্জা পরিচ্ছন্ন। —**প্রণবরঞ্জন ঘোষ**

শিক্ষা, সমাজ ও ধর্ম—স্বামী অভেদানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ ; ১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা ৬ হইতে প্রকাশিত। দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য চার টাকা। পৃষ্ঠা ২০৩।

স্বাধীনতা অর্জনের পর আমাদের সমাজ ও শিক্ষাব্যবস্থাকে পুনর্গঠন করিবার প্রয়াস—প্রয়োজন অনুপাতে তাহা পর্যাপ্ত না হইলেও—পরিদৃষ্ট হইতেছে। এই পুনর্গঠন যে পাশ্চাত্যের অনুকরণমাত্রে পর্যবসিত হওয়া কোন মতেই বাঞ্ছনীয় নয়, তাহাও দেশের বহু চিন্তাশীল ব্যক্তি অনুভব করিতেছেন। আমাদের জাতীয় সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ও তাহার হিতকারক উপাদানগুলি কি কি, কিভাবে ঐগুলি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া পাশ্চাত্যের কোন্ কোন্ বৈশিষ্ট্য আমাদের গ্রহণ করিতে হইবে, কোন্‌গুলি প্রথম হইতে সাবধানে বর্জন করিতে হইবে—এ-সম্বন্ধে একটি পরিষ্কার ধারণা শিক্ষিত ভারতবাসী মাত্রেরই থাকা আবশ্যক মনে হয়। সেই কারণে জাতীয় দৃষ্টিকোণ হইতে শিক্ষা সমাজ ও ধর্ম সম্বন্ধে চর্চা ও আলোচনা যত অধিক হয় ততই শ্রেয়ঃ।

শিক্ষা সমাজ ও ধর্মের যুগোপযোগী মূল্যায়ন আমরা স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলীতে দেখিতে পাই। যে-সকল উত্তরসূরী স্বামীজীর দৃষ্টিকোণ দিয়া স্বদেশ ও তাহার সভ্যতাকে বিচার করিতে আমাদের শিখাইয়াছেন, স্বামী অভেদানন্দ তাঁহাদের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। তাই স্বামী অভেদানন্দের শিক্ষা সমাজ ও ধর্ম সম্বন্ধীয় কয়েকটি ভাষণের সঙ্কলন ও তাহার বঙ্গানুবাদ-সংবলিত এই পুস্তকখানির দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশ সময়োপযোগী হইয়াছে। অনুবাদের ভাষা বেশ সহজ, সরল ও সাবলীল। বিস্তৃত বর্ণনাপূর্ণ সূচীপত্র ও স্থানে স্থানে প্রদত্ত আবশ্যকীয় পাদটীকা পুস্তকটির উপযোগিতা বৃদ্ধি করিয়াছে। পুস্তকটি প্রত্যেক সাধারণ গ্রন্থাগারে স্থান পাইবার যোগ্য। তবে ইহাতে অজস্র মুদ্রণ-প্রমাদ রহিয়া গিয়াছে। —'**শ্রী**'…

পদাবলী-সাহিত্য—শ্রীকালিদাস রায়। প্রকাশক : এ. মুখার্জি অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ, ২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা ১২। পৃষ্ঠা ২৪০, মূল্য ৭৲ টাকা।

বৈষ্ণব পদাবলী একদিকে যেমন বৈষ্ণব ভক্তগণের সাধনের সহায়, অপরদিকে তেমনই প্রাচীন বাংলার শ্রেষ্ঠ কাব্য-সাহিত্য ও কীর্তনের প্রধান অবলম্বন। পদাবলী একাধারে ধর্ম, সাহিত্য ও সঙ্গীত—বাংলার প্রাচীন সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

কালিদাস রায় কবি বলিয়াই সুপরিচিত, গদ্য-রচনাতেও সিদ্ধহস্ত, বিশেষ করিয়া তাঁহার সমালোচনামূলক রচনা বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে। তাঁহার পদাবলী-সাহিত্যের তত্ত্ববিচার ও রসবিশ্লেষণ পাঠকবর্গকে নূতন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিবে।

২৩টি পরিচ্ছেদে পদাবলীর বিষয়বস্তু, তত্ত্বানুশাসন, কাব্যরূপ, ব্রজবুলি, প্রকাশের ভাষা, আধ্যাত্মিকতা, কীর্তন-সঙ্গীত ও আধ্যাত্মিক ইঙ্গিত, লীলাতত্ত্ব, ভক্তিমার্গে ভিন্ন ভিন্ন স্তর, গৌরচন্দ্রিকা, রাসলীলা, নামানুরাগ, রূপানুরাগ, বাল্যলীলা, মাথুর প্রভৃতি আলোচিত।

অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'গ্রন্থ-পরিচিতি'তে লিখিয়াছেন : বৈষ্ণবরস-মাধুরীর প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম প্রীতি ও সহানুভূতি গদ্যপদ্যের দ্বিমুখী গঙ্গা-যমুনা-ধারায় প্রবাহিত হইয়া আবেগধর্মী ও বিশ্লেষণাকাঙ্ক্ষী উভয়বিধ পাঠকেরই রুচিকে তৃপ্ত করিয়াছে।

পুস্তকখানি বাংলাসাহিত্যের অনুশীলনকারী ছাত্রবৃন্দেরও কাজে লাগিবে।

বিদর্শন-যোগ—শ্রীশীলানন্দ ব্রহ্মচারী। প্রকাশক : ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী, প্রাচ্য বাণী মন্দির, ৩নং ফেডারেশন স্ট্রীট, কলিকাতা ৯। পৃষ্ঠা ২৮, মূল্য ১৲।

'বিদর্শন-যোগ' বৌদ্ধধর্মের একপ্রকার সাধন-পদ্ধতি। আলোচ্য পুস্তিকায় এই সাধন-পদ্ধতি সরলভাবে সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। বইটির ভূমিকা লিখিয়াছেন ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী।

কায় মন প্রভৃতির সূক্ষ্মতম পর্যবেক্ষণে অতীন্দ্রিয় উপলব্ধি বিদর্শন-সাধনার লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে পৌছিতে হইলে প্রয়োজন চারিত্রিক শুচিতা। বৌদ্ধ শাস্ত্রে এই জন্য শীল-সাধনার নির্দেশ আছে। ইহা দ্বারা চারিত্রিক শুচিতা লাভ হইলে সমাধি-ভাবনা বা বিশেষ ধ্যানপদ্ধতি সহায়ে চিত্তকে বিমুক্তি-রসাস্বাদনের অনুকূল করা হয়।

যাঁহারা বৌদ্ধ ধ্যানপদ্ধতি সম্বন্ধে জানিতে চান, তাঁহারা এই পুস্তিকাপাঠে উপকৃত হইবেন।

কপিল-গীতা (ভক্তিযোগ)—ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার। ৩নং অন্নদা নিয়োগী লেন, কলিকাতা-৩ হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৯৬, মূল্য ৫০ ন.প.।

শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের ২৫তম হইতে ৩৩তম অধ্যায় কপিল-গীতা নামে খ্যাত। এখানে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু জননী দেবহূতিকে পুত্র কপিল তত্ত্বজ্ঞানের কথা বলিয়াছেন। শ্রীধর স্বামী কপিল-গীতার নামকরণ করিয়াছেন 'যোগমাণিক্যমঞ্জুষা', ইহা ভগবৎপ্রাপ্তির সহজসাধ্য শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

আলোচ্য পুস্তকে মূল শ্লোক ও সরল বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইয়াছে। 'অনুধ্যান' নামে ব্যাখ্যাটি তাৎপর্যবোধক। পকেট-সাইজ বইটি সাধকগণের সঙ্গে রাখিবার উপযুক্ত।

সন্দীপন—(১৯৬২) : প্রকাশক—স্বামী বিমুক্তানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষণ-মন্দির, বেলুড় মঠ, হাওড়া। পৃষ্ঠা ১০০।

শিক্ষণ-মন্দিরের (B. T. College) বার্ষিক পত্রিকা সন্দীপনের তৃতীয় সংখ্যাটি রবীন্দ্রনাথ-স্মরণে অনেকগুলি সুচিন্তিত লেখায় সমৃদ্ধ : রবীন্দ্রজীবনশিক্ষা, রবীন্দ্র-সাহিত্যে বিশ্বমানবতা, শতাব্দীর সূর্য, শিক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র-শিক্ষাদর্শনের কয়েকটি দিক, প্রবন্ধ ও সমালোচনা-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ।

অন্যান্য প্রবন্ধের মধ্যে উল্লেখযোগ্য : ধর্মশিক্ষাপ্রসঙ্গে, স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাদর্শ, Spirit of Indian Culture, Indiscipline among students, Aristotle's scheme of Education, Education to-day.

পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজের 'শিক্ষক ও ছাত্রগণের প্রতি' শিক্ষাপ্রদ ভাষণটি এই সংখ্যার অলংকার।

নবগৌর-কথা—শ্রীতারিণী চৌধুরী। শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ সাধন আশ্রম, পোঃ নরেন্দ্রপুর, ২৪পরগনা হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৮৭, মূল্য ২৲।

পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পড়িয়াছি। কিন্তু বিজয়কৃষ্ণই যে 'নব গৌর'—এ-কথা বুঝিতে একটু সময় লাগিয়াছিল। অদ্বৈতবংশজাত বলিয়াই যে এরূপ সম্ভব হইবে, ইহা অবশ্যই ভক্তের মনোবাঞ্ছা। সেই জন্যই বলিতে হয়—এ সব গুহ্যকথা ছাপাইয়া প্রাকৃত জীবকে না জানানোই ভাল।

'শ্রীমন্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যে সাধন মাত্র সাড়ে তিনজনকে দিয়েছিলেন, সেই সাধন বিজয়কৃষ্ণ এবার বহুজনকে বিতরণ করলেন অকাতরে।' —এই প্রকার উক্তি দ্বারা লেখক কি প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন সেই পুরাতন গৌরের চেয়ে এই 'নব গৌর' আরও বড় এবং আরও শক্তিমান্? যেভাবে তিনি লিখিয়াছেন, তাহাতে তাঁর বক্তব্য প্রমাণিত হয় নাই—এইটুকুই আমরা বলিতে পারি।

আশা করি লেখক শীঘ্রই শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণের অপূর্ব জীবন ও চরিত্র—তুলনামূলক সমালোচনা বর্জন করিয়া শুধু ঘটনার মাধ্যমেই বিস্তারিত-ভাবে জানাইবেন।

Thus Spake Prophet Muhammad. —Compiled by Dr. M. Hafiz Syed, M.A., Ph.D. Published by the President Sri Ramakrishna Math, Mylapore, Madras. Pp. 102 ; price 40 nP.

হজরত মহম্মদের উপদেশগুলি সম্বন্ধে জনসাধারণের ঠিক ঠিক ধারণা নাই। আলোচ্য পুস্তিকাটিতে সকলের বোধগম্য সহজ ইংরেজীতে ইসলাম-ধর্মপ্রবর্তক মহম্মদের কতকগুলি সার্বভৌম উপদেশ লিপিবদ্ধ।

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ইসলাম-ধর্মসাহিত্যে সুপণ্ডিত ডক্টর হাফিজ মহম্মদ প্রামাণিক ইসলাম-ধর্মপুস্তকসমূহ হইতে বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে উপদেশগুলি সঙ্কলন করিয়াছিলেন। কিন্তু এই পুস্তিকা প্রকাশিত হওয়ার পূর্বেই তাঁহার দেহত্যাগ হওয়ায় তিনি এই অমূল্য সঞ্চয়নটি পুস্তকাকারে গ্রথিত দেখিয়া যাইতে পারেন নাই।

স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ সহজে বুঝিবার জন্য ঈশ্বর, বিশ্বাস, জ্ঞান, মানবসেবা, সাবধান-বাণী, পশুদিগের প্রতি কর্তব্য, প্রার্থনা প্রভৃতি বিষয়ানুক্রমে উপদেশগুলি সাজাইয়াছেন। প্রারম্ভে পয়গম্বর মহম্মদের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী সন্নিবেশিত।

এই পুস্তকপাঠে ইসলাম-ধর্মের প্রকৃত তথ্য ও মূল ভাব সম্বন্ধে একটি ধারণা হইবে এবং ইহা পারস্পরিক শুভেচ্ছা বিনিময়ে সহায়তা করিবে। প্রচ্ছদপটের ছবিতে আরবের মরুভূমির দৃশ্যপটে চন্দ্রকলার উদয় তাৎপর্যপূর্ণ।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

নূতন অধ্যক্ষ ও সহাধ্যক্ষ

গত ৪ঠা অগস্ট শনিবার শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দ মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নূতন অধ্যক্ষ (President) এবং শ্রীমৎ স্বামী যতীশ্বরানন্দ মহারাজ সহাধ্যক্ষ (Vice-President) নির্বাচিত হইয়াছেন। তাঁহারা সুস্থ থাকিয়া দীর্ঘকাল শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনকে উত্তরোত্তর কল্যাণপথে পরিচালিত করুন—শ্রীভগবানের নিকট ইহাই প্রার্থনা।

শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দ মহারাজের কর্মজীবনের সংক্ষিপ্ত বিবৃতি এই সংখ্যার প্রথমে দ্রষ্টব্য।

কার্যবিবরণী

বারাণসী ঃ রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের ৬০তম বর্ষের (১৯৬০-৬১ খৃঃ) কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। বহু বৎসর যাবৎ জাতি-ধর্মনির্বিশেষে আর্তসেবারত এই প্রাচীন শাখা-কেন্দ্রের আলোচ্য বর্ষের কর্মধারা ঃ

হাসপাতাল ঃ অন্তর্বিভাগে ৪,০৫০ রোগী ভরতি হয়, ৩,৪৯১ আরোগ্যলাভ করে। অস্ত্র-চিকিৎসা ১,২০৪। গড়ে দৈনিক ১০৩টি শয্যা (bed) রোগী দ্বারা অধিকৃত থাকে। বহির্বিভাগে (শিবালা-শাখাসহ) নূতন ৮২,৭৫৯ এবং পুরাতন ২,৪৯,৪২২ রোগী চিকিৎসিত হয়। অস্ত্রচিকিৎসা (ইঞ্জেকশনসহ) ৫১,৭২৩ ; এক্স-রে ও ক্লিনিক্যাল পরীক্ষা যথাক্রমে ১,১৮৫ ও ১৫,৩৫৮।

বৃদ্ধ ও অসমর্থদের জন্য আশ্রয়-ভবন ঃ পুরুষদের আশ্রয়ভবনে ১০ জন এবং মহিলাদের আশ্রয়-ভবনে ২২ ছিলেন। স্থান থাকিলেও অর্থাভাবে অধিকসংখ্যক প্রার্থীকে রাখার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নাই।

সাহায্য ঃ ১১০ জন অসমর্থ ও অসহায় বৃদ্ধাকে মাসিক সাহায্য-বাবদ মোট টাকা ২,৫৯৮·৭৫ দেওয়া হয়। ৪১৬ জনকে সাময়িক সাহায্য দেওয়া হয়, তাহাতে ব্যয় হয় টাকা ১,৪৪৫·৬৫। কম্বল ধুতি প্রভৃতিও বিতরণ করা হয়।

গুঁড়া দুধ হইতে দুধ তৈরী করিয়া গড়ে প্রতিদিন ৬৬২ জনকে দেওয়া হয়, বিতরিত দুগ্ধের পরিমাণ ১৫,৩৮৭ পাউণ্ড (গুঁড়া)। ১১০ জন দরিদ্র ছাত্রকে ৫৫৪ পাঠ্যপুস্তক কিনিয়া দেওয়া হয়।

অধিকাংশ সেবার কাজই ত্যাগব্রতীদের দ্বারা হইয়া থাকে, ইহাই এই সেবাশ্রমের বিশেষত্ব।

রেঙ্গুন ঃ রামকৃষ্ণ মিশন সোসাইটি সমগ্র ব্রহ্মদেশে সুপরিচিত। ১৯৬১ খৃঃ কার্যবিবরণীতে প্রকাশিত সোসাইটি-পরিচালিত বিভিন্ন কর্মের পরিচিতি ঃ

গ্রন্থাগারে ৭টি ভাষায় বিভিন্ন বিষয়ের ৩৪,১৫০ গ্রন্থ আছে, আলোচ্য বর্ষে ৩,৫০০ খানি গ্রন্থ সংযোজিত হইয়াছে এবং ৪০,০১৪ (পূর্ববর্ষে ৩৫,৯০৪) পঠনার্থে প্রদত্ত হয়। পাঠাগারে ইংরেজী, বাংলা, বর্মী, হিন্দী, গুজরাতী, তামিল, উর্দু ভাষায় ২৮ দৈনিক ও ১২৫ সাময়িক পত্রিকা রাখা হয়।

গড়ে দৈনিক পাঠক-সংখ্যার তুলনা :

বর্ষ	'৫৮	'৫৯	'৬০	'৬১
পাঠক	২২৫	৩২৫	৩৫০	৩৭৫

গীতা, বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ও মহাপুরুষ-বাণী অবলম্বনে ২৫৫টি ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়, শ্রোতৃসংখ্যা গড়ে ৩০। এতদ্ব্যতীত শিক্ষা-সংস্কৃতি-বিষয়ক আলোচনাও উল্লেখযোগ্য। ২৯টি শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র দেখানো হইয়াছিল। সপ্তাহে তিন দিন বর্মী ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বিভিন্ন ধর্মের আচার্যগণের জন্মদিনগুলি যথাযথভাবে উদ্‌যাপিত হয়।

স্বামী নিত্যবোধানন্দ

জেনেভাস্থিত রামকৃষ্ণ কেন্দ্রের পরিচালক স্বামী নিত্যবোধানন্দ সম্প্রতি দেশে ফিরিয়াছেন। সেদিন নরেন্দ্রপুরে একটি ছাত্রসভায় তিনি বলেন : ভারতীয় সংস্কৃতি এবং ভারত সম্পর্কে অজ্ঞতার ফলে ইওরোপের শুধু সাধারণ লোকই নহে, সেখানকার একশ্রেণীর শিক্ষিত লোকের মধ্যেও ভারত-বিরোধী মনোভাব দেখা যায়। সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টায় ভারতের ঐতিহ্যপূর্ণ অতীত ও বর্তমান ভাবধারা সম্বন্ধে ব্যাপকভাবে প্রচারের ব্যবস্থা না হইলে ভারতবর্ষ ইওরোপীয় জনসাধারণের এক বিরাট অংশের নিকট 'আজব দেশ' এবং ভারতীয়েরা 'আজব মানুষ'রূপে বিরাজ করিবে। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির উপর তিনি দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তি ও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, ইওরোপে ভারতীয় সংস্কৃতি এবং ভাবধারা সম্বন্ধে প্রচারের সুব্যবস্থা না থাকায় সেখানকার শিক্ষিত সমাজের কাছে ভারতবর্ষ অনগ্রসর ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন দেশরূপে পরিচিত। কেবলমাত্র ইওরোপের উচ্চশিক্ষিত চিন্তাশীল পণ্ডিতগণ ভারতের সংস্কৃতি-সম্বন্ধে সজাগ আছেন, কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা অত্যন্ত কম।

স্বামী নিত্যবোধানন্দ জানান যে, ইটালি, সুইজারল্যাণ্ড, জার্মানি, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম এবং ইংলণ্ডে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশত-বার্ষিকী অনুষ্ঠানের আয়োজন চলিতেছে।

স্বামী সিদ্ধাত্মানন্দের বক্তৃতা-সফর

কয়েকজন বন্ধুর অনুরোধক্রমে সিঙ্গাপুর রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী সিদ্ধাত্মানন্দ গত ১৯শে এপ্রিল হইতে ৩০শে জুন পর্যন্ত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ও জাপান অঞ্চলে বক্তৃতা-সফরে যান। তিনি থাইল্যাণ্ড, হংকং, জাপান, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ ও উত্তরবোর্নিও পরিদর্শন করেন। নানা প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে আয়োজিত ৪২টি সভায় তিনি ভাষণ দেন। যে-সব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁহার বক্তৃতার ব্যবস্থা হয়, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য : রামকৃষ্ণ-বেদান্ত সোসাইটি, টোকিও; রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ একাডেমি, ওসাকা; টোকিও ও ওসাকা বিশ্ববিদ্যালয়; হিন্দুমন্দির, হংকং; ফিলিপাইন বিশ্ববিদ্যালয়, ম্যানিলা।

ম্যানিলায় টেলিভিশনে 'ভারত-কৃষ্টির মূল ভাব' সম্বন্ধে তিনি ভাষণ দেন।

গত ২৬শে মে টোকিওতে স্থানীয় রামকৃষ্ণ-বেদান্ত সোসাইটির উদ্যোগে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন জাপান-স্থিত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত এবং স্বামী সিদ্ধাত্মানন্দ।

এই সফরকালে স্বামী সিদ্ধাত্মানন্দ বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠানের জন্য অনেক স্থলে স্থানীয় কমিটি গঠন করেন। টোকিও এবং জাপানের অন্যান্য স্থানে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক কৃষ্টি-সম্মেলনেও তিনি যোগদান করেন।

আমেরিকায় বেদান্ত

সেণ্ট লুই: বেদান্ত সোসাইটির বার্ষিক (এপ্রিল, ৬১—মার্চ, ৬২) কার্যবিবরণী: কেন্দ্রাধ্যক্ষ—স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ।

(১) রবিবারে ধর্মালোচনা: সোসাইটির উপাসনা-মন্দিরে সারা বৎসর রবিবারে সর্বসমেত ৪৬টি বক্তৃতা প্রদত্ত হয়। নানা ধর্মীয় ও শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান হইতে অনেকে যোগদান করেন।

(২) ধ্যান ও কথোপকথন: প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যায় স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ আগ্রহশীল ব্যক্তিগণকে ধ্যানাভ্যাস শিক্ষা দিয়াছেন এবং ভাগবত ও গীতার অধ্যাপনা করিয়াছেন। মঙ্গলবারের ক্লাসের মোট সংখ্যা ৪৬। মহাপুরুষগণের জন্মদিনে এবং বিশেষ উৎসব-দিনেও ধ্যানের ক্লাস অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

(৩) অতিরিক্ত সভা: সোসাইটির উপাসনা-মন্দিরে ছাত্রগণের জন্য দুইটি অতিরিক্ত ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। একটি সভায় স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ ২৪টি লিখিত প্রশ্নের উত্তর দেন।

(৪) উৎসব: শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, খৃষ্ট, শঙ্করাচার্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের পুণ্য জন্মদিবসে এবং অন্যান্য উৎসব-দিনে (দুর্গাপূজা, বড়দিন, গুড্ ফ্রাইডে প্রভৃতি) বিশেষ ধ্যান, ভজন, শাস্ত্রপাঠ ও জীবনী-আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মতিথি উপলক্ষে সমবেত সকলকে ভোজনে আপ্যায়িত করা হয়।

(৫) পরিদর্শকবৃন্দ: আলোচ্য বর্ষে স্বামী পবিত্রানন্দ, স্বামী শান্তস্বরূপানন্দ ও স্বামী শ্রদ্ধানন্দ সোসাইটি পরিদর্শন করেন। এতদুপলক্ষে আয়োজিত সভায় তাঁহারা বক্তৃতা দেন। এতদ্ব্যতীত এই বৎসর ৪০ জন বিশিষ্ট অতিথি সোসাইটি পরিদর্শন করেন।

(৬) নানাস্থানে প্রচার: স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ নিউইয়র্ক, বোস্টন, প্রভিডেন্স ও স্যানফ্রান্সিস্কো বেদান্তকেন্দ্রে বক্তৃতা দেন।

(৭) অবকাশ: ছয় সপ্তাহ গ্রীষ্মাবকাশের সময় সোসাইটির ক্লাস ও বক্তৃতা বন্ধ থাকে। বেদান্তানুরাগী ভক্তবৃন্দ এই সময় প্রার্থনা-সভায় যোগদান করেন।

(৮) গ্রন্থাগার: সোসাইটির সদস্যবৃন্দ ও বন্ধুবর্গ গ্রন্থাগারের পুস্তকসমূহের যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করিতেছেন।

(৯) ব্যক্তিগত আলোচনার মাধ্যমে কেন্দ্রাধ্যক্ষ এই বৎসর ১০০ জনকে সাধন-নির্দেশ দেন।

(১০) প্রচারের পরিধি-বিস্তার: ক্যানসাস শহর, মিজুরী ও ইহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বেদান্ত ও শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারার প্রচার-কার্য ধীরে ধীরে বিস্তৃতি লাভ করিতেছে।

(১১) **বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী-প্রস্তুতি:** স্বামীজীর জন্ম-শতবার্ষিকী সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠানের জন্য শক্তিশালী কমিটি গঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও সাধারণ গ্রন্থাগারসমূহে স্বামী নিখিলানন্দ-সঙ্কলিত 'Vivekananda: The Yogas and Other Works' গ্রন্থ দুইশত কপি উপহার দেওয়া হইবে। কোন্ কোন্ প্রতিষ্ঠানে এই গ্রন্থ নাই তাহা জানিবার জন্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও গ্রন্থাগারে লেখা হইয়াছে। গত জানুআরি, '৬২ হইতে বই দেওয়া আরম্ভ হইয়াছে। মার্চ মাস পর্যন্ত ৫৫টি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ এবং ১৬টি গ্রন্থাগার এই বই পাইয়াছে।

'স্বামী বিবেকানন্দ' সম্বন্ধে কলেজের ছাত্রদের মধ্যে রচনা-প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ রচনার জন্য ১০০ ডলার পুরস্কার দেওয়া হইবে।

বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী-প্রস্তুতি

মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহে অনুষ্ঠিত একটি প্রেস-কনফারেন্সে বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী কমিটির সাধারণ সম্পাদক স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ জানান: ভারতের তথা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান হইতে আগামী ১৯৬৩ খৃঃ স্বামীজীর শতবার্ষিকী সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠানের জন্য উদ্দীপনাপূর্ণ সাড়া পাওয়া যাইতেছে।

লেলিনগ্রাড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেণ্ট লিখিয়াছেন যে, স্বামীজীর জন্ম-শতবার্ষিকী যথোপযুক্ত মর্যাদা-সহকারে যত অধিকসংখ্যক স্থানে সম্ভব উদ্‌যাপিত হইবে। মাদাম রমাঁ রলাঁ (Madame Romain Rolland) ক্রীস্টফার ঈশারউড Christopher Isherwood), অধ্যাপক তুচি (Prof. Tuci) এবং আরও অনেকে অনুরূপ ভাবে পত্র লিখিয়াছেন এবং শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করিয়াছেন।

শতবার্ষিকী-প্রস্তুতিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী-সভা কিরূপ সাহায্য করিতেছেন, তাহা নিম্নের বিবরণ হইতে ধারণা হইবে:

(১) কেন্দ্রীয় মন্ত্রী-সভার যোগাযোগ ও প্রচার দপ্তর (The Ministry of Information and Broadcasting) কর্তৃক স্বামীজীর জীবনী অবলম্বনে প্রামাণিক চলচ্চিত্র (Documentary film) প্রস্তুত করা হইতেছে।

(২) কেন্দ্রীয় মন্ত্রী-সভার সমাজ-উন্নয়ন-বিভাগ (Ministry of Community Development)-এর সহযোগিতায় ভারতের সাড়ে পাঁচ লক্ষ গ্রামে স্বামীজীর শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হইতেছে।

(৩) কেন্দ্রীয় মন্ত্রী-সভার পরিবহন ও সংবাদ-সরবরাহ দপ্তর (Ministry of Transport and Communication) কর্তৃক স্বামীজীর চিত্র-সম্বলিত দুইটি ডাকটিকিট বাহির করা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে।

(৪) কেন্দ্রীয় মন্ত্রী-সভার যোগাযোগ ও প্রচার দপ্তর কর্তৃক স্বামীজীর একটি আলেখ্য-সংগ্রহ (Album) প্রকাশ করা হইতেছে।

(৫) কেন্দ্রীয় মন্ত্রী-সভার সমাজ-উন্নয়ন বিভাগ কর্তৃক নূতন ভারত গঠনের উপযোগী এবং নারীজাতির উন্নতির জন্য স্বামীজীর বাণীগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হইবে।

(৬) কেন্দ্রীয় মন্ত্রী-সভার শিক্ষাদপ্তর কর্তৃক স্বামীজীর শিক্ষা-বিষয়ক বাণীগুলি প্রকাশ করা হইবে।

(৭) স্বামীজীর নীতি ও ধর্মবিষয়ক বাণীগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে। ইহা দ্বারা ধর্মশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সাধারণের ধারণা হইবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতার ব্যবস্থা

বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী কমিটির সাধারণ সম্পাদক জানাইতেছেন যে, স্বামীজীর স্থায়ী স্মৃতি সংরক্ষণের জন্য তাঁহার নামে ভাষণমালার ব্যবস্থা করার আবেদনক্রমে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার জানাইয়াছেন: স্থির হইয়াছে যে, প্রতি দুই বৎসর অন্তর স্বামী বিবেকানন্দের নামে বেদান্ত-দর্শন সম্বন্ধে দুইটি বা তিনটি বক্তৃতা দিবার জন্য বিখ্যাত দার্শনিকগণকে আমন্ত্রণ করা হইবে।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-সংবাদ

ডিগবয়ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে গত ১৪ই হইতে ১৮ই জুন পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে পূজা, উপনিষৎ ও 'কথামৃত' পাঠ, কথকতা, রামনাম-সঙ্কীর্তন হয়। প্রায় ৫,০০০ নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন। দুইদিন দুইটি ধর্মসভার আয়োজন করা হয়; বিশিষ্ট বক্তাগণ শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবন ও বাণী অবলম্বনে ভাষণ দেন। শেষ দিনের সভায় স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ পৌরোহিত্য করেন।

ভারতে বিদেশী পর্যটক

গত ১০ বৎসরে ভারতে বিদেশী পর্যটকের সংখ্যা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৬১ খৃঃ ১,৩৯,০০০ বিদেশী ভ্রমণকারী ভারত পরিদর্শন করেন। ১৯৫১ খৃঃ বিদেশী ভ্রমণ-কারীর সংখ্যা ছিল প্রায় ১৭,০০০।

ভারত এই বিদেশী পর্যটকদের নিকট হইতে ১৯৫১ খৃঃ প্রায় ৫ কোটি টাকার বিদেশী মুদ্রা অর্জন করে, ১৯৬১ খৃঃ ইহা বাড়িয়া ২০ কোটি টাকার উপর হইয়াছে।

ভারতে বিদেশী ভ্রমণকারীদের মধ্যে শতকরা ২০ জন আমেরিকা হইতে এবং শতকরা ১৫ জন যুক্তরাজ্য হইতে আসিয়াছিলেন। —P. T. I.

বৌদ্ধবিহারের ধ্বংসাবশেষ

গত ২৩শে মে সোভিয়েট সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান 'তাসের' এক সংবাদে বলা হইয়াছে যে, সোভিয়েট বৈজ্ঞানিকগণ মধ্য-এশিয়ার অন্তর্গত উজবেকীস্তানে একটি প্রাচীন গুহা-চৈত্যের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করিয়াছেন। এই বৌদ্ধ বিহারটি খৃষ্টীয় প্রথম শতক হইতে তৃতীয় শতকের মধ্যে নির্মিত হইয়াছিল।

এই ধ্বংসাবশেষের ভিতর হইতে পাত্রাদির যে-সব ভগ্ন অংশ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে সংস্কৃত বাক্য লিপিবদ্ধ আছে। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে, প্রাচীনকালে মধ্য-এশিয়ার জনসাধারণের সহিত ভারতবাসীর যোগাযোগ ছিল।

এই বৌদ্ধ বিহারটি তারমেজ নামক একটি প্রাচীন অঞ্চলের মধ্যে অবস্থিত। ১২২০ খৃঃ চেঙ্গিজ খাঁর সৈন্যগণ তারমেজ ধ্বংস করিয়াছিল। এই বিহারের মধ্যে মুদ্রা, প্রাচীন গ্রীক পদ্ধতিতে নির্মিত আলোকাধার প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছে। —রয়টার

প্রাচীন বুদ্ধমূর্তি

নদীয়া জেলার তেহট্ট থানার অন্তঃপাতী বরেয়া গ্রামে সম্প্রতি একটি পুষ্করিণী খননকালে মাটির আট ফুট নিচে একটি সুন্দর প্রাচীন বুদ্ধমূর্তি পাওয়া গিয়াছে। মূর্তিটি নিখুঁত অবস্থাতেই ছিল, খননের সময় কোদালের আঘাতে উহা দুই জায়গায় সামান্য ভাঙিয়া গিয়াছে। কষ্টিপাথরে খোদাই-করা মূল মূর্তির উপরে পাঁচটি, পাশে দুইটি এবং নিচে পাঁচটি ছোট বুদ্ধমূর্তি আছে। এই সঙ্গে একটি মাটির প্রদীপ, একটি তামার গেলাস ও কয়েক টুকরা পুরাতন পাথর পাওয়া যায়।

আবিষ্কৃত মূর্তি বরেয়া স্কুল-প্রাঙ্গণে রাখা হইয়াছে। প্রত্যহ বহুসংখ্যক লোক দূর-দূরান্তর হইতে দেখিতে আসিতেছে, গত বুদ্ধপূর্ণিমার দিন মূর্তি দেখিবার ও পূজা দিবার জন্য সহস্রাধিক লোক সমবেত হয়।

—সঙ্কলিত

ভারতে গমের চাষ

খাদ্য-মন্ত্রণালয় হইতে প্রকাশিত ইস্তাহার অনুসারে ১৯৬১-৬২ খৃঃ ভারতে উৎপন্ন গমের পরিমাণ ১,১৬,২০,০০০ টন। এত বেশী গম পূর্বে ভারতে কখনও উৎপন্ন হয় নাই। এই বৎসর ৩,৩২,৪০,০০০ একর জমিতে গমের চাষ হয়। গত বৎসর অপেক্ষা এই বৎসর গম-চাষের পরিমাণ ৩'৭% বৃদ্ধি এবং ফলন বাড়িয়াছে ৭.৪%। —সঙ্কলিত

রকেট-যুগে যাতায়াত

রকেট-বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক জর্জি পোকরো-ভস্কি বলেন, রকেটের সাহায্যে মানুষ পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে যাতায়াত করিতে পারিবে। একটি বড় শহর অতিক্রম করিতে এখন যে-সময় লাগে, রকেটের সাহায্যে পৃথিবীর দূরতম স্থানে যাইতে সেই সময়ই লাগিবে। রকেট-ব্যবহার প্রচলিত হইলে পৃথিবী 'একটি শহরে' পরিণত হইবে। মানুষ তখন একই দিনে পৃথিবীর দূরতম প্রান্তের মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে পারিবে।

এই উদ্দেশ্যে একাধিক পর্যায়ের রকেট ব্যবহার করা যাইতে পরে। এই সব রকেট বিমান-বন্দরে অবতরণ করিতে পারিবে। রকেটগুলি অবতরণের জন্য উপযুক্ত স্থান ঠিক করিতে হইবে এবং বেতার-প্রযোগের উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে হইবে। —রয়টার

যান্ত্রিক নার্স

টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন জাপানী ডাক্তার ইঞ্জিনিয়রদের সহায়তায় একটি যান্ত্রিক নার্স নির্মাণ করিয়াছেন। এই যান্ত্রিক নার্স রোগীর রক্তের চাপ, নাড়ির গতি এবং শরীরের তাপের হিসাব রাখিতে পারে। এইসব সে কাগজে লিখিয়া রাখে এবং রোগীর প্রয়োজন-মত বিপদ-সঙ্কেতের সাহায্যে ডাক্তারকে ডাকিতে পারে। —সঙ্কলিত

ভারতের লোকসংখ্যা

ভারতের জনসংখ্যা বর্তমানে ৪৩ কোটি ৯০ লক্ষ নির্ধারিত হইয়াছে—গত বৎসরের আদমসুমারীর পর অস্থায়িভাবে যে-সংখ্যা (৪৩ কোটি ৬০ লক্ষ) ঘোষিত হয়, ইহা তদপেক্ষা ৩০ লক্ষ বেশী।

গোয়া, দমন, দিউ, দাদরা ও নগর হাভেলি এবং নেফার (NEFA) লোকসংখ্যা ৩০ লক্ষ যোগ করিলে মোট জনসংখ্যা দাঁড়ায় ৪৪ কোটি ২০ লক্ষ।

১৯৬১ খৃঃ গণনার পরবর্তী হিসাব-পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে, ৩০ লক্ষেরও সামান্য বেশী গণনায় বাদ পড়িয়াছে। হাজারে ৭ জন করিয়া বাড়িয়াছে।

গণনায় কম ধরিলেও ১৯৬১ খৃঃ ১লা মার্চ তারিখে ভারতের লোকসংখ্যা হওয়া উচিত ছিল ৪৩ কোটি ৬০ লক্ষের স্থলে ৪৩ কোটি ৯০ লক্ষ।

নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্য জনসংখ্যা-গণনায় ভুল হইয়া থাকে:

(১) গোটা বাড়িটাই বাদ দেওয়া বা দুইবার করিয়া বাড়ির লোকসংখ্যা গণনা করা।

(২) বাড়ির লোকজনদের কিছু কিছু বাদ পড়া বা কিছু কিছু লোককে দুইবার করিয়া গণনা করা।

১৯৫১খৃঃ আদমসুমারীর পর গণনা-পরবর্তী হিসাব পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, প্রতি হাজারে ১১ জন করিয়া লোক বাদ পড়িয়াছে।

[P.T.I. হইতে সঙ্কলিত]

কেনোপমা ভবতু তেঽস্য পরাক্রমস্য
রূপঞ্চ শত্রুভয়কার্য্যতিহারি কুত্র।
চিত্তে কৃপা সমরনিষ্ঠুরতা চ দৃষ্টা
ত্বয্যেব দেবি বরদে ভুবনত্রয়েঽপি॥
— শ্রীশ্রীচণ্ডী ৪।২২

ব্লক ও মুদ্রণ : বেঙ্গল অটোটাইপ কোং

শিল্পী : শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

দুর্গাসূক্তম্

জাতবেদসে সুনবাম সোমমরাতীয়তো নিদহাতি বেদঃ।

স নঃ পর্ষদতি দুর্গাণি বিশ্বা নাবেব সিন্ধুং দুরিতাত্যগ্নিঃ॥ ১ ॥

তামগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং বৈরোচনীং কর্মফলেষু জুষ্টাম্।

দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে সুতরসি তরসে নমঃ ॥ ১ ॥

অগ্নে ত্বং পারয়া নব্যো অস্মান্ স্বস্তিভিরতি দুর্গাণি বিশ্বা।

পূশ্চ পৃথ্বী বহুলা ন উর্বী ভবা তোকায় তনয়ায় সংযোঃ ॥ ৩ ॥

বিশ্বানি নো দুর্গহা জাতবেদঃ সিন্ধুং ন নাবা দুরিতাতিপর্ষি।

অগ্নে অত্রিবন্মনসা গৃণানোঽস্মাকং বোধ্যবিতা তনূনাম্ ॥ ৪ ॥

পৃতনাজিতং সহমানমুগ্রমগ্নিং হুবেম পরমাৎসধস্থাৎ।

স নঃ পর্ষদতি দুর্গাণি বিশ্বা ক্ষামদ্দেবো অতি দুরিতাত্যগ্নিঃ ॥ ৫ ॥

প্রত্নোষি কমীড্যো অধ্বরেষু সনাচ্চ হোতা নব্যশ্চ সৎসি।

স্বাং চাগ্নে তন্বং পিপ্রয়স্বাস্মভ্যং চ সৌভগমায়জস্ব ॥ ৬ ॥

গোভির্জুষ্টমযুজো নিষিক্তং তবেন্দ্র বিষ্ণোরনুসঞ্চরেম।

নাকস্য পৃষ্ঠমভি সংবসানো বৈষ্ণবীং লোক ইহ মাদয়ন্তাম্ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ

[কৃষ্ণযজুর্বেদের অন্তর্গত ঐতরেয় আরণ্যক এবং মহানারায়ণ উপনিষদে এই কয়েকটি মন্ত্র আছে। যদিও ঐ মন্ত্রগুলির অগ্নিপক্ষে ব্যাখ্যা আছে, তাহা হইলেও ইহা দুর্গাসূক্ত-রূপে প্রসিদ্ধ এবং কোন কোন মন্ত্র সায়ণও দুর্গাপক্ষে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কোন কোন ব্যাখ্যাকার সবগুলিই দুর্গাপক্ষে ব্যাখ্যা করেন। সায়ণ বলিয়াছেন, এই মন্ত্র কয়েকটি অনিষ্ট-নিবৃত্তির জন্য জপনীয়। সেইজন্য উহা স্বরের সহিত উদ্ধৃত করিয়া নিম্নে অনুবাদ দেওয়া হইল।]

যাঁহা হইতে মানুষ প্রভৃতি জ্ঞান লাভ করে, সেই দেবীর উদ্দেশ্যে যাগকালে আমরা সোমরস নিষ্কাশন করি। সেই দেবী সর্বজ্ঞা; যাহারা আমাদের শত্রু হইতে ইচ্ছা করে, তিনি তাহাদিগকে দগ্ধ করেন। তিনি আমাদের সকল বিপদ নাশ করিয়াছেন। নাবিক যেমন পোতের দ্বারা সমুদ্র অতিক্রম করে, সেইরূপ তিনি আমাদিগকে পাপ হইতে তারণ করেন। ১

যিনি মন্ত্রশাস্ত্রে নবদুর্গারূপে প্রসিদ্ধা, অগ্নিতুল্যবর্ণা, যিনি নিজ তাপের দ্বারা আমাদের শত্রুকে দগ্ধ করেন, যিনি বিশিষ্টরূপে প্রকাশমানা, পরমাত্মা অর্থাৎ মহাদেব কর্তৃক দৃষ্টা, ফলের নিমিত্ত উপাসক কর্তৃক সেবিতা, আমরা সেই দুর্গাদেবীর শরণ গ্রহণ করি। হে দেবি! তুমি সংসার হইতে উত্তম রূপে জীবকে ত্রাণ কর, সেইহেতু তুমি ত্রাণকারিণী। তোমাকে নমস্কার। ২

হে দেবি! তুমি স্তবার্হ, তুমি মঙ্গলময় উপায়সকলের দ্বারা আমাদিগকে সমস্ত বিপদ হইতে অতিক্রম করাইয়া সংসারের পরপারে লইয়া যাও। তোমার অনুগ্রহে আমাদের বাসযোগ্য পৃথিবীরূপ পুরী বিস্তীর্ণ হউক। আমরা তোমার পুত্র, আমাদের জন্য তুমি সুখদাত্রী হও! ৩

হে সর্বজ্ঞে, সকলবিপদ্‌হন্ত্রি! নাবিক যেমন নৌকার দ্বারা সমুদ্র অতিক্রম করে, সেইরূপ তুমি আমাদিগকে সমস্ত পাপ হইতে তারণ কর। হে দেবি! অত্রি মুনি যেমন 'সকলের সুখ হউক' এইরূপ সর্বদা মনে মনে ভাবনা করেন, তুমিও সেইরূপ মনে মনে গুণের* উচ্চারণ করিয়া আমাদের (স্থূল এবং সূক্ষ্ম) শরীরের রক্ষক হও। ৪

তুমি পরকীয়সেনা-জয়কারিণীদিগের মধ্যে সর্বোত্তম, অতএব তুমি শত্রুর অভিভব-কারিণী। হে দেবি! তুমি উৎকৃষ্ট স্থানে অবস্থান কর। তোমার ভৃত্যের সহিত তোমাকে তোমার অবস্থান-দেশ হইতে আহ্বান করি। সেই দেবী আমাদের সকল বিপদ নাশ করেন, এবং তিনি আমাদের অপরাধ ক্ষমা করিয়া আমাদিগকে অতিপাতক হইতে রক্ষা করেন। ৫

হে দেবি! তুমি যাগে স্তবনীয় হইয়া সুখ বিস্তার কর। কর্মফল প্রদান করিয়া কর্মের সম্পাদনা কর। তুমি স্তুত হইয়া যাগদেশে অবস্থান কর। অতএব দেবি! আমাদের হবির দ্বারা তুমি তোমার শরীর তৃপ্ত কর এবং তারপর আমাদিগকে সৌভাগ্যযুক্ত কর। ৬

হে দেবি! আমরা নিজ নিজ সৌভাগ্যের উদ্দেশ্যে দুঃখাদিশূন্য সর্বব্যাপী তোমার ভৃত্য হইয়া তোমাকে পশুর দ্বারা, অমৃতধারার দ্বারা স্নান করাইয়া সেবা করিব। স্বর্গে বাসকারী দেবতাগণ তোমাতে ভক্তি প্রদান করিয়া আমাদিগকে ইহলোকে বাঞ্ছিত ফল প্রদানপূর্বক হৃষ্ট করুন। ৭ [সায়ণ-ভাষ্যানুযায়ী বঙ্গানুবাদ—ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্যকৃত]

* এখানে শুভ বা মঙ্গল অর্থে গুণ বলা হইয়াছে।

কথাপ্রসঙ্গে

'চিত্তে কৃপা সমরনিষ্ঠুরতা'

অশুভ অসুরশক্তি নির্জিত হইয়াছে দেবগণের কাহারও একার শক্তিতে নয়, তাহাদের সম্মিলিত শক্তি—দেবীশক্তি দ্বারা। সেই শক্তিই সকলের সকল শক্তির উৎস। সত্ত্বগুণী দেবগণও মাঝে মাঝে এ কথা ভুলিয়া যান, তাই তাঁহাদের পরাভব স্বীকার করিতে হয় রজোগুণী অসুরের কাছে।

ত্রিগুণাত্মিকা ত্রিগুণাতীতা মহাশক্তি—সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের শক্তি; সৃজন পালন সংহার—সকলই তাঁহার লীলা, ইহার কোনটিতে যে তাঁহার অধিকতর প্রীতি আছে, তাহা নহে। যে আগ্রহ লইয়া তিনি চরাচরের জন্মবিধান করেন, সেই আগ্রহ লইয়াই তাঁহার সন্তানস্বরূপ সৃষ্ট প্রাণিবর্গকে তিনি স্বীয় স্তন্যবৎ পানাহার দিয়া লালন পালন করেন, ইহলোকে ভোগকাল পূর্ণ হইলে তিনিই আবার সংহারের—দেহান্তর-গ্রহণের বা চরম মুক্তির ব্যবস্থা করেন। ইহার কোনটিতে তাঁহার বিশেষ আসক্তি বা বিশেষ আগ্রহ নাই। অনাসক্তিই যে মহাশক্তির গোপন রহস্য। অনাসক্ত মনেই তো বিপরীত ভাবের সমন্বয় সম্ভব।

তাই তো দেখি, দেবীমূর্তিতে রুদ্রমধুরের মিলন, সুন্দর ও ভয়ঙ্করের সমন্বয়। সিংহস্কন্ধাধিরূঢ়া জগন্মাতা পাদাঙ্গুষ্ঠমাত্র দ্বারা দৈত্যশক্তি নির্জিত করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন—শান্তভাবে, প্রসন্নমুখে। একটু পূর্বে তাঁহার সমরনিষ্ঠুরতা দেবতারা দেখিয়াছেন, কিন্তু তখনও কি তাঁহার চিত্তে কৃপা ছিল না? তিনি কি প্রাকৃত রোষবশে হিংসার ভাবে এই হত্যাকাণ্ডে মত্ত হইয়াছিলেন? নিশ্চয়ই না। বিশ্বজননী সকলেরই জননী; দেবতার জননী, দৈত্যেরও জননী!

দুষ্ট সন্তানকে শাসন করিবার সময় জননীর রুদ্রমূর্তি দেখিয়া আমরা যেন ভীত না হই! রুদ্রের মধ্যেও মধুর রহিয়াছে, শাসনের মধ্যেও কল্যাণচিন্তা আছে, নিষ্ঠুরতার মধ্যেও কৃপা আছে। জীবনে দুঃখ সুখের—অভিশাপ আশীর্বাদের অগ্রদূত।

দুষ্ট দৈত্যশক্তি দম্ভ ও অজ্ঞান বশতঃ জননীকে চিনিতে পারে না, তাঁহারই সহিত সংগ্রামে মত্ত হয়। কৃপাময়ী জননীও সর্বপ্রকার নিষ্ঠুরতা সহ তাহার যুদ্ধপিপাসা মিটাইয়াছেন—অজ্ঞান দূর করিয়াছেন, অসুর এবার তাঁহাকে চিনিতে পারে, নিজেকেও চিনিতে পারে, বুঝিতে পারে সেও মায়ের সন্তান। তখন? সে-ও 'মা, মা' করে।

তাই বুঝি সাধক কবি গাহিয়াছেন: 'মা যদি সন্তানে মারে, তবুও সে 'মা, মা' করে।' আমরাও যেন ভুলিয়া না যাই—এই দুঃখ-দাহনের ভিতর দিয়াই মায়ের স্নেহধারাবর্ষণ। যেন ভুলিয়া না যাই—'দেবীমাহাত্ম্যে'র ঋষির অনুভূতি 'চিত্তে কৃপা সমরনিষ্ঠুরতা চ'। যেন বুঝিতে পারি, মায়ের স্নেহের শাসনে শত নিষ্ঠুরতার মধ্যেও করুণার ফল্গুধারা নিত্য প্রবাহিত।

বেলুড়ে বিবেকানন্দ-বিশ্ববিদ্যালয়

[একটি রাজোচিত দান]

বেলুড়ে প্রস্তাবিত বিবেকানন্দ-বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য রামকৃষ্ণ মিশনের আবেদন-ক্রমে ভাগ্যকুলের (বর্তমানে পূর্বপাকিস্তানে) স্বর্গত কুমার প্রমথনাথ রায়ের পুত্র শ্রীবলরাম রায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে ও উহার সংরক্ষণে সহায়তা করিতে 'রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ-বিশ্ববিদ্যালয় ট্রাস্ট' নামে একটি ট্রাস্ট (Trust) গঠন করিয়াছেন। মাননীয় শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন এই ট্রাস্টের সভাপতি (President) এবং মাননীয় শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায়, সলিসিটর শ্রীবীরেন্দ্রকুমার বসু ও রামকৃষ্ণ মিশনের দুইজন প্রবীণ সন্ন্যাসী ইহার ট্রাস্টী (Trustee) হইয়াছেন। এই ট্রাস্ট গঠন করিয়া দাতা উইলের দ্বারা তাঁহার স্থাবর সম্পত্তির কিছু অংশ দানপত্র করিয়াছেন—এই সম্পত্তির বার্ষিক আয় প্রায় এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার (১,৫০,০০০) টাকা।

আমাদের দেশের যে-সকল ব্যক্তি যুবকগণের প্রকৃত শিক্ষাবিষয়ে স্বভাবতই আগ্রহশীল, তাঁহারা এই মহানুভব দাতাকে তাঁহার দানের জন্য রামকৃষ্ণ মিশনের সহিত আন্তরিকভাবে অভিনন্দিত করিবেন।

প্রস্তাবিত বিবেকানন্দ-বিশ্ববিদ্যালয় যুগাচার্য স্বামীজীর স্মৃতি-সংরক্ষণের একটি উপযুক্ত নিদর্শন হইবে, তদুপরি ইহা ঐতিহাসিক গুরুত্বের দিক দিয়াও স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। মানুষ-গড়ার এবং চরিত্রগঠনের উপযোগী শিক্ষা স্বামীজী দেশবাসীকে দিতে চাহিয়াছিলেন; এই ধরনের শিক্ষা ভারতের সর্বজনীন আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য তো তুলিয়া ধরিবেই, উপরন্তু পাশ্চাত্য ভাব ও কৃষ্টির শ্রেষ্ঠ উপাদানগুলিও ইহার ব্যাপক কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত হইবে। ইহা দ্বারা প্রাচ্যের বেদান্ত এবং পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান ও শিল্পবিদ্যার জীবনপ্রদ সমন্বয় সাধিত হইবে।

প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপদানে যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার উদ্দেশ্যে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের নিকট শীঘ্র পেশ করিবার জন্য একটি কর্মসূচী প্রস্তুত করা হইতেছে। এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য প্রথমেই দুই কোটি টাকা প্রয়োজন। মিশনের কর্তৃপক্ষ বিশেষভাবে আশা করেন, সহৃদয় জনসাধারণ তাঁহাদের আবেদনে সত্বর সাড়া দিয়া উপযুক্ত তহবিল গঠনে সহায়তা করিবেন, যাহাতে পরিকল্পনাটি স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম-শতবর্ষেই উপযুক্তভাবে রূপায়িত হইতে পারে। আরও আশা করা যাইতেছে যে, কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার উভয়েই প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়টির যথোপযুক্ত সংরক্ষণে পর্যাপ্ত পরিমাণে সাহায্য দান করিবেন।

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ

সাধারণ সম্পাদক

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড়

ছায়ারূপা

ডক্টর রমা চৌধুরী

সর্বজনবন্দ্য শ্রীশ্রীচণ্ডীর পঞ্চম অধ্যায়ে একটি অপূর্ব দেবীস্তব আছে। এই স্তবে পরমাদেবীকে এককুশভাবে বর্ণনা ক'রে প্রণাম নিবেদন করা হয়েছে। তার মধ্যে একটি অত্যাশ্চর্য স্তব হ'ল এইরূপ :

যা দেবী সর্বভূতেষু ছায়ারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥ (৫।৩১)
যে দেবী সর্বভূতে ছায়ারূপে বিরাজিতা,
তাঁকেই প্রণাম তাঁকেই প্রণাম তাঁকেই প্রণাম,
অনিন্দিতা।

এস্থলে একটি অতি ন্যায্য প্রশ্ন হ'তে পারে যে, জগজ্জননী পরমজ্যোতির্ময়ী, অনন্ত আলোকস্বরূপা, অসীমদীপ্তিশালিনী সে ক্ষেত্রে তাঁর মধ্যে অন্ধকার বা ছায়া তো বিন্দুমাত্র থাকতে পারে না; তবে তিনি 'ছায়ারূপা' হবেন কি ক'রে?

কিন্তু প্রকৃতকল্পে এক্ষেত্রে বিরোধদোষদুষ্ট কিছুই নেই। 'ছায়া' শব্দের প্রকৃত অর্থ কি? এদিক থেকে দেখতে গেলে আলো ও ছায়া পরস্পর বিরুদ্ধ নয়, উপরন্তু পরস্পর পরিপূরক। একটি মূলীভূত প্রাকৃতিক নিয়ম এই যে, কোন বস্তু আলোর সম্মুখে এসে পড়লে তার ছায়া পড়ে, অর্থাৎ তার অবিকল মূর্তিটি প্রতিফলিত হয়; এবং এই ভাবে সেই একটিমাত্র বস্তুর যেন দুটি মূর্তি, দুটি রূপ; একটি প্রকৃত মূর্তি—প্রকৃত রূপ ও অপরটি তারই অবিকল প্রতিবিম্ব। এইদিক থেকে বলা চলে যে, আলো ও ছায়া অঙ্গাঙ্গী—অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ।

উপনিষদেও আমরা এইভাবের মন্ত্র পাই। যেমন সুবিখ্যাত কঠোপনিষদে দু-বার 'ছায়াতপ' (ছায়া ও আলো) এই সমাসবদ্ধ শব্দটি পাওয়া যায় :

ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে
গুহাম্প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্ধে।
ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি
পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিণাচিকেতাঃ॥ ৩।১

কর্মফলভোগকারী এই যে জীবাত্মা,
চিত্তগুহাপ্রবিষ্ট তাঁরে যে পরমাত্মা—
ছায়ালোকতুল্য দোঁহে বলেন সকলে,
ত্রিপঞ্চ-অগ্নিধারী, ব্রহ্মজ্ঞ কুতূহলে॥

যথাদর্শে তথাত্মনি যথা স্বপ্নে তথা পিতৃলোকে
যথাপ্সু পরীব দদৃশে তথা গন্ধর্বলোকে।
ছায়াতপয়োরিব ব্রহ্মলোকে॥ ৬।৫

বুদ্ধিমাঝে আত্মা দেখায় দর্পণসম স্পষ্ট,
পিতৃলোকে তা দেখা যায় স্বপ্নসম অস্পষ্ট,
জলস্থ বস্তু সম গন্ধর্বলোকে তা অব্যক্ত,
ব্রহ্মলোকে ছায়া-আলো সম তা সুব্যক্ত॥

সুপ্রাচীন ও সুপ্রসিদ্ধ বৃহদারণ্যকোপনিষদেও দু-বার 'ছায়াময়ঃ পুরুষঃ' এরূপ উল্লেখ পাওয়া যায় (২।১।১২, ৩।৯।১৪)। উভয় ক্ষেত্রেই বলা হয়েছে যে, এই 'ছায়াময় পুরুষ হলেন 'মৃত্যু'। অথচ একই সঙ্গে বলা হয়েছে যে, যিনি এই 'ছায়াময় পুরুষ'কে 'মৃত্যু'রূপে উপাসনা করেন, তিনি ইহকালে পূর্ণায়ু প্রাপ্ত হন; কাল পূর্ণ হওয়ার পূর্বে মৃত্যু তাঁর নিকট আগমন করে না। (২।১।১২)

প্রশ্নোপনিষদে এরূপ একটি মন্ত্র আছে : আত্মন এব প্রাণো জায়তে। যথৈষা পুরুষে ছায়ৈতস্মিন্নেতদাততং মনোকৃতেনায়াত্যস্মিঞ্ছরীরে। (৩।৩)

—আত্মা থেকেই প্রাণ জন্মে। যেমন পুরুষে ছায়া, তেমনি এই আত্মাতে তা বিস্তৃত হয়ে আছে। মনের সঙ্কল্প-বশতই তা এই শরীরে আসে।

কৌষিতকী উপনিষদের মন্ত্রটিও (৪।১৪) বৃহদারণ্যকোপনিষদের মন্ত্রের সমতুল্য। এস্থলেও বলা হচ্ছে যে, 'ছায়াপুরুষ' হলেন 'মৃত্যু'। অথচ এখানেও একই সঙ্গে বলা হয়েছে, যিনি এই 'ছায়াপুরুষ'কে 'মৃত্যু'রূপে উপাসনা করেন, তিনি স্বয়ং ও তাঁর সন্তান অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন না।

উপনিষদের এই সব 'ছায়াবাদের' প্রকৃত অর্থবিষয়ে একটু চিন্তা করা যাক। এস্থলে জীবকে বলা হয়েছে 'ছায়া', ব্রহ্মকে 'আলোক'। এর সাধারণ অর্থ উপলব্ধি করা কঠিন নয়। সেই অর্থ হ'ল এই যে, বস্তু যেরূপ ছায়ারূপে অবিকল প্রতিবিম্বিত হয়, ছায়া যেমন বস্তুর অবিকল রূপ, জীবও তেমনি ব্রহ্মের অবিকল রূপ। কিন্তু বস্তু আলো, তার ছায়া কালো। সেজন্য আলো ব্রহ্মের কালো রূপই জীব—অবিকল রূপ নিশ্চয়ই; কিন্তু কালো রূপও—সমভাবে, নিঃসংশয়ভাবে। এর কারণ কি?

এই কারণ নিয়েই বিরোধ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে, একতত্ত্ববাদী অদ্বৈত বেদান্ত-সম্প্রদায় এবং একেশ্বরবাদী বিশিষ্টাদ্বৈতাদি-বেদান্ত-সম্প্রদায়ের মধ্যে। এই প্রসঙ্গে শঙ্কর প্রমুখ অদ্বৈতবাদিগণ বলছেন, 'ছায়াতপ' শব্দের অর্থ হ'ল এই যে, জীব ও ব্রহ্ম—ছায়া ও আলোকের ন্যায়ই সম্পূর্ণ বিরুদ্ধস্বভাব। অর্থাৎ একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, জীবজগৎ মিথ্যা—মায়া মাত্র। সেজন্য একমাত্র চন্দ্রই যেরূপ সত্য, জলস্থ চন্দ্র প্রতিবিম্ব নয়, সেরূপ ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, অবিদ্যায় প্রতিফলিত ব্রহ্ম প্রতিবিম্ব বা জীব নয়। এই হ'ল অদ্বৈত বেদান্তের সুবিখ্যাত 'প্রতিবিম্ববাদ', এই মতে অবিদ্যা-প্রতিফলিত জীবজগৎ মিথ্যা।

কিন্তু রামানুজ প্রমুখ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণের মতে 'ছায়াতপ' শব্দের অর্থ হ'ল এই যে, জীব ও ব্রহ্ম—ছায়া ও আলোকের ন্যায় নিত্য সম্বন্ধ-যুক্ত, সেজন্য জীবও ব্রহ্মেরই ন্যায় নিত্যসত্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও জীবকে ব্রহ্মের 'ছায়া' বলা হয়েছে ব্রহ্মের স্বতন্ত্রতা ও জীবের পরতন্ত্রতা পরিস্ফুট করবার জন্য। এই স্বতন্ত্র-পরতন্ত্রবাদ একেশ্বরবাদী বেদান্ত-সম্প্রদায়ের একটি মূলীভূত তত্ত্ব; যেহেতু সেই মতানুসারে একমাত্র ব্রহ্মই স্বতন্ত্রসত্তা, এবং জীবজগৎ ব্রহ্মের কার্য, গুণ, শক্তি, অংশ ও দেহ রূপে ব্রহ্মের তুল্য সত্য হলেও সম্পূর্ণরূপেই ব্রহ্মের উপর নির্ভরশীল।

সেই জন্যেই প্রশ্নোপনিষদের উপরি-উদ্ধৃত মন্ত্রে বলা হয়েছে যে, ছায়া যেরূপ পুরুষের আশ্রিত, প্রাণ বা জীবও সেরূপ ব্রহ্মের আশ্রিত। এই কারণে বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ও কৌষিতকী উপনিষদের উপরি-উদ্ধৃত মন্ত্রে বলা হয়েছে যে, ছায়াপুরুষ অথবা জীব একাধারে মৃত্যু ও মৃত্যুঞ্জয়ী। সংসারী জীবের উচ্চনীচ দুটি দিক্ আছে—জড়দেহের দিক্, অজড় আত্মার দিক্। অজ্ঞানবশতঃ যদি জীব কেবল এই জড়দেহের দিক্‌টিকেই সত্য ব'লে মনে করে, তা হ'লে মৃত্যু অথবা শোকতাপপূর্ণ সাধারণ সাংসারিক জীবনই হবে তার সব, এর অধিক প্রাপ্য আর তার কিছুই থাকবে না। অপর পক্ষে যদি সাধনবলে সে দেহকে অতিক্রম ক'রে আত্মাকে উপলব্ধি করতে পারে, তা হ'লে তার প্রাপ্য হবে অমরত্ব; বা জন্মমৃত্যুময় সংসারচক্র থেকে শাশ্বত পরিত্রাণ; অর্থাৎ অমৃত-রসঘন আনন্দস্বরূপ আলোকদীপ্ত মোক্ষ।

এইভাবে আমরা দেখলাম যে, 'ছায়া' শব্দের অর্থ 'জীব'—কারও কারও মতে সত্য জীব, কারও বা মতে মিথ্যা জীব। শ্রীশ্রীচণ্ডী মহাগ্রন্থের দার্শনিক মতবাদ হ'ল জগৎসত্যবাদী বেদান্তের অনুরূপ। সেজন্য এই গ্রন্থের মতে—জীব সত্য, ব্রহ্মতুল্যই সত্য। সুতরাং এক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে, জগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারিণী পরব্রহ্মের পরাশক্তি-স্বরূপিণী—পরমাপ্রকৃতিরূপিণী, আদ্যাশক্তি 'ছায়া'-রূপে অথবা জীবাত্মা-রূপে বিরাজিত এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে। এই তো হ'ল ভারতীয় দর্শনের সুপ্রসিদ্ধ 'পরিণামবাদ'। এই মতানুসারে জগৎস্রষ্টা স্বয়ং সৃষ্ট জীবজগতে পরিণত হন, এবং সেজন্য স্বয়ং তিনিই এই সুবিশাল জগতের অণুতে পরমাণুতে চিরবিরাজমান তাঁর পরিপূর্ণ সৌন্দর্যে মাধুর্যে ঐশ্বর্যে। এই কারণেই ছান্দোগ্যোপনিষদ্ পরমগৌরব ভরে ঘোষণা করেছিলেন মানব-সভ্যতার প্রথম উষাগমে—'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম ; তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত'। (৩।১৪।১)

—এই সমুদয় বস্তুই ব্রহ্ম। তিনিই সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কর্তা। এইভাবে তাঁকে শান্ত হয়ে উপাসনা করবে।

এই হ'ল শান্তিলাভের একমাত্র উপায়—শান্ত হয়ে একমাত্র তাঁকেই কেবল উপাসনা কর সব সময়ে ; একমাত্র তাঁকেই কেবল আশ্রয় কর সর্বাবস্থায়। এই যে পার্থিব ভোগসুখের পশ্চাতে নিরন্তর উন্মত্তবৎ অনুধাবন, এই যে স্বার্থান্বেষণে নিরন্তর পশুবৎ ব্যগ্রতা, এই যে অতিক্ষুদ্র তুচ্ছ হীন ক্ষীণ জীবনযাপনে মূঢ়বৎ আসক্তি—তা কেবল বর্ধন করে অশান্তি, সর্জন করে অমঙ্গল, অর্জন করে পাপগরল।

সেইজন্যই বিশেষ প্রয়োজন সেই 'ব্রহ্মদৃষ্টি' লাভের—যা আমাদের সমর্থ করে এই ধরণীরই ধূলিতে, এই মর্ত্যেরই মাটিতে, এই সংসারেরই অরণিতে, এই ভুবনেরই ভবনে ভবনে দর্শন করতে সেই মহাতত্ত্ব যে, তিনিই প্রত্যেক জীব, তিনিই সমগ্র জগৎ। এই পরম সত্যেরই মধুর প্রকাশ দেখে আমরা পরমধন্য হই শ্রীশ্রীচণ্ডীর এই দেবীস্তবে। পরমালোকস্বরূপিণী, ভাস্বতী জগন্মাতাকে 'ছায়ারূপা' বলা হয়েছে কেবল এই জন্যেই। তিনি বিম্ব, জীব প্রতিবিম্ব। কিন্তু বিম্বই স্বয়ং যে প্রতিবিম্বে বিরাজমান—তিনিই তো জীব, জীবরূপে জীবে নিহিতা, জীবের সঙ্গে অভিন্নাত্মা, জীবের সঙ্গে স্বরূপতঃ অভিন্না, সেজন্যই তিনি 'ছায়ারূপা'। এই ছায়া তাঁর কায়াকে আবৃত করে না, এই ছায়া তাঁর কায়ার অবিকল রূপ। জীবের অন্তরদেশে স্বয়ং জগজ্জননী তাঁর ছায়া ফেলেছেন, প্রতি-বিম্বিত করেছেন তাঁর স্বরূপ, প্রতিফলিত করেছেন তাঁর সত্তা, প্রকটিত করেছেন তাঁর পরম মধুরিমা—ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণুর অপেক্ষা করেছেন, পরিপূর্ণ করেছেন, অনন্তের অধিকারী করেছেন—এই তো হ'ল তার শ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য, এই তো হ'ল তার মুক্তি। সত্যই শ্বেতাশ্বত-রোপনিষদ্ (৫।৯) বলেছেন ঃ

'বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ সঃ চানন্ত্যায় কল্পতে॥'

—কেশাগ্রের শতভাগের শতভাগ জীব এই। তথাপি সে অনন্তের অধিকারী।

এতেই তো হ'ল 'ছায়ারূপা' মহাজননীর ছায়াত্বের পূর্ণ সার্থকতা।

এসগো বিশ্বমাতা !

শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্তী

আমার এই আঙিনাতে তোমারি,
আসন পাতা !
এসগো বিশ্বময়ি, বিশ্বরানি,
বিশ্বমাতা !
নীলিম গগন মাঝে
বরণের শঙ্খ বাজে,
ধরণী মন্ত্র-স্বরে উচ্চারিছে
বোধন-গাথা !
এসগো বিশ্বময়ি, বিশ্বরানি,
বিশ্বমাতা !

শেফালি দেছে আঁকি' আলিম্পনের
শুভ্র-ছটা,
ফুলেরা করে রচন অলংকারের
বর্ণ-ঘটা !
সরসী সাজায় ডালি,
ভরিয়া স্বর্ণ-থালি,
কমলের অর্ঘ্যখানি আজকে তারি
বক্ষে গাঁথা !
এসগো বিশ্বমাঝে বিশ্বরানি,
বিশ্বমাতা !

নিখিলের হৃদয় জুড়ে জাগে সাড়া
তোমার পূজার,
আমিগো সাজিয়ে দিনু তারি মাঝে
মোর উপচার !
এস মোর আঙিনাতে,
রাজীব চরণ-পাতে,
নিলাম শরণ আমি
লুটানু এ মোর মাথা !
এসগো বিশ্বময়ি, বিশ্বরানি,
বিশ্বমাতা !

ভারতের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ

স্বামী বিবেকানন্দ

ওঁ তৎ সৎ।

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়।

নাসতো সৎ জায়েত।

অনস্তিত্ব হইতে কোন অস্তিত্বের উদ্ভব সম্ভব নহে। যাহা 'অসৎ' তাহা কোন সদ্বস্তুর হেতুও হইতে পারে না। শূন্যতা হইতে কোন বস্তু জাত হয় না।

কার্য-কারণ-নিয়ম আর্যজাতিরই মতো সুপ্রাচীন। এই নিয়ম সর্বশক্তিমান্, কোন দেশ বা কালের সীমায় ইহা আবদ্ধ নয়। প্রাচীন ঋষি-কবিগণ ইহার মহিমা কীর্তন করিয়াছেন, দার্শনিকগণ ইহা প্রণয়ন করিয়াছেন এবং ইহাকেই ভিত্তিপ্রস্তররূপে স্বীকার করিয়া আজ পর্যন্ত হিন্দুজাতি তাহার জীবনদর্শন রচনা করিয়া চলিয়াছে।...

যুগ-প্রারম্ভে জাতির মনে ছিল কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা। অল্পকাল মধ্যে সেই জিজ্ঞাসাই বলিষ্ঠ বিশ্লেষণে পরিণতি লাভ করে এবং যদিও আদিযুগের প্রথম-প্রয়াসের মধ্যে কাঁচা-হাতের অপরিণত স্বাক্ষর ছিল—যেমন থাকে সুদক্ষ স্থপতির প্রাথমিক সৃষ্টির মধ্যে,—তথাপি নির্ভীক উদ্যম ও নিখুঁত বৈজ্ঞানিক প্রণালীর মধ্য দিয়া সে এক বিস্ময়কর ফল প্রসব করিয়াছিল।

এই জিজ্ঞাসার সাহস আর্যঋষিদিগকে নিয়োজিত করিয়াছিল যজ্ঞবেদীর প্রতিটি ইষ্টক-খণ্ডের স্বরূপ অনুসন্ধানে, উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল শাস্ত্রের প্রতিটি শব্দের মাত্রানির্ণয়ে ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে কিংবা তাহাদের পুনর্বিন্যাসে। ইহারই প্রেরণায় পূজা-উৎসবাদির তাৎপর্য সম্পর্কে কখন তাহারা সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিল, কখন তাহাদের ব্যাখ্যায় বা বিশ্লেষণে অগ্রসর হইয়াছিল, কখন বা সেগুলি একেবারে বর্জন করিয়াছিল।

এই অনুসন্ধিৎসার ফলে প্রচলিত দেবতাবর্গকে নূতন করিয়া ঢালিয়া সাজা হইয়াছিল এবং সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী ও সর্বশক্তিমান্ বিশ্বস্রষ্টারূপে যিনি কীর্তিত, যিনি পিতৃপুরুষের স্বর্গীয় পিতা—তাঁহার জন্য হয় একটি দ্বিতীয় পর্যায়ের স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল, অথবা এককালে অপ্রয়োজনীয় বোধে তাঁহাকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া, তাঁহাকে বাদ দিয়াই এক সার্বভৌম ধর্মের আরম্ভ হইয়াছিল, সেই ধর্মের অনুগামি-সংখ্যা পৃথিবীতে আজও সর্বাধিক।

ইহারই অনুপ্রেরণায় যজ্ঞবেদীর ইষ্টক-স্থাপন-ব্যবস্থা হইতে জ্যামিতি-বিজ্ঞানের উদ্ভব হইয়াছিল। আবার পূজা-উপাসনার যথাযথ কাল-নির্ণয়ের চেষ্টা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছিল জ্যোতির্বিজ্ঞান, যাহা সকলকে বিস্মিত করিয়াছিল।

ঐ অনুসন্ধিৎসা হইতেই অঙ্কশাস্ত্রে তাঁহাদের দান প্রাচীন অথবা আধুনিক যে-কোন জাতির দান অপেক্ষা অধিকতর হইয়াছিল এবং রসায়নশাস্ত্রে ধাতু-ঘটিত ঔষধ-প্রস্তুতের অভিজ্ঞতায়, সঙ্গীতের স্বরগ্রাম-নির্ধারণে, বেহালাজাতীয় তারযন্ত্রের উদ্ভাবনে তাহাদের যে প্রতিভা, তাহাই আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা গড়িয়া তুলিতে প্রভূত সাহায্য করিয়াছিল।

এই ভাব হইতেই বিচিত্র গল্প ও উপাখ্যানের সাহায্যে অপরিণত শিশুমন গড়িয়া তুলিবার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়াছিল এবং আজও পৃথিবীর সর্বদেশে নার্সারী বা ঐ ধরনের শিক্ষায়তনে শিশুগণ ঐ-সকল গল্পই শিখিয়া থাকে, আর ঐগুলির মধ্য দিয়াই জীবনের পটে সুস্পষ্ট ছাপ গ্রহণ করে।

এই তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ-শক্তির সম্মুখে এবং পশ্চাতে যেন একটি কোমল ও মসৃণ আচ্ছাদন ছিল এবং তাহারই মধ্যে সুরক্ষিত ছিল এই জাতির অপর একটি মানসিক বৈশিষ্ট্য—যাহাকে 'কবির অন্তর্দৃষ্টি' বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে।

এ-জাতির ধর্ম, দর্শন, ইতিহাস, নীতিশাস্ত্র, পৌরবিজ্ঞান প্রভৃতি সব কিছুই যেন কবি-কল্পনার পুষ্পবেদীতে খচিত ছিল এবং সেগুলিকে অন্য যে-কোন ভাষা অপেক্ষা সুন্দরতররূপে প্রকাশ করিয়াছিল এক বিচিত্র ভাষা—যাহার নাম 'সংস্কৃত' ভাষা বা 'পূর্ণাঙ্গ' ভাষা। এমন কি গণিতের কঠিন সংখ্যাতত্ত্বসমূহ প্রকাশ করিতেও ছন্দোবদ্ধ শ্লোক ব্যবহৃত হইয়াছিল।

সেই বিশ্লেষণী শক্তি এবং নির্ভীক কবি-কল্পনা, যাহা ঐ শক্তিকে প্রেরণা দিত—যেন দুইটি আভ্যন্তরীণ কারণই হিন্দুর জাতীয় চরিত্রের প্রধান সুর, ঐ দুইটি সমন্বিত শক্তির বলেই আর্য-জাতি চিরদিন ইন্দ্রিয়-স্তর হইতে অতীন্দ্রিয় স্তরের দিকে গতিশীল, এবং ইহাই এই জাতির দার্শনিক চিন্তাধারার গোপন রহস্য; ইহা দক্ষ-কারিগরের নির্মিত ইস্পাত-ফলকের মতো, যাহা লৌহদণ্ডকে ছেদন করিতে পারে, আবার বৃত্তাকারে রূপায়িত হইবার মতো নমনীয়ও বটে।

স্বর্ণ ও রৌপ্যপাত্রে তাহারা ছন্দগাথা উৎকীর্ণ করিয়াছিল। মণিমাণিক্যের ঐকতানে, মর্মর প্রস্তরের বহু বিচিত্র স্থাপত্যে, বর্ণ-সুষমার সঙ্গীতে এবং সূক্ষ্ম বস্ত্রশিল্পের সৃষ্টিতে, যে-সৃষ্টি এই জগতের বাহিরে অন্য এক রূপকথার জগতের বলিয়া মনে হইত, সব কিছুর পশ্চাতে এই জাতির চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের সহস্রবর্ষব্যাপী সাধনা নিহিত ছিল।

কলা, বিজ্ঞান, এমন কি প্রাত্যহিক জীবনের বাস্তবতা পর্যন্ত সব কিছু এমন ছন্দোময় ভাব-দ্বারা মণ্ডিত ছিল যে, চরমে ইন্দ্রিয়ের স্তর অতীন্দ্রিয় স্তরে উত্তীর্ণ হইত, স্থূল বাস্তবতা সূক্ষ্ম অবাস্তবতার রঙিন আভায় অনুরঞ্জিত হইয়া উঠিত।

এ-জাতির দূর-অতীত ইতিহাসের যতটুকু আভাস পাওয়া যায়, তাহা হইতে বোঝা যায়, সেই আদি যুগেই—ক্ষেত্রবিশেষে প্রয়োগ করিবার যন্ত্র-হিসাবে এই বৈশিষ্ট্য তাহাদের আয়ত্তে ছিল। বেদ-গ্রন্থে এই জাতির জীবনাখ্যায়িকা চিত্রিত হইবার পূর্বে চলার পথে বহু প্রকারের ধর্ম ও সমাজ পশ্চাতের পথরেখায় নিশ্চয়ই বিলুপ্ত হইয়াছিল।

সেখানে দেখা যায়—এক সুসংবদ্ধ দেবতামণ্ডলী, উৎসবাদির বিস্তারিত ব্যবস্থা, ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তির তাগিদে গঠিত বংশানুক্রমিক একটি সমাজ। সেখানে ইতিমধ্যেই অনেক প্রয়োজনীয় ও বিলাসের সামগ্রী বর্তমান।

আধুনিক পণ্ডিতগণের প্রায় সকলেই এ-বিষয়ে একমত যে, ভারতীয় জলবায়ু এবং ভারতে প্রচলিত রীতিনীতি তখনও এই জাতির উপর তেমন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই।

আরও কয়েক শতাব্দী অতিক্রান্ত হইল। তখন দেখা গেল এক মানব-গোষ্ঠী, তাহাদের উত্তরে তুষারাচ্ছন্ন হিমালয়, দক্ষিণে দক্ষিণাপথের উষ্ণতা—মধ্যে দিগন্তবিস্তীর্ণ সমতল, সীমাহীন অরণ্য অঞ্চল, আর তাহাদেরই মধ্য দিয়া দুর্বারগতি নদীসমূহ প্রচণ্ড স্রোতে প্রবাহিত। দেখা গেল—তাতার, দ্রাবিড়, আদিবাসী-প্রমুখ বিভিন্ন জাতির অস্পষ্ট ও ক্ষণস্থায়ী চিত্র। ইহাদেরই শোণিতমোক্ষণে, ভাষা ধর্ম ও আচার-পদ্ধতির অবদানে—ধীরে ধীরে আর্যদেরই অনুরূপ আর এক মহান্ জাতির উদ্ভব হইয়াছিল, যাহারা আরও শক্তিশালী, উদার অঙ্গীভূত-করণের ফলে অধিকতর সংবদ্ধ।

আরও দেখা যায় যে, এই কেন্দ্রীয়গোষ্ঠী গ্রহণ-শক্তির প্রভাবে সমগ্র দেশের জনসাধারণের উপর স্বকীয় চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যের ছাপ অঙ্কিত করিয়াও বিশেষ গর্বের সঙ্গে নিজেদের 'আর্য' পরিচয় অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে এবং অপরাপর জাতিকে নিজেদের সভ্যতা-সংস্কৃতির সকল সুযোগ-সুবিধা প্রদান করিতে সম্মত হইয়াও আর্যজাতির অন্তরঙ্গ-গোষ্ঠীর মধ্যে কাহাকেও গ্রহণ করিতে অসম্মত।

ভারতীয় আবহাওয়া এই জাতির প্রতিভাকে উন্নততর লক্ষ্যে চালিত করিয়াছিল। এ দেশের প্রকৃতি ছিল কল্যাণময়ী, পরিবেশ ছিল আশু ফলপ্রসূ। সুতরাং জাতির সমষ্টিমন সহজেই উন্নত চিন্তাক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া জীবনের বৃহত্তর সমস্যাসমূহের মুখোমুখি দাঁড়াইয়াছিল এবং সেইগুলিকে জয় করিতে সচেষ্ট হইয়াছিল। ফলে দার্শনিক এবং পুরোহিত ভারতীয় সমাজে সর্বোচ্চ আসন লাভ করিয়াছিলেন, অস্ত্রধারী ক্ষত্রিয় নহে।

পুরোহিতগণ আবার ইতিহাসের সেই আদিম যুগেই পূজা-অর্চনার বিস্তারিত বিধি-নিয়ম-প্রণয়নে নিজেদের শক্তি নিয়োজিত করিয়াছিল। তারপর কালক্রমে, যখন সে-সকল প্রাণহীন অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াকর্মের বোঝা জাতির পক্ষে অসহনীয় হইয়া উঠিযাছিল, তখনই দার্শনিক চিন্তা দেখা দিল, এবং এই ক্ষত্রিয়েরাই প্রথম মারাত্মক আচার-অনুষ্ঠানের বেড়াজাল ছিন্ন করিযাছিল।

সে এক দ্বন্দ্বের কাল।...

একদিকে পুরোহিতকুলের অধিকাংশ আর্থিক প্রয়োজনের তাগিদে বাধ্য হইয়াই শুধু সেইসকল ক্রিয়াকর্মকেই সমর্থন করিত, যেগুলির জন্য সমাজব্যবস্থায় তাহারা অপরিহার্য এবং সর্বোচ্চ মর্যাদা তাহাদের প্রাপ্য। আবার অন্যদিকে যে রাজন্যবর্গের শক্তি ও শৌর্যই জাতিকে রক্ষা করিত—পরিচালিত করিত এবং যাঁহাদের নেতৃত্ব তখন উচ্চ মননক্ষেত্রেও প্রসারিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে, তাঁহারা শুধু ক্রিয়ানুষ্ঠানদক্ষ পুরোহিতবর্গকে সমাজের সর্বোচ্চ স্থান ছাড়িয়া দিতে আর সম্মত ছিলেন না। আরও একদল ছিল, পুরোহিতকুল ও রাজকুল,—উভয় হইতে যাহারা উদ্ভূত, তাহারা পুরোহিত এবং দার্শনিক দুই শ্রেণীকেই বিদ্রূপ করিত, অধ্যাত্মবাদকে ধাপ্পাবাজি ও বুজরুকি বলিয়া অভিহিত করিত এবং জাগতিক সম্ভোগকেই জীবনের সর্বোত্তম কাম্যবস্তু বলিযা ঘোষণা করিত। ইহারাই জড়বাদী।

সাধারণ মানুষ তখন ধর্মের প্রাণহীন আচার-অনুষ্ঠানে ক্লান্ত এবং দার্শনিক ব্যাখ্যার জটিলতায় বিভ্রান্ত। কাজেই তাহারা দলে দলে এই জড়বাদীদের সঙ্গে যোগ দিয়াছিল।

শ্রেণীগত সমস্যার সূচনা তখন হইতেই, এবং ভারত-ভূখণ্ডে আনুষ্ঠানিক ধর্ম, দার্শনিকতা ও জড়বাদের মধ্যে যে ত্রিমুখী বিরোধ আরম্ভ হইয়াছিল, আজ পর্যন্ত সেই বিরোধ অমীমাংসিত ভাবে অব্যাহত চলিয়া আসিতেছে।

এ বিরোধের প্রথম সমাধান-প্রচেষ্টা শুরু হয় ভাব-সমীকরণের সূত্র অনুসরণ করিয়া, যাহা স্মরণাতীত কাল হইতে জনসাধারণকে একই সত্য বিভিন্নভাবে দেখিতে শিখাইয়াছিল।

এই চিন্তাধারার মহান্ নেতা ক্ষত্রিয় শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং। তাঁহারই উপদেশ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। জৈন, বৌদ্ধ এবং অন্যান্য বহু সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থানের ও বিপর্যয়ের পর অবশেষে শ্রীকৃষ্ণ অবতার-রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন এবং যথার্থ জীবনদর্শন-রূপে গীতা স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল।

বর্ণাধিকারে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিবার জন্য রাজন্যবর্গের যে দাবি এবং পুরোহিতকুলের বিশেষ সুযোগ-সুবিধার বিরুদ্ধে জনসাধারণের বিক্ষোভ-জনিত যে-উত্তেজনা, তাহা সাময়িকভাবে প্রশমিত হইলেও তাহার মূলীভূত হেতু যে সামাজিক বৈষম্য, তাহা তখনও দূর হইল না, রহিয়াই গেল। শ্রীকৃষ্ণ জাতি-নির্বিশেষে, স্ত্রীপুরুষ-নির্বিশেষে সকলের সম্মুখে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু সামাজিক ক্ষেত্রে অনুরূপ সমস্যা তিনি স্পর্শ করেন নাই। সকলের সামাজিক সাম্যের জন্য বৌদ্ধ বৈষ্ণব প্রভৃতি সম্প্রদায়ের বিপুল সংগ্রাম সত্ত্বেও সেই অমীমাংসিত সমস্যা আমাদের কাল পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

তাই দেখা যায়, বর্তমান কালের ভারতবর্ষে মানুষের আধ্যাত্মিক সমতা স্বীকৃত হইলেও সামাজিক বৈষম্য দৃঢ়ভাবে রক্ষিত হইতেছে। আমরা দেখিতে পাই যে, সেই সামাজিক বৈষম্যের বিরোধ খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে নূতন শক্তি লইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে শাক্যমুনি বুদ্ধদেবের নেতৃত্বে প্রাচীন আচার-ব্যবস্থাদি একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। সেই সময় বিশেষ-অধিকার-ভোগী পুরোহিতবর্গের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়ায় বৌদ্ধগণ প্রাচীন বৈদিক আচার-অনুষ্ঠানের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি পর্যন্ত দূরে নিক্ষেপ করিয়াছিল। বৈদিক দেবতাদিগকে বৌদ্ধাচার্যগণের ভৃত্যশ্রেণীতে অবনমিত করিয়াছিল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে এই কথা ঘোষণা করিয়াছিল যে 'স্রষ্টা' বা 'সর্বনিয়ন্তা' বলিয়া কিছু নাই, উহা পুরোহিতগণের আবিষ্কার অথবা কুসংস্কার মাত্র।

পূজানুষ্ঠানে পশুবলি নিবারণ করিয়া বংশগত জাতিভেদ ও পুরোহিতকুলের আধিপত্য লুপ্ত করিয়া এবং আত্মার নিত্যত্বে অবিশ্বাস করিয়া বৌদ্ধধর্মের লক্ষ্য ছিল বৈদিক ধর্মের সংস্কার করা। বৌদ্ধধর্ম কখনও হিন্দুধর্মকে ধ্বংস করিতে চাহে নাই, প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থাও বিপর্যস্ত করিতে চাহে নাই। বৌদ্ধগণ একদল ত্যাগী সাধুকে একটি সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ে সুগঠিত করিয়াছিল, কতিপয় ব্রহ্মবাদিনী নারীকে সন্ন্যাসিনীরূপে গড়িয়া তুলিয়াছিল, আর যজ্ঞবেদীর স্থানে সিদ্ধ মহাপুরুষদের প্রতিমূর্তি স্থাপন করিয়াছিল। এই ভাবেই প্রাণশক্তি-সম্পন্ন একটি পদ্ধতি প্রবর্তিত হইয়াছিল।

খুব সম্ভব এই সংস্কারকগণ দীর্ঘকাল ধরিয়া ভারতের জনসাধারণের আনুগত্য লাভ করিয়াছিলেন, এবং যদিও প্রাচীন শক্তিসমূহ কখনই সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে নাই, তথাপি বৌদ্ধপ্রাধান্যের কালে তাহাদের মধ্যে প্রভূত পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল।…

প্রাচীন ভারতবর্ষের সর্বযুগেই মননশীলতা ও আধ্যাত্মিকতা জাতির প্রাণকেন্দ্র ছিল, রাজনীতি নয়। বস্তুতঃ আধুনিককালের মতো প্রাচীনকালেও রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতা বিদ্যাবুদ্ধি ও আধ্যাত্মিক চর্চার নিম্নে স্থান পাইত। ধর্মগুরু এবং আচার্যগণ যে-সকল শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালিত করিতেন, সেগুলিকে অবলম্বন করিয়াই জাতির জীবন-স্পন্দন উচ্ছ্বসিত হইতে থাকিত। সেইজন্য দেখা যায় যে পাঞ্চাল, বারাণসী ও মিথিলাবাসীদের সমিতিগুলি অধ্যাত্ম-সাধনা ও দার্শনিক উৎকর্ষের মহান্ কেন্দ্ররূপে গড়িয়া উঠিয়াছিল। কালক্রমে আবার এগুলিই আর্যসমাজের বিভিন্ন দল-উপদলের পক্ষে রাজনীতিক উচ্চাভিলাষ-পূরণের কর্মকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল।

আধিপত্য-লাভের জন্য কুরুপাঞ্চাল যে-যুদ্ধে পরস্পরকে ধ্বংস করিয়াছিল, সে-যুদ্ধের ইতিহাস প্রাচীন মহাকাব্য 'মহাভারতে'র মাধ্যমে আমরা পাইয়াছি। পূর্বাঞ্চলে মগধ ও মিথিলাকে ঘিরিয়াই আধ্যাত্মিক প্রাধান্য আবর্তিত হইয়াছিল এবং কুরু-পাঞ্চাল যুদ্ধের অবসানে মগধের রাজশক্তি কতকটা প্রাধান্য লাভ করে।

এই পূর্বাঞ্চলই বৌদ্ধদিগের প্রধান কর্মক্ষেত্র ছিল এবং সেখানেই তাহাদের সংস্কারমূলক কার্যাবলী অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। আবার যখন মৌর্য নরপতিগণ সম্ভবতঃ নিজেদের ক্ষতিকর কুল-কলঙ্কচিহ্ন স্খালন করিবার জন্য বাধ্য হইয়া ঐ নূতন আন্দোলনকে শুধু সমর্থন নয়, পরিচালিতও করিয়াছিলেন,—তখন নূতন পুরোহিত-শক্তি পাটলিপুত্রের রাজশক্তির সহিত হাত মিলাইয়াছিল।

একদিকে বৌদ্ধধর্মের জনপ্রিয়তা এবং নূতন প্রাণশক্তি যেমন মৌর্যরাজন্যবর্গকে ভারতবর্ষের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ সম্রাট্রূপে গৌরবান্বিত করিয়াছিল, অন্যদিকে তেমনি মৌর্যরাজশক্তির সাহায্যেই বৌদ্ধধর্ম সমগ্র বিশ্বে প্রসার লাভ করিয়াছিল এবং আজ পর্যন্ত তাহার চিহ্ন আমরা দেখিতে পাইতেছি।...

এ-কথা অবশ্য সত্য যে, প্রাচীন বৈদিক ধর্মের বর্জনশীলতা ও স্বাতন্ত্র্যবোধ বাহিরের কোন সাহায্য গ্রহণে তাহাকে নিবৃত্ত করিয়াছিল। ফলে বৈদিক ধর্ম নিজের শুচিতা যেমন রক্ষা করিতে পারিয়াছিল, তেমনি অনেক হীন প্রভাব হইতেও নিজেকে মুক্ত রাখিতে সক্ষম হইয়াছিল। কিন্তু প্রচারের অতি-উৎসাহে বৌদ্ধধর্মের পক্ষে সেটি সম্ভব হয় নাই।

অত্যধিক গ্রহণ-প্রবণতার জন্য বৌদ্ধধর্ম কালক্রমে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের প্রায় সবটুকুই হারাইয়া ফেলিয়াছিল এবং জনপ্রিয়তার চরম আগ্রহে কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই মূল বৈদিক ধর্মের তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা আর তাহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। বৈদিক সম্প্রদায় ইতিমধ্যে পশুবলি প্রভৃতি বহু অবাঞ্ছিত আচার-অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়াছে এবং প্রতিদ্বন্দ্বী বৌদ্ধ ধর্মের উদাহরণ হইতে শিক্ষাগ্রহণ করিয়া বিশেষ বিবেচনার সহিত মূর্তি-উপাসনা, মন্দিরে শোভা-যাত্রা প্রভৃতি জাঁকজমকপূর্ণ উৎসবাদির প্রভূত পরিবর্তন সাধন করিয়াছিল এবং যথাসময়ে পতনোন্মুখ ভারতীয় বৌদ্ধধর্মকে এককালে নিজ আবেষ্টনীর মধ্যে গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল।

সিথিয়ানদের ভারতাক্রমণ এবং পাটলিপুত্র-সাম্রাজ্যের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে সব যেন হুড়মুড় করিয়া ভাঙিয়া গেল। এই আক্রমণকারীর দল নিজেদের বাসভূমি মধ্য এশিয়ায় বৌদ্ধ

প্রচারকদের আক্রমণে ইতিপূর্বেই ক্রোধদীপ্ত হইয়াছিল। এখন ব্রাহ্মণ্যধর্মের সূর্যোপাসনার সহিত নিজেদের সৌরধর্মের প্রভৃত সাদৃশ্য তাহারা লক্ষ্য করিল এবং যখন ব্রাহ্মণগণ তাহাদের বহু আচার-পদ্ধতি নিজেদের ধর্মের অঙ্গীভূত করিয়া গ্রহণ করিতে সম্মত হইল, তখন সহজেই ইহারা ব্রাহ্মণদের পক্ষ অবলম্বন করিল।

তারপরই এক অন্ধকারময় যুগের কৃষ্ণযবনিকা, যার দীর্ঘ ছায়া ক্ষণে ক্ষণে ইতস্ততঃ প্রসারিত। কখন যুদ্ধের কোলাহল ও আর্তনাদ, কখন ব্যাপক নরহত্যার জনশ্রুতি—সে-কালের এই ছিল পরিস্থিতি, আর তাহার অবসানে এক নূতন অবস্থায় নূতন দৃশ্যের সূচনা হইয়াছিল।

তখন মগধ-সাম্রাজ্য আর নাই। প্রায় সমগ্র উত্তর ভারতবর্ষ পরস্পর-বিবদমান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্তরাজ কর্তৃক শাসিত হইতেছে। পূর্বাঞ্চলে ও হিমালয়ের সন্নিহিত কোন কোন প্রদেশে এবং সুদূর দক্ষিণে ছাড়া সমগ্র ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম তখন লুপ্তপ্রায়। আর সেই পরিস্থিতির মধ্যেই বংশানুক্রমিক পুরোহিতশক্তির সঙ্গে দীর্ঘ সংগ্রামের পর জাতি জাগিতেছে; জাগিয়া উঠিয়া দেখিল, জাতির জীবন একদিকে বংশগত ব্রাহ্মণের অন্যদিকে নবযুগের বর্জনশীল সন্ন্যাসীর—এই দ্বিবিধ পৌরোহিত্যের কবলে; এই সন্ন্যাসি-সম্প্রদায় বৌদ্ধ-সংগঠনী-শক্তির অধিকারী হইলেও বৌদ্ধদের মতো জনসাধারণের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিল না।···

ইহার পর প্রাচীনের ধ্বংসস্তূপ হইতেই নবজাগ্রত ভারতবর্ষের অভ্যুত্থান হইয়াছিল। নির্ভীক রাজপুতজাতির বীর্যে ও শোণিতের বিনিময়ে সে-ভারতবর্ষের জন্ম, মিথিলার সেই ঐতিহাসিক জ্ঞান-কেন্দ্রের নির্মম ক্ষুরধারবুদ্ধি জনৈক ব্রাহ্মণ কর্তৃক সেই নবভারতের স্বরূপ ব্যাখাত; আচার্য শঙ্কর এবং তাঁহার সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়-প্রবর্তিত এক নূতন দার্শনিক ভাবের দ্বারা সেই ভারত পরিচালিত এবং মালবের সভাকবি ও সভাশিল্পিবৃন্দের সাহিত্য ও শিল্পদ্বারা সে-ভারত সৌন্দর্য-মণ্ডিত।

নবজাগ্রত ভারতের সম্মুখে দায়িত্ব ছিল গুরুতর, সমস্যা ছিল বিরাট, যে-সমস্যা পূর্বপুরুষদের সম্মুখেও কখন উপস্থিত হয় নাই।

তুলনীয় অবস্থাটি ছিল এই: প্রথম যুগের একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও সংহত জাতি; একই রক্তস্রোত যাহাদের মধ্যে প্রবাহিত, যাহাদের ভাষা ও সামাজিক আকাঙ্ক্ষা-অভিলাষ এক এবং দুর্লঙ্ঘ্য প্রাকার-বেষ্টনীর অন্তরালে নিজেদের ঐক্য-সংরক্ষণে যাহারা নিয়ত যত্নশীল,—সেই জাতিই বৌদ্ধপ্রাধান্যের কালে বহু সংযোজন ও বিস্তারের ফলে এক বিপুল আয়তন লাভ করিয়াছিল। আবার বর্ণ, ভাষা, ধর্মসংস্কার, সামাজিক উচ্চাভিলাষ প্রভৃতি বিপরীত প্রভাবে সেই জাতিই বহু বিবদমান গোষ্ঠীতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। এখন সেইগুলিকে একটি বিরাট সঙ্ঘবদ্ধ জাতিতে গড়িয়া তোলাই এক প্রকৃত সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বৌদ্ধগণও অবশ্য এই সমস্যার সমাধানে অগ্রসর হইয়াছিলেন, কিন্তু তখন তাহার আয়তন ও গুরুত্ব এত বিস্তৃত ছিল না।

তখন পর্যন্ত প্রশ্ন ছিল, আর্যজাতিভুক্ত হইবার জন্য যে-সকল মানবগোষ্ঠী আগ্রহান্বিত, তাহাদিগকে স্বকীয় সংস্কৃতিতে অনুপ্রাণিত করিয়া বহুবিচিত্র উপাদান-সমন্বিত এক বিরাট আর্যদেহ গড়িয়া তোলা।······বিশেষ সুবিধাদানের এবং আপসের মনোভাব সত্ত্বেও বৌদ্ধধর্ম

প্রভূত সাফল্য অর্জন করিয়াছিল, এবং ভারতবর্ষের জাতীয় ধর্মরূপে বিরাজিত ছিল। কিন্তু কালক্রমে যখন তাহাদের ইতরজাতি-সুলভ ইন্দ্রিয়াসক্তি-বহুল উপাসনার প্রলোভন আর্যগোষ্ঠীর অস্তিত্বের পক্ষেই মারাত্মক হইয়া উঠিয়াছিল, এবং সে-সংযোগ দীর্ঘতর কালের জন্য স্থায়ী হইলে আর্যসভ্যতা নিঃসন্দেহে বিনষ্ট হইত। ইহার পর স্বভাবতই আত্মরক্ষার একটি স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এবং নিজবাসভূমিতে স্বতন্ত্র ধর্মসম্প্রদায়রূপে বৌদ্ধধর্ম আর টিকিয়া থাকিতে পারে নাই।

সেই প্রতিক্রিয়া-আন্দোলন উত্তরে কুমারিল্ল এবং দক্ষিণে আচার্য শঙ্কর ও রামানুজ-কর্তৃক পরিচালিত হইয়া বহু মত, বহু সম্প্রদায়, বহু পূজা-পদ্ধতি পুঞ্জীভূত হইয়া হিন্দুধর্মে তাহার শেষ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। বিগত সহস্র বৎসর কিংবা তদপেক্ষা অধিক কাল ধরিয়া এই অঙ্গীভূত করাই এই ছিল তাহার প্রধান কাজ। মাঝে মাঝে দেখা দিত সাময়িক সংস্কার-আন্দোলন।

এই প্রতিক্রিয়া প্রথমতঃ বৈদিক আচার-অনুষ্ঠানগুলির পুনঃপ্রবর্তনের চেষ্টা করিয়াছিল। পরে তাহাতে ব্যর্থ হইয়া বেদের দার্শনিক ভাগ বা উপনিষদ্‌সমূহকেই ভিত্তিরূপে স্থাপন করিয়াছিল।

এই আন্দোলন ব্যাসদেবের মীমাংসা-দর্শন এবং শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ গীতাকে পুরোভাগে স্থাপন করিয়াছিল এবং পরবর্তীকালের যাবতীয় আন্দোলন ঐ পন্থা অবলম্বন করিয়াই অগ্রসর হইয়াছিল। শঙ্করাচার্যের আন্দোলন অতি উচ্চ জ্ঞান-মার্গেই চালিত হইয়াছিল। কিন্তু জাতিভেদে অতিনিষ্ঠা, সহজ ভাবাবেগ সম্পর্কে ঔদাসীন্য এবং শুধু সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে প্রচার—এই ত্রিবিধ কারণে জনসাধারণের মধ্যে সে আন্দোলন বিশেষ ফলপ্রসূ হয় নাই। অন্যদিকে রামানুজ একটি অত্যন্ত কার্যকর ও বাস্তব মতবাদের ভিত্তিতে এবং ভাব-ভক্তির বিরাট আবেদন লইয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন। ধর্মোপলব্ধির ক্ষেত্রে জন্মগত জাতিবিভাগ তিনি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিলেন, সর্বসাধারণের কথ্যভাষাই ছিল তাঁহার প্রচারের ভাষা। ফলে জনসাধারণকে বৈদিক ধর্মের আবেষ্টনীতে ফিরাইয়া আনিতে রামানুজ সম্পূর্ণভাবে সফল হইয়াছিলেন।

উত্তরাঞ্চলে সে প্রতিক্রিয়ার পরেই মালব সাম্রাজ্যের সাময়িক গৌরবদীপ্তি দেখা দিয়াছিল। কিন্তু অতি অল্পকাল মধ্যেই তাহার অবসান ঘটিলে উত্তর-ভারত যেন দীর্ঘকালের জন্য গাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইল। আর সে-নিদ্রা রূঢ়ভাবে ভাঙিয়াছিল আফগানিস্তানের গিরিবর্ত্ম দিয়া সবেগে সম্মুখে ধাবমান মুসলমান অশ্বারোহী দলের বজ্রনিনাদে।

যাহা হউক, দক্ষিণাঞ্চলে শঙ্কর ও রামানুজের অভ্যুদয়ের পরই এ-দেশের স্বাভাবিক নিয়মানুসারে একতাবদ্ধ জাতি ও শক্তিশালী সাম্রাজ্যের উদ্ভব হইয়াছিল। কাজেই দক্ষিণ ভারতবর্ষই তখন ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির আশ্রয়ভূমি হইয়া উঠিয়াছিল; আর, এক সমুদ্রতীর হইতে অন্য সমুদ্রতীর পর্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র উত্তর-ভারতবর্ষ—মধ্যএশিয়ার বিজেতাদের পাদমূলে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল।

দক্ষিণভারতকে পদানত করিবার জন্য মুসলমানগণ শতাব্দীর পর শতাব্দী চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু সে অঞ্চলের কোথাও একটি শক্ত ঘাঁটিও স্থাপন করিতে পারে নাই। বস্তুতঃ সঙ্ঘবদ্ধ ও শক্তিশালী মোগল সাম্রাজ্যের দক্ষিণবিজয় যখন প্রায় সমাপ্তির মুখে, ঠিক সেই সময়

সেই ভূখণ্ডের পার্বত্যপ্রদেশ হইতে, মালভূমির নানাপ্রান্ত হইতে কৃষকগণ অশ্বারোহী যোদ্ধবেশে দলে দলে, কাতারে কাতারে রণক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। রামদাস-প্রচারিত, তুকারাম-সমুদ্গীত ধর্মের জন্য তাহারা প্রাণ বিসর্জন দিতে কৃতসঙ্কল্প; এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে বিশাল মোগল সাম্রাজ্য নামমাত্রে পর্যবসিত হইল।

মুসলমানযুগে উত্তরভারতে বিজয়ীজাতির ধর্মে দীক্ষা-গ্রহণ হইতে জনসাধারণকে নিবৃত্ত রাখাই ছিল সকল আন্দোলনের মুখ্য প্রয়াস: তাহারই ফলে সে-সময়ে ধর্মজগতে এবং সমাজ-ব্যবস্থায় সমানাধিকারের ভাব দেখা দিয়াছিল।

রামানন্দ, কবীর, দাদূ, শ্রীচৈতন্য বা নানক এবং তাঁহাদের সম্প্রদায়ভুক্ত সাধুসন্তগণ দার্শনিক বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী হইলেও মানুষের সম-অধিকার প্রচার বিষয়ে সকলে এক-মত ছিলেন। সাধারণের মধ্যে ইসলামের অতি দ্রুত অনুপ্রবেশ রোধ করিতেই ইঁহাদের অধিকাংশ শক্তি ব্যয়িত হইয়াছে: কাজেই নূতন আকাঙ্ক্ষা বা আদর্শ উদ্ভাবন তখন তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। বস্তুতঃ যদিও জনসাধারণকে নিজধর্মের আবেষ্টনীতে ধরিয়া রাখিবার জন্য তাঁহাদের প্রয়াস অনেকটা ফলপ্রসূ হইয়াছিল, এবং মুসলমানদিগের উগ্র-সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামিও কতকটা প্রশমিত করিতে তাঁহারা সক্ষম হইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহারা ছিলেন নিছক আত্মসমর্থনকারী; কোনপ্রকারে শুধু বাঁচিয়া থাকার অধিকার লাভ করিবার জন্যই তাঁহারা প্রাণপণ সংগ্রাম করিতেছিলেন।

এইকালে উত্তরভারতে একজন শক্তিমান্ দিব্য পুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল। সৃজনী প্রতিভাসম্পন্ন শেষ শিখগুরু—গুরু গোবিন্দসিংহের আধ্যাত্মিক কার্যাবলীর ফলেই শিখসম্প্রদায়ের সর্বজনবিদিত রাজনৈতিক সংস্থা গড়িয়া উঠিয়াছিল। ভারতের ইতিহাসে বরাবর দেখা গিয়াছে যে-কোন আধ্যাত্মিক অভ্যুত্থানের পরে, তাহারই অনুবর্তিভাবে একটি রাষ্ট্রনীতিক ঐক্যবোধ জাগ্রত হইয়া থাকে এবং ঐ বোধই আবার যথানিয়মে নিজ জনয়িত্রী যে বিশেষ আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা, তাহাকে শক্তিশালী করিয়া থাকে। কিন্তু মহারাষ্ট্র বা শিখ সাম্রাজ্যের উত্থানের প্রাক্কালে যে আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইয়াছিল, তাহা ছিল সম্পূর্ণরূপে প্রতিক্রিয়াশীল। মালব কিংবা বিদ্যানগরের কথা দূরে থাকুক, মোগলদরবারেও তদানীন্তন কালে যে প্রতিভা ও বুদ্ধিদীপ্তির গৌরব ছিল, পুণার রাজদরবার কিংবা লাহোরের রাজসভায় বৃথাই আমরা সে-দীপ্তির অনুসন্ধান করিয়া থাকি। মানসিক উৎকর্ষের দিক হইতে এই যুগই ভারতেতিহাসের গাঢ়তম তমিস্রার যুগ এবং ঐ দুই ক্ষণপ্রভ সাম্রাজ্য—ধর্মান্ধ গণ-অভ্যুত্থানের প্রতিনিধিস্বরূপ ছিল, সর্ববিধ সাংস্কৃতিক উৎকর্ষের তাহারা একান্ত বিরোধী; উভয়েই মুসলমান-রাজত্ব-ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গেই নিজেদের সকল প্রেরণা ও কর্মপ্রবৃত্তি হারাইয়া ফেলিয়াছিল।...

তারপর আবার এক বিশৃঙ্খলতার যুগ উপস্থিত হইল। শত্রু ও মিত্র, মোগলশক্তি ও তাহার ধ্বংসকারীরা এবং তৎকাল পর্যন্ত শান্তিপ্রিয় ফরাসী ও ইংরেজ-প্রমুখ বিদেশী বণিকৃদল এক ব্যাপক হানাহানিতে লিপ্ত হইয়াছিল। প্রায় অর্ধ-শতাব্দীরও অধিক কাল যুদ্ধ, লুণ্ঠন ও ধ্বংসছাড়া দেশে আর কিছুই ছিল না। পরে সে তাণ্ডবের ধূমধূলি

যখন অপসারিত হইল, তখন দেখা গেল সকলের উপর জয়লাভ করিয়া সদম্ভ পদবিক্ষেপে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—ইংরেজ-শক্তি। সেই শক্তির শাসনাধীনেই অর্ধশতাব্দীকাল ধরিয়া দেশে শান্তি ও আইন-শৃঙ্খলা অব্যাহত। অবশ্য সে শৃঙ্খলা যথার্থ উন্নতির দ্যোতক কিনা—কালের নিকষেই তাহা পরীক্ষিত হইবে।

দিল্লীর বাদশাহী আমলে উত্তরভারতীয় সম্প্রদায়গুলি যে ধরনের ধর্ম-আন্দোলন করিত, ইংরেজ আমলেও ভারতের জনসাধারণের মধ্যে সে ধরনের কিছু কিছু আন্দোলন দেখা গিয়াছিল। কিন্তু সে-সব ছিল যেন মৃত বা মৃতকল্পের কণ্ঠধ্বনির মতো—ভয়ার্ত এক জাতির শুধু বাঁচিয়া থাকার অধিকারের জন্য ক্ষীণ আবেদন। বিজেতাদের রুচি ও অভিপ্রায় অনুসারে নিজেদের ধর্মগত ও সমাজগত যে-কোন পরিবর্তন সাধন করিতে তাহারা একান্ত উদ্‌গ্রীব, বিনিময়ে শুধু বাঁচিয়া থাকিবার অধিকারটুকুই ছিল তাহাদের প্রার্থনা। আর ইংরেজ-শাসনে বিজেতাদিগের সহিত তাহাদের ধর্ম অপেক্ষা সামাজিক পার্থক্যই ছিল স্পষ্টতর।

মনে হয়, এ-শতকের হিন্দু সংস্কার সম্প্রদায়গুলির একটি মাত্র আদর্শ ছিল—তাহাদের ইংরেজ প্রভুর সমর্থন-লাভ। কাজেই ইহাদের অস্তিত্ব যে ব্যাঙের ছাতার মতো ক্ষণিক হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য কি?

ভারতের বৃহৎ জনসমাজ অতি নিষ্ঠার সহিত এই সম্প্রদায়গুলিকে দূরে পরিহার করিয়া চলিত। জনসাধারণের কাছে ইহাদের স্বীকৃতি ছিল মৃত্যুর পরে, অর্থাৎ এগুলি লোপ পাইলেই যেন তাহারা আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত।

সম্ভবতঃ আরও কিছুকাল এইরূপই চলিবে, অন্য রূপ হইতে পারে না।*

Characteristic of the Hindu race

This analytical power and the boldness of poetical visions, which urged it onward are the two great internal causes in the make-up of Hindu race. They together, formed as it were, the keynote to the national character.

This combination is what is always making the race press onward beyond the senses—the secret of those speculations which are like the steel blades the artisans used to manufacture—cutting through bars of iron, yet pliable enough to be easily bent into a circle

—*Vivekananda*

* ইংরেজীতে লিখিত 'Historical Evolution of India' প্রবন্ধের অনুবাদ : শ্রীতামসরঞ্জন রায়।
দ্রষ্টব্য : Complete Works of Swami Vivekananda—Vol. VI, Pp. 128—138

চতুর্বর্গ অথবা পুরুষার্থ-চতুষ্টয়

ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য

প্রত্যেক শাস্ত্রে পুরুষার্থের উল্লেখ প্রায়ই দেখা যায় এবং লোকেও সামান্যভাবে 'পুরুষার্থ'-শব্দের প্রয়োগ করে ও একটা সাধারণ অর্থ বোঝে। কিন্তু এই পুরুষার্থের পরিষ্কার ধারণা আমাদের অনেকেরই নাই অথচ ইহার উপরেই মানুষের যাবতীয় চেষ্টা; সেইজন্য সংক্ষেপে সহজভাবে ইহার আলোচনা করা যাইতেছে।

ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া তৃণ পিপীলিকা পর্যন্ত সকল জীবই সুখ পাইতে ও দুঃখ দূর করিতে চায়। এইজন্য সুখপ্রাপ্তি ও দুঃখ-নিবৃত্তি সকল জীবের কাম্য। এই বিষয়ে কাহারও বিবাদ নাই। তবে যে কুন্তী ভগবানের নিকট বিপদ চাহিয়াছিলেন,[১] তাহার অভিপ্রায় ভিন্ন। তাহার অভিপ্রায় এই যে, বিপদের সময় মানুষ ভগবানের চিন্তা করে, সম্পদে প্রায়ই ভগবানের কথা ভুলিয়া যায়। ভগবানের চিন্তা করিলে ভগবানে ভক্তি হয় এবং তাহার ফলে জ্ঞান লাভ করিয়া মানুষ মুক্ত হয়। অথবা ভগবানের আনন্দ (সুখবিশেষ) লাভ করিয়া সংসারমুক্ত হয়। সুতরাং কুন্তীরও নিত্য ভগবদানন্দলাভের ইচ্ছাই মুখ্য। বিপদ্‌প্রাপ্তির ইচ্ছা গৌণ। সুতরাং সুখ ও দুঃখনিবৃত্তি সকল জীবের মুখ্য পুরুষার্থ। পুরুষ যাহা চায়, তাহাই পুরুষার্থ।[২] কিন্তু এই সুখ ও দুঃখনিবৃত্তি কি উপায়ে লব্ধ হইবে, তাহা সকল জীব জানে না। উহা জানাইবার জন্যই শাস্ত্রের প্রবৃত্তি। মনুষ্যভিন্ন অন্যজীবের শাস্ত্রে অধিকার নাই। সেইজন্য বলা যাইতে পারে, মনুষ্যভিন্ন জীব ঐকান্তিক সুখপ্রাপ্তির ও দুঃখনিবৃত্তির ভাগী হয় না। যদিও দেবতাদের আত্মজ্ঞানে অধিকার আছে এবং তাহার ফলে তাহাদের মুক্তি হয়, তথাপি সেই দেবজন্মও মনুষ্যজন্মের শাস্ত্রকৃত কর্মের ফল এবং মনুষ্যজন্মে বেদাদি-শাস্ত্র-শ্রবণের ফলেও দেবজন্মে জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে। অতএব একমাত্র মানুষেরই শাস্ত্রে অধিকার।

শাস্ত্রে চারি প্রকার পুরুষার্থ বর্ণিত আছে। এখানে 'পুরুষ' শব্দের অর্থ 'মানুষ'। আর 'অর্থ' শব্দের অর্থ 'প্রয়োজন'। তাহা হইলে 'পুরুষার্থে'র ফলিত অর্থ হইল 'মানুষের প্রয়োজন'। অথবা পুরুষ অর্থাৎ মানুষ যাহা প্রার্থনা করে—চায়, তাহা পুরুষার্থ।

এই পুরুষার্থ কয় প্রকার এবং ইহার ক্রম কি, এই বিষয়ে পৃথিবীর উৎপত্তির প্রথম হইতে বিবাদ চলিয়া আসিতেছে। যেমন—কেহ কেহ অর্থাৎ কোন কোন চার্বাক বলেন, 'কাম'ই একমাত্র পুরুষার্থ। কোন চার্বাক বলেন, 'অর্থ ও কাম' এই দুইটিই পুরুষার্থ। 'অর্থ' ব্যতীত 'কাম' সিদ্ধ হয় না; সেইজন্য দ্বিতীয় বাদীদিগের মতে 'অর্থ'ও একটি পুরুষার্থ। আবার কোন কোন বেদবাদী বলিতেন, 'ধর্ম'ই একমাত্র পুরুষার্থ; যেহেতু 'ধর্ম' হইতেই 'অর্থ ও কাম' সিদ্ধ হয়। এই সমস্ত বিবাদ যে প্রাচীন কালেও হইত, তাহা

---

১ বিপদঃ সন্তু নঃ শশ্বৎ তত্র তত্র জগদ্‌গুরো।
ভবতো দর্শনং যৎ স্যাদপুনর্ভবদর্শনম্॥
[শ্রীমদ্‌ভাগবত ১।৮।২৫]

২ পুরুষেণ অর্থ্যতে প্রার্থ্যতে যঃ স পুরুষার্থঃ। অর্থাৎ পুরুষ (মানুষ) কর্তৃক যাহা প্রার্থিত হয়, তাহা পুরুষার্থ।

মনুসংহিতার নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটি [২।২২৪] হইতে পরিষ্কার বুঝা যায়। যথা :

ধর্মার্থাবুচ্যতে শ্রেয়ঃ কামার্থৌ ধর্ম এব চ।
অর্থ এবেহ বা শ্রেয়স্ত্রিবর্গ ইতি তু স্থিতিঃ॥

অর্থাৎ কাহারও কাহারও মতে 'ধর্ম ও অর্থ' এই দুইটি শ্রেয়ঃ; কাহারও মতে 'কাম ও অর্থ'ই শ্রেয়ঃ; আবার কেহ বলেন, 'ধর্ম'ই শ্রেয়, কাহারও মতে 'অর্থ'ই শ্রেয়। কিন্তু মহামতি মনুর মতে ভোগেচ্ছুর পক্ষে 'ধর্ম, অর্থ ও কাম' এই তিনটি শ্রেয়ঃ। মহর্ষি মনু অন্যত্র 'মোক্ষ'কে পুরুষার্থ, শুধু পুরুষার্থ নয়, পরম পুরুষার্থ বলিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার মতে 'ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ' এই চতুর্বিধ পুরুষার্থ। মনু বেদজ্ঞ মহর্ষি। সুতরাং 'ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ' এই চতুর্বিধ পুরুষার্থ যে বেদের মত, তাহা নিশ্চিতভাবে অনুমান করা যায়। এতদ্ব্যতীত বেদে বিভিন্ন স্থলে উক্ত চারিপ্রকার পুরুষার্থের উল্লেখ আছে। বিস্তৃতি-ভয়ে তাহার উল্লেখ করিলাম না। সংক্ষেপে উপনিষদ্ হইতে দুই-একটির উল্লেখ করা যাইতেছে।

'স নৈব ব্যভবৎ তচ্ছ্রেয়োরূপমত্য-সৃজত ধর্মম্' [বৃঃ উঃ ১।৪।১৪], তিনি (সৃষ্টিকর্তা) কর্মে সমর্থ হইলেন না, তখন অতিশয় শ্রেয়োরূপ ধর্ম সৃষ্টি করিলেন। 'স হ প্রাতঃ সঞ্জিহান উবাচ যদ্বতান্নস্য লভেমহি লভেমহি ধনমাত্রাম্' [ছাঃ উঃ ১।১[illegible]], সেই চাক্রায়ণ ঋষি প্রাতঃকালে শ[illegible]-ত্যাগ করিয়া (তাঁহার স্ত্রীকে শুনাইয়া শুনাইয়া) বলিতে লাগিলেন, যদি কিছু অন্ন খাইতে পাইতাম, তাহা হইলে কিছু ধন লাভ করিতে পারিতাম। ধন যে অর্থেরই পর্যায়, তাহা আর বলিতে হইবে না। 'স কামঃ সমৃধ্যেত যৎকামঃ স্তুবীতেতি' [ছাঃ উঃ ১।৩।১২], যাহা (ভোগ্য-বিষয়) কামনা করিয়া স্তব করে, সেই কাম্য বিষয় সমৃদ্ধ হয়। 'পুনরাবৃত্তিরহিতাং মুক্তিং প্রাপ্নোতি মানবঃ' [মুক্তিকোপনিষৎ ১।২০], ভগবদ্ভ-জনকারী ব্যক্তি তাঁহার কৃপায় জ্ঞান লাভ করিয়া পুনর্জন্মরহিত মুক্তি প্রাপ্ত হয়। অগ্নিপুরাণে স্পষ্টই আছে 'ধর্মার্থকামমোক্ষাশ্চ পুরুষার্থা উদাহৃতাঃ'। সুতরাং বৈদিক মতে 'ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ' এই চারিপ্রকারই পুরুষার্থ, ইহা সিদ্ধ হইল।

বৌদ্ধ ও জৈন মতে 'অর্থ ও কাম'কে হেয় বলা হইলেও সংসারীলোকের পুরুষার্থ, ইহা বলা হইয়াছে। যাহা হউক চতুর্বিধ পুরুষার্থ বিষয়ে আস্তিকগণের বিবাদ নাই। এই চারি প্রকার পুরুষার্থের মধ্যে প্রথমে অর্থ ও কামের সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা হইতেছে। কারণ ধর্মের সম্বন্ধে একটু অধিক বর্ণনীয় আছে।

এখানে 'অর্থ' বলিতে টাকাপয়সা, বুঝিতে হইবে। যদিও 'অর্থ'শব্দের ধাতুগত অর্থ—যাহা চাওয়া যায় অর্থাৎ ইচ্ছার বিষয় তাহা, তথাপি 'ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ' চারিটিই ইচ্ছার বিষয় হওয়ায়, সবই অর্থের মধ্যে পড়িয়া যাওয়ায় চারি প্রকার বিভাগের ব্যর্থতা হইয়া যায়। এইজন্য উক্ত অর্থের সঙ্কোচ করিয়া এখানে অর্থ-শব্দে টাকাপয়সা প্রভৃতি বুঝিতে হইবে।

কাম-শব্দের ভাববাচ্যে নিষ্পন্নরূপের অর্থ কামনা বা 'ইচ্ছা'। সেই অর্থ এখানে অভিপ্রেত নয়। কারণ পুরুষ (মানুষ) যাহা ইচ্ছা করে, তাহাই এখানে পুরুষার্থ। 'ইচ্ছা'কে ইচ্ছা করা যায় না; অতএব 'ইচ্ছা' পুরুষার্থ নয়। ইচ্ছার বিষয়ই পুরুষার্থ। এইজন্য এখানে কাম-শব্দের কর্মবাচ্যে নিষ্পন্নরূপের অর্থ ধরিতে হইবে। অর্থাৎ 'কাম্যতে যঃ' এইরূপ অর্থে কাম-শব্দটি বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে কাম-শব্দের অর্থ

হইল—মানুষ যাহা কামনা করে। কিন্তু মানুষ অধিকারভেদে ধর্ম, অর্থ, বিষয় বা বিষয়সুখ ও মুক্তি কামনা করে। সুতরাং সমস্ত পুরুষার্থই কাম-শব্দের অর্থ দাঁড়াইয়া যায়। এইজন্য ধর্ম, অর্থ ও মুক্তি ভিন্ন যাহা পুরুষের অভিপ্রেত, তাহাকেই এখানে কাম-শব্দের বাচ্যার্থ বলিতে হইবে। অতএব অন্ন, পানীয়, বস্ত্র, গো, ভূমি, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ ইত্যাদি ভোগ্য ঐহিক ও পারলৌকিক বিষয়সকলকে এখানে কাম-শব্দের বাচ্যার্থ বুঝিতে হইবে।

প্রশ্ন হইতে পারে অন্ন, পানীয়, বস্ত্র প্রভৃতি যদি কাম-শব্দের অর্থ হয়, তাহা হইলে চতুর্বর্গের ক্রম 'কাম, অর্থ, ধর্ম ও মোক্ষ'—এইরূপ হওয়াই যুক্তিযুক্ত। কারণ লোকের অন্ন, পানীয় প্রভৃতিই প্রথম আকাঙ্ক্ষিত, অধিকাংশ লোক ও সকল প্রাণীই খাদ্য, পানীয়, স্ত্রী প্রভৃতি চায়। উহার জন্য অর্থের প্রয়োজন বলিয়া কামের পরে অর্থ আকাঙ্ক্ষিত বস্তু। ধর্মের আকাঙ্ক্ষা মনুষ্য ভিন্ন জীবের হয়ই না। মানুষের মধ্যেও অল্প লোকই ধর্ম চায়; মুক্তির প্রার্থী অতি বিরল।

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, সকল প্রাণীর প্রার্থিত পদার্থের ক্রম এখানে অভিপ্রেত নহে। যদি সকল প্রাণীর প্রার্থিত বস্তুর কথা বলা হইত, তাহা হইলে 'পুরুষার্থ'-শব্দের প্রয়োগ না করিয়া 'ভূতার্থ' বা 'প্রাণ্যর্থ' ইত্যাদি রূপ শব্দের প্রয়োগ করা হইত। 'পুরুষ' বলিতে মানুষকেই প্রধানতঃ বুঝায়। সেইজন্য মানুষেরই অভিলষিত বস্তুর ক্রম এখানে 'পুরুষার্থ'-শব্দে অভিহিত হওয়ায় কাম, অর্থ—এইরূপ ক্রম হইতে পারে না। তা-ছাড়া মানুষ ভিন্ন নিম্ন-স্তরের প্রাণীর ধর্ম ও মোক্ষ হয় না। দেবতা প্রভৃতি উর্ধ্বস্তরের প্রাণীর মোক্ষ হইলেও ধর্ম হয় না। দেবতাদের ধর্ম হয় না—ইহা জৈমিনি আচার্যের মত। মীমাংসাশাস্ত্রে ইহা প্রতিপাদন করা হইয়াছে, এবং বেদান্তদর্শনে প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে দেবতাধিকরণে প্রসঙ্গ-ক্রমে উল্লিখিত হইয়াছে। আর দেবতাদের মুক্তি হইতে পারে, ইহা দেবতাধিকরণে বিস্তৃত ভাবে সাধন করা হইয়াছে।

মানুষের মধ্যে অধিকাংশ মানুষ কাম ও অর্থের প্রার্থী হইলেও যেরূপ কাম ও অর্থ অর্জন করিলে মানুষ হীন জন্ম প্রাপ্ত না হয়, সেইরূপ কাম ও অর্থ যাহাতে তাহাদের অভিপ্রেত হয়, তাহা বিধান করিবার জন্য শাস্ত্র প্রথমে ধর্মের উল্লেখ করিয়া পরে ক্রমে অর্থ, কাম ও মোক্ষের নাম নির্দেশ করিয়াছে। সুতরাং অর্থ ও কাম যাহাতে ধর্মমূলক হয়, অধর্মমূলক না হয়—ইহা শাস্ত্রের অভিপ্রেত। সেইজন্য সকলের অপেক্ষা ধর্মের গুরুত্ব অধিক। ধর্ম হইতেই অর্থ, কাম ও এমন কি মোক্ষও সম্পাদিত হয়। যে ধর্মের এত মহিমা সে-ধর্মের স্বরূপ কি, তাহার লক্ষণ কি ও তদ্বিষয়ে প্রমাণ কি ও উহার ফল কি?—এইরূপ জিজ্ঞাসা লোকের স্বভাবতই হয়। সেইজন্য অতি সংক্ষেপে ধর্মের সম্বন্ধে উক্ত প্রশ্নের উত্তর-রূপে বর্ণনা করা হইতেছে।

যাহা লোককে ধরিয়া রাখে অথবা যাহা দ্বারা লোক ধৃত হয়—এইরূপ কর্তৃবাচ্যে অথবা কর্মবাচ্যে ধৃ-ধাতুর উত্তর মন্-প্রত্যয় করিয়া ধর্ম শব্দটি[৩] নিষ্পন্ন হইয়াছে। কোন্ বস্তু জগৎকে ধরিয়া রাখে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, বাস্তবিক পক্ষে আত্মাই জগৎকে ধরিয়া রাখে। সমস্ত বিশ্বই আত্মাতে স্থিত। বৃহদারণ্যক উপনিষদেও আছে এই অক্ষরব্রহ্মেই সমস্ত

---

৩ ধৃ+(ভৃ্—উ) ধাতুর উত্তর—অর্তিস্তুসুহুসৃধৃক্ষি-ক্ষুভায়াবাপদিযক্ষিনীভ্যো মন্ [সিদ্ধান্তকৌমুদী উণাদিসূত্র] এই সূত্রানুসারে 'ধর্ম'-শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে।

বিধৃত[৪]। 'আত্মা' অর্থে মাণ্ডূক্য-কারিকায় এবং অন্যান্য উপনিষদেও ধর্ম-শব্দের প্রয়োগ আছে। কিন্তু এখানে ধর্ম-শব্দের 'আত্মা'-অর্থ গ্রাহ্য নহে। কারণ তাহা পুরুষের স্বরূপ বলিয়া ত্যাজ্য বা গ্রাহ্য নয়। যাহা ত্যাজ্য বা গ্রাহ্য নয়, তাহা পুরুষের অভিপ্রেত হয় না। যদিও মুক্তি বস্তুতঃ ত্যাজ্য বা গ্রাহ্য নয়, তথাপি গ্রাহ্যরূপে মনে হয় বলিয়া পুরুষার্থ। এ-সম্বন্ধে পরে আলোচনা হইবে। সুতরাং এখানে 'ধর্ম' বলিতে পুণ্যাত্মক কর্মই গ্রহণীয়; এই পুণ্যাত্মক কর্ম কি, কিরূপে তাহা ধর্মপদবাচ্য, তাহাই আলোচ্য। বৌদ্ধ বলেন, চিত্তের শুভ বাসনাই ধর্ম। জৈনমতে সূক্ষ্মমূর্তিবিশিষ্ট দেহাদির উৎপাদক পুদ্গল 'ধর্ম'-শব্দ বাচ্য। সাংখ্য- ও যোগমতে মনের বৃত্তিবিশেষই ধর্ম। বৈশেষিক-মতে আত্মার বিশেষ গুণই ধর্ম। প্রাভাকর- ও নৈয়ায়িক মতে বিহিত যাগাদি-ক্রিয়া-জন্য 'অপূর্ব'ই ধর্ম-শব্দের বাচ্য। ভট্টমতে যাগাদি-ক্রিয়াকেই 'ধর্ম' বলা হয়। জৈমিনি ধর্মের লক্ষণ করিয়াছেন—'চোদনা লক্ষণোঽর্থো ধর্মঃ' [মীঃ সূঃ ১।১।২]। অর্থাৎ যাহা লোকের প্রীতির হেতু অথচ বেদের বিধিবাক্য হইতে গম্য, তাহাই 'ধর্ম'। যেমন জ্যোতিষ্টোম-নামক যাগ স্বর্গাদি প্রীতির হেতু এবং বেদবিধি-গম্য। অতএব উক্ত যাগ ধর্ম-পদের অর্থ। চোদনা-শব্দের অর্থ প্রবর্তক বা নিবর্তক বাক্য—অর্থাৎ যে বাক্য হইতে লোকের কোন অভিলষিত বিষয়ে প্রবৃত্তি অথবা অনিষ্ট বিষয় হইতে নিবৃত্তি হয়, তাহাকে 'চোদনা' বলে। যেমন 'স্বর্গকামো যজেত'; 'স্বারাজ্যকামো রাজসূয়েন যজেত'; 'ব্রাহ্মণো ন হন্তব্যঃ'। স্বর্গকামী ব্যক্তি যাগ করিবে; স্বারাজ্যকামী ব্যক্তি রাজসূয় যাগ করিবে; ব্রাহ্মণ-হত্যা করিবে না।—ইত্যাদি বৈদিক বাক্যকে 'চোদনা' বলে। সেই চোদনা হইয়াছে লক্ষণ অর্থাৎ প্রমাণ যাহার, এমন যে-অর্থ অর্থাৎ অভিলষিত বিষয়ের সাধন, তাহাই 'ধর্ম'।

কেবল 'অর্থ'ই অর্থাৎ অভিলষিত ফলের সাধনই ধর্ম—এইরূপ বলিলে ভোজন প্রভৃতিও ধর্ম হইয়া পড়িত। ভোজন হইতে মানুষের অভিলষিত ক্ষুন্নিবৃত্তি, শরীরের পুষ্টি ও তুষ্টিরূপ ফল সিদ্ধ হয়। কিন্তু ভোজনকে কেহই 'ধর্ম' বলে না। ভোজন ধর্ম হইলে পশুপক্ষীও ধার্মিক হইত। এইজন্য 'চোদনালক্ষণ' কথাটি ব্যবহৃত হইয়াছে। ভোজন প্রভৃতি বেদবিধি-গম্য নহে, ভোজনের বিধি বেদে উক্ত হয় নাই। এইজন্য ভোজন ধর্মপদবাচ্য হইল না। চোদনালক্ষণ অর্থাৎ যাহা কেবল বেদগম্য, তাহা ধর্ম এইরূপ বলিলে 'ন হিংস্যাৎ' অর্থাৎ হিংসা করিবে না—এই বেদবাক্য হইতে জানা যাইতেছে, হিংসা অনর্থের কারণ। সুতরাং অনিষ্টের কারণরূপে হিংসাও বেদগম্য হওয়ায় ধর্মপদবাচ্য হইয়া পড়িত। এইজন্য অর্থ অর্থাৎ সুখের হেতু—ইহা বলা হইয়াছে। হিংসা দুঃখের হেতু বলিয়া ধর্ম হইতে পারে না।

কুমারিল ভট্ট বলেন দ্রব্য, গুণ ও কর্ম প্রভৃতি শ্রেয়ের সাধনরূপে বেদগম্য বলিয়া উহারাও ধর্মপদবাচ্য।[৫] যেমন 'গোদোহনেন পশুকামস্য' অর্থাৎ যে ব্যক্তি পশুকামনা করিবে, সে গোদোহন (গাইদোয়া ঘটীবিশেষ)-পাত্রে জল প্রণয়ন (এক প্রকার জলের সংস্কার-কর্ম) করিবে। এখানে গোদোহন-দ্রব্যটি

---

৪ 'এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে' [বৃঃ উঃ ৩।৮।৯] ইত্যাদি।

৫ 'দ্রব্যগুণক্রিয়াদীনাং ধর্মত্বং স্থাপয়িষ্যতে।'
দ্রব্য, গুণ ও ক্রিয়া প্রভৃতির ধর্মত্ব সাধন করা হইবে।
[মীমাংসা-শ্লোকবার্তিক ১।১।২।১৩]

পশুরূপ ফলের সাধনরূপে বেদগম্য হওয়ায় ধর্ম-পদের অর্থ হইল—ইত্যাদি।

প্রশ্ন হইবে যাহা বেদগম্য অথচ মানুষের অভিলষিত ফলের সাধন, তাহাই ধর্ম হইলে পুরাণ, স্মৃতি, আচার প্রভৃতি হইতে যাহা অভিলষিত ফলের সাধন বলিয়া জানা যায়, তাহা কি ধর্ম হইবে না? ইহার উত্তরে জৈমিনি, শবরস্বামী, কুমারিল প্রভৃতি ধর্মাচার্যগণ বলিয়াছেন—বেদমূলক স্মৃতি, বেদ ও স্মৃতিমূলক শিষ্টাচার ও ধর্মবিষয়ে প্রমাণ—অর্থাৎ যে-সমস্ত স্মৃতি বেদের অবিরোধী অথচ বেদমূলক, সেই সকল স্মৃতি এবং বেদমূলক স্মৃতিসম্মত আচার ও বেদ এই ত্রিবিধ প্রমাণগম্য অথচ আকাঙ্ক্ষিত ফলের সাধনই ধর্মপদবাচ্য।

মহর্ষি মনু বলিয়াছেন, সমস্ত বেদ, বেদমূলক স্মৃতি ও শীল (অনসূয়া প্রভৃতি) ধার্মিকগণের আচার ও আত্মতুষ্টি—এই পাঁচটি ধর্মবিষয়ে প্রমাণ। শীল ও আত্মতুষ্টিকে আচারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিলে পূর্বোক্ত বেদ, স্মৃতি ও আচার—এই ত্রিবিধ প্রমাণের বর্ণনে কোন বিরোধ হয় না।[৬] এইভাবে দেখা গেল, ধর্মের সম্বন্ধে বেদ, স্মৃতি ও আচার ইহারা প্রমাণ। আর বেদাদি ত্রিবিধ প্রমাণগম্য অথচ অভিলষিত ফলের সাধন—ইহাই ধর্মের স্বরূপ। যাহা স্বরূপ, তাহা লক্ষণ হয়। সুতরাং স্বরূপের বর্ণনা দ্বারা ধর্মের লক্ষণও বলা হইল। মহাভারতে অনেক প্রকার ধর্মের লক্ষণ বলা হইয়াছে।[৭]

প্রশ্ন হয়, ধর্মের যাহা লক্ষণ বর্ণিত হইল, উহা সার্বভৌম লক্ষণ নয়। কারণ যাঁহারা বেদ, পুরাণ বা স্মৃতি মানেন না এইরূপ খৃষ্টান, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতির মতে পূর্বোক্ত ধর্মের লক্ষণ সঙ্গত হয় না। সুতরাং ধর্মের এমন একটি লক্ষণ করা আবশ্যক, যাহাতে সকলের ধর্মই উহার অন্তর্ভূত হয়। আর খৃষ্টান প্রভৃতির ধর্ম—ধর্ম নয়, ইহা বলা অযৌক্তিক। যেহেতু তাঁহারাও বলিতে পারেন, হিন্দু প্রভৃতির ধর্ম ধর্মই নয়। অতএব ধর্মের সার্বভৌম লক্ষণ কি? ইহার উত্তরে স্বামীজীর অনুসরণ করিয়া বলিতে হইবে, যাহা কাহারও দুঃখের হেতু নয়, সুখের হেতু অথচ করা সম্ভব, তাহাই ধর্ম।[৮] যেমন—পরের উপকার করা। পরের উপকার করিতে হইলে কিছু কষ্ট আছে, কেবল বসিয়া বসিয়া পরের উপকার করা যায় না, কিন্তু উহাতে নরকাদি-জনিত প্রবল দুঃখ হয় না, পরোপকার সুখের হেতু, এই জন্মে পরোপকারীর আত্মতৃপ্তি হয়, আর পরলোকে স্বর্গাদি-জনিত সুখ হয় এবং যাহার পক্ষে যেমন সম্ভব, সেইরূপ পরোপকার করা সম্ভব। সুতরাং পরোপকারটি ধর্ম। এইরূপ যাগ, দান, হোম, প্রার্থনা, উপাসনা, অহিংসা প্রভৃতি সকল প্রকার ধর্মই উক্ত লক্ষণের অন্তর্ভুক্ত হইবে। অবৈধ হিংসা, চৌর্য, পরাপকার প্রভৃতি ইহলোকে এবং পরলোকে প্রবল দুঃখের হেতু বলিয়া উহাতে কিছু সুখ থাকিলেও এবং করা সম্ভব হইলেও ধর্মপদবাচ্য হইতে পারে না। এই প্রকার ধর্মের লক্ষণ নৈয়ায়িকদিগেরও সম্মত বলিয়া মনে করার যথেষ্ট হেতু আছে। কারণ তাঁহারা ইষ্টসাধনতা, অনিষ্টাসাধনতা ও কৃতিসাধ্যতা—এই তিনটিকে বিধির অর্থ

---

৬ 'বেদোঽখিলো ধর্মমূলং স্মৃতিশীলে চ তদ্বিদাম্।
আচারশ্চৈব সাধুনামাত্মনস্তুষ্টিরেব চ॥'
[মঃ সং ২।৬]

৭ মহাভারত শান্তিপর্ব দ্রষ্টব্য।

৮ উক্ত লক্ষণ স্বামীজীর উক্তির অভিপ্রায়-হিসাবে বর্ণিত হইল—সাক্ষাৎ উক্তি নয়।

বলেন।[১] এই বিধি বেদবাক্যও হইতে পারে অথবা মহাপুরুষের বাক্যও হইতে পারে। সকল ধর্মে যাহা কিছু ধর্ম বলিয়া অনুষ্ঠিত হয়, তাহা সেই সেই সম্প্রদায়ের কোন না কোন প্রামাণিক মহাপুরুষের উপদেশ হইতে জ্ঞাত। যদি তাহা কোন মহাপুরুষ কর্তৃক উপদিষ্ট না হয়, তাহা হইলে উহাকে ধর্ম বলা হইবে না।

১ গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৭ম শ্লোকে মধুসূদন সরস্বতীর টীকা দ্রষ্টব্য।

সর্বপ্রকার ধর্মের মধ্যে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ ধর্ম আছে, যাহাতে কাহারও বিবাদ নাই। যেমন যোগসূত্রে বর্ণিত—অহিংসা সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ। এই পাঁচটি ধর্ম নানা ধর্মসম্প্রদায়ে ভিন্ন ভিন্ন নামে উল্লিখিত হইয়াছে। যে-কেহ অনুসন্ধান করিলেই বুঝিতে পারে না। সকল ধর্মকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়। যথা: কায়িক, বাচিক এবং মানসিক। কায়িক যেমন—যাগাদি, বাচিক—জপ, স্বাধ্যায় প্রভৃতি, মানস যথা—শম, ধ্যান ইত্যাদি। [ক্রমশঃ]

স্বরানুসারী বেদার্থের সূক্ষ্মতা

শ্রীরামশঙ্কর ভট্টাচার্য

আজকাল যাঁহারা বেদার্থবিষয়ে আলোচনা করেন বা ব্যাখ্যাদি প্রণয়ন করেন, তাঁহারা প্রায়ই স্বরের প্রতি দৃষ্টি দেন না, ইহা অশাস্ত্রীয় পন্থা। যখন পরম্পরায় ইহা প্রসিদ্ধ আছে যে, স্বরের দ্বারা বেদার্থের নির্ধারণ করা বিধেয়, তখন স্বরের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই বেদার্থ করা উচিত। ব্যাকরণাদিতেও আমরা দেখিতে পাই যে, স্বরভেদানুসারে অর্থের ভেদ হয়, অতএব স্বর পরিত্যাগপূর্বক বেদার্থ করা হইলে উহা সুধীজন-সম্মত হইবে না। স্বর দুষ্ট হইলে অনর্থ হয়, পূর্বাচার্যগণের এই উপদেশ সর্বদাই স্মরণীয়।

কেবল স্বরই নহে, ছন্দের দ্বারাও অর্থের নির্ধারণ হইয়া থাকে। ছন্দের দ্বারা বৈদিক-মন্ত্রের দেবতার নির্ধারণ করা যাইতে পারে (সন্দিগ্ধ স্থলে), এই বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করিব। ছন্দঃশাস্ত্রের দ্বারা মন্ত্রগত পাদের নির্ধারণ হয়, এবং পাদহেতুক স্বরভেদও হইয়া থাকে, ইহা শব্দশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে। স্বরভেদের সহিত অর্থভেদের সম্বন্ধ আছে, অতএব কখনও কখনও ছন্দের দ্বারা অর্থনির্ণয় করা যাইতে পারে, ইহা জ্ঞাতব্য। অবান্তর অর্থের সমাপ্তি প্রতিপাদে করণীয়, ইহা পূর্বাচার্যমত, অতএব পাদবৈশিষ্ট্যানুযায়ী মন্ত্রার্থেও ভিন্নতা হয়, ইহাও স্বীকার্য হইবে।

মন্ত্রগত অনেক সূক্ষ্ম ভাব স্বরের দ্বারা জানা যাইতে পারে, যাহা সাধারণভাবে পদ-পদার্থ জ্ঞানের দ্বারা নিশ্চয় করা যায় না—এই বিষয়ে একটি বিশিষ্ট উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। এই উদাহরণ হইতে সুধী পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে, সূক্ষ্ম বৈদিক অভিপ্রায় বুঝিতে হইলে স্বরের প্রতি লক্ষ্য করা কর্তব্য এবং লক্ষ্য না রাখিলে তত্ত্বনির্ধারণে বিপর্যয়ও হইতে পারে। বেদের অভিপ্রায়-বিষয়ে যে বহু

পরস্পর পৃথক্ মত দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার কিয়দংশ স্বরের দ্বারা সমাহিত হইতে পারে, ইহা জ্ঞাতব্য।

প্রসিদ্ধ ঈশোপনিষৎ (ইহা শুক্ল-যজুর্বেদের কাণ্বশাখায় আছে ; এই উপনিষদের শাঙ্কর ভাষ্য আছে ; মাধ্যন্দিন সংহিতায়ও এই উপনিষৎ আছে, তবে তাহাতে ঈষৎ পাঠভেদ দৃষ্ট হয় ; উভয় সংহিতাতেই ৪০শ তম অঃ) এর দ্বিতীয় মন্ত্রে বলা হইয়াছে :

'কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ'।

এস্থলে 'জিজীবিষেৎ' পদে সন্-প্রত্যয় উদাত্ত দৃষ্ট হয় (জীব + সন্ + বিধিলিঙ্। তিপ্)। সাধারণতঃ 'পিপঠিষতি,' 'বভূষতি' আদি সন্নন্ত পদে ধাতুভাগ উদাত্ত থাকে। সন্-প্রত্যয় পরে থাকিলে ধাতুভাগের উদাত্ত হওয়াই নিয়ম, এবং উপনিষদের এই পদে প্রত্যয়ভাগ কেন উদাত্ত হইল, এই প্রশ্ন হইতে পারে (এবং হওয়া উচিতও)।

স্বরশাস্ত্রবিৎ জানেন যে, উদাত্ত স্বরে অর্থের প্রাধান্য হয়। 'পিপঠিষতি' আদি প্রয়োগে (যেস্থলে ধাতু উদাত্ত দৃষ্ট হয়) ধাত্বর্থের প্রাধান্য থাকায় তথায় 'মুখ্য পঠন ক্রিয়ার জন্য ইচ্ছা করা হইয়াছে'—ইহা বুঝা যায়।

'জিজীবিষেৎ' পদে সন্ উদাত্ত হইয়াছে। সন্-প্রত্যয়ের অর্থ 'ইচ্ছা', অতএব এস্থলে ইচ্ছার প্রাধান্য বুঝাইতেছে। এই দৃষ্টিতে অর্থ হইবে —জীবনধারণ করিবার ইচ্ছা যদি প্রধান হয়, যদি জীবনধারণ করিতেই হয়, তাহা হইলে যজ্ঞাদি-কর্ম করিয়াই জীবনধারণ করিতে হইবে। স্বরের দ্বারা এস্থলে ইহা বুঝা যায় যে, যদি জীবনধারণ করিবার ইচ্ছা প্রবল হয়, অর্থাৎ দেহ রোধ করিবার শক্তি না থাকে (অর্থাৎ কর্মত্যাগ করিবার মতো মানসিক যোগতা না থাকে), তবেই যজ্ঞাদি-কর্ম করিতে হইবে। যজ্ঞাদি-কর্ম করার প্রাধান্য (অর্থাৎ যজ্ঞাদি-কর্ম করিতেই হইবে, যতদিন জীবন আছে) বা জ্ঞান-কর্ম-সমুচ্চয়-বাদ স্বরহেতুক সূক্ষ্ম অর্থের দ্বারা নিরাকৃত হইল (মাধ্যন্দিন সংহিতাতেও সন্-প্রত্যয় উদাত্ত দৃষ্ট হয়)।

আচার্য শঙ্কর যদিও তাঁহার ভাষ্যে এস্থলে স্বরসম্বন্ধী কোন চর্চা করেন নাই, তথাপি তাঁহার ভাষ্য স্বরানুসারী। কারণ তিনি এস্থলে জ্ঞানকর্ম-সমুচ্চয়-বাদ খণ্ডন করিয়াছেন এবং জ্ঞান-কর্মের বিরোধ-পক্ষকে দৃঢ় করিযাছেন। অবিদ্যাবহুলতাহেতু প্রাণধারণেচ্ছা যাহাদের প্রবল, তাহারাই কর্মের অধিকারী, ত্যাগী সন্ন্যাসীরা যজ্ঞাদি-কর্ম পরিত্যাগ করিতে পারেন, এইভাব সন্-প্রত্যয়ের উদাত্তত্ব দ্বারা সিদ্ধ হইল। যদি ধাতুভাগ উদাত্ত হইত, তাহা হইলে জীবন-ধারণকারী মাত্রই কর্মাধিকৃত হইবে, যতক্ষণ জীবনধারণ আছে, ততক্ষণ যজ্ঞাদি-কর্ম করিতেই হইবে, এই অর্থ ধ্বনিত হইত। ইহা হইলে কর্মাচরণের নিত্যতাও সিদ্ধ হইত। বস্তুতঃ 'কর্ম' ও 'কর্মত্যাগ' এতদুভয়ই যথাযোগ্য অধিকারীকে লক্ষ্য করিয়া বেদে উপদিষ্ট হইয়াছে, ইহা মানা ব্যতীত গত্যন্তর নাই।

এই একটি দৃষ্টান্ত হইতেই আমরা বুঝিতে পারি যে, বেদার্থ-নির্ধারণে স্বরের আবশ্যকতা কত অধিক। ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যেও শঙ্করাচার্য কয়েকস্থলে স্বরের সহায়তায় অর্থ নির্ধারণ করিয়াছেন এবং ইহাই শিষ্টসম্মত মার্গ।

ভারতে নেশন-গঠন সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরী

কাদের সংযোগে ভারতীয় নেশন গঠিত হবে? স্বামীজী বলেছেন, 'A nation in India must be a union of those whose hearts beat to the same spiritual tune.' যাদের হৃদয়তন্ত্রী একই আধ্যাত্মিক সুরে বেজে ওঠে, ভারতীয় নেশন হবে তাদেরই সমষ্টি। 'আধ্যাত্মিক' কথাটির উপর তিনি খুবই জোর দিয়েছেন: যে-কোন রাগিণীতে বাজলে হবে না, আধ্যাত্মিক রাগিণীতে বাজা চাই। নানা প্রসঙ্গে বহুস্থলে তিনি বলেছেন যে, হিন্দু বা ভারতবাসীর জীবনে আধ্যাত্মিকতাই হচ্ছে প্রধান সুর। সুতরাং স্বামীজীর মতে ভারতীয় নেশন হবে প্রধানতঃ হিন্দু-মনোভাবসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের নেশন। অহিন্দুরাও ভারতীয় নেশনের অন্তর্ভুক্ত হ'তে পারে যদি তারা হিন্দুভাবাপন্ন হয়, অর্থাৎ এ-কথা মেনে নেয় এবং আচরণে প্রমাণ করে যে, (১) আধ্যাত্মিকতাই জীবনের মূল সুর, (২) সকল ধর্মই সত্য, কোন ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ কিংবা অশ্রদ্ধার ভাব পোষণ করা অনুচিত।

স্বামীজী উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, "কোন হিন্দু যদি আধ্যাত্মিকতা-পরায়ণ না হয়, তবে তাকে আমি 'হিন্দু' বলতে নারাজ। অন্যান্য দেশে মানুষ রাজনীতিকে জীবনে প্রাধান্য দিতে পারে এবং রাজনীতির দাবি মেটাবার পর ধর্মকে জীবনে একটুখানি ঠাঁই দিতে পারে; কিন্তু এখানে—এই ভারতবর্ষের মাটিতে আমাদের জীবনের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান কর্তব্য হচ্ছে আধ্যাত্মিকতা—জীবনে অন্য সব জিনিসের স্থান তার পরে।"

আধ্যাত্মিকতা বলতে কি বুঝায়? শুধু ধর্মপরায়ণ কিংবা নীতিপরায়ণ বলতে যা বুঝায়, আধ্যাত্মিক বলতে তার চেয়ে অনেক বেশি বুঝায়। শুধু নীতিপরায়ণতা স্বামীজীর লক্ষ্য নয়। অধিকাংশ স্থলেই তিনি 'spiritual' 'spirituality' শব্দ ব্যবহার করেছেন। 'আধ্যাত্মিকতা' বলতে আমরা বুঝি এই কটি ধারণা অথবা বিশ্বাস: (১) আমাদের প্রত্যেকের ভিতরেই আত্মা রয়েছেন; তিনিই আমাদের দেহরথের রথী। (২) জগৎসংসার অনিত্য, আত্মাই নিত্য। (৩) আত্মাকে প্রত্যক্ষভাবে অবগত হওয়া মানবজীবনের উদ্দেশ্য। আধ্যাত্মিক হওয়ার মানে হচ্ছে—জড়বাদ ও ভোগবিলাসের দিকে না গিয়ে আত্মোপলব্ধির দিকে লক্ষ্য রেখে জীবনে অগ্রসর হওয়া।

আধ্যাত্মিকতাই হিন্দু সমাজের বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ এই গুণ হিন্দুদিগকে নিজেদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ এবং অন্যান্য সমাজ থেকে পৃথক্ করেছে। যাতে লোকের মধ্যে গভীরতম ঐক্যবোধ জন্মায়, তার উপরেই দেশের একতা এবং রাষ্ট্রীয় একতা সম্ভবপর। ভারতবর্ষের বেলায় হিন্দুত্ব ব্যতীত আর কোন ঐক্যবন্ধন নেই বললেও চলে। দেশের অভ্যন্তরে ভাষাগত ও জাতিগত (Racial) বৈচিত্র্যের সীমা নেই; একতার সূত্র শুধু হিন্দুত্ব কিংবা হিন্দুসুলভ মনোভাব। এই তথ্য এবং যুক্তির উপর নির্ভর করেই স্বামীজী বলেছেন যে, উদার হিন্দুভাবের ভিত্তির উপরেই ভারতীয় নেশন গড়ে উঠবে। হিন্দুত্ব বলতে যদি আধ্যাত্মিকতা বুঝায়, তবে গুণের বিচারেও হিন্দুত্বের চেয়ে উৎকৃষ্টতর ভিত্তিভূমি আর কিছুই হ'তে পারে না।

হিন্দুত্বই যে ভারতীয় সভ্যতার প্রাণ এবং ভারতবর্ষের প্রকৃত ঐক্য-বিধায়ক—এ-কথা Vincent Smith এর ন্যায় ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহাসিক পর্যন্ত স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। স্মিথসাহেব লিখেছেন: ভারতের বিভিন্ন জনসমাজ একটা বিশেষ ধরনের কৃষ্টি অথবা সভ্যতা গ'ড়ে তুলেছে, যা পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যতা অথবা কৃষ্টির তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। এইটিই হচ্ছে ভারতীয় ঐক্যের মূল ভিত্তি। এক কথায় বলতে গেলে ভারতের বিশিষ্ট সভ্যতার নাম হচ্ছে 'হিন্দুত্ব'। ভারতবর্ষ প্রধানতঃ হিন্দুদের দেশ, ব্রাহ্মণের দেশ। ব্রাহ্মণেরা তরবারির সাহায্য না নিয়ে কেবলমাত্র শান্তিপূর্ণ অনুপ্রবেশের দ্বারা ভারতের আনাচে-কানাচে তাঁদের ভাবরাশি ছড়িয়ে দিতে সমর্থ হয়েছেন।

স্বামীজী আমাদের সমগ্র ইতিহাস আলোচনা করেই ব'লে গিয়েছেন: হিন্দুত্বের মধ্যেই আমাদের জাতীয়তা বা 'নেশনত্ব'। যতদিন আমরা হিন্দুত্বকে (আর হিন্দুত্ব বলতেই আধ্যাত্মিকতা) আঁকড়ে থাকব, ততদিন আমাদের ক্ষয় নেই; আর যখনই আমরা হিন্দুত্বকে বিসর্জন দেবো, তখনই আমাদের মৃত্যু। 'তরঙ্গের পর তরঙ্গের আকারে বর্বর জাতিদের আক্রমণ আমাদের এই প্রিয় জন্মভূমির উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছে। শত শত বৎসর ধরে 'আল্লা হো আকবর' ধ্বনি এই দেশের গগন বিদীর্ণ করেছে, এবং এমন কোন হিন্দু ছিল না যে, যে-কোন মুহূর্তে নিজের নিপাত আশঙ্কা করেনি। এই পৃথিবীতে যত ঐতিহ্যময় দেশ আছে, তাদের মধ্যে এই দেশই সর্বাপেক্ষা অধিক নির্যাতন এবং পরাধীনতা সহ্য করেছে। তথাপি পূর্বে যেমন ছিলাম, তেমনি আজও আমরা দাঁড়িয়ে আছি,—ভবিষ্যতে যত সঙ্কটই আসুক, তার সম্মুখীন হবার জন্যে প্রস্তুত হয়েই আছি। আর শুধু তাই নয়, সম্প্রতি এরূপ লক্ষণ দেখা গিয়েছে যে, আমরা যে শুধু টিকে থাকতেই সমর্থ তা নয়, বহির্জগতে প্রতিষ্ঠালাভেও আমরা সমর্থ, কারণ জীবনের চিহ্নই হচ্ছে সম্প্রসারণ।

অন্যত্র স্বামীজী বলেছেন, 'ভারতের পুনরুজ্জীবন সম্পর্কে যে যা বলে বলুক, আমি সারাজীবন ধরে কাজ ক'রে আসছি এবং সেই [অভিজ্ঞতার] জোরে আমি তোমাদিগকে বলছি যে, তোমরা যদি আধ্যাত্মিক ভাবপরায়ণ না হও, তবে কিছুতেই নবজীবন আসবে না, আর তোমাদের নিজেদের জন্যেই যে এর প্রয়োজন, তা নয়, এর উপর সমগ্র জগতের কল্যাণ নির্ভর করছে। কারণ খোলাখুলিই আমি তোমাদিগকে বলছি যে, পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিত্তি একেবারে তলদেশ পর্যন্ত নড়ে গিয়েছে। জড়বাদের শিথিল বালুকারাশির উপর যত বিশাল সৌধই নির্মিত হোক না কেন, একদিন বিপদ ঘটবেই—, একদিন না একদিন তাকে ধসে পড়তে হবেই হবে।'

স্বামীজী তো মুক্তপুরুষ ছিলেন, তাঁর দেশও ছিল না, সমাজও ছিল না। তথাপি হিন্দুত্বের অভিমান তাঁর ছিল। স্বজাতীয় ভ্রাতৃবৃন্দকে সম্বোধন ক'রে তিনি বলছেন: হিন্দুদের মধ্যে আমি একজন অতি নগণ্য ব্যক্তি, তথাপি আমার জাতির গৌরব, আমার পূর্বপুরুষের গৌরব আমি যথেষ্টই ক'রে থাকি। নিজেকে 'হিন্দু' বলতে আমার বুক ফুলে ওঠে। ধন্য আমি যে, তোমাদের অধম সেবকদের মধ্যে আমিও একজন। হে তত্ত্বজ্ঞানীদের বংশধরগণ, হে ঋষিদের বংশধরগণ! আমি ধন্য যে, আমি তোমাদের দেশবাসী, তোমাদেরই

একজন। অতএব নিজেদের উপর বিশ্বাস স্থাপন কর, নিজের পূর্বপুরুষদের জন্য লজ্জিত না হয়ে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে কর। আর একটি কথা, কখনও পরের অনুকরণ ক'রো না। যখনই পরের অনুকরণ করতে যাবে, তখন থেকেই তোমার স্বাধীনতা আর থাকবে না।

যে 'নেশনত্ব' কেবলমাত্র রাষ্ট্রাশ্রয়ী, তার কথা স্বামীজী বলেননি, উদার ধর্মাশ্রয়ী নেশনত্বের কথা—যে-নেশনত্ব জীবনের সকল-ক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত, তার কথাই তিনি বলেছেন। আর তাঁর নিকট হিন্দুত্ব ছিল আধ্যাত্মিকতার সমার্থক। প্রশ্ন উঠতে পারে, স্বামীজীর আদর্শ এত উঁচু যে, মানবসমাজে এর প্রতিষ্ঠা কিংবা কার্যকারিতা অসম্ভব। উত্তরে বলা যেতে পারে যে, আদর্শ ও বাস্তবের মধ্যে ব্যবধান চিরকাল থাকবে, কিন্তু সেজন্য আদর্শের মূল্য কিছু হ্রাস পায় না। যাঁরা জড়বিজ্ঞানী, তাঁদের আদর্শ জড়বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সর্বজ্ঞ হওয়া, প্রকৃতির সমস্ত রহস্য ভেদ করা। এরূপ সর্বজ্ঞতা মানুষ কখনও লাভ করতে পারবে না, এ-কথা তাঁরা খুবই জানেন, কিন্তু তাই ব'লে এই আদর্শ কি নিরর্থক এবং পরিত্যাজ্য? আদর্শের মূল্য আদর্শ-হিসাবেই যাচাই করতে হবে। আদর্শের কাজ হচ্ছে বাস্তবের মধ্যে কখনও সম্পূর্ণভাবে ধরা না দিয়ে মানুষকে ক্রমাগত সামনে টেনে নিয়ে যাওয়া। আধ্যাত্মিকতা হিন্দুর জীবনের আদর্শ, এ-কথা বলতে এই বুঝায় না যে, হিন্দুমাত্রই আত্মোপলব্ধি করেছে কিংবা একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে করবে। এতে শুধু এইটুকু বুঝায় যে, হিন্দু জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষার ঝোঁক থাকবে আত্মোপলব্ধির দিকে এবং সমাজে শ্রেষ্ঠ সম্মানের আসন হবে তাঁদের, যাঁরা আত্মোপলব্ধি করেছেন। ব্রহ্মজ্ঞের পদতলে রাজা, ধনী, বিদ্বান্ সকলেই মাথা নোয়াবেন। সমাজের ঝোঁক যে সেদিকে হ'তে পারে, এবং অল্পকাল পূর্ব পর্যন্ত হিন্দুসমাজের ঝোঁক যে সেদিকে ছিল—ইতিহাসে তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এই আদর্শ যে ভ্রান্ত নয়, স্বামীজী সে-কথা নিজেই ব'লে গিয়েছেন: বহু যুগ পূর্বেই আমাদের পথ আমরা বেছে নিয়েছি, ছাড়বার উপায় নেই। যে যাই বলুক, আমাদের বাছাইটা যে ভুল হয়েছে, তা কখনই নয়। জড়ের চিন্তা না ক'রে চৈতন্যের চিন্তা করা, মানুষের ভাবনা না ক'রে ঈশ্বরের ভাবনা করাটা কি ভুল পন্থা বলতে পারো? আর পরলোকে দৃঢ় বিশ্বাস, ইহলোকের প্রতি তীব্র বিতৃষ্ণা, অপরিমিত ত্যাগশক্তি, ঈশ্বরে পরম নির্ভরতা, আত্মার অবিনশ্বরত্বে দৃঢ় বিশ্বাস,—এগুলি তোমাদের মজ্জাগত। ছাড়তে চেষ্টা কর দেখি। আমি স্পর্ধার সঙ্গে বলছি, ছাড়তে তোমরা পারবে না। বাইরে জড়বাদী সেজে, দু-চার মাস জড়বাদের বুলি আউড়ে তোমরা আমাকে ভুল বোঝাবার চেষ্টা করতে পারো,—কিন্তু আমি তো ঠিক জানি, তোমরা কি উপাদানে তৈরি। যেই আমি হাত ধরে টানব, তোমাদের নাস্তিক-ভাব দূরে পালাবে,—যে আস্তিক্যবুদ্ধি নিয়ে জন্মেছ, সেই নিয়ে আবার ঠিক পথে ফিরে আসবে। স্বভাব কখনও ছাড়তে পারো কি?

আমাদের জাতির প্রাণ কোথায় রক্ষিত হয়ে আছে, আমাদের জাতীয় ঐক্য কি উপায়ে সাধিত হবে, আমাদের নব জীবন কোন্ পথ ধরে আসবে,—এ-সব বিষয়ে স্বামীজীর মূল কথাগুলি খুব সংক্ষেপে উদ্ধৃত করা হ'ল। প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির আলোচনা স্বামীজী কোথাও করেননি। হিন্দুধর্মকে জয়শীল এবং ভারতীয় জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করাই ছিল তাঁর জীবনের স্বপ্ন, তাঁর কর্মসূচীর লক্ষ্য; এবং

সেই সঙ্ঘবদ্ধতার মূলে থাকবে আধ্যাত্মিকতা। এরূপ সংঘবদ্ধতার মধ্যে কোন সঙ্কীর্ণতার স্থান নেই,—মানবতার সহিত, অন্য ধর্মাবলম্বীদের সহিত এর কোন বিরোধ কখনও হ'তে পারে না। এরূপ উচ্চাদর্শবিশিষ্ট সুসংহত সুবিন্যস্ত সমাজ সহজেই উন্নতিশীল হবে, এবং ইচ্ছা করলেই আপন রাষ্ট্র গড়তে ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে সমর্থ হবে। এমন কি রাষ্ট্রের প্রতি উদাসীন থেকে এবং রাষ্ট্রের সাহায্য ব্যতিরেকেই এরূপ সমাজ সমুন্নত জীবন যাপন করতে পারবে। যতদূর বুঝা যায়, এই ছিল স্বামীজীর ধারণা।

রবীন্দ্রনাথও স্বদেশী যুগ পর্যন্ত যে এরূপ মতাবলম্বীই ছিলেন, নিম্নের দুটি উদ্ধৃতি থেকে তা স্পষ্ট প্রতীয়মান হবে।

'হিন্দু সভ্যতা রাষ্ট্রীয় ঐক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। সেই জন্য আমরা স্বাধীন হই বা পরাধীন থাকি, হিন্দু সভ্যতাকে সমাজের ভিতর হইতে পুনরায় সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে পারি—এ আশা এ ত্যাগ করিবার নহে।'

'আমাদের হিন্দু সভ্যতার মূলে সমাজ, য়ুরোপীয় সভ্যতার মূলে রাষ্ট্রনীতি। সামাজিক মাহাত্ম্যেও মানুষ মাহাত্ম্য লাভ করিতে পারে, রাষ্ট্রনীতিক মহত্ত্বেও পারে।'

বনের বেদান্তকে গৃহস্থের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে হবে, এ-কথা স্বামীজী যেমন বলেছেন, রবীন্দ্রনাথও তেমনি বলেছেন যে, পলিটিক্সের হারজিত যা হয় হোক, আধ্যাত্মিক কল্যাণের প্রতি আমাদিগকে সর্বদাই দৃষ্টি রাখতে হবে। দুজনেই এ-কথা খুব জোর দিয়ে ব'লে গিয়েছেন যে, হীনাবস্থা থেকে আমাদের দেশ ও সমাজকে উপরে তোলবার একমাত্র উপায় জনসাধারণের মধ্যে সংশিক্ষার বিস্তার। দুজনেরই আকাঙ্ক্ষা এই ছিল যে, সরকারের মুখাপেক্ষী না হয়ে এই সুশিক্ষার ব্যবস্থা আমরা নিজেরাই ক'রব এবং সুশিক্ষার সাহায্যে সঞ্জীবিত সমাজের মধ্যে যে একতা গড়ে উঠবে—সেই একতা হবে স্থায়ী এবং সত্যিকার একতা।

আর এক ধরনের একতা হচ্ছে কৃত্রিম একতা—উপর থেকে চাপানো এবং বন্ধনরজ্জুর একতা। ইংরেজ উপর থেকে চেপে ধরে শাসনরজ্জুর সাহায্যে এই ধরনের একতা ভারতবর্ষে এনেছিল। বন্ধনরজ্জু জীর্ণ হ'লে কিংবা ছিঁড়ে গেলে এই ধরনের একতা টিকে থাকতে পারে না। আজ কি সেই অবস্থাই আমাদের ঘটেনি? স্বামীজী যে-পথে মৌলিক এবং হৃদয়ের একতা আনবার নির্দেশ দিয়াছিলেন, সে-পথে না গিয়ে আমরা ভাবলুম যে, ইংরেজের বিদেশী শাসনরজ্জুকে দূরে ফেলে দেশী শাসনরজ্জু দিয়ে সমস্ত দেশকে বেঁধে আমরা এক ক'রে ফেলবো। এ-সম্পর্কে বিগত পনেরো বৎসরের অভিজ্ঞতা কি বলে, সেই প্রশ্ন আজ প্রত্যেকেই নিজেকে জিজ্ঞাসা করতে পারি।

যেখানে সমগ্র সমাজদেহে রাষ্ট্র-নিরপেক্ষ কোন গভীর ঐক্যবোধ নেই, সেখানে যথার্থ নেশন-রাষ্ট্র গড়ে উঠতে পারে কি? রাষ্ট্রের সুদিন-দুর্দিনের ভিতর দিয়ে—এমন কি অরাজকতার মধ্যেও যে সজীব একত্ব বজায় থাকে এবং রাষ্ট্রকে ঠিক জায়গায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে, সেইটিই সমাজের প্রাণশক্তি, সেইটেই প্রকৃত ঐক্যবোধ অথবা নেশনত্ব। 'ভারত-বর্ষ'—এই নামের সঙ্গে হিন্দুত্ব অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। হিন্দুত্বের অভিমানকে বাদ দিয়ে আর কোন্ অবলম্বনের জোরে আমরা ভারতবাসীরা যথার্থ মানুষরূপে এক হয়ে দাঁড়াব? স্বামীজী এই জিজ্ঞাসা আমাদের সম্মুখে রেখে গিয়েছেন।*

---

* [উনবিংশ শতাব্দীতে 'হিন্দু'-শব্দটি Indian বা ভারতীয় এই অর্থেও ব্যবহৃত হইত,—কি দেশে, কি বিদেশে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেও ঐরূপ ব্যবহার পাওয়া যায়, কিন্তু বর্তমানে শব্দটির বিশেষ অর্থান্তর ঘটিয়াছে, ইহা লক্ষণীয়। উঃ সঃ]

আর্যসমাজ ও স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী

শ্রীঅমিতাভ মুখোপাধ্যায়

পাশ্চাত্য শিক্ষার ফল-হিসাবে উনবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে যে-কয়টি ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারমূলক আন্দোলন ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল, আর্যসমাজ-আন্দোলন তাদের মধ্যে অন্যতম। বাংলা দেশে ব্রাহ্মসমাজ ও বোম্বাই-এ প্রার্থনা-সমাজ সে-যুগে যে-ধরনের আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, পঞ্জাব রাজপুতানা ও উত্তর-প্রদেশের পশ্চিমাংশে আর্যসমাজ প্রায় সেই রকম আলোড়নই এনে দিয়েছিল বললে কিছু-মাত্র অত্যুক্তি করা হবে না। ব্রাহ্মসমাজ ও প্রার্থনা-সমাজের তুলনায় আর্যসমাজের আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গী অবশ্যই অনেক বেশী রক্ষণশীল ও ভারতীয়-ভাবাপন্ন ছিল। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ ও প্রার্থনা-সমাজের মতো আর্যসমাজের প্রভাব কেবলমাত্র শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের গণ্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, জনসাধারণ (mass) বলতে আমরা বর্তমানে যা বুঝি, তাকেও কিছুটা স্পর্শ করেছিল। সেই হিসাবে প্রথম দুটি আন্দোলনের তুলনায় আর্যসমাজ-আন্দোলনের সম্ভাবনা অনেক ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী ছিল বলেই মনে হয়। আর্যসমাজের উগ্র হিন্দুয়ানি মনোভাব ও লালা লাজপত রায় প্রমুখ দেশনেতাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগের জন্য সরকারী মহলে কেউ কেউ একে প্রচ্ছন্ন ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন ব'লে মনে করেছিলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দলগতভাবে এই সমাজের কোন রাজনীতিক ভূমিকা ছিল না।

আর্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী ১৮২৪ খৃঃ কাথিয়াওয়াড়ের এক সম্পন্ন ব্রাহ্মণ-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। গার্হস্থ্য আশ্রমে তাঁর নাম ছিল মূলশঙ্কর। বাল্যে ও কৈশোরে তাঁর শিক্ষাদীক্ষা সবই হয়েছিল প্রাচীন প্রথামত, এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ইংরেজী বর্ণমালার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেনি। তবে নিজে ইংরেজী শিক্ষা না পেলেও সেই শিক্ষার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ফলের সঙ্গে দয়ানন্দ অপরিচিত ছিলেন না,—পরবর্তী কালে তাঁর সমস্ত শক্তিই ব্যয়িত হয়েছিল সেই শিক্ষার কুফলগুলি দূর করার চেষ্টায়। সংস্কৃত ভাষায় দয়ানন্দ অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন, গুজরাতী ও হিন্দী ভাষাও তাঁর ভাল করেই শেখা ছিল। প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র, বিশেষতঃ বেদ-বেদান্ত তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল বলা চলে, এবং শাস্ত্রীয় বিচারে প্রতিপক্ষের পণ্ডিতদের পরাজিত করা এইজন্য তাঁর পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ হয়েছিল।

কৈশোরেই মূর্তিপূজা নিয়ে পিতার সঙ্গে মূলশঙ্করের বিরোধ বেধেছিল এবং কথিত আছে, পিতার নির্দেশ লঙ্ঘন ক'রে তিনি এক শিবরাত্রির রাত্রে তাঁর উপবাস ভঙ্গ করেন। ১৮৪৬ খৃঃ মাত্র ২২ বৎসর বয়সে তিনি গৃহত্যাগ ক'রে সন্ন্যাস-ব্রত গ্রহণ করেন ও কঠোর তপস্যায় রত হন। এই অবস্থায় ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বহু সাধু-সন্ন্যাসীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। এঁদের মধ্যে মথুরার স্বামী বিরজানন্দ সরস্বতী দয়ানন্দের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন; ভারতের সর্বত্র পৌরাণিক হিন্দুধর্মের পরিবর্তে বৈদিক হিন্দুধর্ম প্রচারের প্রেরণা দয়ানন্দ নাকি এই সন্ন্যাসীর কাছ থেকেই পেয়েছিলেন। ১৮৬৩ খৃঃ

দয়ানন্দ বৈদিক ধর্ম প্রচারের জন্য তাঁর ভারত-পরিক্রমা শুরু করেন। বিভিন্ন স্থানে বহু সনাতনপন্থী পণ্ডিতের সঙ্গে তাঁর শাস্ত্রীয় বিচার হয় এবং কাশীর বিচার-সভায় জয়লাভের পর তাঁর খ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। পঞ্জাব, রাজপুতানা, গুজরাত ও উত্তরপ্রদেশে দয়ানন্দ বিশেষ সাফল্য লাভ করেন, দেশীয় রাজা ও জমিদারেরা কয়েকজন তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। আবার কোন কোন স্থানে তাঁর প্রতিপক্ষেরা তাঁকে যুক্তিতর্কে পরাজিত করতে না পেরে হত্যা করবার চেষ্টাও করেন। বাংলা-দেশে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে দয়ানন্দের সাক্ষাৎকার ঘটে। ১৮৭৪ খৃঃ দয়ানন্দের বিখ্যাত গ্রন্থ 'সত্যার্থপ্রকাশ' রচিত হয়, এর মধ্যেই তাঁর ধর্ম- ও সমাজ-সম্বন্ধীয় চিন্তাধারার পূর্ণ পবিচয় পাওয়া যায়। বোম্বাই পর্যটনের সময় দয়ানন্দ ব্রাহ্ম- ও প্রার্থনা-সমাজের নেতাদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন, কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গীর বিস্তর পার্থক্য থাকায় তাঁদের পক্ষে পরস্পরের সহযোগিতা করা সম্ভবপর হয়নি। ১৮৭৫ খৃঃ বোম্বাই-এ প্রথম আর্যসমাজের প্রতিষ্ঠা হয়। ১৮৭৪ হ'তে ১৮৮১ খৃঃ পর্যন্ত সাত বৎসর দয়ানন্দ মাদাম ব্লাভাট্‌স্কি-প্রতিষ্ঠিত ভারতের থিওসফিক্যাল সোসাইটির সঙ্গে একযোগে কাজ করেছিলেন, কিন্তু ১৮৮১ খৃঃ প্রায় সমগোত্রীয় এই দুটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিভেদ ও মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয় ও দয়ানন্দ থিওসফিক্যাল সোসাইটির সঙ্গে তাঁর সংযোগ সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করেন। ১৮৮২ খৃঃ তাঁর চেষ্টায় 'গৌরক্ষিণী সভা' স্থাপিত হয় ভারতে গো-রক্ষার উদ্দেশ্যে। পরের বৎসর অর্থাৎ ১৮৮৩ খৃঃ প্রায় ৬০ বৎসর বয়সে দয়ানন্দ ইহলীলা সংবরণ করেন।

দয়ানন্দের মৃত্যুর পর তাঁর প্রধান অনুচর বর্গ তাঁর আরব্ধ কাজ চালিয়ে নিয়ে যান। এঁদের মধ্যে লালা হংসরাজ, পণ্ডিত গুরুদত্ত, লালা লাজপত রায় এবং স্বামী শ্রদ্ধানন্দ প্রধান ছিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই কিন্তু আর্য-সমাজের মধ্যে দুটি বিরোধী দলের সৃষ্টি হয়; রক্ষণশীল দল 'মহাত্মা' বা 'নিরামিষাশী' (vegetarian) দল নামে ও সংস্কারকামী দল 'কলেজ' দল নামে পরিচিত হন। শেষোক্ত দল হিন্দুসমাজে ব্যাপক সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন, বৈদিক হিন্দুধর্মের নামে তাঁরা বহু পাশ্চাত্য প্রথা ও সামাজিক আদর্শ গ্রহণ করেন। লাহোরের 'দয়ানন্দ অ্যাংলো-বেদিক' (D.A.V.) কলেজ এঁদেরই কীর্তি। 'মহাত্মা' দল আচারে-ব্যবহারে নিজেদের ভারতীয়ত্ব সম্পূর্ণভাবে অক্ষুণ্ণ রাখতে চেয়েছিলেন। হরিদ্বারের বিখ্যাত 'গুরুকুল' বিদ্যালয় তাঁদের প্রতিষ্ঠান। ১৮৯২ খৃঃ এই দুই দলের মধ্যে প্রকাশ্য বিরোধ দেখা দেয়, কিন্তু এই অন্ত-র্বিরোধ সত্ত্বেও আর্যসমাজের জনপ্রিয়তা বিশেষ হ্রাস পায়নি। ১৯১১ খৃঃ লোকগণনায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে প্রায় আড়াই লক্ষ স্ত্রী-পুরুষ নিজেদের আর্যসমাজী ব'লে পরিচয় দেন এবং পরোক্ষভাবে আরও অনেক লোক যে সমাজের প্রভাবে এসেছিলেন, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। ভারতবর্ষের মোট জনসংখ্যার তুলনায় অবশ্য আর্যসমাজের সভ্যসংখ্যা খুব বেশী ছিল না, কিন্তু উত্তর-পশ্চিম ভারতে, বিশেষতঃ পঞ্জাব ও উত্তরপ্রদেশে বহু প্রতি-পত্তিশালী ব্যক্তি এই সমাজের পৃষ্ঠপোষকরূপে অবতীর্ণ হন ও তার ফলে ঐ অঞ্চলের হিন্দুদের মধ্যে সাময়িকভাবে একটি বিশেষ সাড়া পড়ে যায়। একমাত্র মাদ্রাজ ভিন্ন ভারতের আর সব প্রদেশেই আর্যসমাজের শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু দক্ষিণ ও পূর্ব ভারতে আর্যসমাজ কোন দিনই বিশেষ প্রভাবশালী হয়ে উঠতে

পারেনি। পূর্ব ভারতে ব্রাহ্মসমাজ ও দক্ষিণ ভারতে থিওসফিক্যাল সোসাইটি আর্যসমাজের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ায়।

স্বামী দয়ানন্দের আন্দোলনের প্রকৃত রূপটি বুঝতে হ'লে তাঁর ধর্ম- ও সমাজ-সংক্রান্ত চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। দয়ানন্দের রচিত 'সত্যার্থপ্রকাশ'ই এ-বিষয়ে সবচেয়ে প্রামাণিক পুস্তক। ধর্মবিষয়ে দয়ানন্দ নিজেকে কোন নূতন মতবাদ বা সম্প্রদায়ের জনক ব'লে দাবি করেননি। নিজেকে সব সময়ে হিন্দু বলেই তিনি পরিচয় দিতেন। তবে রামমোহনের মতো দয়ানন্দের হিন্দুধর্মও পৌরাণিক এবং প্রচলিত হিন্দুধর্ম হ'তে বহুলাংশে ভিন্ন ছিল। রামমোহন বেদান্ত বা উপনিষদ্‌কে হিন্দুধর্মের মূল গ্রন্থ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন, দয়ানন্দ বেদকেই হিন্দুর তথা আর্যজাতির একমাত্র প্রামাণিক শাস্ত্র ব'লে দাবি করেন। অবশ্য বেদাঙ্গ ও বেদান্তকেও তিনি বেদের অংশ ব'লে মনে করতেন, কিন্তু বেদের (অর্থাৎ সংহিতা ও ব্রাহ্মণের) প্রামাণ্যই তাঁর কাছে সব চেয়ে বড় ছিল। 'বৈদিক ধর্মে ফিরে যাও'—এই ছিল দয়ানন্দের প্রধান বাণী। সমস্ত ধর্মের সমস্ত সত্যের এমন কি সমস্ত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বেরও মূল বেদের মধ্যে নিহিত আছে ব'লে দয়ানন্দ বিশ্বাস করতেন। প্রচলিত সায়ন-ভাষ্যকে অগ্রাহ্য ক'রে তিনি নিজেই বেদের টীকা রচনা করেছিলেন, যদিও তাঁর প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ের বাইরে সে টীকার বিশেষ সমাদর হয়নি। আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের প্রতিটি আবিষ্কার, এমন কি মারণাস্ত্রগুলিও বৈদিক যুগের আর্যদের কাছে সুপরিচিত ছিল ব'লে তিনি দাবি করতেন। এই দাবির সমর্থনে কয়েকটি বৈদিক সূক্তের অভিনব ব্যাখ্যা করা দয়ানন্দের মতো সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের পক্ষে অবশ্যই খুব কঠিন ছিল না, তবে দেশের উচ্চশিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে সেই ব্যাখ্যা কতদূর গ্রহণযোগ্য হয়েছিল, তা সন্দেহের বিষয়। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক ফার্কুহার (J. N. Farquhar) মনে করেন, দয়ানন্দ তাঁর এই ব্যাখ্যা নিজেই সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতেন না, শুধু আধুনিক সভ্যতার তুলনায় বৈদিক সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করবার জন্যই তিনি এই ধরনের যুক্তি প্রয়োগ করতেন। ফার্কুহারের এই মতের স্বপক্ষে কিন্তু বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না, দয়ানন্দের এ বিশ্বাস খুব সম্ভব আন্তরিক ছিল। বেদই সমস্ত ধর্মের ভিত্তি-স্থানীয় ব'লে দয়ানন্দ সকল জাতির, সকল বর্ণের স্ত্রীপুরুষের বেদপাঠে অধিকার আছে ব'লে ঘোষণা করেন।

বেদবাহ্য অন্যান্য হিন্দুশাস্ত্র, বিশেষতঃ স্মৃতি ও পুরাণের প্রতি দয়ানন্দের বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল না। মনুস্মৃতি ভিন্ন অন্যান্য স্মৃতিশাস্ত্র ও অষ্টাদশ পুরাণকে তিনি অজ্ঞ স্বার্থপর লোকের রচনা বলেই মনে করতেন। রামমোহনের মতো দয়ানন্দও ব্রহ্ম বা পরমাত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু বহু দেবদেবীর পূজা প্রতিমাপূজা ও পশুবলি —পৌরাণিক হিন্দুধর্মের এই তিনটি প্রধান অঙ্গের তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন। বিভিন্ন পৌরাণিক দেবদেবীকে দয়ানন্দ সুদূর অতীতের জ্ঞানী ও বিলক্ষণ 'মানুষ' বলেই মনে করতেন। পুরোহিত-তন্ত্র ও মূর্তিপূজার নিন্দায় দয়ানন্দ প্রায় রামমোহনের মতোই মুখর ছিলেন। বৈদিক যুগে আর্যেরা গোমাংস-ভক্ষণে অভ্যস্ত ছিলেন ব'লে তিনি প্রথম জীবনে গোহত্যার সমর্থন করেন, কিন্তু পরে এ-বিষয়ে তাঁর মতের সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয় ও মৃত্যুর এক বৎসর পূর্বে তিনি 'গৌরক্ষিণী সভা' স্থাপন করেন।

ইসলাম ও খৃষ্টধর্মের প্রতি দয়ানন্দের মনোভাব অত্যন্ত বিরূপ ছিল। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, ভারতবর্ষের সমস্ত দুঃখদুর্দশার জন্য ইসলাম ও খৃষ্টধর্মের এ-দেশে আগমনই প্রধানতঃ দায়ী। 'গৌরক্ষিণী সভার' প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষে এই সব বহিরাগত ধর্মের প্রভাব নষ্ট করা। আর্য-সমাজের একটি বিশেষ কার্য-কলাপের মধ্যে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার রূপটি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে, সেটি হচ্ছে দয়ানন্দের প্রবর্তিত 'শুদ্ধি-আন্দোলন'। ভারতবর্ষে এক জাতি, এক ধর্ম ও এক সমাজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে পরিচালিত এই আন্দোলনের আসল লক্ষ্য ছিল ভারতীয় অ-হিন্দুদের হিন্দুধর্মে দীক্ষা-দান। এই আন্দোলনের ফলে ভারতবর্ষে হিন্দুধর্মাবলম্বী লোকের সংখ্যা বিশেষ বৃদ্ধি না পেলেও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ যে প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছিল, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই।

হিন্দুসমাজের পুনর্গঠন-কল্পে দয়ানন্দ কতক-গুলি সামাজিক সংস্কারের প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করেন। প্রথমতঃ তিনি হিন্দুদের মধ্যে দীর্ঘকাল-প্রচলিত জাতিভেদ-প্রথার পরিবর্তন কামনা করেন। বংশানুক্রমিক জাতিভেদ-প্রথায় তাঁর বিন্দুমাত্র আস্থা ছিল না। বেদপাঠ ও ব্যাখ্যায় সকল জাতির (বা বর্ণের) সমান অধিকার আছে ব'লে তিনি ঘোষণা করেন। আর্যসমাজ-পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলির কোথাও জাতিভেদের ভিত্তিতে বৈষম্যমূলক ব্যবহার করা হ'ত না। নিম্নবর্ণের এমন কি অস্পৃশ্য জাতির বালক-বালিকাদের মধ্যে শিক্ষা-প্রসারের জন্য আর্যসমাজ বহু চেষ্টা করে। আর্যসমাজের সাপ্তাহিক উপাসনা-সভাগুলিতেও নিম্নবর্ণের লোকেদের প্রার্থনা-পরিচালনার অধিকার স্বীকৃত হয়।

দয়ানন্দ স্ত্রীপুরুষের সমান অধিকারে বিশ্বাসী ছিলেন। বৈদিক যুগে অপ্রচলিত বাল্যবিবাহ-প্রথার তিনি নিন্দা করেন। পুরুষের পক্ষে ২৫ ও নারীর পক্ষে ১৬ বৎসর বয়সই বিবাহের ন্যূনতম বয়স হওয়া উচিত ব'লে দয়ানন্দ মনে করতেন। সাধারণতঃ বিধবা ও বিপত্নীক উভয়ের পুনর্বিবাহের বিরোধী হলেও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তিনি বিধবাবিবাহের সমর্থন করতেন। স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারের ব্যাপারেও দয়ানন্দের যথেষ্ট আগ্রহ দেখা যায়। অনাথা বালিকাদের শিক্ষাদানের জন্য তিনি পঞ্জাবের জলন্ধরে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। ব্রাহ্মসমাজ-পরিচালিত 'ব্রাহ্মিকা সভা'র অনুকরণে আর্যসমাজ-পরিচালিত 'স্ত্রীসভা' স্থাপিত হয়।

অনুন্নত ও অস্পৃশ্য জাতির লোকদের সামাজিক উন্নতির জন্য আর্যসমাজ নানাভাবে চেষ্টা করে। বিশেষতঃ যাতে হিন্দুসমাজের এই অবজ্ঞাত ও অবহেলিত অংশের মধ্যে খৃষ্টধর্ম প্রবেশ-লাভ করতে না পারে, তার জন্য দয়ানন্দের অনুবর্তীরা সচেষ্ট হন। লালা লাজপত রায় এই উদ্দেশ্যেই লাহোরে 'বৈদিক স্যালভেশান আর্মি' গঠন করেন। কোন কোন ব্যাপারে দয়ানন্দের সংস্কারপ্রচেষ্টা সে-যুগের রক্ষণশীল মনোভাবকে অত্যন্ত রূঢ়ভাবে আঘাত করে। পৌরাণিক যুগে প্রচলিত 'নিয়োগ' প্রথাকে সমর্থন ক'রে দয়ানন্দ প্রবল সামাজিক প্রতিকূলতার সম্মুখীন হন। সমুদ্র-যাত্রার বিরুদ্ধে সে-যুগের হিন্দুসমাজে যে দৃঢ়মূল সংস্কার ছিল, দয়ানন্দ তারও উচ্ছেদ করার চেষ্টা করেন।

শিক্ষাবিস্তারের ব্যাপারেও দয়ানন্দ ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত আর্যসমাজের একটি সক্রিয় ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের

প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করলেও দয়ানন্দ মনে করতেন যে, তাদের মূল তত্ত্ব সবই বেদের মধ্যে নিহিত আছে। তাঁর ধর্মচিন্তা জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার জন্য দয়ানন্দ নিজেই কয়েকটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁর বিদ্যালয়ের পণ্ডিতেরাই অনেক সময়ে প্রচ্ছন্নভাবে তাঁর ভাবের বিরোধিতা করতেন। পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের মানসে পরবর্তী কালে লাহোরে 'দয়ানন্দ অ্যাংলো-বৈদিক কলেজ' প্রতিষ্ঠা করা হয়। এক হিসাবে এটি স্যর সৈয়দ আহ্‌মেদ-প্রতিষ্ঠিত আলিগড অ্যাংলো-মহমেডান কলেজেরই (বর্তমানে যা আলিগড মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে) হিন্দু সংস্করণ। কিন্তু আর্য-সমাজের রক্ষণশীল অংশ এই কলেজের প্রদত্ত শিক্ষায় বিশেষ সন্তুষ্ট হ'তে পারেননি। তাই তাঁরা ১৯০২ খৃঃ হরিদ্বারে বিখ্যাত 'গুরুকুল বিদ্যালয়' স্থাপন করেন। সাত বৎসর বয়সের বালকদের এই বিদ্যালয়ের ছাত্র-হিসাবে গ্রহণ করা হ'ত এবং পঁচিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত তাদের এখানে থেকে কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন ক'রে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য, প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র (বিশেষতঃ বেদ), ইংরেজী ভাষা এবং পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানও (মাতৃভাষার মাধ্যমে) শিক্ষা করতে হ'ত। ছাত্রেরা এখানে প্রায় বিনা-বেতনেই অধ্যয়নের সুযোগ লাভ ক'রত, শিক্ষকেরা মাত্র নিজেদের ভরণ-পোষণের উপযুক্ত পারিশ্রমিক গ্রহণ করতেন। যে আঠারো বৎসর ছাত্রেরা এখানে বিদ্যাভ্যাসের সুযোগ পেত, তার মধ্যে একবারও তাদের আত্মীয় পরিজনের কাছে ফিরে যাবার অনুমতি দেওয়া হ'ত না, শিক্ষকেরাই এই কয় বৎসর তাদের অভিভাবক ও সঙ্গী হিসাবে থাকতেন। কোনরকম জাতি বা বর্ণগত বিভেদকে আর্যসমাজ-পরিচালিত এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে প্রশ্রয় দেওয়া হ'ত না। সে-যুগের বর্ণহিন্দু-সমাজের রক্ষণশীল মনোভাবের কথা স্মরণ করলে আর্যসমাজের এই উদারতা ও দৃঢ়তার প্রশংসা না ক'রে পারা যায় না। পরবর্তী কালে এই প্রতিষ্ঠানের অনুকরণে পঞ্জাব ও উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আরও কয়েকটি 'গুরুকুল' প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির সঙ্গে জড়িত না থাকলেও পরোক্ষভাবে দয়ানন্দ তাঁর দেশবাসীর মধ্যে জাতীয়তা-বোধ জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করেছিলেন। ভারতবর্ষ ভারতবাসীর জন্য বা আর্যভূমি আর্যজাতির জন্য এই ধরনের মনোভাবকে দয়ানন্দ ও তাঁর অনুবর্তীরা ক্রমশই দৃঢ় ক'রে তুলছিলেন। ভারতবর্ষের প্রাচীন গৌরবের কথা বারবার দেশবাসীকে স্মরণ করিয়ে দিয়েও তাঁরা এই দেশপ্রেমের ভাবকেই সুগভীর করছিলেন। দয়ানন্দ স্পষ্টই বলতেন যে, মদ্যপায়ী গোমাংসভোজী বিধর্মীদের ভারতে আগমনই এ-দেশের সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার মূল কারণ। 'ভগবদ্গীতা'র অভিনব ব্যাখ্যা ক'রে তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, দুর্বৃত্ত অত্যাচারী লোকেদের হত্যা করাও ধর্মের দৃষ্টিতে পাপ কাজ ব'লে বিবেচিত হয় না। পরবর্তী কালে দয়ানন্দের এই প্রকার উক্তি বহু ভারতীয় সন্ত্রাস-বাদীকে হিংসাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত হ'তে প্রেরণা দিয়েছিল। দয়ানন্দের অনুবর্তীদের মধ্যে কারও কারও পঞ্জাবের বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ ছিল। এঁদের মধ্যে লালা লাজপত রায়, অজিত সিং, শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা, ও ভাই পরমানন্দের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পঞ্জাব ও উত্তরপ্রদেশে দয়ানন্দের আর্য-সমাজ-আন্দোলন বিশেষ সাফল্য লাভ করে।

পঞ্জাবে ১৮৬৩ খৃঃ ব্রাহ্মসমাজের একটি শাখা স্থাপিত হয়েছিল, কিন্তু আর্যসমাজের প্রবল প্রতিযোগিতার জন্য ব্রাহ্ম আন্দোলন পঞ্জাবে শীঘ্রই স্তিমিত হয়ে পড়ে। উত্তর-পশ্চিম ভারতে বৈদেশিক চিন্তাধারা ও সভ্যতার প্রভাবকে সীমাবদ্ধ রাখার কাজে আর্যসমাজ আংশিক সাফল্য লাভ করেছিল, সন্দেহ নেই। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের গণ্ডির বাইরেও জনমানসে দয়ানন্দের প্রভাব কিছুটা রেখাপাত করেছিল। জনচিত্তকে আকর্ষণ করার ব্যাপারে দয়ানন্দের এই সাফল্য সে-যুগের সমাজ-সংস্কারকদের অনুপ্রেরণা দিয়েছিল। প্রচলিত পৌরাণিক হিন্দুধর্মের কুসংস্কারগুলিও এই আন্দোলনের ফলে কিছু কিছু দূর হয়। সব শেষে এ-কথাও স্বীকার করতে হবে যে, পরোক্ষভাবে দয়ানন্দের আন্দোলন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামকে—বিশেষতঃ বিপ্লবী আন্দোলনকে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দিয়েছিল।

বারেক এসে দাঁড়াও

শ্রীশান্তশীল দাশ

তোমার কথা অনেক শুনি, অনেক পড়ি, তবু তো কই
হদিস্ কিছু পাইনে তোমার, কোথায় থাক, কী রূপ ধরো ;
বিশেষণের অনেক মালা তোমার নামের সঙ্গে গাঁথা,
শেষ কোথা তার, এখনো যে দিনে দিনে হচ্ছে জড়ো।

একি শুধুই খেয়াল খুশি! বিলাসী মন তোমায় গড়ে
নানা রঙের তুলির টানে ইচ্ছামতো যখন তখন ?
আসল সাথে নেইকো দেখা, নকল নিয়েই মাতামাতি—
এমনি করেই দিন কেটে যায়, বছর যুগও—অপসরণ।

যেমন দেখি আকাশ, আলো, পাহাড়, নদী, ফুলের ডালা,
সবুজ ঘাসের আস্তরণ আর পথের ধূলো, অসংখ্য মুখ ;
এধার ওধার যেদিক তাকাই, কতই কি যে চক্ষে পড়ে—
তেমনি ক'রে দেখব তোমায়, দেখব কবে—ভরবে এ বুক ?

অনেক শুনে, অনেক প'ড়ে মিটছে নাকো একটু ক্ষুধা ;
বাড়ছে ব্যথা, সংশয়েতে কখনো বা ভরছে ভুবন -
অশান্ত এ মনের কোণে দ্বন্দ্ব-দ্বিধার কী জাল বোনা!
বারেক এসে দাঁড়াও দেখি রূপটি ক'রে নিরাবরণ।

ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে ঈশ্বরতত্ত্ব

ডক্টর শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ঈশ্বরের স্বরূপ

ন্যায়-বৈশেষিক মতে পরমাত্মাই ঈশ্বর। তিনি সর্বশক্তিমান্ সর্বজ্ঞ পুরুষ এবং জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের আদি কারণ। দেশ, কাল ও আকাশে অবস্থিত বহু নিত্য পরমাণু, মন ও জীবাত্মা প্রভৃতি উপাদানরূপে লইয়া তিনি জগৎ রচনা করেন। পরমাণু, মন ও আত্মা, দেশ কাল ও আকাশ নিত্য পদার্থ। অতএব এগুলি ঈশ্বরের সৃষ্ট নহে। ঈশ্বরের ন্যায় ইহারা সৃষ্টির পূর্ব হইতেই বিদ্যমান থাকে। এ-সব উপাদান হইতে ঈশ্বর জগৎ নির্মাণ করেন। এই অর্থে তাঁহাকে জগৎস্রষ্টা বলা হয়। তিনি জগতের উপাদান কারণ নহেন, তিনি ইহার নিমিত্ত কারণ। কুম্ভকার যেমন মৃত্তিকা হইতে ঘট নির্মাণ করে, ঈশ্বর তেমনি নিত্য পরমাণু প্রভৃতি হইতে জগৎ নির্মাণ করেন। সৃষ্টির পর তিনি জগৎকে ধারণ করিয়া থাকেন এবং কল্পান্তে ইহার প্রলয় বা বিনাশ সাধন করেন। তিনি এক অনন্ত ও নিত্য আত্মা। সৃষ্ট জগৎ তাঁহার শরীর এবং তিনি জীবজগতের অন্তরাত্মা। তাঁহার জ্ঞান নিত্য ও অনন্ত। নিত্য জ্ঞান তাঁহার অবিচ্ছেদ্য গুণ, স্বরূপ নহে। জীবের কর্মানুসারে সুখ ও দুঃখ ভোগের জন্য এবং নীতি ও ধর্ম সংস্থাপনার্থ ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করেন, পালন করেন এবং কল্পক্ষয়ে সংহারও করেন। তিনি জীবের কর্মের প্রযোজক কর্তা। কোন জীবই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বা স্বাধীন নয়। জীব তাহার কর্মের নিমিত্তহেতু মাত্র। জীবের অবশ্য কিছু স্বাতন্ত্র্য বা সীমাবদ্ধ স্বাধীনতা আছে, কিন্তু জীব ঈশ্বরকর্তৃক প্রেরিত হইয়া কর্ম করে। যেমন পুত্রকন্যা পিতামাতা কর্তৃক প্রেরিত হইয়া নিজ নিজ কর্ম করে, জীবগণও ঈশ্বরের ইচ্ছা ও প্রেরণা অনুসারে কর্ম করে। ঈশ্বর জীবের কর্মফলদাতা। জীবের সুকর্ম বা কুকর্ম অনুসারে তিনি জীবকে সুফলরূপ সুখ এবং কুফলরূপ দুঃখ দেন। জীব নিজের কর্মের ফল নিজেই ভোগ করে, ইহাই ঈশ্বরের ইচ্ছা অর্থাৎ নিয়ম।

ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ

ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব-বিষয়ে অনেক প্রমাণ-প্রযোগ দেখা যায়। কোন কোন গ্রন্থে ৮।১০টি প্রমাণের উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে যেগুলি সুপ্রসিদ্ধ এবং সচরাচর প্রযুক্ত হয়, তাহাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইতেছে।

(১) কার্যত্বলিঙ্গক অনুমান

ঈশ্বরের অস্তিত্ব-বিষয়ে প্রথম প্রমাণ হইল কার্যত্বলিঙ্গক অনুমান। অনুমানটি এইরূপ: পর্বত, সাগর, চন্দ্র, সূর্য প্রভৃতি পার্থিব পদার্থের কোন কর্তা আছেন, যেহেতু ইহারা সকলেই এক একটি কার্য এবং কার্য থাকিলেই তাহার কর্তা অবশ্য থাকিবে, যেমন—ঘটরূপ কার্যের কর্তা কোন কুম্ভকার অবশ্য আছে। পর্বত ও সাগর প্রভৃতি যে-কার্য, তাহা তাহাদের সাবয়বত্ব এবং অবান্তর-মহত্ত্ব হইতে বুঝা যায়। পর্বতাদি বস্তু বহু অবয়ব বা অংশের সংযোগে গঠিত। তৎপরে ইহারা দেশ কাল ও আকাশের ন্যায় অতি মহৎও নয় এবং পরমাণুর ন্যায় অতি ক্ষুদ্রও নয়, কিন্তু মধ্যমপরিমাণবিশিষ্ট। অতি মহৎ

বা অসীম দ্রব্য দেশ কাল প্রভৃতি কার্য নয়। সেইরূপ অতি ক্ষুদ্র পরমাণুও কার্য নয়। ইহারা নিত্য দ্রব্য এবং ইহাদের কোন কর্তা নাই। কিন্তু পর্বত, সাগর প্রভৃতি অতি মহৎ বা অসীম দ্রব্য নয়, অথবা ইহারা অতি ক্ষুদ্র দ্রব্যও নয়। ইহারা-মধ্যমপরিমাণবিশিষ্ট। এইরূপ সাবয়ব এবং অবান্তর মহত্ত্ববিশিষ্ট দ্রব্যমাত্রই কার্য এবং তাহাদের কোন কর্তা আছে। পর্বত, সাগর প্রভৃতি অবয়ব-সংযোগের জন্য কোন বুদ্ধিমান্ কর্তা প্রয়োজন। এরূপ কর্তার পর্বতাদির উপাদান যে পরমাণুপুঞ্জ তাহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান থাকিবে, পর্বতাদি কার্য উৎপন্ন করিবার ইচ্ছা থাকিবে এবং সেই ইচ্ছানুসারে কার্য করিবার প্রযত্নও থাকিবে, অর্থাৎ পর্বতাদির কর্তা জ্ঞান-চিকীর্ষা- ও কৃতি-সম্পন্ন হইবেন। অধিকন্তু তিনি সর্বজ্ঞ হইবেন, কারণ কেবলমাত্র কোন সর্বজ্ঞ পুরুষই অতি সূক্ষ্ম পরমাণু প্রভৃতি এবং অসীম দ্রব্য দেশ কাল প্রভৃতি প্রত্যক্ষ কবিতে পারেন। এইরূপ সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান্ পুরুষের নাম ঈশ্বর।

(২) *অদৃষ্টলিঙ্গক অনুমান*

ঈশ্বরের অস্তিত্ব-বিষয়ে দ্বিতীয় প্রমাণ এইরূপ: সংসারে মানুষের সুখ-দুঃখের এত তারতম্য কেন? কেহ সুখী, কেহ দুঃখী, কেহ পণ্ডিত, কেহ মূর্খ হয় কেন? অবশ্য এজন্য মানুষের কর্মই দায়ী। যে যেমন কর্ম করে, সে তেমন ফল ভোগ করে। সুকর্ম সুখরূপ সুফল এবং কুকর্ম দুঃখরূপ কুফল প্রসব করে, ইহা আমরা এই জীবনে দেখিতে পাই। অবশ্য কোন কোন স্থলে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায় সত্য। কিন্তু সেস্থলে বলিতে হইবে, জীবের পূর্বজন্মে শুভ বা অশুভ কর্মের ফল এত প্রবল যে, তাহা এই জীবনের কর্মের যথাযোগ্য ফলোদয়ে বাধা প্রদান করে এবং তাহাকে রোধ করিতে হইলে প্রবলতর কর্ম বা চেষ্টা আবশ্যক। অতএব আমরা বলিতে পারি যে, আমাদের কর্মই আমাদের সব সুখ-দুঃখের কারণ। শুভ কর্ম দ্বারা জীবাত্মা পুণ্য অর্জন করে এবং অশুভ কর্ম দ্বারা পাপ অর্জন করে। পাপ ও পুণ্য আমাদের প্রত্যক্ষ হয় না। এজন্য জীবাত্মার পাপপুণ্যের সমষ্টিকে তাহার 'অদৃষ্ট' বলে। অদৃষ্ট বা দৈব বলিতে পূর্বজন্মকৃত কর্মের পাপ-পুণ্যরূপ ফলমাত্রই বুঝায়, তদ্ব্যতীত কোন অদৃষ্ট বা দৈব নাই। জীব তাহার অদৃষ্ট অনুসারে সুখ-দুঃখ ভোগ করে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে: জীবের অদৃষ্ট কিরূপে তাহাকে যথাযোগ্য ফল প্রদান করে? অদৃষ্ট জড় ও অচেতন পদার্থ। ইহা কিরূপে বুঝিবে যে, এই শুভাশুভ কর্মের এইরূপ এবং এই পরিমাণ শুভাশুভ ফল হওয়া উচিত? কোন চেতনপুরুষ দ্বারা পরিচালিত হইলে অচেতন যন্ত্রাদি ঠিকমত কাজ করে, ইহা আমরা বুঝিতে পারি। অচেতন দ্রব্য বা শক্তি নিজে কোন প্রয়োজন সাধন করিতে পারে না। অতএব স্বীকার করিতে হয় যে, অদৃষ্ট কোন চেতন-পুরুষ দ্বারা পরিচালিত হইয়া জীবকে তাহার কর্মানুযায়ী ফল প্রদান করে। জীব অদৃষ্টের পরিচালক হইতে পারে না। কারণ সে নিজেই জানে না যে, তাহার অদৃষ্টে কি আছে এবং কখন কখন অদৃষ্ট তাহার সকল প্রচেষ্টা বা পুরুষকার ব্যর্থ করিয়া দেয়। অতএব অদৃষ্টের পরিচালক-হিসাবে কোন সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান্ পুরুষকে স্বীকার করিতে হইবে। আর তাঁহারই নাম ঈশ্বর। এখানে এ-কথা উল্লেখ-যোগ্য যে, জার্মান দার্শনিক কাণ্ট অনুরূপ যুক্তি দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

(৩) বেদপ্রামাণ্যমূলক অনুমান

ঈশ্বরের অস্তিত্ব-বিষয়ে ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে উল্লিখিত তৃতীয় প্রমাণটি এইরূপ : বেদ প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্র যে অভ্রান্ত জ্ঞানের আকর, তাহা সকল আস্তিক্যবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিই স্বীকার করেন। বেদ প্রামাণিক শাস্ত্র—ইহা সকলের স্বীকার্য। এখন প্রশ্ন হইতেছে—বেদের প্রামাণ্যের হেতু কি? বেদকে কেন প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করা হয়? ন্যায়-বৈশেষিক মতে আয়ুর্বেদ ও মন্ত্রবিজ্ঞানের প্রামাণ্যের মতো বেদের প্রামাণ্য আপ্তপ্রামাণ্যমূলক। আয়ুর্বেদ একটি প্রামাণিক বিজ্ঞান। ইহা যে প্রামাণিক, তাহা ইহার অনুশাসনের ফলদৃষ্টে বুঝা যায়।

আয়ুর্বেদের বিধান অনুসারে অনেক রোগ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। কিন্তু আয়ুর্বেদের প্রামাণ্য তাহার কর্তা বা রচয়িতার আপ্তত্বের উপর নির্ভর করে, অর্থাৎ কোন অভ্রান্ত ও বিশ্বস্ত পুরুষ কর্তৃক রচিত বলিয়াই আয়ুর্বেদ প্রামাণিক। বেদের প্রামাণ্যও সেইরূপ বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ বেদও আপ্তপুরুষের বাক্য বলিয়াই প্রামাণিক শাস্ত্র। বেদ যে প্রামাণিক, তাহা দৃষ্টার্থ বেদবাক্য হইতে বুঝা যায়। কোন কোন বৈদিক ক্রিয়ার ফল আমরা ইহলোকেই দেখিতে পাই। অতএব অদৃষ্টার্থ বেদবাক্যকেও প্রামাণিক বলা যায়। আয়ুর্বেদের ন্যায় বেদও কোন আপ্তপুরুষের উপদেশ বলিয়াই প্রামাণিক। আমাদের মতো অল্পজ্ঞ পুরুষেরা বেদের রচয়িতা হইতে পারে না, কারণ বেদে অনেক অতি সূক্ষ্ম ও অতীন্দ্রিয় পদার্থ-বিষয়ে উপদেশ আছে, এবং সেগুলি সাধারণ মানুষের জ্ঞানগম্য নয়। অতএব কোন সর্বজ্ঞ পুরুষকেই বেদের রচয়িতা বা উপদেষ্টা বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। এই সর্বজ্ঞ পুরুষ হইলেন ঈশ্বর।

(৪) শ্রুতিপ্রমাণ

শ্রুতিতে অর্থাৎ বেদ ও উপনিষদে ঈশ্বরের অস্তিত্ব-সম্বন্ধে স্পষ্ট উক্তি আছে। যেহেতু শ্রুতি ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্পষ্টভাষায় ব্যক্ত করিয়াছে, জগৎস্রষ্টা ঈশ্বর নিশ্চয়ই আছেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হইয়াছে, 'সকলের শাসনকর্তা, পালনকর্তা ও রক্ষাকর্তা এক জন্মরহিত আত্মা আছেন, তিনি সকলের পূজা গ্রহণ করেন এবং সকলকে সুফল দান করেন।'[১]

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে কথিত হইয়াছে, 'এক ঈশ্বর সর্বভূতের অন্তরে নিহিত আছেন, তিনি সর্বব্যাপী, সর্বভূতের অন্তরাত্মা, সর্বভূতের অন্তর্যামী ও সর্বভূতের আশ্রয়স্থল।'[২]

ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, 'ঈশ্বর সর্বজীবের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত আছেন, তিনি সর্বভূতকে মায়া দ্বারা যন্ত্রারূঢ় পুত্তলিকার ন্যায় চালিত করেন।'[৩] এ সকল শ্রুতি ও স্মৃতিবাক্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে।

এখানে কোন তর্ককুশল ব্যক্তি আপত্তি করিতে পারেন যে, কেবল শ্রুতি ও স্মৃতির উক্তি দ্বারা ঈশ্বর প্রমাণিত হন না। তর্কযুক্তি দ্বারাই ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে হইবে, কেবল শ্রুতিমূলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিলে তাহা যুক্তিহীন মতবাদ মাত্র হইয়া পড়িবে এবং সকলের গ্রাহ্য হইবে না। এইরূপ আপত্তির খণ্ডনে দুইটি কথা বলিতে পারা যায়। প্রথমে বলা যায় যে, কোন তর্কযুক্তি বা প্রমাণ-প্রয়োগ দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না। কোন বস্তুকে প্রমাণ করার অর্থ হইতেছে, উহাকে কোন স্বীকৃত ও ব্যাপক তত্ত্ব হইতে অনিবার্যভাবে 'প্রসক্ত' বলিয়া প্রদর্শন করা।

---

১ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ৪।৪ ২২-২৪
২ শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ ৬।১১
৩ গীতা ১৮।৬১

যেমন, 'এ ব্যক্তি মরণশীল' এই বাক্যটি—'সকল মানুষ মরণশীল' এবং 'এ ব্যক্তি একজন মানুষ' এই দুই বাক্যের সহযোগে প্রমাণিত হয়, যেহেতু উহা তাহাদের সংযোগ হইতে অনিবার্য-ভাবে প্রসক্ত হয়। কিন্তু ঈশ্বর সকল তত্ত্বের উপরে পরম তত্ত্ব, অন্য কোন উচ্চতর তত্ত্ব হইতে তাঁহার প্রসক্তি বা নিগমন প্রদর্শন করা যায় না, যেহেতু তাঁহার উপরে কোন তত্ত্ব নাই, অন্য সব তত্ত্ব তাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত। সাধারণতঃ দর্শনশাস্ত্রে যে-সব তথাকথিত প্রমাণ দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করা হয়, তাহাদের আলোচনা করিলে ঈশ্বর যে কোন প্রমাণগ্রাহ্য নহেন, তাহা বুঝিতে পারা যায়।

এখন দ্বিতীয় কথা হইতেছে, ঈশ্বরতত্ত্ব বা কোন তত্ত্ব নির্ণয়ের প্রকৃষ্ট উপায় হইল সেই তত্ত্বের সাক্ষাৎকার। তর্কযুক্তি দ্বারা তত্ত্বনির্ণয় হয় না। জন্মান্ধ ব্যক্তি তর্কযুক্তি করিয়া আলোকের জ্ঞান লাভ করিতে পারে না। যদি ভাগ্যক্রমে তাহার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া আসে, তবে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ দ্বারা সে আলোকের জ্ঞান লাভ করে এবং তর্কযুক্তির অপেক্ষা করে না। সেইরূপ ঈশ্বরদর্শন বা ঈশ্বর-সাক্ষাৎকারই ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রকাশিত করে, এবং তখন আর প্রমাণ-প্রয়োগের কোন প্রয়োজন হয় না। পক্ষান্তরে সাক্ষাৎকারের অভাবে বহু প্রমাণও ঈশ্বরে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মাইতে পারে না।

অতএব যাহাদের ঈশ্বর-সম্বন্ধে কোন প্রত্যক্ষানুভূতি নাই, তাহাদিগকে ঈশ্বরদ্রষ্টা সাধু ও ঋষিদের উপদেশের উপর নির্ভর করিতে হয়। বেদ বা শ্রুতি এইরূপ ঋষিদের উপদেশ। এজন্য শ্রুতিবাক্য ঈশ্বর-বিষয়ে চূড়ান্ত প্রমাণরূপে গণ্য হইবার যোগ্য। যেমন যুগে যুগে বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিকদের উপদেশ হইতে আমরা অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্য ও তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করি, সেইরূপ বেদ ও উপনিষদের বাক্য হইতে ঈশ্বর- ও অধ্যাত্ম-তত্ত্ব জানিতে পারা যায়।

রহস্য

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

রহস্যে এ সৃষ্টি ঘেরা—
আগে কি তা আমি জানি।
খুঁজছি কাকে? চারিদিকেই
দেখছি কেবল ভগবানই।
এমন অধম আমি ও যে,—
হারিয়ে যাই তাহার মাঝে
চোখে আমার ধাঁধা লাগায়
রূপ-সাগরের চকমকানি।

ক্ষুদ্র বৃহৎ ঢেউ উঠিছে—
আনন্দ পাই, পাই কভু ভয়।
সাম্রাজ্য জল-বিম্ব সম
উঠছে এবং হতেছে লয়।
একই তিনি, একাই তিনি,
সবই তিনি, কতক চিনি।
দেখছি যতই বাড়ছে ততই
আমার মনের উনখুনানি।

বলবো কত তাঁহার কথা
ব'লে কথা ফুরায় না কো,
সৃষ্টি তাঁহার চির-কিশোর
কোন কালেই বুড়ায় না কো।
অমৃতের এক সত্র এ দেশ—
পঙ্‌ক্তি-ভোজন হয় না কো শেষ
সজল ব্যাকুল চোখ চেয়ে রয়
স্ফুরে নাকো মুখের বাণী।

'যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ'

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

গীতার পাতায় পাতায়, শ্লোকে শ্লোকে জ্ঞানের মণিমাণিক্যের দ্যুতি। এই শ্লোক-গুলির মধ্যে একটিতে আছে: শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ। এর ভাষ্য করতে গিয়ে শ্রীঅরবিন্দ 'Essays on the Gita'র মধ্যে লিখেছেন:

> And then there comes a remarkable line in which the Gita tells us that this Purusha, this soul in man, is, as it were, made of shraddha, a faith, a will to be, a belief in itself and existence, and whatever is that will, faith or constituting belief in him, he is that and that is he.

আমাদের জীবনের উপরে বিশ্বাসের প্রভাব সত্যই অপরিমেয়। Aldous Huxleyর 'Ends and Means' একখানি নাম-করা বই। এই বইখানির যে-অধ্যায়টিতে বিশ্বাস-সম্পর্কে আলোচনা আছে, সেখানে দেখতে পাচ্ছি:

> 'All we are, is the result of what we have thought.' Men live in accordance with their philosophy of life, their conception of the world. This is true even of the most thoughtless. It is impossible to live without a metaphysic.

মানুষ সত্য-সত্যই শ্রদ্ধাময়। যারা নিতান্ত নির্বোধ, তারাও বিশ্বাস করে কোন না কোন আদর্শে। আদর্শ নেই—এমন মানুষ মিলবে না। বিশ্বাসের ব্যাপারটা সর্বজনীন। প্রশ্ন বিশ্বাসের এবং অবিশ্বাসেব নয়। কারও বিশ্বাসের মূলে আছে বিচারবুদ্ধির আলো, বাস্তবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়, কেউ বা পরিচালিত হচ্ছে ভ্রান্ত বিশ্বাসের মরীচিকা দ্বারা। ভালো বিশ্বাস এবং মন্দ বিশ্বাস—এ দুয়ের একটাকে আমাদের বেছে নিতে হয়। আমরা পাপ-পুণ্যের ধারণা করি আমাদের এই বিশ্বাসের আলোয়। সত্যের চরম রূপ সম্পর্কে আমাদের মনে যেমন বিশ্বাস বাসা বাঁধবে, ভালো এবং মন্দ সম্পর্কে আমাদের ধারণাও তেমনি হবে। আর ভালো ও মন্দ সম্পর্কে আমরা যে ধারণা পোষণ করি, আমাদের আচরণের মধ্যে তারই তো অভিব্যক্তি।

এই জন্যই বিশ্বাসের ব্যাপারটাকে আমরা আদৌ ছোট ক'রে দেখব না। কারণ 'যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ'—যার যে-রকম শ্রদ্ধা, তার জীবনও সেই রকম হবে। হিটলার বিশ্বাস করতেন: জার্মানেরা জাতিতে নর্ডিক (Nordic) আর নর্ডিক জাতি পৃথিবীর সকল জাতির সেরা। অতএব নর্ডিকদের কর্তব্য হচ্ছে জগৎকে জয় করবার জন্যে নিজেদের সঙ্ঘবদ্ধ করা এবং যেহেতু ইহুদীরা জাতি হিসাবে তাদের সমকক্ষ নয়, সেই হেতু তাদের নিশ্চিহ্ন ক'রে ফেলা।

হাক্সলি তাই লিখেছেন: If we think wrongly, our being and our actions will be unsatisfactory.—আমাদের চিন্তার মধ্যে যদি গলদ থাকে, আমাদের জীবনবীণা ঠিক সুরে কখনও বাজবে না, আমাদের আচরণের মধ্যে ত্রুটি ঘটবেই।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাই বিশ্বাসের উপরে এতখানি জোর দিয়েছিলেন। বলতেন:

> একটা দৃঢ় ক'রে তাঁর চিন্তা করলে তিনিই জানিয়ে দেবেন, তিনি কেমন। শ্যামপুকুরে

পৌঁছিলে তেলীপাড়াও জানতে পারবে। জানতে পারবে যে, তিনি শুধু আছেন (অস্তিমাত্রম্) তা নয়, তিনি তোমার কাছে এসে কথা কবেন—আমি যেমন তোমার সঙ্গে কথা কচ্ছি। বিশ্বাস করো, সব হয়ে যাবে।

আবার বলছেন :

মনেতেই বদ্ধ, মনেতেই মুক্ত। আমি মুক্ত পুরুষ; সংসারেই থাকি বা অরণ্যেই থাকি, আমার বন্ধন কি? আমি ঈশ্বরের সন্তান ও রাজাধিরাজের ছেলে; আমায় আবার বাঁধে কে? যদি সাপে কামড়ায়, 'বিষ নেই' জোর ক'রে বললে বিষ ছেড়ে যায়। তেমনি আমি বদ্ধ নই, আমি মুক্ত—এই কথাটি রোক ক'রে বলতে বলতে তাই হয়ে যায়। মুক্তই হয়ে যায়।

মনের উপরে, বিশ্বাসের উপরে ঠাকুর বরাবরই জোর দিয়েছেন। তাঁর বাণীর সঙ্গে একালের জগদ্বরেণ্য মনীষীদের বাণীর যথেষ্ট মিল আছে। আমাদের জীবনধারাকে পরিচালিত করবার ব্যাপারে বিশ্বাসের অপরিমেয় প্রভাবের দিকে তাকিয়েই হাক্সলি লিখেছেন :

So far from being irrelevant our metaphysical beliefs are the finally determining factor in all our actions.

ঈশ্বর, আল্লা, পরলোক সম্পর্কে আমরা যে সকল বিশ্বাস পোষণ করি, তারা আমাদের জীবনে অপ্রাসঙ্গিক তো নয়ই, বরং তারাই শেষ পর্যন্ত আমাদের জীবনের সমস্ত কর্মকে নিয়ন্ত্রিত করে।

তাই আমাদের বিশ্বাসের জগৎকে কর্ম-জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখবার মতো মূঢ়তা আর নেই। যারা আধ্যাত্মিক বিশ্বাসকে কোন দাম দেয় না, কর্মকেই একান্ত বড় করে দেখে, তারা কেবল যে মূর্খ তা নয়, তারা হচ্ছে হস্তিমূর্খ। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন : ভগবানের নাম করলে মানুষের দেহমন সব শুদ্ধ হয়ে যায়। কেবল 'পাপ' আর 'নরক' এই সব কথা কেন? একবার বলো যে, অন্যায় কর্ম যা করেছি আর করবো না। আর তাঁর নামে বিশ্বাস কর।

আধুনিক জগতে বুদ্ধিকে বড় বেশী প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে, সেই সঙ্গে ইচ্ছা-শক্তিকেও। বুদ্ধির দাম নেই, ইচ্ছাশক্তির দাম নেই—এমন কথা বলা হচ্ছে না। বলা হচ্ছে—বিশ্বাসেরও মূল্য আছে : যাকে বুদ্ধির আলোতে উপলব্ধি করা যায় না, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে যাকে জানা সম্ভব নয়, তারও বিপুল মূল্য থাকতে পারে। টেনিসনের সেই কথা :

More things are wrought by prayer than this world dreams of.

খ্যাতনামা ফরাসী লেখক মঁতেন (Montaign) বুদ্ধিকে বিপুল মূল্য দিয়েছেন। তাঁর লেখায় যুক্তির জয়গান সর্বত্র : Reason alone should guide our inclination. তিনিও কিন্তু বিশ্বাসের মূল্য কম ক'রে দেখেননি। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে রয়েছে :

If we had a single drop of faith we should move mountains from their places, says the holy word. Our actions which would be accompanied and guided by the divinity would not be simply human; they would have in them something miraculous, like our belief.

ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকলে আমাদের কর্মের হাল ধরবেন ঈশ্বর নিজে, সেই সব কর্ম শুধু মানবীয় হবে না, তাদের মধ্যে সঞ্চারিত হবে এমন কিছু, যা অলৌকিক—আমাদের বিশ্বাসের মতো।

সিয়্যাটেল্ বিশ্বমেলা

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তস্থিত ওয়াশিংটন রাজ্যের সিয়্যাটেল্ শহরে এই বৎসর একটি বিশ্বমেলা (World's fair) ২১শে এপ্রিল হইতে বসিয়াছে এবং ২১শে অক্টোবর শেষ হইবে। ছয়মাসকালস্থায়ী এই বিরাট আন্তর্জাতিক মেলা পৃথিবীর নানা জাতির মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি, সমাদর, সহানুভূতি এবং একতা উদ্বুদ্ধ করিবে, সন্দেহ নাই। অনেক বই পড়িয়া, অনেক রাজনৈতিক জল্পনা-কল্পনা বাগ্‌বিতণ্ডা করিয়া মানুষের হৃদয়ে হৃদয়ে যে নৈকট্য ও বোঝাপড়ার ভাব আসে না, উন্মুক্ত আকাশতলে ধরিত্রীমাতার একটি প্রাঙ্গণে নানা দেশের নানা ভাষার নানা সংস্কৃতির নরনারী যখন মিলিত হইয়া পরস্পরকে দেখিবার সুযোগ পায়, তখন স্বভাবতই ঐ একাত্মবোধ ও মনের মিল উপস্থিত হয়। সাময়িক ভাবেও মানুষ তখন ভুলিয়া যায় জাতির, বর্ণের, ধর্মের, ভূগোলের বাধা—পৃথিবীর সকল প্রান্তের মানুষের সহিত এক হইয়া সমগ্র মানবজাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা-উন্নতিচেষ্টা-সংগ্রাম ও সার্থকতাকে সে তখন এক করিয়া উপলব্ধি করিতে শিখে। সিয়্যাটেল্ বিশ্বমেলার পরিকল্পনা ও বাস্তব রূপদানের মধ্যে এই সত্যটি সুস্পষ্টভাবে নিহিত রহিয়াছে—দেখিতে পাইলাম। যদিও আমেরিকান গভর্নমেণ্ট এই মেলার প্রধান উদ্যোক্তা ও পরিপোষক, তথাপি তাঁহারা এই মেলার সুযোগ লইয়া আমেরিকার প্রচার ও জয়গানের চেষ্টা করেন নাই, প্রত্যেকটি ব্যবস্থায় সমগ্র পৃথিবীর কথা ভাবিয়াছেন, সমগ্র পৃথিবীকে উপস্থাপিত করিতে চাহিয়াছেন।

স্যানফ্রান্সিস্কো আমার কর্মক্ষেত্র। এখান হইতে সিয়্যাটেল্ ৯০০ মাইল, কিন্তু জেট্-যুগের মাহাত্ম্যে আকাশপথে দেড় ঘণ্টাতেই এই দূরত্বকে এখন জয় করা যায়। সিয়্যাটেল্ শহরের বেদান্ত-সমিতিতে আশ্রয় লইলাম। মেলা দেখার সঙ্গে এই সমিতির পরিচালক পূজনীয় প্রাচীন সন্ন্যাসী স্বামী বিবিদিষানন্দজীর পুণ্যসঙ্গ এবং স্থানীয় বেদান্তানুরাগী বন্ধুদের সহিত আলাপ-পরিচয়ও ছিল আমার গরমের ছুটির একাদশ দিনের সংক্ষিপ্ত ভ্রমণের অন্যতম উদ্দেশ্য ও আকর্ষণ।

সিয়্যাটেল্ শহরের প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনী অতি মনোরম। সাতটি পাহাড়ের উপর এই বিরাট নগরী স্থাপিত। উত্তর দিকে ১৪৫ মাইল দূরবর্তী মাউণ্ট বেকারের (উচ্চতা—১০,৭৫০ ফুট) তুষারশৃঙ্গ প্রায় সব সময়েই দেখা যায়। দক্ষিণ দিকে ১৬৫ মাইল দূরে মাউণ্ট সেণ্ট হেলেন্‌স্ (উচ্চতা—৯,৬৭১ ফুট), ১২৩ মাইল দূরে মাউণ্ট অ্যাডাম্‌স্ (উচ্চতা—১২,৩০৭ ফুট) এবং দক্ষিণ-পূর্ব কোণে প্রায় ৯০ মইল দূরে মাউণ্ট রেনিয়ারের (উচ্চতা—১৪,৪১০ ফুট) তুষারাবৃত শিখরগুলির নয়নাভিরাম দৃশ্য সিয়্যাটেল্-বাসীর গর্বের বস্তু। শহরের পশ্চিম প্রান্তে প্রশান্ত মহাসাগরের সহিত সংযুক্ত দুইটি বিস্তৃত জলপথ—পাগেট সাউণ্ড এবং এলিয়ট উপসাগর। পাগেট সাউণ্ডে অনেকগুলি ছোট ছোট দ্বীপ আছে। এলিয়ট উপসাগরে সিয়্যাটেল্-এর সুবৃহৎ বন্দর অবস্থিত। এই বন্দর জাপান, ফিলিপিন প্রভৃতি প্রাচ্যদেশগামী জাহাজের একটি প্রধান আড্ডা। সিয়্যাটেল্-এর পূর্ব প্রান্ত ২৪ মাইল লম্বা একটি বিরাট

হ্রদকে স্পর্শ করিয়াছে। উহার নাম লেক ওয়াশিংটন। এতগুলি বিস্তৃত জলপ্রণালী শহরের গায়ে থাকিবার জন্য নৌ-ভ্রমণ এখানকার লোকের একটি দ্বিতীয় স্বভাবে দাঁড়াইয়াছে। প্রতি দশটি পরিবারের মধ্যে একটির নিজস্ব মোটর-নৌকা আছে। সিয়্যাটেল্-বাসীরা দাবি করে, তাহাদের শহর হইল পৃথিবীর 'নৌ-যানের রাজধানী'। শহরের লোকসংখ্যা পাঁচলক্ষ। এখানকার ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি আমেরিকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়। আমেরিকার প্রসিদ্ধ বিমান-ব্যবসায়ী বোইঙ্গ (বোইঙ্গ-৭০৭ নামক বিখ্যাত জেট-বিমানের নির্মাতা ইহারাই) কোম্পানির প্রধান কারখানা সিয়্যাটেলেই। আমেরিকার দুইটি রেলওয়ের প্রান্ত স্টেশন এখানে। সিয়্যাটেলের আন্তর্জাতিক বিমান-বন্দর আমেরিকার পশ্চিম উপকূলের সহিত সারা পৃথিবীর আকাশপথের যোগ রক্ষা করে। এই স্থানের জলবায়ুও নাতি-শীতোষ্ণ। শীতকালে ৪০° ডিগ্রীর নীচে এবং গরম কালে ৮০° ডিগ্রীর উপর যায় না। বার্ষিক বৃষ্টির পরিমাণ ৩৪ ইঞ্চি। খাদ্য ও বাসস্থানের প্রচুর সুবিধা রহিয়াছে। ওয়াশিংটন রাজ্যকে বলা হয় 'চিরসবুজ রাজ্য' (ever-green state)। এই রাজ্যের প্রধান শহর সিয়্যাটেল্-এ ঐ সবুজত্ব বিশেষভাবেই লক্ষ্য করিবার। কত যে গাছপালা বাগান প্রতি রাস্তায় এবং প্রায় প্রত্যেক বাড়িতে—দেখিলে চোখ জুড়াইয়া যায়! এমন একটি শহরে বিশ্বমেলার আয়োজন সব দিক দিয়াই সমীচীন হইয়াছে।

বিশ্বমেলাকে পাঁচটি প্রধান 'জগতে' ভাগ করা যায়, যথা:—(১) বিজ্ঞানজগৎ (২) একবিংশ শতাব্দীর জগৎ (৩) শিল্পবাণিজ্যের জগৎ (৪) চারুকলার জগৎ (৫) আমোদপ্রমোদের জগৎ।

এই প্রত্যেকটি 'জগতে'র নানা বিভাগ-উপবিভাগ আছে। সমগ্র মেলাটিকে ভাল করিয়া দেখিতে অন্ততঃ একমাস সময়ের প্রয়োজন হয়। আমার দেখা ঘটিয়াছিল মাত্র তিন দিন। প্রথম (১৮ই জুলাই) সকাল ৯ টায় মেলাক্ষেত্রের পূর্বদ্বারে হাজির হইলাম। প্রবেশমূল্য ২ ডলার (প্রায় ৯৷৷০ টাকা)। এই দিন ১০ ঘণ্টা ছিলাম। সময় যে কোথা দিয়া কাটিয়া গিয়াছিল, খেয়াল ছিল না। ইহার পর পুনরায় যাই ২১শে জুলাই এবং ২৩শে জুলাই এবং ছিলাম যথাক্রমে ৬ ঘণ্টা ও ৮ ঘণ্টা।

এই মেলার প্রতীক-স্বরূপ একটি অভিনব লৌহস্তম্ভ মেলাক্ষেত্রের দক্ষিণদরজার কাছে নির্মিত হইয়াছে। উহার নাম 'আকাশ-সূচী' (space-needle)। ৬০৬ ফুট লম্বা এই অতিকায় 'সূচ'টি ৫৮৫০ (?) ওজনের একটি কংক্রীট ব্লকের ভিতর প্রোথিত। তিন-পায়ের একটি ৫০০ ফুট লম্বা স্টীলের ফ্রেম 'সূচ'টিকে ধরিয়া রাখিয়াছে। 'সূচে'র শীর্ষদেশে প্রথমে রেলিংঘেরা গোলাকার একটি 'নিরীক্ষণ-মণ্ডপ' (observation-deck)। উহাতে এককালে প্রায় ৮০০ লোক দাঁড়াইতে পারে। এই প্ল্যাটফর্মের মাথায় আর একটি কাচঘেরা গোল-কক্ষ—যাহা অনবরত ঘুরিতেছে, অবশ্য খুব ধীরগতিতে—ঘণ্টায় ৩৬০° ডিগ্রী। এই কক্ষে প্রায় তিনশত লোক চেয়ারে বসিয়া খাইতে পারে। এই উপরের গোল কামরার নাম 'সূচের চোখ' (eye of the needle)। সকালবেলার জলখাবার একপ্লেট খাইতে ৬ ডলার অর্থাৎ প্রায় ২৮৲ টাকা লাগে। দুইটি দ্রুতগতি 'এলিভেটর' (আমাদের দেশে যাহাকে 'লিফ্‌ট্' বলা হয়) দর্শনার্থীদের লইয়া অনবরত উঠানামা করিতেছে। 'সূচে' উঠিবার লোহার ৮৩২ ধাপের আঁকা বাঁকা

সিঁড়িও একটি অবশ্য আছে। মেলার পরিকল্পকদের মতে 'আকাশ-সূচী'টি হইল বর্তমানের আকাশযুগ (space-age)-এর আশা-আকাঙ্ক্ষার নির্দেশক। ৬০০ ফুটের চেয়ে উচ্চতর গগনচুম্বী অট্টালিকা বা স্তম্ভ পৃথিবীতে অনেক আছে (নিউ ইয়র্ক এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিংএর উচ্চতা ১২৫০ ফুট; টোকিও টেলিভিশন-স্তম্ভের উচ্চতা ১০৮২ ফুট; ফ্রান্সে এফেল টাওয়ারের উচ্চতা ৯৮৪·২৫ ফুট), কিন্তু এই 'আকাশ-সূচী'টির গঠন ও পরিকল্পনা সম্পূর্ণ আলাদা। এম্পায়ার স্টেটবিল্ডিং প্রভৃতির উপর উঠিলে একটি সমাপ্তির দৃষ্টিভঙ্গী মনে আসে, মানুষ এত বড় একটা কীর্তি শেষ করিয়াছে, কী অদ্ভুত! এই বৃহৎ কীর্তিটিকে পৃথিবীরই অন্তর্ভুক্ত করিয়া একটি গর্ববোধ আমাদের অনুভূতিকে আপ্লুত করে। কিন্তু 'আকাশ-সূচী'র উপর উঠিলে কোন 'সমাপ্তি'র মনোভাব হৃদয়ে জাগে না—জাগে ভবিষ্যতের প্রতি উন্মুখতা। আকাশ-সূচী মানুষকে উর্ধ্বে সীমাহীন আকাশের অজ্ঞাত সম্ভাবনার উদ্দেশ্যে নির্ভয় অভিযানের আহ্বান জানায়। ইহা মানুষের কোন পরিসমাপ্ত কীর্তি নয়, অনাগত কীর্তির পাতনিকা। ইহা পৃথিবীর মাটিতে দাঁড়াইলেও পৃথিবীর উপরকার রহস্য-লোকেরই প্রহরী।

কিন্তু এই 'সূচে'র উপর উঠিতে প্রচুর ধৈর্যের পরিচয় দিতে হয়। দেখিলাম—তিন দিকে মানুষের তিনটি লম্বা লাইন দাঁড়াইয়া একটু একটু করিয়া নড়িতেছে। একটি লাইন 'আকাশ-সূচী'তে উঠিবার টিকিট কিনিবার জন্য, দ্বিতীয়টি 'সূচী'র মাথায় 'নিরীক্ষণ-মণ্ডপে' উঠিবার এলিভেটরে পৌঁছিবার জন্য আর তৃতীয়টি হইল যাহারা সূচীর 'চোখ'—অর্থাৎ শীর্ষস্থ ঘূর্ণায়মান রেস্টর‍্যান্টে যাইবে, তাহাদের জন্য। প্রথম লাইনে ৪৫ মিনিট দাঁড়াইয়া টিকিটঘর হইতে ১ ডলার দিয়া টিকিট কিনিয়া দ্বিতীয় লাইনে স্থান পাইলাম এবং আরও প্রায় এক ঘণ্টা দাঁড়াইয়া অবশেষে এলিভেটরে প্রবেশ করিলাম এবং চোখের পলকে 'নিরীক্ষণ-মণ্ডপে' উপস্থিত হইলাম। ৬ ডলার খরচ করিয়া ব্রেকফাস্ট খাইবার মতো রুচি ও সঙ্গতি ভারতীয় সন্ন্যাসীর থাকিবার কথা নয়। অতএব ঘূর্ণায়মান গোল-কামরা আর প্রত্যক্ষ করা হইল না। বস্তুটি কি, তাহা অবশ্য অনুমানে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছিল। তবে যাহা ঐ সুবৃহৎ কামরাটিকে ঘণ্টায় ৩৬০° ডিগ্রী ঘুরাইতেছে, উহা মাত্র এক অশ্বশক্তিযুক্ত একটি মোটর। উহা বড়ই বিস্ময়কর লাগিল। 'নিরীক্ষণ-মণ্ডপ' হইতে সিয়্যাটেল্ ও তাহার পারিপার্শ্বিক অঞ্চলের পর্বতমালা, বনানী, হ্রদ, সাগর, উপসাগর—সবই অতি চমৎকার দেখা যায়। আশ্চর্য সুন্দর দৃশ্য! কিন্তু পূর্বে যেমন বলিয়াছি মন এই দৃশ্যে বেশীক্ষণ বাঁধা থাকে না। অনন্ত আকাশের দিকে তাকাইয়া নির্জনে এই অনন্তের যাত্রী বলিয়া একটি অনুভব স্বতই চিত্তে উপস্থিত হয়। 'আকাশ-সূচী'র অভিজ্ঞতা মূল্যবান্।

'আকাশ-সূচী'তে উঠিবার আগে লাইনে দাঁড়াইবার ব্যাপারে একটি জিনিস লক্ষ্য করিয়া বেশ আনন্দ হইতেছিল। শত শত লোক দুজন দুজন করিয়া পিছে পিছে দাঁড়াইয়া আছে, গুটি গুটি আগাইতেছে দুই ঘণ্টা রৌদ্রের মধ্যে এই দুর্ভোগ ভোগ করিতেছে, কিন্তু কোন বচসা, ধাক্কাধাক্কি, অনাবশ্যক উত্তেজনা, চেঁচামেচি নাই। নাগরিক জীবনে শৃঙ্খলা-বিষয়ে পাশ্চাত্য জাতিসমূহের নিকট আমাদের কতই না শিখিবার আছে!

'আকাশ-স্থচী' হইতে নামিয়া 'বিজ্ঞানজগৎ'-এর দিকে অগ্রসর হইলাম, এখানেও লাইন, তবে আলাদা কোন 'দর্শনী' লাগে না। লাইনের প্রয়োজন এই জন্য যে, এক সঙ্গে সাত শত লোককে প্রদর্শনীর মধ্যে ঢুকাইয়া পর পর বিভিন্ন বিভাগের ভিতর দিয়া লইয়া যাওয়া হয়। তাহাতে ভিড়ের শৃঙ্খলা থাকে এবং প্রত্যেকেই দ্রষ্টব্য জিনিসগুলি দেখিবার স্থযোগ পায় এবং এলোমেলো ঘুরিয়া সময় ও শক্তির অপব্যয় ঘটে না। একবার সাত শত লোক এই প্রদর্শনীর প্রথম হলটি দেখিয়া দ্বিতীয় হলে ঢুকিলেই বাহিরে অপেক্ষমাণ দ্বিতীয় সাত শতকে ভিতরে লইয়া যাওয়া হয়। আধ ঘণ্টা আন্দাজ বাহিরে আমাদিগকে অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল, মনে পড়ে।

'বিজ্ঞানজগৎ' পর পর ছয়টি এলাকায় বিভক্ত। প্রথম—'বিজ্ঞানের গৃহ' (The House of Science) এখানে ১০ মিনিটব্যাপী একটি সবাক্ চিত্রে বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিকের লক্ষ্য এবং কর্মপ্রণালী সম্বন্ধে একটি বহুতথ্যপূর্ণ ভূমিকা পরিবেশন করা হয়। সাতটি প্রজেক্টর একটি পর্দায় সাতটি ভিন্ন ভিন্ন ছবি ফেলিতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ছবিগুলি একটি বৃহৎ সংযুক্ত ছবি স্থষ্টি করিতেছে।

দ্বিতীয় এলাকার বিষয়বস্তু—বিজ্ঞানের প্রসার (Development of Science)। এখানে পাঁচটি উপবিভাগ আছে। এক একটি বিভাগে এক এক শ্রেণীর বিজ্ঞানের ইতিহাস, আবিষ্কার, গবেষণা ও ক্রমোন্নতির বিষয় নানা ছবি, চার্ট, মডেল, চলচ্চিত্র এবং টেলিভিশনের সাহায্যে উপস্থাপিত হইতেছে। ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক্স্ আণবিক ও পারমাণবিক বিজ্ঞান, জেনেটিক্স্ এবং জ্যোতির্বিদ্যায় নানা দেশের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকের অবদান এবং বর্তমান গবেষণা সাধারণ মানুষের উপযোগী করিয়া অতি স্থন্দর ভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হইতেছে।

'বিজ্ঞানজগৎ' এর তৃতীয় এলাকায় রহিয়াছে 'স্পেসেরিয়াম্' (Spacearium)। ইহা একটি বৃহৎ এলুমিনিয়মের বর্তুলাকার ছাদযুক্ত গোলাকার প্রদর্শনী-গৃহ। এখানে ৭০০ লোক একসঙ্গে বসিয়া পনের মিনিটে ৬০ কোটি কোটি কোটি মাইল মহাকাশ-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা লাভ করে। একটি স্থবৃহৎ প্রোজেক্টর এবং অন্যান্য নানাবিধ যন্ত্রপাতির সাহায্যে এই কৃত্রিম 'মায়া' সৃষ্ট হয়। সকলে যথাস্থানে বসিলে 'স্পেসেরিয়াম সেণ্ট্রাল কনট্রোল'-এর ঘোষণা শোনা যায়—'এইবার আমাদের মহাকাশ-যান ছাড়িবে। এই বিমানের গতিবেগ আলোকের গতিবেগের ১০ ট্রিলিয়ন (১ ট্রিলিয়ন = ১ লক্ষ কোটি) গুণ।' আলো ধীরে ধীরে কমিতে থাকে, ক্রমশঃ গভীর অন্ধকারে সব আচ্ছন্ন হয়, এবং কৃত্রিম শব্দ দ্বারা 'যাত্রী'রা ঠিক বোধ করিতে থাকেন যে, বিমান ছাড়িয়াছে। ছাতের একটি খড়খড়ি খুলিয়া যায় এবং বৈকালীন সূর্যালোক-প্রতিভাসিত পৃথিবীকে আমরা শেষ দেখিয়া লই। অতঃপর বর্তুলাকার ছাদরূপ আকাশে দেখিতে পাওয়া যায় পূর্ণ চন্দ্রকে। বর্ণয়িতা ব্যাখ্যা করেন—'পৃথিবী হইতে আড়াই লক্ষ মাইল দূরে পৃথিবীরই উপগ্রহ এই চন্দ্র মরুপ্রান্তর এবং এলোমেলো পাহাড়শ্রেণীর এক বায়ুহীন উষর জগৎ···।' এইবার চন্দ্র অদৃশ্য হয় এবং সিংহ (Leo), কন্যা (Virgo), তুলা (Libra) এবং বৃশ্চিক (Scorpius) রাশির তারকাগুচ্ছ দৃষ্টিপথে আসে। বিমানটি এইবার গতিপথ বদলায় এবং আমাদের বাম পাশে সূর্যকে উঠিতে দেখা যায়। বিমান ক্রমে সূর্যের অভিমুখে অগ্রসর হয়। বর্ণয়িতা বলেন—'আমাদের নিজস্ব তারকা সূর্য বস্তুতঃ আণবিক
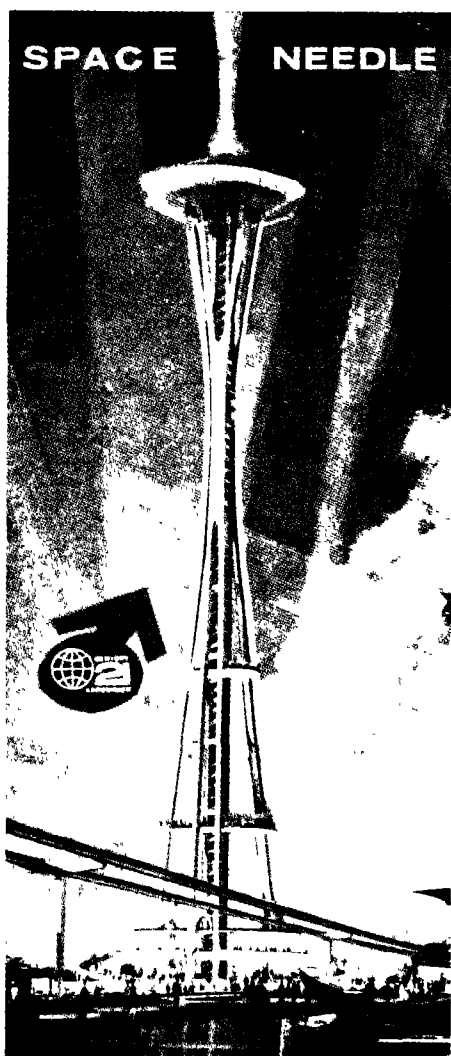
আকাশ-সূচী

(পৃঃ ৪২০-২১)

বিমান হইতে বিশ্বমেলার দৃশ্য

বিশ্বমেলার দক্ষিণ প্রবেশ-দ্বার
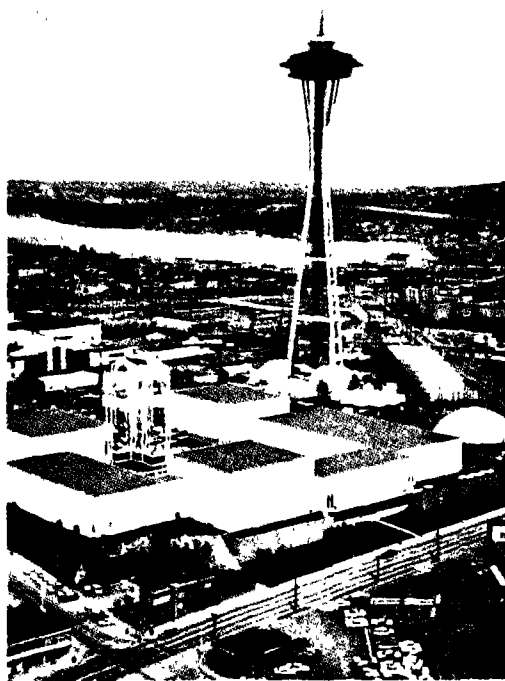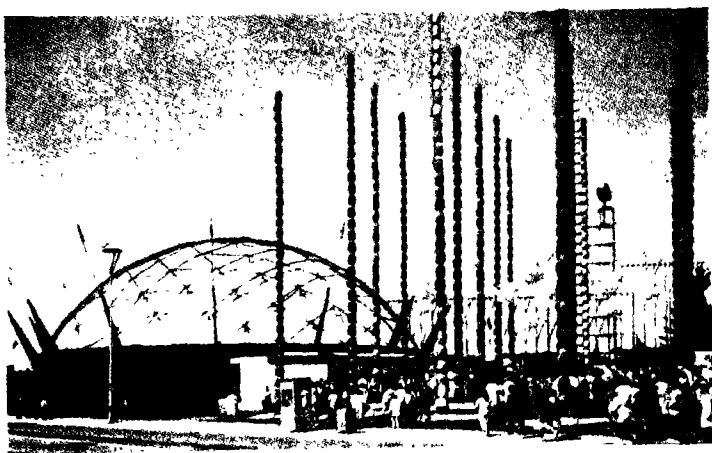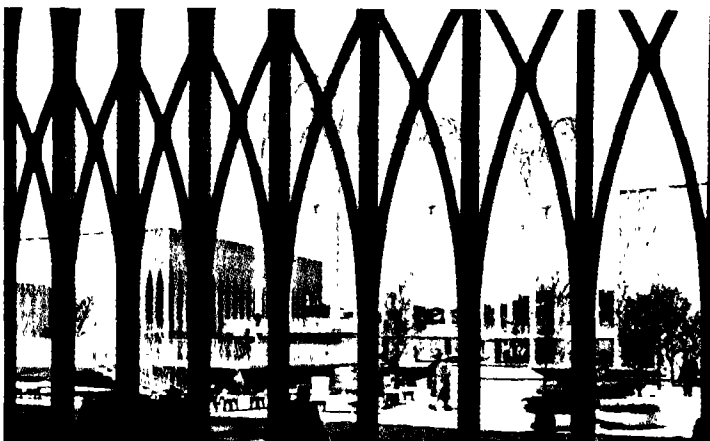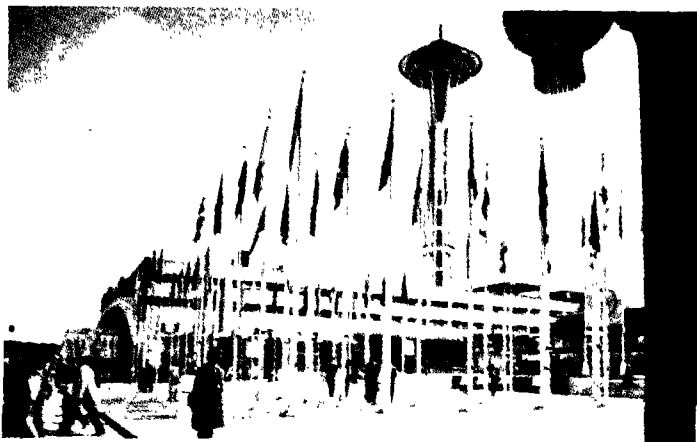
নগর-চত্বর

আন্তর্জাতিক ফোয়ারা

বিশ্লেষঘটিত একটি অতিকায় চুল্লী। প্রতি সেকেণ্ডে ইহা চার মিলিয়ন টন জড়কে শক্তিতে পরিণত করিতেছে।' দেখিতে পাওয়া যায় সৌরকলঙ্ক, সৌরস্ফীতি (Solar prominence), লক্ষ লক্ষ মাইল বিস্তৃত সূর্যের জ্বলন্তশিখা। ক্রমে আকাশে রামধনুর বর্ণ ছড়াইয়া সূর্য দৃষ্টির আড়ালে যায়।

তাহার পর দেখা যায় রক্তবর্ণের মঙ্গল গ্রহকে—পৃথিবী হইতে পাঁচ কোটি মাইল দূরে। মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যবর্তী বিরাট শূন্যতায় মাঝে মাঝে ছেদ আসে এক একটি গ্রহাণুপুঞ্জের (Asteroid) আলোক দ্বারা। এবার দেখা দেয় পৃথিবী হইতে ৮০ কোটি মাইল দূরে অবস্থিত শনিগ্রহকে। তাহার পর আমাদের সূর্যমণ্ডলের শেষ গ্রহ প্লুটোকে ছাড়াইয়া বিমান হাজির হয় প্রকৃত মহাশূন্যে। আমাদের সূর্যমণ্ডলের বাহিরে এক একটি তারাকে দেখা যায়। পরে ছায়াপথ। স্পেসেরিয়াম-এর কনট্রোল এবার ঘোষণা করেন—'আমরা এবার ছায়াপথ ছাড়িয়া অ্যাণ্ড্রোমিডার দিকে যাইব। হাতের রেলিং দয়া করিয়া ধরুন।'

এই জ্যোতির্মণ্ডল-ভ্রমণকে যন্ত্রের সাহায্যে এত বাস্তব করিয়া তোলা হইয়াছে যে, প্রত্যেকেই একটি রোমাঞ্চ অনুভব করেন। সাময়িকভাবে পৃথিবীকে ভুলিয়া যান এবং মহাকাশের পরিবেশ চিত্তে গভীর রেখাপাত করে। কথক বলিয়া চলেন—'অ্যাণ্ড্রোমিডা হইল আমাদের মণ্ডলের ছায়াপথেরই যমজ-ভগিনীস্বরূপ আর একটি বিরাট নক্ষত্রপুঞ্জ (galaxy)। ইহাতে ১০ হাজার কোটি তারা আছে।' অ্যাণ্ড্রোমিডাকে দেখা যায়, ক্রমে উহা বাম পাশে অন্তর্হিত হয়। এতক্ষণে 'মহাকাশযান' ১৮০ ডিগ্রী ঘোরা শেষ করিয়াছে। এবার আরও অনেক নক্ষত্রপুঞ্জ দৃষ্টিতে আসে। একটি শঙ্খিল ছায়াপথে (spiral galaxy) দেখা যায় মহাকাশের অত্যাশ্চর্য ঘটনা—একটি নক্ষত্রের বিস্ফোরণ। ছায়াপথের লক্ষ লক্ষ তারকার সমবেত উজ্জ্বলতার অপেক্ষা অনেক বেশী দীপ্তি বিকীরিত এই বিস্ফোরণে। পুনরায় বর্ণয়িতার কণ্ঠস্বর : 'এবার আমরা গৃহে ফিরিব।' পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনের পথে শুক্র এবং বুধগ্রহের সাক্ষাৎ মিলে। বর্তুলাকার ছাদের জানলা বন্ধ হয়। প্রদর্শনী-গৃহের আলো জ্বলিয়া উঠে। আমরা আবার পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিয়াছি!

'বিজ্ঞানজগৎ'-এর চতুর্থ এলাকায় 'বিজ্ঞানের প্রণালী' (Methods of Science) প্রদর্শিত। নক্সা, লিপি এবং চলচ্চিত্রের সাহায্যে পদার্থ-বিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, রসায়ন, জীববিজ্ঞান প্রভৃতি প্রধান প্রধান বিজ্ঞানের গবেষণার রীতি এখানে বুঝানো হইয়াছে। পঞ্চম এলাকার নাম 'বিজ্ঞানের দিগন্ত' (Horizons of Science)। এখানে বিজ্ঞানের সহিত মানবসমাজের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কল্যাণের দিগ্‌দর্শন করা হইয়াছে। বিজ্ঞানের আগামী পরিকল্পনাসমূহ কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিলে মানুষের যথার্থ মঙ্গল হইবে এবং উহার অভাবে কী সমূহ বিপদ হইতে পারে, তাহার বিশদ আলোচনা চিত্রাদির সাহায্যে উপস্থাপিত।

'বিজ্ঞানজগৎ'-এর ষষ্ঠ ও শেষ এলাকাটি কিশোর-বয়স্কদের জন্য। এখানে ছোট ছোট সহজ যন্ত্রপাতি তাহাদের জন্য সাজানো রহিয়াছে। এক একটি টেবিলের সামনে দাঁড়াইয়া খুশিমতো এক একটি পরীক্ষা তাহারা নিজে করিয়া দেখিতে পারে। একসঙ্গে আমোদ ও শিক্ষা।

'একবিংশ শতাব্দীর জগৎ' একটি বিরাট ১১০ ফুট উঁচু সৌধে প্রদর্শিত। এই সৌধের আয়তন ১৩০,০০০ বর্গফুট। একতলাতে আগামী শতাব্দীর পরিবহন, বসবাস, স্বাস্থ্যোন্নতি, শিক্ষা-সংক্রান্ত নানা উন্নত পরিকল্পনার মডেল এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রদর্শিত হইয়াছে। এই সৌধের মাঝখানে বিশেষ মঞ্চে ধাপে ধাপে ১১ তলা উঁচু একটি 'আগামী কল্যকার জগৎ' প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রতি কুড়ি মিনিট অন্তর ১০০ জন করিয়া দর্শককে লইয়া বর্তুলাকার কাচের এলিভেটর 'আগামী কল্যকার জগতে' উঠিতেছে। এই বিশেষ পরিবহনটির নাম 'বুদ্বুদ্‌যান' (bubbleator)। বিংশ শতাব্দীর বর্তমান ত্রি-চতুর্থকে মানুষ একটি যুগসন্ধিতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। আগামী শতাব্দীর সার্থক জীবনের জন্য চাই এখনই সুচিন্তিত পরিকল্পনা। মানুষের শিক্ষা, সমাজ, পরিবার, খাদ্য, কৃষি, কলকারখানা, নগরী, পরিবহন, যোগাযোগ সবই আর চল্লিশ বৎসরের মধ্যে অভিনব রূপ লইবে। কি সে-রূপ, তাহারই একটি ধারণা এই প্রদর্শনীতে দিবার চেষ্টা হইয়াছে। আত্মসংযম ও নৈতিকবোধ যদি পর্যাপ্ত পরিমাণে অনুশীলিত না হয়, তাহা হইলে একবিংশ শতাব্দী মানুষের নিকট একটি বিভীষিকারূপে উপস্থিত হইবে, প্রদর্শনীর পরিকল্পকগণ ইহা বহুভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

বিজ্ঞানজগতের আর একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য হইল 'আকাশ-যাত্রা'র শিবির। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের এন-এ-এস-এ (National Aeronautics and Space Administration) এই শিবিরের উদ্যোক্তা। ১৯৫৭ খৃঃ ৪ঠা অক্টোবর রাশিয়ায় স্পিউট্‌নিক-১ নিক্ষিপ্ত হইবার পর হইতে যে আকাশ-যুগের (Space-age) আরম্ভ, তাহারই বিস্তারিত পরিচয় ও সম্ভাবনা এই শিবিরে নানা যন্ত্রপাতি, মডেল, চিত্রাদির সাহায্যে উপস্থাপিত।

'বিজ্ঞানজগৎ' ও 'একবিংশ শতাব্দীর জগৎ' দেখিবার পর দর্শকগণ 'শিল্পবাণিজ্যের জগৎ' দেখিতে উৎসাহিত হন। আমেরিকা ব্যতীত নিম্নলিখিত দেশগুলির শিল্পবাণিজ্যের পরিচিতি পৃথক্ পৃথক্ শিবিরে (pavilion) সাজানো আছে। প্রত্যেক স্থানেই সেই সেই দেশের প্রতিনিধিরা রহিয়াছেন। দেশগুলি: ব্রেজিল, ক্যানাডা, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, গ্রেটব্রিটেন, ভারতবর্ষ, জাপান, কোরিয়া, মেক্সিকো, পেরু, ফিলিপিন, জাতীয় চীন, সুইডেন, থাইল্যাণ্ড, সংযুক্ত আরব রিপাব্লিক, ইয়োরোপীয় কমন মার্কেটের ছয়টি জাতি (বেলজিয়াম, জার্মানি, ফ্রান্স, ইটালি, লাক্সেমবর্গ, হল্যাণ্ড), আফ্রিকার জাতিপুঞ্জ, স্যানম্যারিনো (উত্তর ইটালির একটি ক্ষুদ্র রাজ্য)। অনেকগুলি শিবিরের সাজ-সজ্জায় সেই সেই দেশের বিশিষ্ট সংস্কৃতির ছাপ ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

কোন কোন শিবিরে শিল্পবাণিজ্যের নিদর্শন ব্যতীত দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতিরও কিছু পরিচিতি দেওয়া হইয়াছে। ভারতীয় শিবিরে ভারতের বস্ত্রশিল্প এবং অন্যান্য কুটীর-শিল্পেরও অনেক নিদর্শন বহু দর্শক-দর্শিকাকে আকৃষ্ট করিতেছে। বর্তমান ভারতে যে-সব যন্ত্রপাতি নির্মিত হইতেছে, তাহারও কিছু কিছু নমুনা রাখা হইয়াছে—দেখিলাম। তবে কি কুটীরশিল্প, কি কারখানায় নির্মিত যন্ত্রপাতি—নমুনাগুলি নির্বাচনে কিছু পক্ষপাতিত্ব করা হইয়াছে মনে হইল। যে সাইকেলগুলি লোককে ভারতীয় সাইকেল-শিল্পের নমুনা-হিসাবে দেখাইবার জন্য রাখা হইয়াছে, তাহা অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট সাইকেল কলিকাতার

দেশীয় কারখানায় প্রস্তুত—আমি পাঁচ বৎসর আগে দেখিয়া আসিয়াছি। জানি না এখানেও কোন প্রাদেশিক বা ব্যক্তিস্বার্থ কর্মকর্তাদের পিছনে ক্রিয়া করিয়াছে কিনা। যাহা হউক ঠিক ভারতীয় শিবিরে একটি প্রশান্ত স্নিগ্ধ শুচি আবহাওয়া অনুভব করিলাম। সারা চিত্ত একটি আশ্চর্য মমতায় ভরিয়া উঠিল।

বর্তমান জগতের কতকগুলি বিশেষ শিল্পের আলাদা আলাদা বড় শিবির আছে—যেমন পেট্রোলিয়ম-শিল্প, জ্বালানি-গ্যাস-শিল্প, বিদ্যুৎ, টেলিফোন, গৃহসজ্জার আসবাব-শিল্প ইত্যাদি। প্রত্যেকটি শিল্পের ইতিহাস কার্যপ্রণালী উপযোগিতা এবং ভবিষ্যৎ দিগ্‌দর্শন অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ-ভাবে চিত্র নক্সা এবং মডেল প্রভৃতির সাহায্যে উপস্থাপিত করা হইয়াছে। ফোর্ড মোটর কোম্পানি একটি সুবৃহৎ শিবিরে তাঁহাদের কারখানায় নির্মিত মোটর প্রভৃতির প্রদর্শনী ব্যতীত একটি 'বহির্বিশ্বে দুঃসাহসিক অভিযান' (An adventure in outer space) -এর ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই অভিযানে ১৫ মিনিট লাগে। একসঙ্গে ১০০ জন ব্যক্তি অতি আরামজনক বিশেষ বিমানটিতে বসিয়া 'বহির্বিশ্ব' ভ্রমণের অভিজ্ঞতা লাভ করেন। যন্ত্রপাতির সাহায্যে ঐ কৃত্রিম অভিজ্ঞতার সৃষ্টি করা হয়। যাত্রীরা অনেকগুলি গ্রহ উপগ্রহ এবং মানুষের সৃষ্ট উপগ্রহদের গতিবিধির একটা ধারণা পান।

একটি পৃথক্ প্যাভিলিয়নে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেশিন (International business machine)-সমূহের কার্যকলাপ দেখানো হইতেছে। ইলেকট্রনিক কম্পিউটার স্বল্প সময়ে সুদীর্ঘ এবং জটিল অঙ্কের কাজ কি ভাবে সম্পাদন করিতেছে, তাহা দেখিলে বিস্ময়াভিভূত হইতে হয়। অরণ্যজাত শিল্প এবং রেলওয়ের জন্যও দুটি পৃথক্ শিবির আছে।

মেলার একস্থানে আন্তর্জাতিক বাজার। এখানে নানা দেশের নানা শিল্পজাত দ্রব্যসম্ভার কিনিতে পারা যায়। আর একটি বৃহৎ ঘেরার মধ্যে 'খাদ্যমণ্ডল' (food circus)। এখানে নানাদেশের ৩।৪ শত রেস্টুর‍্যাণ্ট নানা খাদ্য ও পেয় সরবরাহ করিতেছে। রেস্টর‍্যাণ্ট হইতে পছন্দমত খাবার কিনিয়া খাইবার জন্য শত শত চেয়ার টেবিল সজ্জিত রহিয়াছে। প্রায় হাজার লোক পছন্দমত স্থানে বসিয়া খাইতে পারে। দলে দলে শত শত লোক আসিয়া খাইয়া চলিয়া যাইতেছে, অথচ সমগ্র জায়গাটিকে সর্বদা কী সুন্দরভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হইতেছে দেখিয়া খুব আনন্দ হইল। ভারতবাসীর পক্ষে ইহা একটি বিশেষ শিক্ষার বিষয়।

'চারুকলার জগৎ' প্রাসাদোপম একটি অট্টালিকায় স্থাপিত। এখানে পাঁচটি গ্যালারিতে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় অঞ্চলের চিত্র, ভাস্কর্য এবং কারুশিল্প রাখা হইয়াছে। প্রাচ্যের এই দেশগুলির কারুশিল্প প্রদর্শিত, যথা—ভারতবর্ষ, পাকিস্তান, সিংহল, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যাণ্ড, কাম্বোডিয়া, ব্রহ্মদেশ, জাপান, কোরিয়া, তিব্বত, চীন গণতন্ত্র এবং নেপাল।

'আমোদপ্রমোদের জগৎ'-এ রহিয়াছে নানাপ্রকার খেলাধূলার জন্য একটি ১২,০০০ দর্শকের উপযোগী স্টেডিয়াম, ৫,৫০০ আসন-যুক্ত একটি রঙ্গভূমি (arena), একটি অপেরা হাউস এবং একটি প্লে-হাউস। নানাদেশের বিশিষ্ট খেলোয়াড়, অভিনেতা এবং নৃত্যগীত কুশলীদের ক্রীড়া অভিনয় এবং নৃত্যগীতবিদ্যাদি

বিভিন্ন দিনের প্রোগ্রাম অনুযায়ী মেলা-দর্শকরা দেখিবার সুযোগ পান।

সিয়্যাটেল্ বিশ্বমেলার একটি অন্যতম চিত্তাকর্ষক দৃশ্য হইল 'আন্তর্জাতিক ফোয়ারা' (International fountain)। পৃথিবীর সকল মানুষ তাহার সন্ধানী ও জিজ্ঞাসু দৃষ্টি প্রতিনিয়ত ঊর্ধ্বে নিয়োগ করিবে—ইহাই এই ১০০ ফুট খাড়া বৃহৎ প্রস্রবণটির ইঙ্গিত।

বিশ্বমেলার আর একটি আকর্ষণ হইল এক চাকার রেলগাড়ি (Monorail)। কংক্রীটের রেলের উপর একচাকা-যুক্ত রেলগাড়ি সিয়্যাটেল্ শহরের ব্যবসায়-অঞ্চল হইতে ঘণ্টায় ৭০ মাইল বেগে মেলা-ক্ষেত্র পর্যন্ত সর্বদা যাতায়াত করিতেছে। এই গাড়িতে চড়াও এক নূতন অভিজ্ঞতা।

সিয়্যাটেল্ বিশ্বমেলায় যে-সব দেশ যোগ দেয় নাই বা দিতে পারে নাই, তাহাদের সংখ্যা কম নয়। সোভিয়েট রাশিয়ার অনুপস্থিতি খুবই চোখে পড়ে। বিশ্বমেলাটি সারা বিশ্বের কীর্তিকলাপ ব্যঞ্জিত করিতে না পারিলেও ইহার লক্ষ্য ও চেষ্টা যে অনেকাংশে সফল হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ করি না।

হে স্বপন !*

স্বামী বিবেকানন্দ

ভালো মন্দ যাই হয় হোক,
সুখের সুস্মিত হাসি দেখা দেয় যদি,
অথবা উদ্বেল হয় দুঃখ-পারাবার,
সবারি আপন অংশ আছে অভিনয়ে,
কারো হাসি কারো কান্না, যখন যেমন,
রয়েছে আপন সাজ প্রত্যেকের তরে—
রৌদ্রে জলে আবর্তিয়া চলে দৃশ্যান্তর।

হে স্বপন ! সার্থক স্বপন !
কাছে দূরে প্রসারিত কর মায়াজাল,
পেলব কোমল কর তীব্র রেখা যত,
সব রুক্ষতারে তুমি নম্র ক'রে তোলো।

তোমারি মাঝারে আছে সব ইন্দ্রজাল :
তোমারি পরশে
প্রাণ পুষ্পে হিল্লোলিত
জাগে মরুভূমি,
মধুর সঙ্গীতে ভরে
ঘনঘোর অশনি-গর্জন,
মৃত্যু আনে মধুময় মুক্তির আস্বাদ।

---

* Thou Blessed Dream : ১৯০০, ১৭ই অগষ্ট প্যারিস হইতে ভগিনী ক্রিষ্টিনকে লিখিত।

অনুবাদ : শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ

শরতে রবীন্দ্র-স্মরণ

শ্রীমতী প্রীতিময়ী কর

রবীন্দ্র-শতবর্ষ শেষ হয়ে গিয়েছে। গত এক বৎসর ধরে বহু সমারোহে বহু আয়োজনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে হয়েছে বিশ্বকবির শতবর্ষ-জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন।

শ্রদ্ধা-অর্পণের একটি প্রধান উপকরণ হ'ল স্মৃতিকথা-আলোচনা। কিন্তু যে কোনদিন চোখে দেখেনি, নিকটে যায়নি, তার স্মৃতিকথায় কি থাকে? আর আলোচনাই বা কি হ'তে পারে? এই প্রশ্নই আগে ওঠে।

কিন্তু মন এ-কথা মানতে চায় না। মনে হয়—স্মৃতি কিছু আছেই। সে-স্মৃতি চোখে-দেখা স্মৃতি নয়, নিকটে যাওয়ার স্মৃতিও নয়, সে-স্মৃতি অন্যভাবে মনের সঞ্চয়। যেমন ক'রে বাঁশির স্বর শুনে, চোখে না দেখেও সুরকারের সঙ্গে হয় পরিচয়, আর সেই পরিচয়ের স্মৃতি নিবিড় গভীর হয়ে উঠে' মনের মধ্যে বাসা বাঁধে।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার পরিচয় সেই ছেলেবেলায়; পাখি-ডাকা ছায়ায়-ঢাকা গ্রামের বাড়ির মাটির উঠানের এক কোণে ছোট্ট পুকুর কেটে জল ঢেলে নির্জন দুপুরে ব'সে পুণ্যিপুকুর আর নিকোনো দাওয়ায় পিটুলি-গোলা আলপনা দিয়ে তিন-কোনা পৃথিবী, বাঁকা আধখানা চাঁদ আর গোল সূয্যি মামা এঁকে বেলপুকুর-ব্রত করার দিনে, সেই কৈশোর-কালে।

সেদিন লেখাপড়া শেখার সময় পড়তাম 'কথামালা' 'বোধোদয়' আরও দু-চারখানা পাঠ্য বই, তখনকার দিনে যা সঙ্কলিত হয়ে প্রকাশিত হ'ত। সে-কথা সে-বইয়ের নাম আজ আর মনে নেই। শুধু মনে আছে তাতেই প্রথম পড়েছিলাম:

আজি কি তোমার মধুর মূরতি
হেরিনু শারদ প্রভাতে,
হে মাতঃ বঙ্গ শ্যামল অঙ্গ
ঝলিছে অমল শোভাতে।

দীর্ঘ সে-কবিতাটি—পল্লীমায়ের শারদ শোভার বর্ণনা। এ কেমন সব কথা! এ কেমন কবিতা! আগে তো কখনও পড়িনি। তরুণ মনে নাড়া দিয়ে সাড়া দিয়ে ভেসে বেড়াত:

মাতার কণ্ঠে শেফালি-মাল্য
গন্ধে ভরিছে অবনী
জলহারা মেঘ আঁচলে খচিত
শুভ্র যেন সে নবনী।

অবাক্ হয়ে যেন নতুন চোখে চেয়ে দেখতাম শারদ প্রভাতের শিউলি-তলাটাকে, আর নীল আকাশে সাদা মেঘ ভেসে যাওয়ার দিকে।

শরৎবর্ণনা আমরা আরও পড়েছিলাম এ কবিতা পড়ার আগে—

'যখন দেখিবে ভাই আকাশেতে মেঘ নাই,
মাঝে মাঝে ডাক শুধু আছে,
তখনি জানিবে মনে সুখ দিতে জীবগণে
সুখের শরৎ আসিয়াছে।'

কিন্তু মনে হ'ত এ দুয়ে কত তফাৎ! কণ্ঠে শিউলি-মালা দোলানো সাদামেঘের আঁচল-ওড়ানো মাতৃমূর্তি তো এতে নেই। বইয়ের পাতা বন্ধ ক'রে বিস্মিত চোখে চার দিকে চাইতাম, বাংলার প্রাকৃতিক শোভার মধ্যে সেই মাতৃমূর্তিকে কখন দেখতে পাব ব'লে। এমন ক'রে তো কেউ দেখতে শেখায়নি।

এর পর আবার সেই পাঠ্য বই-এ পড়লাম—

'আনন্দময়ীর আগমনে
আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে,
হের ওই ধনীর দুয়ারে
দাঁড়াইয়া কাঙালিনী মেয়ে।
বাজিতেছে উৎসবের বাঁশি,
কানে তাই পশিতেছে আসি
ম্লান মুখ বিষাদে বিরস—'

তখনকার দিনে আজকের দিনের মতো সর্বজনীন পূজা কেউ কল্পনা করতে পারত না। সবাই পূজা-মণ্ডপে গিয়ে পূজো দেখতে পাবে, ধনী দরিদ্র একসাথে হয়ে সবাই পুষ্পাঞ্জলি দিতে পারবে, প্রসাদ পাবে, এ-প্রথার চলন ছিল না। পূজো হ'ত তখন ধনীর গৃহে। আত্মীয় বন্ধু নিমন্ত্রিত হয়ে তাদের বাড়িতে যেত, দরিদ্র নীচ জাতি সে-বাড়ির চৌকাঠ মাড়াতে পারত না, তৃষিত চক্ষে দুর্গোৎসবের সমারোহের দিকে দূর থেকে তারা তাকিয়ে থাকত। সেই দিনে কবি লিখলেন—

'জননীরা আয় তোরা সব।···
মাতৃহারা মা যদি না পায়
তবে আজ কিসের উৎসব?'

সত্যই তো! এমন সাড়ম্বরে মাতৃপূজার দিনে

'সে যদি রহে ম্লান মুখে বিষাদে বিরস,
তবে মিছে সহকার-শাখা,
তবে মিছে মঙ্গল কলস।'

এই শাশ্বত সত্য কথা এমন সুললিত ছন্দে সকলের মনের দরজায় সেদিন পৌঁছে দিয়েছিলেন, আর একজন মাত্র, তিনি স্বামী বিবেকানন্দ; তিনি বলেছিলেন:

**বহুরূপে সম্মুখে তোমার
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।**

দু-জনের জীবনের পথ ভিন্ন। একজন কবি, একজন সন্ন্যাসী। কিন্তু মূল সত্য ও সুরের কি আশ্চর্য মিল! কিশোর-মনে সেই দুটি ছন্দ কেমন ক'রে একই ভাবে অভূতপূর্ব ঝঙ্কার তুলেছিল। আজ সেই দুই মহামানবের জন্মশত-বর্ষের সন্ধিক্ষণে বার বার সে-কথা মনে পড়ছে।

সেদিনের কবিতা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কবি-গুরুর সাথে আর একটি পরিচয় ঘটেছিল, সে তাঁর ছবি-দেখার—সেই সঙ্কলিত পাঠ্য পুস্তকেই; কবিতার পাশে তখন কবি ও লেখকদের ছবি থাকত। যৌবন অতিক্রান্ত, মস্ত টিকোল নাক, দুপাশে দুটি পদ্ম-পাপড়ির মতো বিশাল চক্ষু। সে-চোখে একপাশে কালো-সুতো-ঝোলানো ফ্রেম-ছাড়া চশমা। মাথার চুলের মাঝখানে সিঁথি কাটা। দু-পাশের চুলগুলি কপালের উপর ঝুলে পড়া। এ ধরনের চেহারাও তখন আর দেখেছি মনে হ'ত না। এ চেহারা যেন অন্য কোন দেশের মানুষের। সে-দেশ যেন এ মাটির দেশ নয়। তখন জানতাম না, সে-দেশ বিশ্বসাহিত্যের, যে-দেশের উদ্দেশ্যে কবি বলতেন—

'ওগো, সুদূর! বিপুল সুদূর!
তুমি যে বাজাও ব্যাকুল বাঁশরী।'

আমার মন সেই অচেনা অজানা সুদূর দেশের কল্পনায় বিহ্বল বিভোর হয়ে প'ড়ত।

তখনকার দিনের কোন কোন যুবক যারা একটু আধটু কবিতা লিখতে পারত, তারা অমনি ক'রে মাঝসিঁথি কেটে, আর অমনি ক'রে ফ্রেম-ছাড়া চশমা প'রে 'রবিঠাকুর'কে অনুকরণ ক'রত—মনে আছে।

চলে গেল ছেলেবেলার কাল। ধীরে ধীরে আসতে লাগলো তার পরের কাল। আর শুনতে লাগলাম, পড়তে লাগলাম, তাঁর কত কবিতা, কত গান। এখন হয়েছে

'সঞ্চয়িতা', তখন ছিল 'চয়নিকা', 'গীতাঞ্জলি', 'কথা ও কাহিনী।' পড়তে লাগলাম—

'দুখের রাতে নিখিল ধরা যেদিন করে বঞ্চনা
তোমারে যেন না করি সংশয়।'

পড়লাম— 'হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা,
অন্য কোনো খানে।'

পড়লাম— 'হায়রে হৃদয় তোমার সঞ্চয়
দিনান্তে নিশান্তে শুধু পথপ্রান্তে
ফেলে যেতে হয়!'

পড়লাম—কেমন ক'রে শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা দিতে হয়, কাব্য-ছন্দে সে-কাহিনী।

সেই সব গান ও কবিতা-ভরা রবীন্দ্রনাথের বইগুলি কিভাবে যে গ্রহণ করতাম, আর যত্নে রক্ষা করতাম, এখনকার দিনের ছেলেমেয়েরা তা ধারণাও করতে পারবে না। বইগুলি আলমারিতে রেখে আনন্দ, তাতে হাত বুলোতে আনন্দ, রবীন্দ্রনাথের ওই বইগুলি আমার আছে—এই গর্বের বা কত আনন্দ। মনে হ'ত যেন এক ঝুড়ি হীরে মতি বুঝি রাখা আছে আমার কাছে।

আমাদের যুগটা ছিল স্বাধীনতা-আন্দোলনের যুগ। পরবর্তী কালে আমরা যা দেখেছি, সে হ'ল সংগ্রাম। সংগ্রাম যে তখন কিছু না ছিল তা নয়, কিন্তু সে প্রায় গোপনে। প্রকাশ্যে ছিল আন্দোলন। সেই সময় রবীন্দ্রনাথের 'জাতীয় সঙ্গীত' বাংলার আকাশে বাতাসে ভেসে বেড়াত। দেশের পরাধীনতার বেদনা কত বেশী ক'রে কবিচিত্তে বাজত, সেই সব গানে তা প্রকাশ পেত। কবির কণ্ঠে তখন কেবল গান আর গান। শুধু বেদনাই বোধ করেননি, আশ্বাস দিয়ে উদ্বুদ্ধও করেছেন জনসমাজকে।

'নিশিদিন ভরসা রাখিস
ওরে মন হবেই হবে।'

আমরা আরও শুনতাম, স্বাধীনতা-সংগ্রামী ছেলেরা কবিগুরুর কবিতা আওড়াতে আওড়াতে ফাঁসির দড়ি গলায় প'রত—

'উদয়ের পথে শুনি কার বাণী
ভয় নাই ওরে, ভয় নাই,
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।'

অবশ্য এ ধরনের গান যে তিনি ছেলেদের ফাঁসি যাবার উদ্দেশ্যে রচনা করেছিলেন, তা নয়। স্বাধীনতা-সংগ্রামের মত ও পথ তাঁর ছিল ভিন্ন। কবির কাব্য-গাথা ভিন্ন ভিন্ন মানুষের বিচিত্র হৃদয়তন্ত্রে নানা ভাবের নানা সুরের ঝঙ্কার তোলে। আমরা বলি—তিনি কত কথা লিখেছেন, কত কথা বলেছেন। কথা তো আসলে আমাদেরই সকলের মনের কথা। নিখিল মানুষের মনের কথা বলাই তো বিশ্বকবির কাজ।

রবীন্দ্রনাথ কি শুধু কবি-প্রতিভাই প্রকাশ করেছেন? তা তো নয়! তিনি ঋষির মতো উপনিষদের পরম সত্য কাব্যকথার ভিতর দিয়ে উদাত্তস্বরে প্রচার ক'রে গেছেন।

পৃথিবীতে যত ধর্মাচরণ উপাসনা সাধন-ভজনের পথ-পদ্ধতির নিয়ম প্রকাশিত হয়েছে, সব কিছুর সাধারণ ও প্রথম কারণ মৃত্যু-রহস্যকে ভেদ করা। মানুষের জীবনে মৃত্যুর প্রশ্ন যদি না থাকত, তবে জগতে এত ধর্মশাস্ত্র এত দর্শন-তত্ত্বের সৃষ্টি হ'ত কিনা সন্দেহ। মৃত্যুকে ভয় করে না এমন মানুষ নেই। মৃত্যুর মতো অকাম্য বস্তু পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই। রবীন্দ্রনাথ সেই মৃত্যুকে বলেছেন, নবজীবনের সিংহদ্বার।

কোন্ কবি মৃত্যুর মুখোমুখী দাঁড়িয়ে কবিতা লিখে বলতে পেরেছেন, তোমাকে আমি চিনেছি। তুমি তো ছলনা-মাত্র।

'তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি
বিচিত্র ছলনাজালে, হে ছলনাময়ি!'
পৃথিবীর ইতিহাসে এর নজির তো নেই।
'অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে
সে পায় তোমার হাতে শান্তির অক্ষয় অধিকার।'

মানুষের ধ্যানের জ্ঞানের সাধনার পরম ফল যে মৃত্যু-মুহূর্তে প্রশান্তি, সেই প্রশান্তিতে সমাহিত হয়ে শান্তির অক্ষয় অধিকার যে অর্জন করেছে, সে মানুষ উপনীত হয়েছে কোন্ পদবীতে?

অন্বীক্ষা

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

সীমাহীন রহস্যের ইন্দ্রজালে মন-বস্তু ঢাকা,
দ্বন্দ্বময় এ সংসার। আত্মবোধ বিনা বেঁচে থাকা
কোনদিন হবে কি সার্থক? জীবনে যা অভিপ্রায়
রহিল অপূর্ণ তব, প্রহরেরা বৃথা চলে যায়—
শিবজ্ঞানে জীবসেবা বিশ্বমাঝে হ'লে নাকো রত,
সহস্র লাঞ্ছনা সাথে আঁখি তব হবে অশ্রুনত।

অগণিত জীবাত্মার আর্তনাদ, বুভুক্ষা-বেদনা
তোমার অন্তরলোকে দিয়েছে কি ক্ষণিক চেতনা?
মুষ্টিমেয় স্বার্থগৃধ্নু মানুষের পশ্বাচারে আজ,
আদর্শের অপমৃত্যু, তারি অঙ্গে করিছে বিরাজ
প্রেতায়িত মুহূর্তেরা: সত্য যাহা, কভু নহে ম্লান,
ষড়যন্ত্র করে যারা, তাহাদের কোথা পরিত্রাণ?

পৃথ্বীতলে দিনে দিনে আণবিক বীভৎসতা মাঝে
সভ্যতার হিংসাচ্ছন্ন দানবীয় চিত্তবৃত্তি রাজে।
বৈরাগ্যে নাহিক মুক্তি—ভ্রান্তবাণী পথভ্রষ্ট করে,
হ'তে পারে প্রেয় তাহা, ক্ষণ-সুখ-প্রত্যয়ের তরে,
শ্রেয় নহে—দিব্যচক্ষে তপস্যায় হেরিয়াছে যারা,
ধরিত্রীর ইতিহাসে মৃত্যুহীন সূর্যসম তারা।

কত আত্মা কাঁদে আজো অন্তরের ভগ্নতরীসনে,
জন্ম-জলধির স্রোতে কামনার ঝঞ্ঝা আবর্তনে
তুমি কি ভেবেছ বন্ধু! মনস্বিতা কোথায় তোমার?
শিখিয়াছ কূটনীতি, মর্মে তব নগ্ন অহঙ্কার।
বিশ্বের বিচিত্র ছন্দ তুমি চাও করিতে বিলয়,
তিমিরতরঙ্গাঘাতে চিরদিন রবে মৃত্যুময়।

স্বামীজীর স্মৃতিকথা

ভক্ত মন্মথনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

এই কি জগদ্বিখ্যাত স্বামী বিবেকানন্দ ?

স্বামীজীর স্বভাব ছিল রাসভারী। দেখলেই সমীহ হয় এমনই ব্যক্তিত্ব। কিন্তু তাঁর মধ্যে অনেক সময় লুকিয়ে থাকত আর একটি ব্যক্তিত্ব। সে যেন দুরন্ত শিশু—না আছে মান, না অপমান। দুনিয়ার সব কিছুই যেন তাঁর কাছে খেলা! যারা কখনও তাঁর এই নিরভিমান শিশুভাব-মূর্তিটি দেখেছে, তারাই বুঝতে পারবে—'বাল-গোপাল'-ভাবটি কি।

১৮৯৮ খৃঃ পর স্বামীজীর স্বাস্থ্য ক্রমশঃ খারাপ হ'তে থাকে। এক বৎসরে গাল চুপসে এমন রোগা হয়ে গেলেন যে দেখলে কষ্ট হয়। সেই কালে ডায়াবিটিস্ রোগের ভাল চিকিৎসাও ছিল না। স্বামীজীরও রোগ মারাত্মক হয়ে দাঁড়ালো। এই সময় কিছুকাল তাঁর জন্য টাটকা ছাগলদুধের ব্যবস্থা করা হ'ল। মঠেই একটি ছাগল পোষা হ'ল। একদিন তাঁর খেয়াল চাপলো, নিজেই দুধ দুইবেন। শুধু পা, হাঁটুর উপর বহির্বাস তোলা —ঘটিটা দুই হাঁটুর মধ্যে—এমন ক'রে দুধ দুইলেন যেন ও-কাজে তিনি কতকাল অভ্যস্ত। ঠিক এই সময় একটি যুবক এসে উপস্থিত। সে দেখতে এসেছিল বিশ্ববিখ্যাত বাগ্মিপ্রবর স্বামী বিবেকানন্দকে। তাঁকে এই কাজে ব্যাপৃত দেখে বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে রইল। স্বামীজী অল্পক্ষণে ঘটি রেখে চলে গেলেন ভিতরে। তখন সেই ছোকরাটি তার সঙ্গীকে আশ্চর্য হয়ে বলছে—'ইনিই বিবেকানন্দ!'

স্বামীজীর তামাকুসেবন

বিলাত-প্রত্যাগত স্বামীজী চুরুট খেতেন। সেটাও প্রথম প্রথম বেশী—পরে তা কমিয়ে দিয়েছিলেন। হুঁকায় কলকে বসিয়ে সুখটান দেওয়াই ছিল তাঁর চিরন্তন অভ্যাস। অনেক সময় তামাক হয়তো পুড়ছে, কদাচিৎ ঈষৎ টান দিচ্ছেন অভ্যাস-বশে, কিন্তু মন অন্যমনস্ক হয়ে গেছে। তামাকটা হয়তো পুড়েই গেল। তখন সেবক ব্রহ্মচারী কাউকে ডেকে হয়তো বললেন—(তামাকটা) পালটে দে তো।

রাখাল মহারাজও তামাক খেতে ভাল বাসতেন। কিন্তু তাঁর তাম্রকূট সেবন করা দেখলে মনে হ'ত খুব তোয়াজ ক'রে আয়েস ক'রে টান দিচ্ছেন।

তাঁর সব কাজেই একটা রাজকীয় ভাব ছিল। স্বামীজী তাই তাঁকে বলতেন, 'রাজা' (রাখালরাজের অপভ্রংশ)। কখনও বলতেন, 'মহারাজা'। তাঁকে আমরা সংক্ষেপে বলতাম, 'মহারাজ'। তামাক খেতে খেতে মহারাজকে প্রায়ই দেখা যেত একেবারে অন্য জগতে মন চলে গেছে। ডাকলে কখনও বলতেন—'হুঁ' আবার কখনও কোন সাড়া নেই। তাঁর মনটি সহজেই যেন অন্তর্মুখী থাকত মনে হয়। খানিকক্ষণ অপেক্ষা ক'রে থাকলে পরে আবার নিজেই কথা বলতেন।

স্বামীজীর কিন্তু সচরাচর এই রকমটি দেখা যেত না। তাঁর স্বাভাবিক দৃষ্টি সম্পূর্ণ বহির্জগৎকে দেখছে ব'লে মনে হ'ত। কিন্তু একটা নিরাসক্তভাবে যেন সব দেখে যাচ্ছে—ভাসা-ভাসা! খুব একটা মজা দেখে সে-চোখে আনন্দ যেন বিচ্ছুরিত হ'তে থাকত। চোখের দৃষ্টিতেও এক এক সময় যেন বিদ্যুতের ঝলক দিয়ে যেত। সেই দৃষ্টি যে দেখত, তারই মনে একটা ত্রাস বা সম্ভ্রম জেগে উঠত

মন আপনিই ব'লে দিত—ইনি পরম শক্তিমান্ পুরুষ—সাবধান!

কিন্তু এই মানুষটিই যখন দিন-মজুরদের সঙ্গে বসে গল্প করতেন এবং তাদেরই মতো ছিলিম ধরে দা-কাটা তামাক খেতেন আর হাতে কলকে ধরে লম্বা টান দিয়ে এক মুখ ধোঁয়া বার করতেন, তখন কে বলবে তিনি তাদেরই কেউ একজন নন্। তখন তাঁর মুখের হাসি গল্প কথা শুনে মনে হ'ত, তাদের জীবনের সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছেন। পরিব্রাজক-জীবনেও কখন কখন রাস্তার ধারে কারও কাছে তামাক চেয়ে খেয়েছেন, এ-কথা শোনা যায়; অথচ এক নাগাড়ে তিন দিন অবধি উপবাস করেছেন, কিন্তু কারও কাছে চেয়ে কিছু খাননি।

তাঁর নিজের মুখেই বলতে শুনেছি—পরিব্রাজক-জীবনে এক আধ দিন উপবাস করাকে তিনি উপেক্ষাই করেছেন, তবে কখন তিন দিনের বেশী উপবাসও করতে হয়নি। সেই সময় একবার 'বাঘে খেয়ে ফেলুক' ভেবে বনে বসেছিলেন। বাঘ কিন্তু ফিরে চলে গেল দেখে দুঃখিতস্বরে বললেন—'বাঘেও খেল না!'

স্বামীজীকে যে দেখেছে, সেই বলেছে—একজন শক্তিমান্ পুরুষ

একবার স্বামীজী ট্রেনে যাচ্ছেন—সেকেণ্ড ক্লাসে; বারে বারে বাথরুমে যেতে হ'ত এই একটা কারণ, তাছাড়া ভিড় সহ্য করতে পারতেন না; স্বাস্থ্য ভেঙে গিয়েছিল—তাই ট্রেনেও একটু বিশ্রাম প্রয়োজন হ'ত। সেবক ব্রহ্মচারী অন্য কামরায়—কখন ইণ্টার কখন বা থার্ড ক্লাসে যেতেন, স্টেশনে ট্রেন থামলে এসে খবরাখবর নিয়ে যেতেন। শরীর ভাল নয়, তাই সে-বার অধিকাংশ সময় বার্থে শুয়েই ছিলেন। সেই কম্পার্টমেণ্টে মাত্র আর একজন আরোহী। তিনি বাঙালী ভদ্রলোক, কিন্তু সাহেবী-ভাবাপন্ন। পোস্ট অফিসের একজন বড় কর্মচারী। স্বামীজী নিজে হ'তে কোন কথা বলেননি। ইংরেজী-কেতায় কেহ পরিচয় না করালে আবার কথা কহা যায় না, তাই সেই বাঙালী-সাহেবও কয়েক ঘণ্টা একসঙ্গে থাকলেও কথা বলেননি। গন্তব্যস্থল আসায় তিনি নেমে গেলেন।

জীবনে সেই একটিবার মাত্র তিনি স্বামীজীকে দেখেছিলেন। পরে তিনি স্বামীজীর পুস্তকাদি পাঠ ক'রে আকৃষ্ট হন। তিনি বলতেন, 'স্বামীজীকে দেখে তখন কিছুই বুঝতে পারিনি। কত বড় লোক তিনি! কিন্তু তাঁর চোখদুটি দেখে বারে বারে চেয়ে চেয়ে দেখলাম। মনে হ'ল—হাঁ, খুব শক্তিমান্ পুরুষ! কিন্তু কি আধ্যাত্মিক সম্পদের কাছে এতক্ষণ কাটালাম, তা তখন মোটেই বুঝতে পারিনি!'

সেকালে সাধারণের চোখে স্বামীজী

স্বামীজী যখন আমেরিকায় তখন বাঙালী শিক্ষিত ব্যক্তি-মাত্রেরই মনে তাঁর প্রতি একটা শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের ভাব জেগেছিল। একজন ভারতবাসী বিদেশে শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পেরেছেন—এইটাই ছিল স্বামীজীর প্রতি শ্রদ্ধার প্রধান কারণ। কিছু লোকে তাঁর লেখাও কিছু কিছু পড়েছিলেন। তাঁরা অবাক্ হতেন তাঁর অভিনব ভাব ও ভাষায়। এ রকম জোরালো ভাষা পূর্বে কেউ শোনেনি।

কিন্তু স্বামীজী যখন বিদেশ থেকে ফিরে এলেন, তখন এক তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি হ'ল। সবাই কি যে করবে, আনন্দে তা ভেবে পেল না। কলকাতায় তাঁর গাড়ির ঘোড়া খুলে ফেলে যুবকেরা রথের মতো টেনে

নিয়ে চললেন। সে-ঘটনা আমি চোখে দেখিনি। কিন্তু বাঙলার বাহিরেও সর্বত্র বাঙালী-সমাজে সেই আলোড়নের ঢেউ গিয়ে লেগেছিল।

স্বামীজী তখনও ভারতে ফেরেননি। রামবাবু (শ্রীরামচন্দ্র দত্ত) খোল-করতাল সহকারে বহুলোক-সমেত 'রামকৃষ্ণ'-নাম-সংকীর্তন বার করতেন। সে-কীর্তন আমি দেখেছি। রামবাবু নিজে ভাবে মাতোয়ারা হয়ে যেতেন। উচ্চৈঃস্বরে—'জয় রামকৃষ্ণ, জয় রামকৃষ্ণ' ব'লে লাফাতেন। দেখে মনে হ'ত, তাঁর ভিতরের ভাব যেন চেপে রাখতে পারছেন না। তিনি বক্তৃতাও দিতেন খুব ভাল। বহু লোক তাঁর বক্তৃতা শুনতে যেতেন—আমিও গেছি। তাঁর প্রধান বক্তব্য ছিল—শ্রীরামকৃষ্ণ এ-যুগে অবতার হয়ে এসেছেন। এই আনন্দ-সংবাদ পারলে তিনি প্রত্যেক ঘরে ঘরে দিয়ে আসেন।

শুনেছি এই খবর বিদেশে থাকতে স্বামীজী শোনেন এবং রামবাবুকে এভাবে সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচার করতে বারণ করেন। কিন্তু রাম-বাবুকে তখন যেভাবে দেখেছি, তাতে মনে হয়, তিনি সে-সময় ভাবোন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন। বারণ শুনে চলার মতো বোধ হয় তাঁর অবস্থাই ছিল না। রামবাবুর প্রতি আমার খুব শ্রদ্ধা ছিল। তাঁর মুখে ঠাকুরের কথা শুনে আমি প্রথম প্রেরণা পাই; এবং মঠে যেভাবে ঠাকুরের ছবি রেখে পূজো করা হ'ত—সেইভাবে এলাহাবাদে একটি ঘর ভাড়া ক'রে আমরাও তাই আরম্ভ করি। ক্রমে তা 'ব্রহ্মবাদিন্' ক্লাবে রূপান্তরিত হয়।

সেই সময় শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব একজন উচ্চকোটির সাধক ও সিদ্ধ মহাপুরুষ এ-কথা সকলেই মেনে নিতেন। স্বামীজী স্বয়ং একজন অতি শক্তিমান্ মহাপুরুষ—তাও লোকে মানতেন। কিন্তু 'রামকৃষ্ণ অবতার' এ-কথা তাঁরা নিতে প্রস্তুত ছিলেন না। স্বামীজী বিলাত হ'তে ফিরে এসেও ঠাকুর-সম্বন্ধে বিশেষ প্রচার করেননি। এ নিয়ে তাঁর গুরুভাইরাও তাঁকে অনুযোগ করেছেন। স্বামীজী যে ঠাকুরকে কি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসার সঙ্গে দেখতেন, তা তিনি নিজের মুখেই বলেছেন, 'শেষে কি শিব গড়তে বাঁদর গড়ব?'

তাই তিনি চেয়েছিলেন কতকগুলি জীবন গঠন করতে—তাঁর অবর্তমানে তাঁর কাজ যাঁরা ক'রে যেতে পারবেন আর ভবিষ্যতের জন্যও অন্য জীবন গড়ে তুলবেন। এঁদের মধ্যে সুধীর মহারাজ, কালীকৃষ্ণ মহারাজ প্রভৃতি গোড়া থেকেই যোগ দেন। সুধীর মহারাজ বয়সে কিছু বড় ছিলেন। তাঁরা চিরদিন আমাকে স্নেহ করতেন। তাঁর মুখে শুনেছি—স্বামীজী ধ্যান-ধারণা ও ব্রহ্মচর্যের উপর বিশেষ জোর দিতেন। বাহিরে কর্মের ভাবের উপর জোর দিলেও অন্তরঙ্গদের কাছে আধ্যাত্মিক জীবনের শ্রেষ্ঠতা-সম্বন্ধে বলতেন। ধ্যান-ধারণা স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধান—এইগুলি তাঁর সন্ন্যাসী শিষ্যদের মধ্যে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।

গুপ্ত মহারাজের প্রেরণায় আর একদল সেবাব্রতী গড়ে ওঠে। 'পরের জন্য হৃদয় কাঁদা চাই'—এইভাবে সেবা করতে হবে। এইটা ছিল গুপ্ত মহারাজের শিক্ষা। যাদের মধ্যে এই ভাবটা ছিল, তাদের প্রতি স্বামীজী ও অন্য মহারাজদের বিশেষ স্নেহ ও অনুগ্রহ ছিল। এই সেবাব্রত যাঁরা নিয়েছিলেন, তাঁরা স্বামীজীকেই জীবনের আদর্শ ব'লে নিয়েছিলেন। কিন্তু স্বামীজীর মধ্যে আধ্যাত্মিক ভাবের যে গভীরতা ছিল, তার পরিচয় পাবার সৌভাগ্য

হয়েছে খুব কম লোকেরই। তাঁর মতো এত বড় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোকও নিজেকে এই বিষয়ে অতি প্রচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিলেন। তাই সর্বসাধারণের মধ্যে তাঁর আধ্যাত্মিক স্বরূপ অধিক প্রকাশিত ছিল না।

স্বামীজী সর্বপূজ্য ছিলেন তাঁর বাগ্মিতার জন্য এবং শক্তিমান্ পুরুষ হিসাবে—তবে তাঁর স্বদেশপ্রেম সকলের হৃদয় জয় করেছিল। এত বড় প্রাণ আর দেখা গেছে ব'লে মনে হয় না। তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর এই স্বদেশপ্রেমকেই শ্রেষ্ঠ আসন দিয়েছেন। তেমনই আবার মহেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর আধ্যাত্মিক গভীরতার ও শক্তির উপর বেশী জোর দিতেন। ভারতবর্ষে এসে তিনি নিজেকে প্রচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিলেন। তাঁর এক বন্ধু সন্ন্যাসী আমাকে বলেছিলেন, 'তোদের স্বামীজী যে কি ক'রে গেল, তা বুঝতে এক হাজার বছর লাগবে।' প্রকৃতপক্ষে স্বামীজীর মধ্যে বহু জিনিস এমন রয়ে গেছে,—যা সর্বসাধারণের নিকট আজও সম্যক্‌রূপে প্রকাশিত হয়নি।

অসংশয়

শ্রীমতী বিভা সরকার

সকল সংশয় পারে দাঁড়াও সুন্দর।
এ প্রবাসী প্রাণ আমি
কাটে মোহে দিন-যামী
বাসনা-দোলায় দোলে বিমুগ্ধ অন্তর।

নিত্য দোলে সংশয়ের দোলা—
অমৃতের স্পর্শ পাই
কোন মোহে ভুলে যাই
এস প্রাণে চির আত্মভোলা।

খেলাঘরে আমি কে ভুলেছি!
কথার আলপনা গাঁথি
কাটে দিন কাটে রাতি
মোহময় আপণ খুলেছি।

যতনে ভঙ্গুর ঘর গড়ি
অমিত অমৃত বাণী
করে মনে কানাকানি
তুচ্ছ এ মাটিরে তবু রয়েছি আঁকড়ি।

খেলাঘরে খেলা হ'লে শেষ
হেলা ভরে ফেলে যাবো
পিছু পানে নাহি চাবো
তোমার স্মরণ মাগি হে মোর অশেষ।

কেন তবে বৃথা মৃত্যুভয়
আমার তো শেষ নেই
বস্ত্র মাত্র দেহ এই
অংশ মাত্র আমি যাঁর তাহে হবো লয়।

দাঁড়ায়েছ হে মোর সুন্দর!
আলো করি মনোলোক
পূর্ণ করি এ দ্যুলোক
প্রাণ জ্যোতিঃপূর্ণ হ'ল প্রণমে অন্তর!

মধ্যযুগের কবি দান্তে

অধ্যাপক রেজাউল করীম

রোম-সাম্রাজ্যের পতনের যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ বৎসরের মধ্যে ইওরোপে যত মহৎ চিন্তা ও মহৎ কার্য হইয়াছে, তার প্রায় সবগুলিরই চরমতম শিল্প-সৌন্দর্য প্রকাশিত হইয়াছে মহাকবি দান্তের অমর কাব্য 'ডিভাইনা কমেডিয়া'তে বা স্বর্গীয় মিলনে।

এই মহাকাব্যে দেখি মহাকবি দান্তে রূপকের আকারে তাঁর ঈশ্বরদর্শনের কাহিনী অপূর্ব ছন্দে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি স্বর্গীয় উল্লাসে পুলকিত হইয়া এক শুভক্ষণে মর-জগতের সীমা অতিক্রম করিয়া এই জীবনেই স্বর্গ নরক ও প্রেতলোক পরিভ্রমণ করিয়াছেন। তাঁর এই কাব্যে আছে পণ্ডিতের মানসিক গভীরতা, মরমী সাধকের আধ্যাত্মিকতা, ট্রবাছুর কবিদের 'শিভালরি'-সম্মত নারী-পূজা।

মধ্যযুগের নব্য কবিগণ যে দার্শনিক ভক্তিকে কাব্যরূপ দিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তার সার্থক প্রকাশ আছে দান্তের এই 'ডিভাইনা কমেডিয়া'তে। পোপ ও ইওরোপের তৎকালীন রাজন্যবর্গ ধর্ম-সম্বন্ধে যে দার্শনিক স্বপ্ন ও মতবাদ দীর্ঘকাল ধরিয়া সযত্নে পোষণ করিতেন, তাহা হইতেছে সর্বজনীন রোমান ক্যাথলিক চার্চের। তাঁরা সর্বজনীন রোমান সাম্রাজ্যের যে বায়বীয় ও ছায়াময় মায়াজাল বুনিয়াছিলেন, এই সবও দান্তেকে কবিতা রচনা করিতে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। তিনি মধ্যযুগের সমুদয় আদর্শকে নব-জীবন দান করিলেন এই মহাকাব্যে। তিনি এই সব আদর্শ মতবাদ ও চিন্তাধারা লইয়া কাব্য রচনা করিয়াছেন এবং সমস্ত রচনার মধ্যে একটা 'poetic passion' (কাব্যময় আবেগ) দিয়াছেন।

দান্তে একটা নূতন ধরনের ঐক্যবোধ জাগ্রত করিয়া সাহিত্যে সমগ্র মধ্যযুগের উপর স্থায়িত্বের স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছেন। পরস্পর-বিরোধী বিষয় তাঁর জ্বলন্ত কল্পনার দ্বারা একীভূত হইয়া গিয়াছে। মানুষের বাস্তব চিত্র, তার প্রকৃতি, তার কর্তব্য, তার জীবন, তার ভাগ্য, তার স্নেহ ও ভালবাসা—এই সবই একীকরণের একটা বিরাট পট-ভূমিকার উপর রূপ গ্রহণ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে এই 'ডিভাইনা কমেডিয়া'তে।

মহাকবি দান্তে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিবার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা। ১২৬৫ খৃঃ মে মাসের শেষের দিকে ফ্লোরেন্সের একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারে দান্তে জন্মগ্রহণ করেন। যে পরিবারে তাঁর জন্ম হয়, সে পরিবারটি দরিদ্র ও পতনোন্মুখ। তাঁর পিতার নাম Alighiero di Bellineione Alighieri, আর মাতার নাম Monna Bella। দান্তের জন্মের অল্পকাল পরে তাঁর মাতার মৃত্যু হয়।

১২৮৩ খৃঃ মাত্র আঠার বৎসর বয়সে দান্তে তাঁর প্রথম কবিতা রচনা করেন। সে-কবিতা এখনও রক্ষিত আছে। কবিতাটি ছোট একটি সনেট। যাদের প্রেমে নিষ্ঠা আছে, তিনি এই কবিতায় তাদের নিকট হইতে তাঁর একটি স্বপ্নের ব্যাখ্যা চাহিয়াছেন। এই ছোট সনেটটি যে উচ্চাঙ্গের কবিতা, তার প্রমাণ আছে। কারণ কবিতাটি রচনার পর ইতালির তৎকালীন

বিখ্যাত কবি কাভালকান্টি (Cavalcanti) দান্তেকে কবি বলিয়া স্বীকৃতি দান করিয়াছিলেন। ইনিই দান্তের সর্বপ্রথম কবি-বন্ধু।

পরবর্তী কয়েকটি বৎসর দান্তে পুস্তক পাঠ করিয়া এবং শরীর-চর্চা করিয়া কাটাইয়া দিলেন। কিছুদিন ফ্লোরেন্সের অশ্বারোহী সৈন্যবিভাগেও কাজ করিয়াছিলেন এবং বীরের মতো যুদ্ধ করেন।

কিশোর-বয়সে কেমন করিয়া ও কি অবস্থায় পড়িয়া দান্তে বিয়াট্রিসকে (Beatrice[১]) ভালবাসিয়াছিলেন, সে এক বিরাট কাহিনী। কিন্তু বিয়াট্রিসের সঙ্গে দান্তের মিলন হয় নাই। বিয়াট্রিসের অভিভাবকগণ অন্যত্র তার বিবাহ দিয়াছিলেন। আর দান্তেও অন্যত্র বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রথম জীবনের ব্যর্থ প্রেম দান্তের অন্তরে চির দুঃখের ছাপ রাখিয়া গিয়াছে। তিনি জীবনে তাহা ভুলিতে পারেন নাই। বিবাহের কিছুদিন পরে বিয়াট্রিসের মৃত্যু হইল—১২৯০ খৃঃ জুন মাসে। দান্তের রোমান্টিক প্রেম ও কবিতার কেন্দ্রস্থল ছিলেন এই বিয়াট্রিস।

দুঃখে মর্মাহত হইয়াই দান্তে কবির কল্পনা দিয়া বিয়াট্রিসকে স্বর্গবাসিনী দেবী করিয়া তুলিলেন। দান্তে এ-সম্বন্ধে বহু কবিতা রচনা করিলেন। ১২৯২ হইতে ১২৯৪ খৃঃ পর্যন্ত বিয়াট্রিসের সম্মানের জন্য তিনি যে-সব কবিতা রচনা করেন, সেগুলিকে একটি পুস্তকাকারে সংগ্রহ করিলেন। তার সঙ্গে গদ্যে একটি প্রবন্ধ জুড়িয়া দিলেন 'Vita Nuova' বা নবজীবন। এই গ্রন্থটি তিনি তাঁর বন্ধু কাভালকান্টির নামে উৎসর্গ করিলেন : 'To my friend to whom I am writing this.'

গদ্য ও পদ্যের সমন্বয়ে রচিত 'ভিটা নোভা' গ্রন্থখানিতে আমরা দেখিতে পাই, দান্তে কেমন করিয়া নারীর পবিত্র প্রেমকে স্বর্গলাভের পথরূপে ভাবিতে শিখিলেন। কবি এই গ্রন্থে প্রেমধর্মের মহান্ আদর্শকে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

প্রেমধর্ম এমন একটা আদর্শ, যাহা মানুষকে বিবিধ প্রকার বিরুদ্ধ অবস্থার মধ্যেও বাঁচাইয়া রাখে। প্রেমিক তার দয়িতার প্রশংসার জন্য যে-সব বাছাবাছা শব্দ ব্যবহার করে, তার মধ্যে সে লাভ করে তার সর্বোচ্চ স্বর্গ-সুখ (Beatitude)। সেই দয়িতার আত্মার ঔজ্জ্বল্য ঈশ্বরের সিংহাসন পর্যন্ত পৌঁছাইতে পারে। যখন সেই দয়িতা তার পাশ দিয়া চলিয়া যায়, তখন সমস্ত কুচিন্তা বিদূরিত হয়। সে যার উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তাকেই মহৎ করিয়া তুলে। সে হইতেছে স্বর্গের সৌন্দর্য-দর্পণ। তাহা এমন এক অলৌকিক সত্তা, যাহা স্বর্গ হইতে মর্ত্যধামে আগত অলৌকিক ভাবকে প্রকটিত করে। তাই দান্তে বলিয়াছেন : 'He seeth perfectly all salvation who seeth my lady.' যখন সে পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করে, তখন তার সৌন্দর্যের আনন্দ আমাদের দৃষ্টিপথ হইতে অন্তর্হিত হইয়া যায়। আর সেই সৌন্দর্যের আনন্দ আধ্যাত্মিক প্রীতিতে রূপান্তরিত হয়। সেই আনন্দ ঊর্ধ্বপথে যাইবার সময় স্বর্গলোকব্যাপী একটা প্রেমের জ্যোতি ছড়াইয়া দেয়—সেই জ্যোতি দেবদূতগণকে অভিবাদন করে। তীর্থযাত্রী আত্মা তার সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়ায়। সে সমগ্র সৌরমণ্ডলের মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করে এবং দেখিয়া বিস্মিত হয়, তার সেই দয়িতা মহান্ ঈশ্বরের মহিমার মধ্যে বিরাজ করিতেছে।

---

১ ইতালীয়ান উচ্চারণ—বেয়াত্রিচে

বিয়াট্রিসের মৃত্যুর ঠিক পর বৎসর দান্তে মনে করিলেন যে, তাঁর জীবন বুঝি ব্যর্থ হইয়া যাইবে। ইচ্ছা না থাকিলেও তাঁকে জন্মভূমির রাজনীতিক গণ্ডগোলের মধ্যে অংশ গ্রহণ করিতে হইল। ১২৯৫ হইতে ১৩০১ খৃঃ পর্যন্ত ফ্লোরেন্সে নানাপ্রকার গণ্ডগোল দেখা দিল। নগরের অধিবাসীরা দুইটি বিবদমান দলে বিভক্ত হইয়া গেল—একটির নাম 'গোএলফ্' (Guelph) অপরটির নাম 'ঘিবেলাইন' (Ghibelline)। কিছুদিনের মধ্যে এই 'গোএলফ্' দলটিও দ্বিধাবিভক্ত হইয়া গেল - একটির নাম 'বিআন্‌শি', অপরটির নাম 'নেরি'।

এই সময় দান্তে অন্যতম ম্যাজিস্ট্রেটের পদে আরূঢ় ছিলেন। দুইমাস এই পদে তিনি কাজ করিয়াছিলেন। এই পদে কাজ করিবার সময় তাঁর প্রিয় বন্ধু কাভালকান্টিকে তিনি মৃত্যু-দণ্ডাজ্ঞা দিতে বাধ্য হন। বন্ধুর উপর এই দণ্ডাজ্ঞা তাঁর নিজের মৃত্যু-দণ্ডাজ্ঞা বলিয়া মনে হইল।

১৩০১ খৃঃ পোপ বোনিফেসের চক্রান্তে এবং ভ্যালোয়ের চার্লসের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে 'নেরি' দল জয়লাভ করিল। এই দলের প্রথম বলি হইলেন দান্তে। ১৩০২ খৃঃ ২৭শে জানুআরি তাঁকে মৃত্যু-দণ্ডাজ্ঞা দেওয়া হইল। তাঁর সম্বন্ধে আদেশ হইল যে, তাঁকে জীবন্ত দগ্ধ করা হইবে।

দণ্ডাদেশ পাইয়া দান্তে স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া নির্বাসনে চলিয়া গেলেন। নির্বাসন-কালে একস্থানে স্থির হইয়া থাকিতে পারেন নাই। কিছুদিন পর্যন্ত তিনি অন্যান্য নির্বাসিত ব্যক্তিদের সহিত একত্র ছিলেন। মহৎ কাজের জন্য তাদের সঙ্গে যুক্ত হইয়া কাজ করিতে লাগিলেন। তাঁর সঙ্কল্প হইল—নির্বাসিত সকল দলের সঙ্গে মিলিত হইয়া ফ্লোরেন্স উদ্ধার করিবেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গীদের ব্যবহারে তিনি বিরক্ত হইয়া পড়িলেন, এবং তাদের বাদ দিয়া নিজেই একটা পার্টি গঠন করিলেন।

এই সময় দান্তে দুইটি গদ্যপুস্তক রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু নানা কাজের চাপে তাহা শেষ করিতে পারেন নাই। (১) 'Vernacular Eloquence'—ইহাতে তিনি ইতালিয়ান লিরিক কবিতার ছন্দ ও মাত্রা লইয়া আলোচনা করিতে চাহিয়াছিলেন। জাতীয় ভাবধারা প্রকাশের জন্য আদর্শ ভাষার দৃষ্টান্ত স্থাপন করিতে চেষ্টা করেন। (২) অপর গদ্য রচনার নাম 'Convito' অথবা 'The Banquet'। ইহা একটি দার্শনিক গ্রন্থ। ইহাতে দর্শনের জটিল বিষয়কে সাধারণ লোকের নিকট বোধগম্য করিবার চেষ্টা করেন।

নানাকারণে দান্তেকে রাজনীতিক গণ্ড-গোলে জড়িত হইতে হইয়াছিল। ১৩১০ খৃঃ লাক্সাম্বার্গের সম্রাট্ হেনরী নূতন শক্তি সংগ্রহ করিয়া আল্পস্-পর্বত অতিক্রম করিলেন, এবং অবিলম্বে মহানগর রোমের দিকে ধাবিত হইলেন। সেই সময় রোম-নগরের চরম দুর্দশা। দান্তে মনে করিলেন, হেনরী এই মহানগরকে উদ্ধার করিবেন। তাই তিনি তাঁকে সাদর অভিনন্দন জানাইলেন। কিন্তু তাঁর আশা পূর্ণ হইল না। ইতালি-প্রবেশের তিন বৎসরের মধ্যে ব্যর্থতায় ও অপমানে ১৩১৩ খৃঃ হেনরী দেহত্যাগ করেন।

এ-পর্যন্ত দান্তে গৃহহীন ভবঘুরে। তাঁর উপর এখনও দণ্ডাদেশের তরবারি ঝুলিতেছে। তাঁকে ধ্বংস করিবার জন্য ফ্লোরেন্স নূতন নূতন কৌশল অবলম্বন করিতে উদ্যত।

দান্তে আশা করিয়াছিলেন, সম্রাট্ হেনরী রোম-সহ ইতালি উদ্ধার করিবেন। কিন্তু তাঁর সে আশা পূর্ণ হইল না। কিন্তু তবু তিনি হতাশায় বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন না। জীবনে তিনি বহু আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। তিনি গৃহহীন যাযাবরের মতো ইতালির নগরে নগরে ঘুরিয়াছেন। তিনি বন্ধুবান্ধব সব হারাইলেন। এমন কি জগৎকেও হারাইলেন, কিন্তু নিজের আত্মাকে হারান নাই।

এই সময়ে তিনি তাঁর বিখ্যাত মহাকাব্য 'ডিভাইনা কমেডিয়া' রচনা শেষ করিতে ইচ্ছা করিলেন। দান্তে মনে করিলেন, জগতের মঙ্গলের জন্য বিধাতা তাঁকে শক্তি দিয়াছেন। সে-শক্তিকে তিনি কাজে লাগাইবেন। তিনি যেন সতর্ক প্রহরী। 'ডিভাইনা কমেডিয়া'তে তিনি সেই দায়িত্ব পূর্ণ করিয়াছেন বলিয়া তাঁর বিশ্বাস হইল। 'ভিটা নোভা'তে তিনি যে-প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, সেই প্রতিশ্রুতি তিনি রক্ষা করিলেন এই 'ডিভাইনা কমেডিয়া'তে।

স্বদেশ হইতে নির্বাসিত জীবনের সুদীর্ঘ ক্লান্তিকর বৎসরগুলি চলিয়া যাইতে লাগিল। ঘোর দারিদ্র্যের মধ্যে এখন তিনি ইতালির নগরে নগরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। এই সময় কবির নিজের জীবনের ইতিহাস সমগ্র মানব-জাতির ইতিহাসের সঙ্গে একীভূত হইয়া গেল। মহতী চিন্তার উচ্চ মিনার হইতে তিনি সমগ্র জগৎকে দেখিতেছেন—জগৎ কি ভীষণ অরাজকতা ও অত্যাচারের কবলিত হইয়াছে! লোভ মাৎসর্য এইসব পাপের বশীভূত হইয়া পড়িয়াছে। দরিদ্রদের উপর যারা অত্যাচার করে, তিনি তাদের দেখিয়াছেন, তিনি রাজ-পুরুষ ও রাজকর্মচারীদের অত্যাচার স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। পুরোহিতগণ শাস্ত্রের শিক্ষা অগ্রাহ্য করিয়া অর্থ ও পার্থিব সম্পদ ও শক্তি লাভ করিতে ব্যগ্র—এ দৃশ্যও তিনি নিরীক্ষণ করিয়াছেন। উচ্চ ও নিম্নস্তরের মানুষের মধ্যে লক্ষ্য করিয়াছেন—নৈতিক দুর্গতি কাল-স্রোতের মতো সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।

তিনি তাঁর আত্মোপলব্ধির স্বচ্ছ আলোকে দেখিতে পাইলেন যে, তাঁর নিজের মনের মধ্যেও এই ধরনের সংগ্রাম চলিতেছে। তিনি দেখিয়াছেন যে, তাঁর জীবনের সুন্দর ভবিষ্যৎ ম্লান হইয়া গিয়াছে। তিনি নিজেও যেন পাপের পঙ্কে পতিত হইয়াছিলেন। কিন্তু এখন তাঁর মনে আসিল ভাবান্তর। এবং ভাবান্তর হইতে রূপান্তর। নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়া মানুষকে নবভাবে উদ্দীপিত করিতে চাহিলেন, এবং অনুতাপের জ্বালায় প্রপীড়িত হইয়া সেই বাল্যজীবনের দয়িতা বিয়াট্রিসের স্মৃতির দিকে প্রত্যাবর্তন করিলেন। তাঁর যৌবনের প্রেম এখন তাঁর নিকট স্বর্গীয় দর্শনে পরিণত হইল। তাঁর এই আত্মোদ্ধার মানবজাতির আত্মোদ্ধার বলিয়া মনে হইল: অবশ্য যদি লোকে তাঁর উপদেশ হৃদয়মন দিয়া শ্রবণ করে ও অনুসরণ করে।

১৩২১ খৃঃ ১৪ই সেপ্টেম্বর দান্তে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে তিনি 'ডিভাইনা কমেডিয়া'র রচনা শেষ করেন। এই কাব্যখানি তিন খণ্ডে বিভক্ত—নরক, প্রেত-লোক (Purgatory) এবং স্বর্গ। এ-জগতে বাস করিয়া জীবন-নদীর ওপারের জগতের স্বপ্ন-দর্শন সাহিত্যের ইতিহাসে নূতন নয়। কিন্তু দান্তের পূর্বে কোন লেখকই গভীর তাৎপর্যপূর্ণ সর্বজনীন আবেদনে ভরা এমন গ্রন্থ রচনা করেন নাই। কবি-হিসাবে দান্তে পূর্ববর্তী বহু লেখককে অতিক্রম করিয়াছেন।

বস্তুতঃ 'ডিভাইনা কমেডিয়া' কেবলমাত্র পরলোকের চিত্র নহে। ইহাতে আরও বহু বিষয়ের ইঙ্গিত আছে। দান্তের যুগের জ্ঞান, ধর্ম, চিন্তা, দর্শন, মহৎ আদর্শ—সব কিছুকেই তিনি এই মহাকাব্যে সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন। মধ্যযুগের ক্যাথলিক ধর্মের তিনি যেন আত্মা। তিনি আধ্যাত্মিকতার রূপকের মাধ্যমে আমাদের এই জগতেরই চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন এই মহাকাব্যে। দান্তের জীবনে ছিল একটা 'মিশন'। নৈতিক আবেদন দিয়া চার্চের দুর্নীতির সংস্কার সাধন করা, রাষ্ট্রের ও সমাজের মধ্যে নবজীবন সঞ্চার করা, মানুষের অন্তরের ব্যথা দূর করা, দুঃখ-দুর্দশার পঙ্ক হইতে গণমনকে উদ্ধার করা এবং সকল শ্রেণীর মানুষের সর্ববিধ কল্যাণ করা —এই হইল তাঁর 'মিশন'। দান্তের মনে একটা গর্ব ছিল যে, তিনি এই মহাকাব্য রচনা করিয়া ঈশ্বরের কাজ করিয়াছেন।

গ্রন্থের প্রারম্ভে তিনি বলিতেছেন: একদা এক বনে পথ হারাইয়া গেলেন। কতকগুলি বন্য জন্তু তাঁকে নিকটস্থ পর্বতে উঠিতে বাধা দিল। তখন প্রাচীন রোমের কবি ভার্জিল তাঁর নিকট উপস্থিত হইলেন। এই ভার্জিল তাঁর পথপ্রদর্শক হইলেন এবং দান্তেকে ভার্জিল নিজেই নরক ও প্রেতলোকে লইয়া যাইবেন। প্রেতলোক দেখা শেষ হইলে বিয়াট্রিস নিজে আসিয়া তাঁকে স্বর্গলোকে লইয়া যাইবেন। তারপর তিনি রোমান কবিকে অনুসরণ করিয়া চলিতে লাগিলেন। রোমান কবি ভার্জিল হইতেছেন মানবীয় দর্শন ও স্বাভাবিক যুক্তির প্রতিনিধি। দান্তে প্রথমে দেখিলেন, নরকে কত লোক পূর্ব জীবনের পাপের জন্য দণ্ডভোগ করিতেছে। যাদের লঘু পাপ, তারা আছে 'পারগেটারি'তে। এখানে কিছুদিন থাকার পর তাদের পাপক্ষালন হইয়া যাইবে। তারপর তারা স্বর্গলোকে যাইবার অধিকার পাইবে। বিয়াট্রিস হইতেছেন ঐশ্বরিক দর্শন এবং ধর্মতত্ত্ববিজ্ঞান। বিয়াট্রিসের সাহায্যে দান্তে নয়টি চলন্ত চক্রের মধ্য দিয়া স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিলেন। সে-রাজ্যে কোন স্থান নাই, কোন কাল নাই—তাহা হইতেছে অনন্ত আনন্দময় আলোময় একটা লোক। বিয়াট্রিসের সাহায্যে তিনি মহীয়সী মেরী মাতার নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁর অনুমোদন পাইলে তবেই মানুষ ঈশ্বরের জ্যোতির্ময় রূপের দর্শন পায়। এইভাবে দান্তে নরক প্রেতলোক ও স্বর্গলোক দর্শন করিয়া মর্ত্যধামে প্রত্যাবর্তন করিলেন। এই হইল 'ডিভাইনা কমেডিয়া'র সার কথা।

এই মহাকাব্যের বাহ্যরূপ যাহাই হউক না কেন, একটু গভীরভাবে পড়িলে বুঝা যাইবে যে, একটি রূপকের সাহায্যে কবি ধর্মের তত্ত্বকথা পাঠককে শুনাইয়াছেন। ইহার কাঠামো হইতেছে—ত্রয়োদশ শতাব্দীর ইওরোপ। কবি তাঁর যুগের ইতালির ইতিহাস হইতে মানব-প্রকৃতির সব দিককেই ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তাঁর এই কাব্যের প্রধান বিষয় হইতেছে 'মানুষ'। ব্যাপক অর্থে ইহার মূল কথা হইতেছে—মৃত্যুর পর আত্মার গতি ও অবস্থান। ভালমন্দ, পাপপুণ্য, আনন্দ অথবা দুঃখ এই সব কিছুর জন্য মানুষকে দেওয়া হইয়াছে স্বাধীন ইচ্ছা। সেই স্বাধীন ইচ্ছা সে কি ভাবে প্রয়োগ করিল, তার জবাবদিহি তাকে করিতে হইবে। তাকে একদিন বিচারকের মানদণ্ডের সামনে উপস্থিত হইতে হইবে, তাতে সে পুরস্কার পাইতে পারে অথবা অথবা দণ্ডিত হইতে পারে।

'ডিভাইনা কমেডিয়া'তে যে নরক-বর্ণনা করা

হইয়াছে, কারও কারও মতে তাহা সার্থক সাহিত্যসৃষ্টি। নরকের বৃত্তান্ত অত্যন্ত মর্মস্পর্শী হইয়াছে। নরকটাও একটা রূপক। দান্তে নিজের সমাজের চারিদিকে যে ছলনা শঠতা দুর্নীতি দেখিয়াছেন, নরকে তাহাই দেখাইয়াছেন। মৃত্যুর পর বিচার হইবে, কেহই তাহা হইতে পরিত্রাণ পাইবে না। তিনি বিশ্বাস করেন, নরকের যে-যন্ত্রণা তাহা এই জগতের অনুতাপহীন পাপের পরিণতি। অনুতাপ ও অনুশোচনা না করিয়া মানুষ যে-সব পাপ করে, নরকে সে তাহার ফলভোগ করে। পাপই নরকের যন্ত্রণার মূর্তি ধারণ করিয়া মানুষকে দগ্ধ করিতেছে। কবি দেখাইয়াছেন, কেমন করিয়া অভিশপ্ত আত্মাগুলি এই নরজীবনেই নিজেদের ভাগ্য নিজেরাই রচনা করিয়াছে। তাই তারা নরকে গিয়া নিজেদের পাপের ফলভোগ করে। বস্তুতঃ রূপকের মাধ্যমে দান্তে পাপের বাস্তব দিকটাই ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। যুক্তির আলোতে এবং মানবীয় দর্শনের পরিচালনায় দান্তে একের পর এক বিভিন্ন পাপীর হৃদয় বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন, তাদের জীবনের 'ট্রাজেডি'র গোপন রহস্য কোথায় ছিল।

'পারগেটারি' বা প্রেতলোকের পরিকল্পনা আরও মৌলিক। ইওরোপীয় সাহিত্যে এত সুন্দর বিষয়-বস্তু নাই বলিলেই চলে। ইহাতে আছে পাপক্ষালনের পর্বতের বর্ণনা। কোটি সূর্য ও তারকার নীচে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের গৌরবের মধ্যে মানুষের পাপ ক্ষয় হইয়া যাইতেছে। অবশেষে সে তার আদিম পবিত্রতা পুনরায় ফিরিয়া পাইতেছে। প্রথম হইতেই ইহাতে আছে প্রেমের সুর। প্রেম হইতেছে দান্তের কবিতার প্রধান আবেদন। এই খণ্ডে তিনি ইহাই দেখাইয়াছেন যে, প্রেমই সমস্ত বিশৃঙ্খলার মধ্যে শৃঙ্খলা ও শান্তি আনয়ন করে। প্রেমের অগ্নিতে পাপ ক্ষয় হইয়া গেলে পাপীও স্বর্গসুখ পাইয়া থাকে। সর্বশেষে স্বর্গের বর্ণনা। ইহাতে দান্তে দেখাইয়াছেন যে, কেবলমাত্র প্রেম ব্যতীত এখানে সব কিছুই রূপান্তরিত হয়। প্রেমই হইতেছে পরিচালক ও বিধি। দান্তের 'মিস্টিসিজ্‌ম্'-এর ব্যাখ্যাই হইতেছে তাঁর প্রেমধর্ম। তিনি 'পারগেটারি'তে দেখাইয়াছেন যে, যুক্তিশীল মানুষের নিকট প্রেম হইতেছে সকল প্রকার পুণ্য ও পাপের বীজ। কারণ প্রেমের ভাল করিবার যে-শক্তি তাহা হইতেছে একটা উপাদান, যাহার উপর নির্ভর করিয়া স্বাধীন ইচ্ছা ভাল কাজ করিতে পারে। 'স্বর্গলোকে' তিনি দেখাইলেন যে, সমগ্র পৃথিবীর গতিই হইতেছে বিশুদ্ধ প্রেমের একটা নৃত্য—'Cosmic dance'। ইহার আরম্ভ হইতেছে প্রথম শ্রেণীর দেবদূতের জগতে। সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে এই নৃত্য অবিরত চলিতেছে। কবির ত্রিলোক দেখা সাঙ্গ হইল। সর্বশেষে ঈশ্বরের আলোক দর্শন করিলেন তাঁর অন্তর্ভেদী সহজাত বুদ্ধি দিয়া। তিনি বুঝিলেন যে, প্রেমই সমগ্র বিশ্বকে ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ করে। পরিণামে সবই চরম ঐক্য লাভ করে। দান্তে-ও বিয়াট্রিস-সম্পর্কের মধ্যে আমরা কবির মরমী জীবনের পরিচয় পাই। ফাদার টিবেল (Tyvell) যাহা বলিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত সত্য কথা: If love be mysticism, then we have the key to all mysticism within ourselves. যখন সমস্ত কামনা শেষ হয়, যখন সমস্ত ইচ্ছা ঈশ্বরের ইচ্ছায় মিলিত হয়, তখন আত্মা তন্ময় হইয়া সেই বিভুর চরণে আত্মসমর্পণ করে। তখন জ্ঞান ও প্রেমের সমস্ত শক্তি পূর্ণ পরিণতি লাভ করে—ইহাই দান্তের মহাকাব্যের শিক্ষা।

মহিষাসুর-বধ

শ্রীঅহীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

[চণ্ডীতে দেবতাদের সঙ্গে অসুরদের তিনটি প্রধান যুদ্ধের উল্লেখ আছে। প্রথম যুদ্ধে ঘটেছিল কারণ-সলিলে অনন্ত-শয়নে শায়িত যোগ নিদ্রা থেকে উত্থিত বিষ্ণুর দ্বারা মধু-কৈটভ-বধ। দ্বিতীয় যুদ্ধে হয়েছিল সমস্ত দেবগণের দেহ-বিনির্গত শক্তি-সঞ্জাত অশেষ-তেজ-সম্পন্না দেবী দুর্গার দ্বারা মহিষাসুর-বধ। এবং তৃতীয়টিতে হয়েছিল দেবী অম্বিকা-দ্বারা শুম্ভ-নিশুম্ভ-বধ।

প্রথম আখ্যায়িকায় দেবীর কথা বিশেষ-কিছু নেই। যা আছে, তা হ'ল অপূর্ব একটি সুন্দর ও ভাব-গম্ভীর স্তব বা ধ্যান। দ্বিতীয় কাহিনীতেও স্তব আছে, কিন্তু তা শেষের দিকে।

দ্বিতীয় আখ্যায়িকার গল্পাংশ অতি চিত্তাকর্ষক। দুর্গাপূজার প্রাক্কালে গল্পটির অনুধ্যান তাঁদেরই জন্যে যাঁরা মূল চণ্ডী পড়েননি, বা পড়েও তার অর্থ ধরতে পারেননি।]

পুরাকালে যখন অসুরদের রাজা ছিল মহিষাসুর আর দেবতাদের অধিপতি ছিলেন পুরন্দর, সেই সময়ে পূর্ণ একশত বৎসর ধরে দেবাসুরের এক যুদ্ধ হয়েছিল। সেই যুদ্ধে মহাবলশালী অসুরদের দ্বারা দেবসৈন্যগণ পরাভূত হয়েছিল, এবং দেবতাগণকে জয় ক'রে মহিষাসুর ইন্দ্রত্ব লাভ করেছিল।

পরাজিত হয়ে দেবগণ পদ্মযোনি প্রজাপতিকে নিয়ে মহাদেব এবং বিষ্ণু যেখানে ছিলেন, সেখানে গেলেন। মহিষাসুর যে-যে ভাবে তাঁদের পর্যুদস্ত ও লাঞ্ছিত করেছিল, দেবতারা সেই সব বৃত্তান্ত তাঁদের জানিয়ে বললেন—সূর্য, ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র, যম, বরুণ এবং অন্যান্য দেবতার এতদিন যা যা অধিকার ছিল, সে-সবেই মহিষাসুর এখন নিজে অধিষ্ঠিত হয়েছে। সেই দুরাত্মার দ্বারা সকল দেবতাই এখন স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হয়ে পৃথিবীতে মরণ-ধর্মী মানুষের মতো বিচরণ করছেন। দেবশত্রু অসুরের কৃত অত্যাচার শিব ও বিষ্ণুর গোচরে এনে দেবতারা তাঁদের শরণাপন্ন হলেন, এবং বললেন, 'এখন তার বিনাশ কি ক'রে হয়, আপনারা সেই চিন্তাই বিশেষ ভাবে করুন।'

দেবগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ ক'রে মধুসূদন ও শম্ভুর ভ্রূকুটি-কুটিল আননে ক্রোধ প্রকটিত হয়ে উঠল। তখন চক্রপাণি নারায়ণের তারপর ব্রহ্মা ও শঙ্করের অতি-কোপ-পূর্ণ বদন থেকে মহৎ তেজ নির্গত হ'ল। ইন্দ্রাদি অন্যান্য দেবতার শরীর থেকেও মহৎ তেজ নিঃসৃত হয়ে একত্র হ'ল। দেবতারা দেখতে পেলেন প্রজ্বলিত পর্বতের ন্যায় এক তেজোরাশি। সর্বদেব-শরীর-সঞ্জাত অতুলনীয় সেই জ্যোতি তখন এক নারীমূর্তিতে রূপায়িত হয়েছে।

শম্ভুর দেহ-সঞ্জাত যে তেজ, তাতে তৈরী হ'ল তাঁর মুখমণ্ডল, যমের তেজ থেকে উৎপন্ন হ'ল কেশপাশ, বিষ্ণুর তেজে হ'ল তাঁর বাহু। চন্দ্রের তেজে সংগঠিত হ'ল তাঁর স্তন-যুগল। ইন্দ্রের তেজে রচিত হ'ল দেহ-মধ্যস্থ তাঁর কটিদেশ; বরুণের তেজে জঙ্ঘা ও উরু, নিতম্ব হ'ল পৃথিবীর তেজে; ব্রহ্মার শক্তিতে হ'ল পদ-যুগল, আর সূর্যের শক্তিতে পদাঙ্গুলি। বসুদের তেজে সৃষ্টি হ'ল হস্তের অঙ্গুলি। কুবেরের শক্তিতে নাসিকা, দক্ষাদি প্রজাপতিদের

সঞ্চারিত তেজে রক্ষিত হ'ল তাঁর দন্তপঙ্‌ক্তি, ত্রিনেত্র উৎপন্ন হ'ল পাবকের তেজ হ'তে। সন্ধ্যাদ্বয়ের তেজে গঠিত হ'ল ভ্রূ-যুগল। শ্রবণেন্দ্রিয় হ'ল বায়ুর তেজে। —এই ভাবে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার তেজ-সমষ্টি হ'তে সমুদ্ভূতা হলেন শিবা অর্থাৎ দেবী দুর্গা।

সেই দেবীকে দর্শন ক'রে দেবতারা আনন্দিত হলেন।

পিণাকধৃক্ মহাদেব তখন নিজ শূল থেকে শূল উৎপন্ন ক'রে তাঁকে দিলেন শূল। নিজ চক্র থেকে উৎপন্ন ক'রে চক্র দিলেন বিষ্ণু। বরুণ দিলেন শঙ্খ। হুতাশন দিলেন তাঁকে শক্তি। মরুৎ দিলেন ধনু এবং বাণপূর্ণ তূণীর-দ্বয়। অমরাধিপ ইন্দ্র দিলেন বজ্র আর ঐরাবতের গলঘণ্টা থেকে উৎপন্ন ক'রে ঘণ্টা। কালদণ্ড থেকে দণ্ড দিলেন যম। বরুণ দিলেন পাশ। প্রজাপতি ব্রহ্মা দিলেন জপমালা ও কমণ্ডলু। তাঁর সমস্ত রোমকূপে নিজ রশ্মি সঞ্চালিত ক'রে দিলেন দিবাকর। কালাভিমানিনী দেবতা দিলেন খড়্গ ও স্বচ্ছ ঢাল। ক্ষীরোদ-সমুদ্র দিলেন অত্যুজ্জ্বল হার, পরিধেয় ও উত্তরীয় বস্ত্র, দ্যুতিমান্ চূড়ামণি, কর্ণ-কুণ্ডল, বলয়সমূহ, শুভ্র ললাট-ভূষণ অর্ধচন্দ্র, সমস্ত বাহুতে অঙ্গদ, চরণে বিমল নূপুর, গ্রীবায় অত্যুত্তম অলঙ্কার, এবং সমুদয় অঙ্গুলিতে শ্রেষ্ঠ অঙ্গুরীসকল। বিশ্বকর্মা দিলেন তাঁকে অতি উজ্জ্বল কুঠার, বহু প্রকার অস্ত্র এবং অভেদ্য বর্ম। শির ও বক্ষের জন্য তাঁর অম্লান-পঙ্কজের মালা দিলেন জলধি, যা ছিল অতি শোভাময়। হিমালয় দিলেন বাহন সিংহ আর বিবিধ রত্ন। ধনাধিপ কুবের দিলেন সদা-পূর্ণ পান-পাত্র। শেষ-নাগ—সর্ব নাগের ঈশ্বর, যিনি এই পৃথিবীকে ধারণ ক'রে আছেন, তিনি দিলেন মহামণি-বিভূষিত নাগহার।—সুর-বৃন্দ প্রদত্ত ভূষণ ও আয়ুধ দ্বারা সম্মানিতা হয়ে দেবী তখন মুহুর্মুহু গর্জন ও অট্টহাস্য করতে লাগলেন।

তাঁর সেই অপরিমিত অতি মহৎ ভীষণ গর্জনে সমস্ত নভোদেশ পরিপূরিত হয়ে গেল। আর প্রতিশব্দও হ'ল সুমহান্। সংক্ষুব্ধ হয়ে উঠল তাতে চতুর্দশ ভুবন, কম্পিত হয়ে উঠল যত সমুদ্র, বিচলিত হয়ে উঠল বসুধা, এবং গিরিশ্রেণী চঞ্চল হয়ে গেল। দেবগণ তখন পরমানন্দে সেই সিংহবাহিনীর জয়ধ্বনি করলেন, এবং মুনিগণ তাঁকে ভক্তিনম্রভাবে স্তব করতে লাগলেন।

সমগ্র ত্রিভুবনকে এইভাবে বিক্ষুব্ধ হ'তে দেখে অসুরগণ তাদের সমস্ত সৈন্য সুসজ্জিত ও অস্ত্র উদ্যত ক'রে দাঁড়ালো। ক্রোধে মহিষাসুর 'আঃ, এ সব কি ?' ব'লে অসুর-বেষ্টিত হয়ে সেই শব্দাভিমুখে ছুটে এল।

তারপর দেখতে পেল সে দেবীকে। তাঁর অঙ্গের জ্যোতিতে ত্রিভুবন উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। পদভারে তাঁর নত হয়ে গেছে পৃথিবী। কিরীট তাঁর উদ্ধত হয়ে আকাশ স্পর্শ ক'রে আছে। ধনুর জ্যা-নিঃস্বনে আলোড়িত হয়ে গেছে পাতাল পর্যন্ত। তিনি তাঁর সহস্র ভুজের দ্বারা সর্বদেশ ও সর্বদিক পরিব্যাপ্ত ক'রে অবস্থান করছেন।

তখন সুরদ্বেষিগণ দেবীর সঙ্গে যুদ্ধে মত্ত হ'ল। তাদের নিক্ষিপ্ত বহু প্রকারের শস্ত্র ও অস্ত্রের আলোতে দশ দিক উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

মহিষাসুরের সেনাপতি মহাসুর চিক্ষুর এবং চামর-নামে অপর এক সেনাধ্যক্ষ অন্যান্য মহাসুর-পরিবৃত ও চতুরঙ্গ বলশালী হয়ে যুদ্ধ করতে লাগলো। উদগ্র-নামে মহাসুর ষাট হাজার এবং মহাহনু-নামে মহাসুর এক কোটি

রথ নিয়ে এল যুদ্ধে। অসিলোম-নামে মহাসুর পাঁচ কোটি, আর বাস্কল-নামে অসুর ষাট লক্ষ রথ নিয়ে রণে মেতে উঠল। পরিবারিত-নামে অন্য এক অসুর সহস্র-সহস্র গজ, অশ্ব এবং কোটি রথ পরিবৃত হয়ে রত হ'ল সেই যুদ্ধে। আর যুদ্ধে মাতলো পাঁচ লক্ষ রথ নিয়ে বিড়ালাক্ষ। হয়-হস্তি-পরিবৃত অন্য বড় বড় অসুরেরাও লিপ্ত হ'ল দেবীর সঙ্গে সেই মহাসংগ্রামে। কোটি কোটি সহস্র রথ-দন্তি-অশ্ব পরিবেষ্টিত হয়ে উপস্থিত ছিল সেখানে মহিষাসুর। দেবীর সঙ্গে তারা সব যুদ্ধ ক'রল তোমর, ভিন্দিপাল, শক্তি, মুষল, খড়্গ, পরশু ও পট্টিশ দ্বারা। কেউ নিক্ষেপ ক'রল শক্তি, কেউ বা পাশ। খড়্গ-প্রহারের দ্বারা তারা দেবীকে নিহত করতে চাইল।

তাদের নিক্ষিপ্ত অস্ত্র-শস্ত্রাদি দেবী চণ্ডিকা তখন নিজ অস্ত্র-শস্ত্র বর্ষণ ক'রে অবলীলাক্রমে ছিন্ন ক'রে দিলেন। দেব-ঋষিগণ কর্তৃক স্তূয়মানা দেবী চণ্ডিকা তারপর অসুরগণের দেহে অস্ত্রশস্ত্র-সকল নিক্ষেপ করলেন। দেবীর বাহন সিংহও ক্রুদ্ধ এবং কম্পিত-কেশর হয়ে অসুর সৈন্যগণ মধ্যে দাবানলের মতন বিচরণ করতে লাগলো। যুদ্ধরত অম্বিকা রণে নিঃশ্বাস মোচন করলেন, সেই নিঃশ্বাস সদ্য শত-শত সহস্র-সহস্র দেবী-সৈন্যরূপে পরিণত হ'ল। এবং তারা দেবী-শক্তিতে শক্তি-সম্পন্ন হযে পরশু, ভিন্দিপাল, অসি, পট্টিশ দ্বারা অসুর-সৈন্য নাশ করতে লাগলো। যুদ্ধ-মহোৎসবে দেবী-সৈন্যদের মধ্যে কেউ বাজাতে লাগলো ঢাক, কেউ বা শঙ্খ, আবার কেউ বাজাতে লাগলো মৃদঙ্গ।

দেবী তখন ত্রিশূল গদা ও খড়্গের আঘাতে শত শত মহাসুরকে নিহত ক'রে ফেললেন। অপর কত অসুরকে ঘণ্টার শব্দের দ্বারা বিমোহিত ক'রে ভূতলে নিপাতিত করলেন। পাশ দ্বারা বেঁধে অন্য অসুরদের আকর্ষণ করলেন অতি প্রচণ্ডভাবে। কেউ কেউ দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল তাঁর তীক্ষ্ণ খড়্গাঘাতে, বিমর্দিত হয়ে অথবা গদাঘাতে নিপাতিত হযে কেউ ভূতলে শয়ন ক'রল। মুষলের ভীষণ আঘাতে আহত হয়ে কেউ কেউ রুধির বমন করতে লাগলো। অপরে ভূমিতে পাতিত হ'ল শূলাঘাতে বিদীর্ণবক্ষ হয়ে। দেবতাদের নিপীড়নকারী অগ্রগামী সৈন্যগণের মধ্যে কেউ কেউ বাণ-বিদ্ধ হয়ে রণাঙ্গণে প্রাণ পরিত্যাগ ক'রল। কারও বা ছিন্ন হয়ে গেল বাহু, কারও ছিন্ন হয়ে গেল গ্রীবা। অন্য কতকদের পাতিত হ'ল শির। আবার অনেকের বিদীর্ণ হযে গেল দেহ-মধ্যভাগ। অনেক মহাসুর ভূমিতে পাতিত হ'ল জঙ্ঘা বিচ্ছিন্ন হয়ে। কারও বাহু, চক্ষু বা চরণ নষ্ট হ'ল। কেউ কেউ হয়ে গেল দেবীর দ্বারা দ্বিধাকৃত। কেউ কেউ ছিন্ন-শির হয়ে পাতিত হয়েও পুনরায় উঠে প'ড়ল। কোন কোন কবন্ধ আবার অস্ত্র গ্রহণ ক'রে দেবীর সঙ্গে করতে লাগলো যুদ্ধ। এবং অপর ছিন্ন-মস্তকেরা তূর্যনিনাদের তালে তালে সেই যুদ্ধে করতে লাগলো নৃত্য। মহাসুরগণ দেবীকে 'তিষ্ঠ তিষ্ঠ' ব'লে ধাবমান হ'ল। যেখানে সেই মহাযুদ্ধ হ'ল, বসুন্ধরার সেই স্থান পাতিত রথ-নাগ-অশ্ব-অসুরের স্তূপে একেবারে হয়ে উঠল অগম্য। আর সেইখানে অসুরসৈন্য-সমূহের মধ্যে প্রবাহিত হয়ে গেল হস্তী অসুর আর অশ্বদের শোণিতধারা সদ্যোজাত এক মহানদীর মতো।

তারপর ক্ষণমধ্যে অম্বিকা অসুরদের সেই মহাসৈন্যকে ক্ষয় ক'রে ফেললেন, যেমন ভস্মীভূত করে বহ্নি তৃণ-দারুর মহাস্তূপকে। কম্পিত-

কেশর সিংহও মহানাদ ক'রে অমরারিদের শরীর থেকে যেন প্রাণ আকর্ষণ করতে লাগলো। দেবীর সৈন্যগণ সেই রণক্ষেত্রে অসুর-দের সঙ্গে এমন যুদ্ধ ক'রল যে, স্বর্গে দেবগণ তাদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে পুষ্পবৃষ্টি করলেন।

তখন স্বীয় সৈন্য হত হচ্ছে দেখে সেনাগতি মহাসুর চিক্ষুর ক্রোধভরে অম্বিকার সঙ্গে যুদ্ধে অগ্রসর হ'ল। সে শরবর্ষণে আচ্ছাদিত ক'রে দিল দেবীকে, যেমন আচ্ছাদিত ক'রে দেয় মেরু-গিরির শৃঙ্গকে মেঘ বারিধারা বর্ষণ ক'রে। অসুরের নিক্ষিপ্ত বাণসকল দেবী ছিন্ন ক'রে দিলেন অবলীলাক্রমে, এবং হনন ক'রে ফেললেন স্বীয় বাণে তার তুরঙ্গসকল ও সারথিকে। ছিন্ন ক'রে দিলেন তিনি তৎক্ষণাৎ তার ধনু এবং ধ্বজা। তারপর তিনি সেই ছিন্ন-ধনু অসুরের সর্বগাত্রে বিদ্ধ ক'রে দিলেন দ্রুতগামী বাণসমূহ। খড়্গ-চর্মধারী সে অসুর তখন ছিন্ন-ধনু বিগত-রথ হতাশ্ব ও হত-সারথি হয়ে ধাবমান হ'ল দেবীর দিকে, এবং অতি বেগবান্ সে তীক্ষ্ণধার খড়্গ দিয়ে সিংহের মূর্ধায় আঘাত হেনে আঘাত ক'রল দেবীর বাম ভুজে।

দেবীর বাহুসংস্পর্শে সেই খড়্গ ভেঙে গেল, তখন সে ক্রুদ্ধ হয়ে গ্রহণ ক'রল শূল। সেই শূল, যা তেজে রবি-বিম্বের মতো জাজ্বল্যমান, নিক্ষেপ ক'রল মহাসুর আকাশ থেকে ভদ্রকালীর প্রতি। সেই শূল পতিত হ'তে দেখে দেবী মোচন করলেন তাঁর নিজ শূল। দেবীর শূলে তখন সেই শূল আর মহাসুর দুইই শতধা হয়ে গেল।

মহিষাসুরের মহাবীর্যবান্ চমূপতি এইভাবে হত হ'লে গজারূঢ় হয়ে অগ্রসর হ'ল ত্রিদশার্দন চামর। সেও নিক্ষেপ ক'রল দেবীর প্রতি শক্তি-অস্ত্র। অম্বিকা তখন অতি দ্রুত হুঙ্কার-শব্দে সেই শক্তিকে নিষ্প্রভ ক'রে ভূমিতে পাতিত করলেন। শক্তিকে এই প্রকারে ভগ্ন ও নিপতিত হ'তে দেখে ক্রোধসমন্বিত হয়ে চামর নিক্ষেপ ক'রল শূল। দেবীও বাণদ্বারা তা ছিন্ন ক'রে দিলেন।

তখন সিংহ উল্লম্ফন ক'রে গজ-কুম্ভ-মধ্যস্থিত সেই দেবশত্রুর সঙ্গে প্রবৃত্ত হ'ল প্রচণ্ড বাহুযুদ্ধে, এবং যুদ্ধমান তারা দুজনেই হস্তিপৃষ্ঠ হ'তে মাটিতে পড়ে গিয়ে যুদ্ধ করতে লাগলো অতি ক্রুদ্ধভাবে এবং অতি দারুণ প্রহার হেনে হেনে। সিংহ তখন বেগে আকাশে উঠে, পুনরায় নেমে এসে থাবার আঘাতে চামরের শির দেহচ্যুত ক'রল।

উদগ্রকে রণে দেবী শিলা ও বৃক্ষ দিয়েই নিহত করলেন। দন্তমুষ্টি ও করতলাঘাতে করালকে করলেন নিপাতিত। ক্রুদ্ধা হয়ে দেবী চূর্ণ করলেন গদাঘাতে উদ্ধতাসুরকে। বাস্কলকে বধ করলেন তিনি ভিন্দিপালের দ্বারা, এবং বাণদ্বারা বধ করলেন তাম্র ও অন্ধককে। উগ্রাস্য ও উগ্রবীর্যকে, এবং মহাহনুকেও ত্রিনেত্রা পরমেশ্বরী ত্রিশূল দিয়ে হত করলেন। বিড়ালাস্যের কায়া হ'তে শির অসি দিয়ে পৃথক্ করলেন। দুর্ধর ও দুর্মুখ উভয়কেই শরের দ্বারা যমালয়ে প্রেরণ করলেন।

এইরূপে স্বীয় সৈন্যক্ষয় হ'লে মহিষের রূপ ধারণ ক'রে মহিষাসুর দেবীর সৈন্যগণকে ত্রস্ত ক'রে তুলল। কাউকে মুখের আঘাতে, অপর কতককে ক্ষুরের আঘাতে, অন্যদের লাঙ্গুল বা শৃঙ্গাঘাতে বিদারিত ক'রে ফেলল। কাউকে দ্রুত ধাবনের বেগে, অপর কাউকে নাদ ও পরিঘূর্ণনে এবং নিশ্বাসের দ্বারা পাতিত ক'রে দিল সে ভূতলে।

প্রমথ-সৈন্যদের নিপাতিত ক'রে, সেই অসুর মহাদেবীর সিংহকে হত্যা করতে ধাবিত হ'ল। তখন অম্বিকা অতীব ক্রুদ্ধা হলেন। মহাবীর্যবান্ সে-ও মহীতলকে ক্ষুরাঘাতে বিদীর্ণ ক'রে শৃঙ্গের দ্বারা পর্বতসমূহ নিক্ষেপ করতে করতে গর্জন করতে লাগলো। তার বেগভ্রমণে বিক্ষুণ্ণা হযে মহী হলেন বিশীর্ণা, এবং লাঙ্গুলের তাড়নে আহত হয়ে সমুদ্র প্লাবিত ক'রল সকল স্থান। তার কম্পিত শৃঙ্গাঘাতে খণ্ড খণ্ড হযে গেল মেঘ। শ্বাসানিলে তার উৎপাটিত হ'ল শত শত পর্বত। ক্রোধ-সমুদ্দীপ্ত এইরূপ মহাসুরকে অতি দ্রুত আগমন করতে দেখে দেবী চণ্ডিকা তার বধের জন্য কুপিতা হলেন।

পাশ ছুড়ে দিযে তিনি বন্ধন করলেন সেই মহাসুরকে। সেও মহাযুদ্ধে এইরূপে বদ্ধ হযে ত্যাগ ক'রল মহিষের রূপ। তারপর সে ক্ষণমধ্যে পরিণত হ'ল সিংহে। এবং যখন অম্বিকা ছিন্ন করলেন তার শির, তখনই তাকে দেখা গেল খড়্গপাণি এক পুরুষরূপে। তখন দেবী শীঘ্রই এই পুরুষকে বাণদ্বারা ছিন্ন করলেন তার খড়্গচর্ম-সমেত। তখন সে ধারণ ক'রল মহাগজের রূপ। শুণ্ডের দ্বারা মহাসিংহকে আকর্ষণ করতে করতে সে গর্জন করতে লাগলো। আকর্ষণকারীর শুণ্ডটি দেবী খড়্গের দ্বারা কেটে ফেললেন।

অতঃপর সেই মহাসুর পুনরায় মহিষের বপু আশ্রয় ক'রে বিক্ষুব্ধ করতে লাগলো চরাচর সহিত ত্রিলোককে। এইবার ক্রুদ্ধা জগন্মাতা উত্তম সুরা পুনঃ পুনঃ পান ক'রে অট্টহাস্য করলেন অরুণ-লোচনা হয়ে। নিনাদ ক'রল সেই অসুর বল-বীর্য-মদোদ্ধত হয়ে, আর তার বিষাণদ্বয়ের দ্বারা নিক্ষেপ করতে লাগলো দেবী চণ্ডিকার প্রতি ভূধরসকল। দেবীও তার নিক্ষিপ্ত পর্বতসকল চূর্ণ করলেন শরবিস্তারে। মধুপানের মত্ততা-জনিত আরক্তিম মুখে ও বিজড়িত স্বরে তখন তিনি বললেন :

গর্জ গর্জ ক্ষণং মূঢ় মধু যাবৎ পিবাম্যহং।
ময়া ত্বয়ি হতেঽত্রৈব গর্জিষ্যন্ত্যাশু দেবতা॥

এই ব'লে তিনি লম্ফ দিয়ে আরূঢ়া হলেন মহিষাসুরে, এবং পদদ্বারা তার কণ্ঠ আক্রমণ ক'রে শূলের দ্বারা তাকে করলেন আঘাত। এইভাবে সেও পদ-নিপীড়িত হয়ে নিজ মুখ হ'তে অর্ধমাত্র নিষ্ক্রান্ত হ'ল। তখন সে দেবীর মহাবীর্যপ্রভাবে স্তম্ভিত হয়ে গেল। অর্ধনিষ্ক্রান্ত হবামাত্রই যুদ্ধরত সেই মহাসুর দেবীর মহা-অসির ঘায়ে ছিন্নশির হয়ে নিপাতিত হ'ল।

তারপর হাহাকার ক'রে সমস্ত দৈত্য সৈন্য ক'রল পলাযন। পরম আহ্লাদিত হয়ে উঠলেন দেবতারা। স্বর্গস্থিত সুরগণ মহর্ষিদের সহিত স্তব করতে লাগলেন দেবীকে। গান গেয়ে উঠল গন্ধর্বপতিগণ আর নৃত্য করতে লাগলো অপ্সরারা।

মহাশক্তি মহামায়া

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

শ্রীশ্রীচণ্ডী বলেছেন—

যচ্চ কিঞ্চিৎ কচিদ্বস্তু সদসদ্বাঽখিলাত্মিকে।
তস্য সর্বস্য যা শক্তিঃ সা ত্বং কিং স্তূয়সে তদা॥

অর্থাৎ হে বিশ্বের আত্মস্বরূপ মহাজননি! সৎ বা অসৎ, স্থাবর জঙ্গম, যত কিছু বস্তু আছে, সেই সব কিছুরই সমবেত শক্তি তুমি—তোমাকে স্তুতি করে কার সাধ্য?

ফলতঃ মহামায়াই সর্বশক্তির আধার।

হিন্দুর তন্ত্র-শাস্ত্র শক্তিরই প্রপঞ্চক। এমন কি বৌদ্ধধর্মও মহাশক্তিরই প্রপঞ্চনায় মুখর এবং শঙ্করও তাঁর অদ্বৈতবাদ-খ্যাপনে এই শক্তির মহামহিমা খ্যাপন করেছেন। অর্থাৎ শূন্যবাদ এবং অদ্বৈতবাদও মাতৃমহিমায় প্রোজ্জ্বল।

উত্তর-পূর্ব ভারতবর্ষ বৌদ্ধধর্মের 'হীনযান' দ্বারা প্রভাবিত হ'ল না; হ'ল অনেকটা 'মহাযান' দ্বারা, বিশেষতঃ 'বজ্রযান' দ্বারা। এই বজ্রযানেই তন্ত্রের আধিক্য। হীনযানীরা ব্যক্তিগত মুক্তিতে সন্তুষ্ট; মহাযানীরা পৃথিবীর সকলেরই মুক্তি চান। ভগবান্ অবলোকিতেশ্বর সুমেরু-পর্বতের চূড়ায় নির্বাণ-লাভের প্রাক্কালে মানবের করুণ আর্তনাদ শুনে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন—যতদিন পৃথিবীর শেষ জীবটি পর্যন্ত নির্বাণের অধিকারী না হবে, ততদিন পর্যন্ত তিনি নির্বাণ চান না। বলা বাহুল্য, 'করুণাবাদ'ই মহাযানের বৈশিষ্ট্য। এঁদের উদ্দিষ্ট নির্বাণপথে বোধিচিত্ত জীব পর পর দশভূমি অতিক্রম করবেন। এই দশভূমির নাম প্রমুদিতা, বিমলা, প্রভাকরী, অর্চিষ্মতী, সুদূর্জয়া, অভিমুখী, দূরঙ্গমা, অচলা, সাধুমতী ও ধর্মমেধা। বৌদ্ধতন্ত্রের এই দশভূমির অতিক্রমণের নিমিত্ত যে সাধনাধারা, তাতে ধ্যেয় বস্তুর সহিত ধ্যাতার একত্ব বা ঐক্য চিন্তন করতে হয়। বৌদ্ধতন্ত্রের ধ্যানবিধিতে এই 'আশ্রয়' অতিশয় প্রয়োজনীয়। শূন্যতার সঙ্গে করুণার সংমিশ্রণ ও অন্বয়। বৌদ্ধ-ধ্যানবিধি অনুসারে হৃদয়ের জ্যোতির্ময় পদ্মে 'আর্যতারা'র ধ্যান করতে হয়। সাধক ভাববেন যে, দেবীশরীরের জ্যোতি সাধকশরীরে সংক্রামিত হয়ে তা পুনঃ জগৎ ব্যাপ্ত করছে এবং ধ্যেয় দেবী পৃথিবীর সর্বত্র বিরাজমানা। সাধক সর্বদা নিজেকে এবং অপরকে নিত্যপূত জানবেন; সর্বশেষে সাধনদেবী ও জগৎ থেকে নিজকে অভিন্ন ভাববেন। উপসংহারের এই ভাবধারা শঙ্করের মজ্জাগত।

শঙ্কর-কৃত শক্তিতত্ত্বের ব্যাখ্যা তন্ত্রসম্মত। তন্ত্রমতে শক্তি সত্য এবং বেদান্ত-মতে মায়া মিথ্যা। শঙ্কর এই উভয় মতের অপূর্ব সমন্বয় সাধন করেছেন।

ব্রহ্মজ্ঞানীও শক্তি স্বীকার করেন; তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ ভগবান্ রামকৃষ্ণ পরমহংস! ব্রহ্মজ্ঞ তোতাপুরী জীবন্মুক্ত হয়েও শিষ্যের সংস্পর্শে এসে শক্তি স্বীকার করলেন।

ব্রহ্মজ্ঞানলাভের পরে যখন শংকর কাশীতে অবস্থান করছিলেন, তখন বিশ্বজননী শক্তি-স্বীকারের প্রয়োজনীয়তা তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন। ফলে শঙ্কর-কৃত 'সৌন্দর্যলহরী' শক্তি-তত্ত্বের একটি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থরূপে আমরা লাভ করি। 'দেব্যপরাধক্ষমাপন-স্তোত্রে' শঙ্কর দেবীকে শিবের উপরেও স্থান দিয়েছেন, যেমন:

কপালী ভূতেশো ভজতি জগদীশৈকপদবীম্।
ভবানি ত্বৎপাণিগ্রহণপরিপাটীফলমিদম্॥

অর্থাৎ শিব যে সমস্ত পৃথিবীর ঈশ্বর হ'তে পেরেছেন, তার কারণ শিব ভবানীর পাণি-গ্রহণে সমর্থ হয়েছেন। 'সৌন্দর্যলহরী'র প্রথম শ্লোকেই বলা হয়েছে যে, শিব সৃষ্টি-বিষয়ে তখনই সমর্থ, যখন তিনি শক্তির সঙ্গে যুক্ত হন, শক্তিরহিত তিনি স্পন্দনেও অসমর্থ— 'শিবঃ শক্ত্যা যুক্তো যদি ভবতি শক্তঃ প্রভাবিতুম্।
ন চেদেবং দেবঃ খলু কুশলঃ·········॥'

শঙ্করের মতে 'সর্বজ্ঞং সর্বশক্তিসমন্বিতং ব্রহ্ম'—ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিযুক্ত। শঙ্কর ব্রহ্মকে অপরিমিত শক্তি বা পরিপূর্ণশক্তি বলেছেন :

'অস্থাপ্যস্মাকম্ ইয়ং জগদ্বিম্বরচনা
গুরুতরসংরম্ভ ইবাভাতি,
তথাপি পরমেশ্বরস্য লীলা এব কেবলা
ঈয়মপরিমিতশক্তিত্বাৎ॥'

শঙ্কর ব্রহ্মের সর্বশক্তিমত্ত্ব থেকেই সর্বজ্ঞত্ব প্রমাণ করেছেন। সর্বশক্তিবাদের দিক থেকে জ্ঞানও একপ্রকার শক্তি। জ্ঞান-ক্রিয়া ঈশ্বরের স্বভাব বলে পুনরায় জ্ঞানও ক্রিয়া শক্তির বিকাশ বলে সগুণ ব্রহ্ম শক্তিস্বরূপ নিশ্চয়ই। শঙ্করের শক্তি-বাদ উপনিষৎ-সমর্থিত। শ্বেতাশ্বতর বলছেন :

পরস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ।
য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাদ্
বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি॥

অর্থাৎ ঈশ্বরের শক্তি বিবিধ, এবং তাঁর জ্ঞান, শক্তি ও কার্য স্বাভাবিক। তিনি বিবিধ শক্তিযুক্ত বলে এক থেকে বহু সৃষ্টি করেন। শঙ্কর বেদান্তসূত্রভাষ্যে (২।১।৩০) বলেছেন :

একস্যাপি ব্রহ্মণো বিচিত্রশক্তিযোগাৎ
উপপদ্যতে বিচিত্রবিকারপ্রপঞ্চঃ।

ইন্দ্রিয়াদিও ব্রহ্মশক্তি ব্যতীত স্ব-স্ব ক্রিয়া সম্পাদন করতে পারে না। শঙ্কর বৃহদারণ্যক উপনিষদের ভাষ্যে বলছেন : ব্রহ্মশক্ত্য-বিধিতানাং হি চক্ষুরাদীনাং দর্শনাদিসামর্থ্যম্। শঙ্কর বেদান্তসূত্রভাষ্যে (২।১।৩০) বলেন : তৎপুনরুপগম্যতে বিচিত্রশক্তিযুক্তিং পরং ব্রহ্মেতি। তদুচ্যতে সর্বোপেতা চ তদ্দর্শনাৎ। অর্থাৎ ঈশ্বরের সর্বশক্তিমত্তা উপনিষদ্ স্বীকার করেছেন; সেইজন্য এ-মতও গ্রহণযোগ্য। এত বড় যে অদ্বৈতাচার্য আদিশঙ্কর তিনিও মণিমন্ত্র-ঔষধাদির শক্তিতে বিশ্বাসী। তিনি বলেছেন : লৌকিকানামপি মণিমন্ত্রৌষধি-প্রভৃতীনাং দেশকালনিমিত্ত-বৈচিত্র্যবশাৎ শক্তয়ো বিরুদ্ধানেককার্যবিষয়া দৃশ্যন্তে।

ফলতঃ বটবৃক্ষ যেমন স্বীয় বৃক্ষাকৃতি বীজে সূক্ষ্মরূপে অবস্থান করে, তেমনি ব্রহ্মেও জাগতিক সমস্ত শক্তি নিহিত হয়ে আছে। আণবিক বোমার ক্ষুদ্র অণুর কত শক্তি। হোমিওপ্যাথি-মতে দ্রব্যের স্থূলাংশের হ্রাসেই শক্তিবৃদ্ধি। লবণকণা বা বালুকণা থেকে প্রস্তুত ঔষধ দুরারোগ্য রোগ অপসারণ করে। এই যদি হয়, তা হ'লে অনন্তশক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্মের শক্তিরাশি কে ধারণা করতে পারে? আমাদের ভারতীয় চিন্তাধারায় 'শক্তি-শক্তিমতোরভেদঃ'—শক্তি ও শক্তিমান্ অভিন্ন, যেমন অগ্নি ও দাহিকাশক্তি অভিন্ন। সুতরাং মানুষ অচিন্ত্য শক্তির ধারণা কি ক'রে করতে পারে? তাই বেদান্তের 'রত্নপ্রভা টীকা'য় টীকাকার বলছেন, 'যদা লৌকিকানাং প্রত্যক্ষদৃষ্টানামপি শক্তিরচিন্ত্যা, তদা শব্দৈকসমধিগম্যস্য ব্রহ্মণঃ কিং বক্তব্যম্'। মধ্বাচার্য বড় সুন্দর ক'রে বলেছেন, 'পরমাত্মনো বিচিত্রাঃ শক্তয়ঃ স্যুঃ। বিচিত্রশক্তিঃ পুরুষঃ পুরাণো ন চান্যেষাং শক্তয়স্তাদৃশা স্যুঃ।'

শঙ্কর অতি সুন্দর সিদ্ধান্ত করেছেন—'কারণস্য আত্মভূতা শক্তিঃ, শক্তেশ্চ আত্মভূতং কার্যম্।' —অর্থাৎ শক্তিই কারণের আত্মা, এবং কার্যরূপে প্রকাশিত সবকিছুই শক্তির প্রকাশ মাত্র। শঙ্কর অন্যত্র অতি স্পষ্টভাবে বলেছেনঃ ন তয়া (মায়য়া) বিনা পরমেশ্বরস্য স্রষ্টৃত্বং সিধ্যতি, শক্তিরহিতস্য তস্য প্রবৃত্তিরসম্ভবাৎ।

গীতা-মতে মায়া ঈশ্বরের শক্তি। ভগবান্ গীতায় বলেছেন, 'দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।' অদ্বৈতবেদান্তে মায়াকে 'অবিদ্যা' বলা হয়েছে। বাচস্পতি মিশ্র 'ভামতী'তে কি সুন্দর আলোচনা ক'রে দেখিয়েছেন যে, সাংখ্যের 'প্রকৃতি' ও বেদান্তের 'মায়া' এক জিনিস নয়। সাংখ্যের প্রকৃতি জড়—স্বতন্ত্র বস্তু। বেদান্তের মায়া স্বতন্ত্র বস্তু নয়—ব্রহ্মজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই তা তিরোহিত হয়। মায়া অনির্বচনীয়া, অব্যক্তা। শঙ্কর সুন্দরভাবে বলেছেন, 'সদসত্ত্যামনির্বাচ্যা মিথ্যাভূতা সনাতনী। অব্যক্তা হি সা মায়া তত্ত্বান্যত্ব-নিরূপণস্যাশক্যত্বাৎ'। তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত আর কিছুতেই এর নাশ হয় না। সত্য জ্ঞানকে মায়া ভয় করে। যে অজ্ঞ, সেই মায়ার অধীন। শঙ্কর তাই বলেছেন, 'পরমেশ্বরাশ্রয়া মায়ামযী মহাসুষুপ্তিঃ যস্যাং স্বরূপপ্রতিবোধ-রহিতা শেরতে সংসারিণো জীবাঃ।' মায়ামুক্ত জীবই শিব, মায়ামুক্ত জীব ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হয়।

ভারতীয় শাস্ত্র চিরকাল স্বীকার করেছেন, 'যমেবৈষ বৃণুতে, তেন লভ্যঃ।' সর্বশক্তিমান্ কৃপা করলেই উদ্ধার ক'রে নিতে পারেন। এমনি তো ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়। তাই চিরক্রিয়াশীলা শক্তির ইচ্ছাতেই মুক্তি সম্ভব হয়ে ওঠে। আজ ১৩৬৯ সালের পূজাবাসরে চির-কল্যাণময়ী ক্ষেমঙ্করীর কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি অশেষ কৃপা ক'রে দেশের ও দশের সকল দুঃখ, দৈন্য, ক্লেশ, ক্লেদ, পাপ, তাপ, শোক, দুঃখ দূর ক'রে দেন। চণ্ডীর ভাষায় জননীকে জানাই :

যয়া ত্বয়া জগৎস্রষ্টা জগৎপাত্যত্তি যো জগৎ।
সোঽপি নিদ্রাবশং নীতঃ কস্ত্বাং স্তোতুমিহেশ্বরঃ॥

শরতের সার্থকতা

'বৈভব'

শরত-সূর্য ঝলমল করে
নির্মল আকাশে;
স্বচ্ছ শিশির টলমল করে
চঞ্চল বাতাসে।

শুভ্র মেঘেরা খলখল করে—
হালকা হাসিতে ভাসে;
পাগল নদী যে কলকল ক'রে
চলে সাগরের পাশে।

বরষা-সিক্ত সাধনার পারে
শরতের পরশে
প্রকৃতি আজিকে পূর্ণ যেন রে
সার্থক হরষে।

* *
*

পূর্ব-পশ্চিম দিগন্তে বিবেকানন্দ

ডক্টর শ্রীকালিদাস নাগ

৪ঠা জুলাই ১৯০২ খৃঃ স্বামী বিবেকানন্দ দেহত্যাগ করেন, তখন তাঁর বয়স ৩৯॥ বছর মাত্র। ভারতের পক্ষে সে যে কত বড় ক্ষতি, তা আমরা এখনও বুঝিনি। তাঁর শতবার্ষিকী 'স্মারক-গ্রন্থে' ইংরেজীতে এ-বিষয়ে আলোচনা করেছি; আর 'উদ্বোধনে' ঘরোয়াভাবে কতকগুলি প্রশ্ন আজ তুলছি। স্বামীজীর মূল্যবান্ 'পত্রাবলী'র পরিবর্ধিত সংস্করণ ছেপে তাঁরা আমাদের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হয়েছেন, তাই উদ্বোধনেই আমার প্রশ্ন তুলি :

নরেন তাঁর পিতামাতার সঙ্গে ১৪।১৫ বছর বয়সে কলকাতা ছেড়ে রায়পুরে যান ও সে-কালের মধ্যপ্রদেশে কোন্ স্কুলে কোন্ শিক্ষকদের কাছে পড়েন (১৮৭৭-৭৮), তার সন্ধান মিলেছে কি? পিতা বিশ্বনাথ দত্ত ও মাতা ভুবনেশ্বরী দেবীর চিঠিপত্র ও অন্য কিছু কাগজপত্র পাওয়া গেছে কি? গৌরমোহন মুখার্জি রাস্তায় যে বড় বাড়ি তাঁদের ছিল, Partition-মামলার ফলে তার অনেকখানি হাত-ছাড়া হয়ে যায়, F. A. Class-এ ভরতি হবার সময় নরেন দত্ত ও নীলরতন সরকার 'বিদ্যাসাগর' মহাশয়ের কলেজে কিছুদিন পড়েন—সে-কথা 'উদ্বোধনে'র মাঘ-সংখ্যায় লিখেছি। কিন্তু তখন Metropolitan কলেজের অধ্যাপক কে কে কোন্ কোন্ বিষয় ছাত্রদের পড়িয়েছিলেন, তার সন্ধান এখনও মেলেনি।

১৯০৮ খৃঃ সেই কলেজে আমি যখন পড়া শুরু করেছি, তখনও মনীষী নগেন্দ্রনাথ ঘোষ (N. N. Ghosh, Bar-at-Law) অধ্যক্ষ, তথা ইংরেজীর অধ্যাপক; হয়তো তিনিই 'নরেন্দ্র'কে ইংরেজী সাহিত্যের পাঠ দেন! পণ্ডিতপ্রবর কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য হয়তো সংস্কৃত পড়িয়েছিলেন; বরানগরের 'মঠ' থেকে লেখা চিঠিতে পড়ছি—বিবেকানন্দ পাণিনি ব্যাকরণ চাইছেন।

General Assembly কলেজে গিয়ে নরেন্দ্র যুক্ত হন প্রতিভাধর সতীর্থ ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের সঙ্গে। তিনি ও নরেন্দ্র Dr. W. Hastie (১৮১৯-৮৪) সাহেবের অধ্যক্ষতায় মিশনরী কলেজের শ্রেষ্ঠ ছাত্র ব'লে নাম রেখে আসেন। ব্রজেন্দ্রনাথের গণিতে ও দর্শনে সমান প্রগাঢ় অধিকার ছাড়া ইংরেজীতে 'Quest Eternal' (বহুদিন পরে প্রকাশিত) কাব্যের কিছু অংশ কলেজের ছাত্ররূপে ব্রজেন্দ্রনাথ (যুগান্তরে আমার প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য) লেখেন। তাঁর সতীর্থ ও সুহৃৎ নরেন্দ্রনাথ ইংরেজী গদ্য-রচনাতে অগ্রণী ছিলেন। তদুপরি Indo-Anglian কবিতা-রচনায় শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁর দাদা মনোমোহন ঘোষের মতো ইংরেজী-কবিতা লিখতেন।

আধ্যাত্মিক (Metaphysical) কবিতার সূত্রপাত এঁদের রচনায় দেখি, কিন্তু আজও এর তুলনামূলক সমালোচনা কেউ করেননি, শুধু শ্রীঅরবিন্দের 'সাবিত্রী' কাব্য যেন কীর্তিস্তম্ভ হয়ে আছে; তার সঙ্গে পড়তে হবে কবি বিবেকানন্দের 'Song of the Sannyasin'—যার সুনিপুণ অনুবাদ ক'রে গেছেন স্বামী শুদ্ধানন্দ, 'Kali the Mother'-এর অনুবাদ করেছেন কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। এত ভাল ক'রে কোন্ কোন্ অধ্যাপক নরেন্দ্র-ব্রজেন্দ্রকে ইংরেজী গদ্য ও পদ্য

রচনা শিখিয়েছিলেন ? এ-সব সন্ধান করতে বলি Scottish Church College (পূর্ব নাম General Assembly)-এর ছাত্রদের।

সেকালের বাগ্মিশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন ঠাকুর রামকৃষ্ণকে 'God-intoxicated' ব'লে চিনেছিলেন, তাঁর 'কথা' নববিধান-সমাজের দুজন আচার্য গিরীশচন্দ্র সেন (বাংলায়) ও প্রতাপচন্দ্র মজুমদার (ইংরেজীতে) প্রথম ('শ্রীম'-র আগে) প্রকাশ করেন। কেশব-রচিত 'নব বৃন্দাবন'-নাটকে নরেন্দ্র অভিনয় করেছিলেন ও 'সঞ্জীবনী'-সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্রের বিবাহ-সভায় নরেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের 'দুই হৃদয়ের নদী' গানটি গেয়েছিলেন ('সুরের গুরু রবীন্দ্রনাথ' দ্রষ্টব্য)। শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর থেকে এসে ব্রাহ্মসমাজে নরেনের উদাত্তকণ্ঠে গাওয়া ব্রহ্মসঙ্গীত শুনতেন, সে-কথা লিপিবদ্ধ হয়েছে, কিন্তু ভক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও 'চিরঞ্জীব শর্মা' (ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল) প্রভৃতি-রচিত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত আজ প্রায় সকলে ভুলতে বসেছে! তাই কলাবিৎ বিবেকানন্দের শতবার্ষিকী উপলক্ষে—রামপ্রসাদ থেকে চিরঞ্জীব পর্যন্ত সব উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের নূতন ক'রে চর্চা ও লুপ্ত রত্নোদ্ধার প্রয়োজন।

দক্ষিণেশ্বর থেকে রামকৃষ্ণপুর (হাওড়া) এবং বাগবাজার থেকে এদিকে হেদুয়া ও ওদিকে কাশীপুর পর্যন্ত যত ভক্তসমাগমে গানের জলসা হ'ত, তার নির্ভরযোগ্য তালিকাও করা হয়নি ; অথচ ঠাকুর রামকৃষ্ণ নিজে বহু অধ্যাত্ম-সঙ্গীতের 'উদ্ধৃতি' দিয়ে গেছেন।

১৮৮৪ খৃঃ কেশবের অকালমৃত্যুতে মর্মাহত হয়ে রামকৃষ্ণদেব নিজে 'কমলকুটীরে' এসে-ছিলেন, মহারানী সুচারু দেবী সে-কথা ব'লে গিয়েছেন। গত বৎসর বালেশ্বর থেকে ময়ুরভঞ্জ ব্রাহ্মসমাজে গিয়ে সে-সব কথা ব'লে এসেছি।

১৮৭৮ খৃঃ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হ'লে নরেন্দ্র দত্ত তার সদস্য হন—পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী 'Men I have Seen'-পুস্তকে সে-কালের কথা লিখে গেছেন। তখন কেশব-ভক্ত প্রতাপ মজুমদারও প্রথম বার মার্কিন দেশে (১৮৮৩) গিয়েছিলেন। তার দশ বছর পরে কলকাতার মজুমদার ও স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগো ধর্মমহাসভায় (Chicago Parliament of Religions) আবির্ভূত হন ; 'New Dispensation' ও 'Indian Mirror' প্রভৃতি পত্রিকায় মজুমদার-বিবেকানন্দ সংঘর্ষের জের চলেছিল, কিন্তু আসল কারণ স্পষ্ট বোঝা যায় না।

এটর্নী বিশ্বনাথ দত্তের মৃত্যুর পর (১৮৮৪) পুত্র নরেন দত্ত সসম্মানে B.A. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পারিবারিক অর্থ-সংকট দূর করতে পিতৃবন্ধু এটর্নী নিমাই বসুর কোম্পানিতে কাজ করেন ; B.L. পরীক্ষা না দিলেও তিনি আইন পড়েছিলেন। কিন্তু অর্থোপার্জনের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আত্মোৎসর্গ করেন এবং এ-বিষয়ে জননী ভুবনেশ্বরী দেবীর অনুমতি লাভ করেন, সে-কথা আমরা জেনেছি। শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের (১৮৮৬) পর 'গুরুভাই'দের নিয়ে বিবেকানন্দ কি কঠোর তপস্যা করেছিলেন ও দেশ-বিদেশে ভ্রমণ ক'রে (১৮৮৮-৯৩) বিবেকানন্দ-রূপে বিশ্ববিশ্রুত হন, সেটি স্মরণ করাবে তাঁর 'শতাব্দী-গ্রন্থমালা'।

বিবেকানন্দ দেশে ও বিদেশে ৩৯ বছর বয়সের মধ্যে কত বিভিন্ন দেশে ও বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে গেছেন, তার পূর্ণ সন্ধান এখনও বাকি আছে। বাংলা ও কলকাতার

ইংরেজী পত্রিকাগুলি খুঁজলে এখনও অনেক নূতন তথ্য মিলবে। 'Bengali'-পত্রিকায় প্রকাশিত খবর: স্বামী বিবেকানন্দের তিরোধানের পর প্রথম যে স্মারক-সভা কলকাতায় হয়, তার সভাপতি ছিলেন নিজে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; শ্রীরামকৃষ্ণ-শতাব্দী সভায় ৭৬ বছর বয়সে একদিন তিনি সভাপতিত্ব করেছিলেন, আমি তাঁর সেই ইংরেজী ভাষণের অনুবাদ দিয়েছি 'বসুমতী' পত্রিকায়।

ক্ষেত্রীর মহারাজা স্বামীজীর স্নেহধন্য শিষ্য ছিলেন, তাঁর দরবার থেকে হিন্দীতে একখানি বড় বই লেখা হয়, তার খবরও কলকাতায় অনেকে রাখেন না। মহীশূরের মহারাজাও স্বামীজীর অনুরাগী ছিলেন, কিন্তু ২।৪টি চিঠিপত্র ছাড়া 'কানাড়ী' পত্রিকায় খোঁজ করা হয়নি। কন্যাকুমারিকায় বিবেকানন্দ তীর্থ-যাত্রা করেন, কিন্তু 'কেরল' পত্রিকাগুলি ভাল ক'রে দেখা হয়নি।

কাশ্মীর-পঞ্জাবে তথা উত্তরপ্রদেশে স্বামী বিবেকানন্দ একাধিকবার গিয়েছিলেন; তাই তাঁর স্মারক Album-সমেত 'বিবেকানন্দ-তীর্থ-পরিক্রমা' সযত্নে সংগ্রহ করা উচিত। আর 'তামিল' পত্রিকাদি থেকেও নূতন তথ্য আমাদের পেতে হবে; কারণ ৮৫বর্ষ-প্রবীণ ডক্টর রামস্বামী আয়ার সেদিন ব'লে গেছেন, প্রধানতঃ রামনাদের রাজা ও তামিল-ভক্তদের দ্বারা স্বামীজীর আমেরিকা-যাত্রার পাথেয় সংগ্রহ (১৮৯৩) করা হয়েছিল।

'শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ'-প্রচার তামিল ভাষায় ও তামিল দেশে সর্বাপেক্ষা ব্যাপকভাবে হয়েছিল, তাই প্রথম পত্রিকা 'ব্রহ্মবাদিন্' স্বামীজীর আমেরিকায় রচনা ও ভাষণাদি প্রথমে ছাপেন দক্ষিণ ভারতে (১৮৯৬-৯৭)। তারপর 'উদ্বোধন' ও 'প্রবুদ্ধ ভারত' (১৮৯৭-৯৮) দুটি প্রসিদ্ধ পত্রিকা স্বামী বিবেকানন্দ নিজে প্রতিষ্ঠা ক'রে গেছেন, সেজন্য নিখিল ভারতীয় সম্পাদক-সমিতির কর্তব্য স্বামীজীকে অর্ঘ্যদান করা। সৌভাগ্যক্রমে 'উদ্বোধন' ও 'প্রবুদ্ধ-ভারত'—উভয় পত্রিকাই ৬০ বছরের অধিককাল প্রকাশিত হয়ে 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ'-কথা প্রচার ক'রে চলেছে; সমকালীন 'নব্য-ভারত', 'প্রবাসী' ও 'Modern Review' প্রভৃতিও তাঁদের কথা ও ভগিনী নিবেদিতা (১৮৬৬-১৯১১)-রচিত বহু মূল্যবান্ প্রবন্ধ ছেপেছেন।

১৮৯৭-৯৮ খৃঃ গঙ্গার উপরে ৭৭ একরের কিছু বেশী জমি ক্রয় ক'রে বেলুড়ে 'শ্রীরামকৃষ্ণ-কেন্দ্র' স্থাপন ক'রে তার আবেদন-পত্র (Appeal) বিবেকানন্দ নিজে লেখেন। তিনিই শ্রীসারদাদেবীকে বেলুড়ে নিয়ে যান; এবং মঠ স্থাপনা ক'রে গুরুভাই স্বামী ব্রহ্মানন্দকে মঠের প্রথম সভাপতি-পদে অভিষিক্ত করেন। কারণ তিনি যেন বুঝেছিলেন, তিনি হঠাৎ চলে যাবেন: I am getting ready to depart (Aug. 1896). মহাযাত্রার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি!—লিখেছিলেন Mary Hale-কে, এবং নিবেদিতাও শুনেছিলেন (১৮৯৮) 'I have hugged the form of Death!' মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখী হয়ে লড়েছি, 'like a lion caught in the net'—যথার্থ 'বেদান্ত-কেশরী'ই বটে।

বিবেকানন্দের পাশ্চাত্য 'জীবনী'র বহু নূতন উপাদান সংগ্রহ ক'রে শ্রীমতী মেরী লুই বার্ক (Burke) যে বিরাট গ্রন্থ লিখেছেন, তেমনি নিবেদিতার আয়ারল্যাণ্ড ও ইংলণ্ডে তথা ভারতে বিক্ষিপ্ত মালমশলা সংগ্রহ করা দরকার। শ্রীরামকৃষ্ণ- (১৮৩৬-১৮৮৬) ও বিবেকানন্দ- (১৮৬৩-১৯০২) জীবনী

'ফরাসী' ভাষায় মনীষী Romain Rolland (১৮৬৬-১৯৪৪) লিখে আমাদের চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ ক'রে গেছেন। ভগিনী নিবেদিতারও জন্মশতাব্দী (১৮৬৬-১৯৬৬) আগতপ্রায়; তাই পূর্ব ও পশ্চিমের যাবতীয় তথ্য সন্ধান ও সংগ্রহ ক'রে ছাপা হোক—আমার এই প্রার্থনা জানালাম। মাদাম রলাঁ বন্ধুভাবে আমাকে এ-বিষয়ে অনুরাধ করেছেন, এবং তিনি Vivekananda Centenary কমিটির Vice-President বলেই জানালাম যে তিন বছর ধরে ১৯২৭-৩০ রলাঁ বহু পত্রাদি শ্রীমৎ শিবানন্দ ও তাঁর অন্য সহযোগীদের লিখে গেছেন; তার মূল ফরাসী কপি প্যারিস-কেন্দ্রে পাঠালে মাদাম্ রলাঁ Vivekananda and Rolland গ্রন্থ প্রকাশ করবেন, যেমন তিনি Tagore and Rolland (১৯৬২) প্রকাশ করেছেন।

১৮৯৭-১৯০২ তিরোধানের পূর্বে এই পাঁচটি বছরে স্বামীজী পূর্ব ও পশ্চিমকে মেলাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা ক'রে গেছেন। তাই UNESCO East-West Major Project স্থির করেন কলকাতার রামকৃষ্ণ মিশন Institute of Culture-ভবনেই আলোচনা-সভা হোক সেখানে Vivekananda Hallই আর এক Parliament of Religions আহ্বান-কেন্দ্র রূপে কাজ করবে। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার ১২টি কেন্দ্র তথা ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানি প্রভৃতি দেশ যেখানে বিবেকানন্দ গিয়েছিলেন, সেই সব দেশের বেদান্ত-কেন্দ্রগুলি থেকেও বহু মনীষী শতাব্দী-উৎসবে যোগ দিতে আসবেন। তাঁদের উপযুক্ত সম্বর্ধনার জন্য আমাদের প্রস্তুত হ'তে হবে। তার সঙ্গে প্রয়োজন Congress of the History of Religions, যার ১৯০০ খৃঃ প্যারিস-অধিবেশনে স্বামী বিবেকানন্দ Dr. J. C. Bose, Patrick Geddes ও নিবেদিতার সঙ্গে প্যারিসে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন; রিপোর্ট দুর্ভাগ্যক্রমে অতি সংক্ষিপ্ত—হয়তো ফরাসীতে বড় ক'রে ছাপা হয়েছে। বিজ্ঞান-বিষয়ে স্বামীজীর কত অনুরাগ! তাই আধ্যাত্মিক ভিত্তির ওপর সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে Technology-ও শেখানো উচিত, সে-কথা তিনি ব'লে গেছেন; তাই বেলুড়ে বিবেকানন্দ-বিশ্ববিদ্যালয়ে তার ব্যবস্থা হচ্ছে। ভবিষ্যদ্-দ্রষ্টা ও জাতির শিক্ষক, পূর্ব-পশ্চিমের সংযোগ-সেতু স্বামী বিবেকানন্দকে সমগ্র জাতির হয়ে আজ কৃতজ্ঞতা ও প্রণতি জানাই।

সমাজতন্ত্রবাদ ও স্বামী বিবেকানন্দ

অধ্যাপিকা শ্রীমতী সান্ত্বনা দাশগুপ্ত

সাম্প্রতিক দৃষ্টিতে বিবেকানন্দের সমাজতন্ত্রবাদ

স্বামী বিবেকানন্দ কোন একস্থলে বলেছেন, 'I am a Socialist'[১] আমি একজন সমাজতন্ত্রবাদী। এই কথাটি বর্তমান সময়ে বহু বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে। কারণ স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন একজন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী অর্থাৎ প্রাচীন ভারত কর্তৃক নির্দেশিত আধ্যাত্মিক জীবনের যে-পথ, তিনি ছিলেন সেই পথেরই পথিক। এবং তিনি ছিলেন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের একান্ত অনুগত শিষ্য, যিনি তাঁর সমগ্র জীবন ধরে একের পর এক ধর্ম-সাধনা ক'রে গিয়েছিলেন। তিনি নিজেও বলেছেন, তিনি তাঁর কর্মজীবনে যা কিছু করেছেন—'মিশন'-স্থাপন, পাশ্চাত্যে বেদান্ত-প্রচার—এ-সকল 'প্রভুর ইচ্ছানুযায়ী'। আবার এই ব্যক্তিই স্বমুখে ঘোষণা করেছেন, 'I am a Socialist', কথাটি সত্যি বিভ্রান্তিকর। কারণ সমাজতন্ত্রবাদের ইতিহাস অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে, সেই 'সাইমন' প্রভৃতি মুষ্টিমেয় কয়েকজন খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী ধর্মযাজক ব্যতীত যাঁরাই সমাজতন্ত্রবাদে আস্থা প্রকাশ করেছেন, তাঁরা সকলেই নিরীশ্বরবাদী ও ধর্মদ্রোহী। এবং বর্তমানে এই সকল 'Christian Socialist'-গণ সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে 'অবৈজ্ঞানিক' ও 'রোমান্টিক' এই অপবাদে ভূষিত হয়ে অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে আছেন, 'সমাজতন্ত্রী' ব'লে কেউই তাঁদের বিশেষ গণ্য করেন না। তার উপর আবার বিবেকানন্দ যে ধর্মমত জগতে প্রচার করেছেন, তার মূল তত্ত্ব হ'ল 'মায়াবাদ', যা বলে 'তিনকালে এ জগতের কোন অস্তিত্ব নেই'। অতএব তাঁর মতো ব্যক্তির নিজেকে সমাজতন্ত্রবাদী ব'লে ঘোষণা করবার তাৎপর্য কি?

এই প্রশ্নটি সম্পর্কে আমাদের দেশবাসিগণ অতি-সম্প্রতি সচেতন হয়েছেন, পাশ্চাত্যদেশে এখনও এ-বিষয়ে কোন প্রশ্ন উঠেছে ব'লে মনে হয় না। বিবেকানন্দের 'সমাজ-চিন্তা' অপেক্ষা তাঁর ধর্ম-চিন্তাই তাঁদের মধ্যে অধিকতর ঔৎসুক্যের সৃষ্টি করেছে। এর কারণ হয়তো ধর্মের অভাবই তাঁরা আজ অধিক পরিমাণে অনুভব করছেন, তাঁদের বর্তমান সভ্যতা ও কৃষ্টির এই দিকের শূন্যতা পূর্ণ করতেই তাঁরা ব্যস্ত। এ-বিষয়ে সঠিক কারণ নির্দেশ করা আজও সম্ভব নয়।

সে যাই হোক, আমাদের দেশ স্বাধীনতা-লাভের পূর্বে এই প্রশ্নটি নিয়ে খুব বেশী মাথা ঘামায়নি। তখন বিবেকানন্দকে অনেকে জাতীয়তাবাদের গুরু হিসাবেই দেখেছেন। কালের প্রয়োজনবশতঃ স্বাধীনতা-আন্দোলনের আদিযুগে ভারতে জাতীয়তাবাদেরই প্রভাব বেশী ছিল। স্বামী বিবেকানন্দ ভারতীয় ভাবধারার গৌরবময় ঐতিহ্য লোকচক্ষুর সামনে তুলে ধরেছিলেন, পরাধীনতার হীনতাবোধে নতমস্তক মুহ্যমান ভারতকে সেই হীনতাবোধের ঊর্ধ্বে মাথা তুলে দাঁড়াতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। যার ফলে ভারতের জাতীয় সংগ্রাম এক অপূর্ব প্রেরণা লাভ করেছিল। সেইজন্য স্বদেশপ্রেমের

১ Letters of Swami Vivekananda p 341

এই উদ্গাতাকেই তখন তারা তাদের পূজার্ঘ্য নিবেদন করেছিল। কিন্তু আজ সে কাল উত্তীর্ণ, স্বাধীনতা অর্জন ক'রে স্বাধীন ভারতের নাগরিক হিসাবে আজ আমরা জগতের সামনে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়েছি। কাজেই জাতীয়তাবাদ আজ আর আমাদের জাতীয় জীবনের কর্মে স্বপ্নে ধ্যানে প্রেরণারূপে পূর্বের মতো কাজ করে না।

তাছাড়া জাতীয়তাবাদের আরও একটা রূপ আছে, সাম্রাজ্যবাদ বা 'imperialism'। ধনতন্ত্রবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত সঙ্কীর্ণ *জাতীয়তাবাদ সাম্রাজ্য বিস্তার* করতে উদ্বুদ্ধ করেছে শক্তিশালী ও অর্থনৈতিক জীবনে অগ্রসর জাতিগুলিকে। জাতীয়তাবাদের এই ভূমিকা আমাদের চোখে পড়েছে, এবং এজন্য আমরা অনেকেই আজ কোন কোন পাশ্চাত্য চিন্তানায়কদের[২] মত অনুসরণ ক'রে জাতীয়তাবাদকে বিসর্জন দিতে চাইছি। স্বাধীনতালাভের কিছুকাল পূর্ব থেকেই ভারতে জাতীয়তাবাদের প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছে। প্রধান কারণ অবশ্য আমাদের দুঃসহ দারিদ্র্য। এ প্রতিক্রিয়া চিন্তার ক্ষেত্রে এবং রাজনীতিক দল গঠনের[৩] ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়। সাম্রাজ্যবাদের প্রতিক্রিয়া-স্বরূপই একদিন তথাকথিত 'বৈজ্ঞানিক সমাজ-তন্ত্রবাদ' জন্ম নিয়েছিল ইওরোপখণ্ডে। আমাদের দেশেও প্রতিক্রিয়ার এই বিশিষ্ট ঢেউটি এসে পৌঁছেছে ও সমাজতন্ত্রবাদকে গ্রহণ করতে দেশ এগিয়ে এসেছে।

ঠিক এই সময়ে কাল-প্রয়োজনেই সম্ভবতঃ আমাদের দৃষ্টি পড়ে স্বামী বিবেকানন্দের সমাজ-চিন্তার উপর। আমরা লক্ষ্য করলাম যে, এই 'সমাজ-চিন্তা' কতকগুলি বিচ্ছিন্ন ভাব নয়, তাদের মধ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি সমাজ-দর্শন উঁকি দিচ্ছে এবং এক অভিনব সাম্যবাদ সেখানে প্রতিষ্ঠিত। সর্বশেষে আমরা সন্ধান পেয়েছি স্বামীজীর উপরি-উক্ত চাঞ্চল্যকর উক্তিটির—'আমি একজন সমাজতন্ত্রবাদী'।

আমরা কিন্তু এ উক্তির দ্বারা প্রথমে বিভ্রান্তই হয়েছি। কারণ সন্ন্যাসীর জীবন-দর্শন —সংসার-ত্যাগ, মায়ারাহিত্য ইত্যাদির সঙ্গে তাঁর এ-উক্তির সামঞ্জস্য কোথায়? এ কি *পরস্পর-বিরোধী কথা ও আচরণ নয়? এ নিয়ে* গভীর সমস্যায় পড়ে যান ভারতীয় সমাজ-দার্শনিকগণের অনেকে।

লোকান্তরিত শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার মহাশয় বোধহয় সর্বপ্রথম স্বামীজীর সমাজতান্ত্রিক চিন্তা-সম্পর্কে সচেতন হন।[৪] তিনিও এ-সমস্যার সমাধান না করতে পেরে শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে, বিবেকানন্দ হলেন 'Christian Socialist'-দের সমগোত্র, তিনি হলেন একজন 'Romantic Socialist'। ভক্ত সন্ন্যাসী হিসাবে হৃদয় দিয়ে তিনি দরিদ্রের ব্যথা অনুভব ক'রে দরিদ্রের ভাগ্যোন্নতি যে-পথে সে-পথকে আহ্বান জানিয়েছিলেন এইমাত্র। কোনরূপ বৈজ্ঞানিক যুক্তিসিদ্ধ নয় তাঁর মত। তবে বিবেকানন্দের বিচ্ছিন্ন উক্তিই যে পরবর্তী কালে ভারতীয় সমাজতন্ত্রবাদকে উদ্বুদ্ধ করেছে—এ-বিষয়ে তিনি স্থিরবিশ্বাসী ছিলেন।

অপর একজন ভারতীয় সমাজশাস্ত্রবিৎ ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত[৫] তাঁর 'Vivekananda,

---

২ মার্ক্স ও তাঁর অনুসরণকারিগণ।

৩ বহু সমাজতন্ত্রবাদী রাজনীতিক দল এই কালে স্থাপিত হয়।

৪ 'Greetings to Young India' দ্রষ্টব্য। 'Creative India' ও অন্যান্য গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

৫ ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত স্বামী বিবেকানন্দের অনুজ।

the socialist' এবং 'Vivekananda, the Patriot-prophet of India' নামক বিখ্যাত গ্রন্থদ্বয়ে অবশ্য অন্য রকম অভিমত দিয়েছেন। ডক্টর দত্ত দ্বিতীয় গ্রন্থখানির মুখবন্ধে বলেছেন :

One cannot but admit that Swamiji was saturated with the ideas of the social revolutionaries of the west··· one will be surprised in reading that Swamiji has not only used Marx's phrase, that 'the poor are getting poorer and the rich are getting richer', but he has also spoken about the 'proletarian' culture.

এ ছাড়া ডক্টর দত্তের মতে যখন রাশিয়াতে বলশেভিক দলের সৃষ্টি হয়নি, তখনই স্বামীজী স্থির জেনেছিলেন যে, পরবর্তী সমাজবিপ্লব ঘটবে রাশিয়া কিংবা চীন দেশে। সত্য সত্যই ১৮৯৬ খৃঃ স্বামীজী তাঁর শিষ্যা সিস্টার ক্রিষ্টিনকে বলেছিলেন[৬] :

The next upheaval that is to usher in another era, will come from Russia or China. I cannot see clearly which, but it will be either the one or the other. Again, the world is in the third epoch under the domination of Vaisya (the merchant). The fourth epoch will be under that of the Sudra (the proletariat).

এই উক্তি হ'তে প্রতীয়মান হয় যে, রাশিয়া ও চীনে মহাবিপ্লবের সম্ভাবনা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। ডক্টর দত্ত এই উক্তির উল্লেখ ক'রে বলেছিলেন যে, এ-কথা বিবেকানন্দ বলেছেন কখন? না, যখন লেনিন শ্রমিক-একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেননি। ডক্টর দত্তের ভাষায় :

And this prophecy was made long before Lenin perhaps had the idea of establishing a proletarian classless state in Russia or before Mao Tse Tung was born.[৭]

ডক্টর দত্তের মতে স্বামীজী ভারতেও এই সমাজ-বিপ্লব চেয়েছিলেন। Swami Vivekananda wanted the reformation of the Indian Society root and branch (P.11)। এই আমূল পরিবর্তন বলতে বিপ্লব ছাড়া আর কি বোঝায়? স্বামীজী স্পষ্ট করেই তো বলেছেন :

Yet a time will come, when there will be the rising of the Sudra class with their Sudra-hood ; it will gain absolute supremacy in every society.[৮]

এই সকল উদ্ধৃতি উদ্ধার ক'রে ডক্টর দত্ত সিদ্ধান্ত করেছেন যে, স্বামীজী পাশ্চাত্যের সমাজবাদীদের মতোই বিপ্লবের স্বপ্ন দেখে গিয়েছেন। ডক্টর দত্ত অবশ্য 'মার্ক্সবাদী' কথাটি ব্যবহার করেননি, তিনি বলেছেন, 'Social revolutionaries of the west'। কিন্তু পাশ্চাত্যের এই 'Social revolutionaries' বলতে বোঝায় Anarchist, Socialist এবং Communistদের। এবং এরা সকলেই কম-বেশী মার্ক্সপন্থী। যাই হোক, ডক্টর দত্তের সিদ্ধান্ত—স্বামীজী এঁদের সমগোত্রীয়। এজন্য যে-সকল মার্ক্সবাদী স্বামীজীকে

---

৬ Memoirs—Sister Christine (quoted by R. Rolland in 'Life of Swami Vivekānanda')

৭ Patriot-prophet—Introduction

৮ 'Modern India'—Swami Vivekananda

'প্রতিক্রিয়াপন্থী' ব'লে অভিহিত করেছেন, ডক্টর দত্ত তাঁদের তীব্র সমালোচনা করেছেন। এই সকল সমাজতন্ত্রবাদিগণ পুরোপুরি বিদেশী প্রভাবে প্রভাবিত বিপ্লবপন্থী সাম্যবাদী। মার্ক্সবাদী একটি সাময়িক পত্রে কয়েক বৎসর পূর্বে (সম্ভবতঃ ১৯৪৯ খৃঃ) 'স্বামী বিবেকানন্দের মত ও পথ' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে এঁদের মত সুন্দররূপে ব্যক্ত হয়েছে। এঁদের মতে মার্ক্সবাদ বলে:

ধর্ম একটি মধ্যযুগীয় কুসংস্কার মাত্র, যা অত্যাচার ও শোষণের যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। ভারতে ইংরেজী-শিক্ষার আদিযুগে যখন নাস্তিকতা খুব প্রসার লাভ করেছিল ইংরেজী-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে, তখনই মধ্যযুগীয় এই কুসংস্কার হ'তে মুক্ত হয়ে ভারত অগ্রগতির পথে পদক্ষেপ করেছিল। কিন্তু এই সময়ে হিন্দু-প্রতিক্রিয়া-আন্দোলন দেখা দেয়। নাস্তিকতা দূরে গিয়ে ধর্মভাবের পুনঃপ্রতিষ্ঠা এঁদের মতে প্রতিক্রিয়া আন্দোলন ছাড়া আর কি? এই প্রতিক্রিয়া-আন্দোলনের তিনজন পুরোহিত: বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ।

ডক্টর দত্ত এঁদের মতকে খণ্ডন করেছেন। তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন যে, স্বামীজী ধর্ম-বিশ্বাসের দিক থেকে যাই হোন না কেন, তিনিও একজন বিপ্লবপন্থী সমাজতন্ত্রবাদী। এবং তিনি প্রগতিশীল, প্রতিক্রিয়াপন্থী বা 'Counter revolutionary' মোটেই নন। এবং মার্ক্সীয় পন্থা বা কার্যক্রমকেই তিনি অভিব্যক্ত করেছেন।

ডক্টর দত্ত কর্তৃক ব্যাখ্যাত স্বামী বিবেকানন্দের সমাজতন্ত্রবাদ মার্ক্সগোত্রীয়। কারণ এর মূল উদ্দেশ্য শ্রমিক-শাসিত শ্রেণী-বিহীন সমাজপ্রতিষ্ঠা। তার উপায় শূদ্রবিপ্লব। তা শুধু নয়, স্বামীজী মার্ক্স-এর ভাষাও কিছু পরিমাণে ব্যবহার করেছেন। তা ছাড়া স্বামীজী পাশ্চাত্য দেশে গিয়ে অন্যতম সমাজতন্ত্রী প্রিন্স ক্রপটকিন (Prince Kroptkin)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন, প্যারিস প্রদর্শনীতে এবং অন্যান্য সমাজতন্ত্রীদের রচিত সাহিত্যের সঙ্গেও যে তিনি পরিচিত ছিলেন, তার প্রমাণ তাঁর বিভিন্ন উক্তিতে পাওয়া যায়। ডক্টর দত্তের শেষ সিদ্ধান্ত এই যে, ইওরোপের সমাজতন্ত্রীদের সংস্পর্শে এসেই স্বামীজী 'সমাজতন্ত্রী' হন এবং সমাজতন্ত্রীরূপে নিজের পরিচয় দেন।

এখানে স্বামীজীর ধর্ম সম্বন্ধীয় বিশ্বাস ও মত নিয়ে ডক্টর দত্তও নিদারুণ ভ্রান্তির মধ্যে পতিত হয়েছেন। এমন একজন বিপ্লবী, তিনিই আবার একান্তভাবে ধর্মবিশ্বাসী! ডক্টর দত্তের এই বিভ্রান্তির কারণ ধর্মসম্বন্ধে তাঁর নিজের বিশ্বাস। তিনি 'Historical Materialism'-এ আস্থা জ্ঞাপন করেছেন এবং বলেছেন:

Truly, the German Philosopher Feuerbach while discussing about Christ has come to the notable conclusion that religion represents the inverted picture and imaginary satisfaction of the real interests of man.

ধর্ম তাঁর মতে কাল্পনিক ও অসত্য বস্তু। এবং ভারতীয় সভ্যতাকে যাঁরা অধ্যাত্ম-সভ্যতা ব'লে অভিহিত করেন, তাঁরা তাঁর মতে 'nothing but religious maniacs'। এই পরিপ্রেক্ষিতে ডক্টর দত্ত স্বামীজীর ধর্মবিশ্বাসকে তাঁর সমাজতন্ত্রবাদের সঙ্গে সামঞ্জস্য করতে প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁর মতে স্বামীজী যখন অল্পবয়স্ক কিশোর, তখন তিনি মধ্যযুগীয়

ভাবধারার প্রতিনিধি রামকৃষ্ণের সংস্পর্শে এসে তাঁর মত গ্রহণ করেছিলেন[৯], কারণ সেই বিদেশী শাসনের যুগে অতীত গৌরবের দিকে ফিরে চাওয়া একজন স্বদেশ-প্রেমিকের পক্ষে ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক। শ্রীঅরবিন্দও এই কারণে বিপ্লবী থেকে যোগীতে পরিণত হয়েছিলেন এবং মহাত্মা গান্ধীর মধ্যেও এই প্রভাব দৃষ্ট হয় (P. 260-61)। তখন কৃষি-নির্ভর সমাজ ভেঙে পড়ছে, শিল্প-নির্ভর সমাজ আসছে। এ অবস্থায় এইরূপ বিপরীত ভাব আবির্ভূত হ'তে বাধ্য ('interpenetration of dialectical opposites is sure to take place')। এই সময়ে যাঁরা জন্মেছিলেন, তাঁদের প্রত্যেকের মধ্যেই এই বৈপরীত্য মূর্ত হয়েছে এবং "They have complexes as they are born and brought up in the midst of transition' (P. 261)। অতএব ডক্টর দত্তের মতে স্বামীজীর মধ্যেও তাঁর ধর্মবিশ্বাস সন্ন্যাসগ্রহণ ইত্যাদি আচরণের সঙ্গে তাঁর সমাজতন্ত্রবাদের বৈপরীত্য ছিল। এবং ডক্টর দত্ত দুঃখ ক'রে বলেছেন, 'strange it is, that the fact of Historical Dialectical Materialisim is persistently ignored by our scholars' (P. 259)। তাঁর সন্ন্যাসের আদর্শ সম্পর্কে ডক্টর দত্তের অভিমত 'It is nauseating to hear extolling monasticism and denouncing household life in modern time.' তবে এই সকল মধ্যযুগীয় ধারণা সত্ত্বেও স্বামীজী যে প্রগতিশীল সমাজতন্ত্রবাদ গ্রহণ করেছিলেন, তার কারণ তাঁর উপর পাশ্চাত্য প্রভাব। The two trips in the west made him shed his notions of Indian mediaevalism and mysticism (P. 273-74)। এবং খানিকটা দিব্যদৃষ্টি সহায়ে (prophetic vision) ১৯০৫ খৃঃ লেনিন যে ধারণা পাননি, 'ওলিয়ান-প্লেখানভ বোর্ড' কল্পনাও করেননি, সেই শূদ্র-শাসিত শ্রেণীহীন সমাজের ধারণা স্বামীজী ১৮৯৬ খৃঃ দিয়েছেন।

'Swami Vevekananda was neither a Marxist nor an economist. But with his prophetic instinct he adumbrated the stage which will bring the resurrection of the Indian people—a casteless and classless society based on the new culture of the Indian masses.'

অর্থাৎ স্বামীজীর মতের পেছনে যে কোন বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও যুক্তি আছে, তা ডক্টর দত্ত ঠিক মনে করেন না। তাঁর ধর্ম-বিশ্বাসের সঙ্গেও তাঁর সমাজতন্ত্রবাদের কোন সম্পর্ক নেই। তবুও তাঁর একটি ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টার সহজাত জ্ঞান (prophetic instinct) ছিল, যার সাহায্যে তিনি সমাজতন্ত্রবাদকে বরণ করেছেন।

দেখা যাচ্ছে—অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার ও ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত উভয়েই বিবেকানন্দের সমাজতন্ত্রের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে, তা বলেন না। এবং তাঁদের উভয়েরই অভিমত যে, পাশ্চাত্য ভাবধারার[১০] সংস্পর্শে এসেই তিনি এই মতবাদ লাভ করেন। তাঁর ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে তাঁর সমাজ-দর্শনের কোন প্রকার সম্বন্ধ আছে, তা তাঁরা স্বীকার করেন না। তবে ডক্টর দত্তের মতে বিবেকানন্দ মার্ক্সগোষ্ঠীর সমাজতন্ত্রী, আর অধ্যাপক সরকারের মতে বিবেকানন্দ খৃষ্টীয়

---

৯ Now the question is, did he accept the medieval ideology and its institutions ? In our perusal of his works we find that he did. P. 260-61 (Patriot-prophet of India)

১০ ডক্টর সরকারের মতে বিবেকানন্দ তাঁর সমাজবাদ পেয়েছিলেন Comte-এর Positivism হ'তে।

সমাজতন্ত্রীদের সমগোত্রীয়। কিন্তু এঁরা এক বিষয়ে নিঃসংশয় যে, বিবেকানন্দ প্রথম ভারতীয় সমাজতন্ত্রী। ডক্টর দত্তের মতে এমন কি তিনি কোন কোন বিষয়ে লেনিন-প্লেখানভ-ট্রটস্কি প্রভৃতিরও পুরোগামী; এবং তিনি প্রতিক্রিয়াশীল আদৌ নন, সম্পূর্ণ প্রগতিশীল। ডক্টর দত্ত ও অধ্যাপক সরকার দুজনেই সমাজতন্ত্রী বিবেকানন্দকে আগামী যুগের অধিনায়ক হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

বর্তমান যুগ সমাজ-বাদের যুগ, এই মতবাদের প্রাধান্য আজ পৃথিবীর সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়। এ যুগে স্বামী বিবেকানন্দ একজন সমাজতন্ত্রবাদী ছিলেন—এ অতি চাঞ্চল্যকর আবিষ্কার। এবং নিশ্চিতই একদিন যেমন তাঁর প্রচারিত জাতীয়তাবাদ দেশবাসীকে কর্মে উদ্বুদ্ধ করেছিল, আজও তাঁর সমাজতন্ত্রবাদের অগ্নিময়ী বাণী সমাজ-সংগঠনে সকলকে প্রেরণা দেবে। সেইজন্য আজ তাঁর সমাজতন্ত্রবাদের যথার্থ পরিচয়-গ্রহণ একান্ত প্রয়োজন। ডক্টর দত্ত ও অধ্যাপক সরকারের আলোচনা যথেষ্ট ঔৎসুক্যের সৃষ্টি করেছে, বিশেষ ক'রে যুব-সম্প্রদায়ের মনে, তা তাদের সংস্পর্শে এলেই আমরা বুঝতে পারি। তাদের সর্বাপেক্ষা বিচলিত করেছে স্বামীজীর নিজেকে 'সমাজতন্ত্রী' ব'লে ঘোষণা। এইজন্য বিবেকানন্দের সমাজতন্ত্রবাদ সম্পর্কে আলোচনা আজ সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব অর্জন করেছে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় পূর্বোক্ত দুজন মনীষীর বিশ্লেষণে অনেক ফাঁক আছে, এবং তাঁরা বিবেকানন্দের সমাজতন্ত্রবাদের যথার্থ রূপটি ধারণা করতে পারেননি। তাঁরা যে-সকল সিদ্ধান্ত করেছেন, আমরা তার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিচারে গ্রহণীয় ব'লে মনে করি না। প্রথমতঃ বিবেকানন্দের সমাজতন্ত্রবাদের কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই—এ যুক্তি গ্রহণ করতে আমরা অসমর্থ। কারণ বিবেকানন্দ একটি সুসংবদ্ধ সমাজতন্ত্রবাদের জন্ম দিয়েছেন, যার ভিত্তি ইতিহাস-পুরাতত্ত্ব-বিজ্ঞান- ও যুক্তি-সম্মত বিশ্লেষণ-পদ্ধতি। দ্বিতীয়তঃ তাঁর ধর্মদর্শনের সঙ্গে এই সমাজতন্ত্রবাদের কোন বৈপরীত্য, যা এঁরা প্রদর্শন করতে চেয়েছেন, তা-ও আদৌ যুক্তিসিদ্ধ নয়। তাঁর সমাজতন্ত্রবাদের ভিত্তি ধর্ম, কার্ল মার্ক্সের সমাজতন্ত্রবাদের ভিত্তি যেমন বস্তুবাদ। মার্ক্স ইতিহাসের বস্তুবাদীর ব্যাখ্যা দিয়েছেন (Materialistic interpretation of History) বিবেকানন্দ তেমনি আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন (Spiritual interpretation of History)। তৃতীয়তঃ বিবেকানন্দের সমাজতন্ত্র খৃষ্টীয় সমাজতন্ত্রের গোষ্ঠীভুক্তও নয়, মার্ক্সীয় সমাজতন্ত্রের সমগোত্রও নয়। এ একটি সম্পূর্ণ মৌলিক সমাজতন্ত্রবাদ, যার গোত্র সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, উৎসও স্বতন্ত্র। ভারতীয় দর্শন-চিন্তা থেকেই তার জন্ম, যদিও তার বিস্তার ঘটেছে পৃথিবীর ইতিহাস এবং বিজ্ঞানসমূহের সহায়ে।*

শ্রীরামকৃষ্ণের ফটো-প্রসঙ্গে

(গত শারদীয়া সংখ্যার পর)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

তৃতীয় ফটোর বিবরণ

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের তৃতীয় (উপবিষ্ট) ফটোটিই সর্বাধিক প্রচারিত এবং সর্বত্র পরম সমাদৃত। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই নিকট এই ফটোখানি সুপরিচিত। 'শ্রীরামকৃষ্ণ'-নাম ও রূপ স্মরণ-মনন মাত্রই তাঁর এই ফটো-মূর্তিটিই আপামর সাধারণের মানস-পটে স্বভাবতই ভেসে ওঠে।

এই ফটোতে দেখা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণদেব গভীর সমাধিমগ্ন অবস্থায় উপবিষ্ট। তাঁর দেহখানি বেশ হৃষ্ট-পুষ্ট, নিটোল-নধর এবং দিব্য লাবণ্য-কান্তিতে পরিপূর্ণ। সুমোহন সুঠাম তনু, অপরূপ নয়নাভিরাম মূর্তি। তাঁর পরিধানে শুভ্র বসন। ঐ বসনে কেবল তাঁর কটিদেশ ও উরুদ্বয় আচ্ছাদিত। উরুদ্বয়ের নিম্নভাগ হ'তে পদযুগলের অবশিষ্টাংশ অনাবৃত। পরিহিত বসনের অঞ্চলখানি সুবিন্যস্তভাবে তাঁর বাম স্কন্ধে রক্ষিত ও যজ্ঞোপবীতের ন্যায় বক্ষোপরি প্রলম্বিত। তাঁর গাত্রে আর অন্য কোন পরিচ্ছদ-ভূষণ নেই, অনাবৃত উন্মুক্ত গাত্র। একটি ছোট কার্পেট-আসনের উপর তিনি সুখাসনে উপবিষ্ট রয়েছেন। ঐ আসনের সম্মুখের সামান্য অংশ তাঁর বাম পদতলে দেখা যায়। তাঁর দক্ষিণ পদটি ভেতরে এবং বাম পদটি বাহিরের দিকে রক্ষিত। বাম পদটি ঐ আসনোপরি সংলগ্ন। দক্ষিণ পদটি বাম পদের গোড়ালির উপর স্থাপিত এবং জানুদেশ কিঞ্চিৎ ঊর্ধ্বে উত্থিত। বাম পদের কনিষ্ঠ অঙ্গুলি ব্যতীত অপর অঙ্গুলিসকল দেখা যায়। তাঁর করপদ্মদ্বয় সংযুক্তভাবে অঙ্কদেশের কিঞ্চিৎ নিম্নে শোভিত। উভয় করের অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ের অগ্রভাগ সংযুক্ত এবং অন্যান্য অঙ্গুলিসকল পরস্পর বদ্ধ। বাম হস্তের নিম্নাংশ কিঞ্চিৎ বক্রভাবাপন্ন। তাঁর নয়নযুগল নিমীলিত, দৃষ্টি একান্ত অন্তর্মুখী—আত্মস্থ। নাসিকা সুতীক্ষ্ণ ও সমুন্নত। মুখারবিন্দ দিব্য হাস্যে প্রফুল্ল। ঊর্ধ্ব পঙ্‌ক্তির সম্মুখস্থ উজ্জ্বল দশনদ্বয় বিকশিত। ওষ্ঠাধরদ্বয় কিঞ্চিৎ পুষ্ট। দক্ষিণ স্কন্ধটি অপেক্ষাকৃত অধিক দৃশ্যমান। বদনমণ্ডল চারু শ্মশ্রু-গুম্ফে বিভূষিত: অতি সৌম্য, দৃপ্ত—মহাপ্রশান্ত। মুখশ্রী অপার প্রেম-দাক্ষিণ্যে ও অপার্থিব করুণা-প্রশান্তিতে পরিপূর্ণ। মস্তকের কেশরাশি সুবিন্যস্ত। নয়নাভিরাম বিমোহন রূপ।

এই ফটো-প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বয়ং বলেছিলেন, 'এটি মহাযোগাবস্থার মূর্তি। এর ভাব অতি উচ্চ। এর ধ্যান-চিন্তা করলেই হয়ে যাবে। একদিন দেখবে, ঘরে ঘরে এই ফটোর পূজা হবে।' দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরের দেওয়ালে অন্যান্য দেব-দেবীর চিত্রপটের সঙ্গে তাঁর নিজেরও একখানি এই ফটো টাঙানো ছিল। ঐ-সকল দেব-দেবীকে প্রণাম-বন্দনাদি করার সময় তিনি তাঁর নিজের ঐ ফটোকেও স্থির দৃষ্টিতে দর্শন করতেন এবং করজোড়ে নমস্কার জানাতেন। শুধু তাই নয়, তিনি স্বহস্তে এই ফটোতে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পূজাও করেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই ফটোটি তোলা হয় ভক্ত ভবনাথ চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ও প্রচেষ্টায় দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে শ্রীশ্রীরাধা-

কান্তজীউর মন্দিরের বাহিরের রোয়াকে। এই ফটোখানি তোলেন বরাহনগরের (৩৬, কুটীঘাট রোড-নিবাসী) ভক্ত অবিনাশচন্দ্র দাঁ। ১৮৮৩ খৃঃ অক্টোবর মাসে (১২৯০ সাল, কার্ত্তিক মাস) রবিবার সকাল প্রায় সাড়ে নয়টার সময় এটি গৃহীত হয়।

শ্রীযুক্ত ভবনাথও বরাহনগরের অধিবাসী ছিলেন। সেই সূত্রে অবিনাশের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল। অবিনাশ তখন বিখ্যাত ফটোগ্রাফার বোর্ন শেফার্ড কোম্পানিতে শিক্ষানবীশ হিসেবে কাজ করছেন এবং একটি ক্যামেরা কিনে সবেমাত্র ফটো তোলার কাজ আরম্ভ করেছেন। বলা বাহুল্য, ঐ কর্মে তাঁর হাত তখনও সে-রকম রপ্ত হয়নি। তাঁর ফটো তোলার কাজের কথা ভবনাথ জানতেন। তাঁকে দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটি ফটো তোলানোর তাঁর আকাঙ্ক্ষা হয়।

ঐ ফটো তোলার কয়েকদিন পূর্বে ভবনাথ একটি ফটো নেওয়ার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণকে অনেক অনুনয়-অনুরোধ করেন। ভবনাথ তাঁর অন্তরঙ্গ। ভবনাথের পীড়াপীড়ি ও আবদারে অনিচ্ছাসত্ত্বেও অগত্যা তিনি কতকটা মৌন-ভাবে সম্মতি প্রদান করেন।

ফটো তোলার দিন (রবিবার) ভবনাথ অবিনাশকে সঙ্গে নিয়ে সকাল প্রায় নয়টার সময় দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হন। শ্রীরামকৃষ্ণ তখন স্নানাদি সেরে শ্রীশ্রীভবতারিণীকে প্রণাম ক'রে নাটমন্দিরে পায়চারি করছেন। সহাস্য বদন, প্রেমানুরঞ্জিত নয়ন, প্রসন্ন-প্রশান্ত মূর্তি; মাতৃভাবে মাতোয়ারা। বাঁ কাঁধের উপর ধুতির আঁচলখানি ফেলা। তথায় সিঁথির শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র কবিরাজ এবং আরও জনকয়েক ভক্ত উপস্থিত। ভবনাথ ও অবিনাশ ৺ভবতারিণীকে প্রণাম ক'রে শ্রীরামকৃষ্ণের পদধূলি গ্রহণ করেন। প্রিয় ভক্ত ভবনাথকে দেখে তিনি পরম আহ্লাদিত হন। তিনি কথায় কথায় তাঁকে তাঁর সঙ্গীটির পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। ভবনাথ তখন স্বীয় সঙ্গীর পরিচয় দিয়ে পুনরায় স্বীয় অন্তরের ঐকান্তিক অভিলাষটি সবিনয়ে জানান। ভক্তবরের ঐ আবদার শুনে তিনি ঈষৎ হাস্য করেন।

অতঃপর শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীরাধাকান্ত-জীউর মন্দিরে গমন করেন। উপস্থিত ভক্তগণও তাঁর পশ্চাদনুসরণ করেন। তিনি রাধাকান্তজীউকে প্রণাম ক'রে ঐ মন্দিরের উত্তরের রোয়াকে শ্রীশ্রীসদাশিব মহাদেবের মন্দিরের দিকে মুখ ক'রে সহাস্য বদনে দণ্ডায়মান হন। সেখান থেকে অপলক দৃষ্টিতে তিনি যেন ঐ শিবকে দর্শন করতে থাকেন। এই অবসরে ভবনাথ একখানি ছোট কার্পেট-আসন এনে তথায় পেতে দেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবস্থ হয়ে ঐ আসনে বসে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সমস্ত বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং তিনি গভীর সমাধিতে নিমগ্ন হয়ে যান। ভবনাথ সেই সুযোগে ফটো তুলে নেবার জন্য অবিনাশকে ইঙ্গিত করেন। ফটোগ্রাফার তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হন।

শ্রীরামকৃষ্ণের দেহ কিঞ্চিৎ বেঁকে ছিল এবং তাঁর বসার ভঙ্গিমায়ও একটু এলোমেলো ভাব ছিল। ক্যামেরার লেন্সে তাঁর মূর্তিতে ঐ সকল ভাব লক্ষ্য ক'রে ফটোগ্রাফার তাঁকে ভালভাবে বসিয়ে দিতে যান। শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধি সম্বন্ধে তাঁর কোনই ধারণা ছিল না। তাঁর কাঁধ ও পা-দুখানি ঠিক ক'রে দিতে গিয়ে তিনি অনুভব করেন, তাঁর দেহ অত্যন্ত কোমল ও হালকা। তাঁর একটি পা সামান্য তুলতে গিয়ে তিনি বোধ করেন, তাঁর দেহ এতই

হালকা যে, দেহখানি যেন শূন্যে উঠে যাচ্ছে। ফটোগ্রাফার তখন ভয়ানক বিচলিত হয়ে পড়েন এবং ভয়ে ক্ষান্ত হন। তাঁর সমাধিস্থ দেহ স্পর্শ ক'রে মহা অপরাধ করেছেন—ভেবে তিনি অতিশয় ভীত ও অপ্রস্তুত হন।

ভবনাথ-প্রমুখ ভক্তগণ লক্ষ্য করেন, শ্রীরামকৃষ্ণের দেহখানি জড়বৎ নিথর নিস্পন্দ। তাঁর নয়নযুগল সম্পূর্ণ নিমীলিত। অপার প্রেম-দাক্ষিণ্যে তাঁর বদনমণ্ডল পরিপূর্ণ। দিব্য হাস্য-জ্যোতিতে শ্রীমুখখানি সমুজ্জ্বল। তাঁর সর্বাঙ্গে অপার আনন্দের হিল্লোল প্রবাহিত। তাঁরা পূর্বেও তাঁর সমাধিস্থ মূর্তি বহুবার দর্শন করেছেন, কিন্তু এরূপ সুগভীর ভাব কখনও প্রত্যক্ষ করেননি।

যা হোক, ঐরূপ সমাধিনিমগ্ন অবস্থাতেই তাঁর ফটো তোলার জন্য ভবনাথ অবিনাশকে নির্দেশ দেন। অবিনাশ তখন বহু কষ্টে নিজেকে কিছুটা সংবরণ ক'রে তাড়াতাড়ি তাঁর ফটো তুলে নেন। কিন্তু বেশী তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে নেগেটিভ কাচখানি ক্যামেরা থেকে বার করার সময় তাঁর হাত থেকে হঠাৎ নীচে পড়ে গিয়ে ভেঙে যায়। সৌভাগ্যক্রমে ঐ প্লেটখানির উপরের (মাথার) দিক ভাঙে। শ্রীরামকৃষ্ণের ছবিখানি কিন্তু অবিকৃতই থাকে।

ফটো তোলা শেষ হ'লে কিছুক্ষণ পরে শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধি ভঙ্গ হয় এবং ধীরে ধীরে তিনি প্রকৃতিস্থ হন। ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু ঠাকুর ঐ ভাবে সমাধিস্থ হয়ে ভক্তের বাসনা পূর্ণ করেন। তারপর তিনি নিজ কক্ষে ফিরে আসেন। ভবনাথ তাঁর শ্রীচরণে প্রণত হয়ে করজোড়ে তাঁকে নিজ অভীষ্ট-সিদ্ধির কথা নিবেদন করেন। তিনি প্রসন্ন দৃষ্টিতে কেবল মৃদু মৃদু হাস্য করেন। অবিনাশ তাঁকে প্রণাম ক'রে এক পাশে একান্ত অপ্রতিভ ও বিচলিতভাবে দাঁড়িয়েছিলেন। অন্তর্যামী ঠাকুর তাঁর মনোভাব বুঝতে পেরে তাঁকে সস্নেহে 'ফটো-মাষ্টার' ব'লে সম্বোধন ক'রে তাঁর মন একেবারে হালকা ক'রে দেন। এইরূপে তাঁর অহেতুক কৃপালাভে দাঁ-মশাই নিজেকে অতিশয় ধন্য ও কৃতার্থ জ্ঞান করেন।

দাঁ-মশায়ের সংসারের অসচ্ছলতার কথা শ্রীরামকৃষ্ণ অবগত হন। তাই তিনি ঐ ফটোর খরচ বাবদ তাঁকে কিছু টাকা দেওয়ার জন্য ভক্তদের বলেন। মহেন্দ্র কবিরাজ মশাই তাঁকে একখানি দশ টাকার নোট দেন। তিনি মুখে কয়েকবার 'থাক্ থাক্, না না' বললেও ঐ নোটখানি গ্রহণ করেন। তিনি কথা দেন, এক সপ্তাহ পরে ফটো পাওয়া যাবে।

তারপর প্রায় তিন সপ্তাহ কেটে যায়। তবুও দাঁ-মশায়ের সাক্ষাৎ নেই। তিনি যে রবিবারে ফটো তুলে নিয়ে যান, তার পরের মঙ্গলবারে তাঁর একটি পুত্র* সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। অভাবের সংসার, তাই ঐ ব্যাপারে তিনি ফটোর টাকা খরচ ক'রে ফেলেন। তিনি অর্থাভাবে ফটোর কাগজ এবং মালমসলা কিনতে পারেননি। সেই লজ্জায় তিনি ঠাকুরের কাছে মুখ দেখাতে পারেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ চিন্তিতভাবে একদিন ভবনাথকে বলেন, 'তিন সপ্তাহ কেটে গেল তবুও তো তোমার ফটো-মাষ্টার এল না! তাই তো তার কি হ'ল?' দাঁ-মশায়ের জন্য ঠাকুরকে চিন্তিত দেখে ভবনাথ তাঁকে বিনীত ভাবে বলেন, 'তাকে কি খবর দেবো?'

---

* মন্মথনাথ দাঁ—জন্ম ১২৯০ সাল, কার্ত্তিক মাস, ইং ১৮৮৩ খৃঃ অক্টোবর মাস, মঙ্গলবার।

মৃদুস্বরে ঠাকুর উত্তর দেন—'হ্যাঁ, একবার তার খবরটা নেওয়া দরকার, সে কেমন আছে!'

ঠাকুরের আজ্ঞায় ভবনাথ কুটীঘাট রোডে দাঁ-মশায়ের বাড়ি যান—তাঁর খোঁজে। তিনি জোর গলায় তাঁকে ডাকাডাকি শুরু করেন। কিছুক্ষণ পরে পায়ে ন্যাকড়ার ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অবস্থায় একটি লাঠিতে ভর দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসে তিনি উপস্থিত হন। তাঁর পায়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা এবং হাতে লাঠি দেখে ভবনাথ চিন্তিত হন। তিনি সমবেদনাভরে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমার পায়ে আবার কি হ'ল হে?' দাঁ-মশাই তখন মুখ সিঁটকে কাতরভাবে বলেন, "আর বোলো না ভাই, যেদিন ঠাকুরের ফটো তুলে আনি, সেদিন ভর সন্ধ্যাবেলায় হঠাৎ পা পিছলে উঠানে পড়ে যাই। ঠাকুরের কৃপায় খুব বেঁচে গেছি!' তারপর তিনি আরও একটু মুখ সিঁটকে পায়ে ন্যাকড়া-জড়ানো স্থানে হাত দিয়ে অতি ক্ষীণকণ্ঠে বলেন, 'এখনও ভাই হাড়ের ব্যথা যায়নি। তাই ঠাকুরের ফটো তৈরী ক'রে নিয়ে যেতে পারিনি।' তাঁর ঐরূপ দুরবস্থা দেখে ভবনাথ তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, 'যাক্ হাড় ভাঙেনি এইটুকুই রক্ষে। ভয় নেই, তাড়াতাড়ি সেরে উঠবে। বেশী নড়াচড়া কোরো না। একটু সাবধানে চলাফেরা করবে।'

অতঃপর ভবনাথ দক্ষিণেশ্বরে ফিরে গিয়ে অবিনাশের দৈবদুর্বিপাকের সকল কথা শ্রীরামকৃষ্ণকে সবিস্তার জানান। তিনি ঐ কথা শুনে কোনরূপ কাতরতা বা সমবেদনা প্রকাশ করেন না, বরং ঈষৎ হাস্য করেন। তিনি ভবনাথকে বলেন, 'তা হোক গে, যে ভাবে পারো, তাকে একবার এখানে নিয়ে এসো।'

ঠাকুরের আজ্ঞায় পরদিন সকালে ভবনাথ কয়েকজন সঙ্গী সহ আবার দাঁ-মশায়ের গৃহে উপস্থিত হন এবং তাঁকে সঙ্গে ক'রে দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে আসেন। পায়ে ন্যাকড়া-জড়ানো অবস্থায় লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁ-মশাই অত্যন্ত কাতরভাবে ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হন। তাঁর পায়ের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে তাঁকে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, 'ও মাষ্টার, তোমার পায়ে কি হ'ল?' দাঁ-মশাই তখন অস্ফুটস্বরে নিজের ঐ আকস্মিক পতনের কথা তাঁকে নিবেদন করেন। দোষী পুত্রকে পিতা যেরূপ গম্ভীরভাবে শাসন করেন, তাঁর ঐ কথা শুনে ঠাকুর তাঁকে সেই ভাবে বলেন, 'দেখ মাষ্টার, তোমার ও-সব কিছুই হয়নি। পায়ের ন্যাকড়া-ফ্যাকড়া খুলে ফেল। বলো না, তোমার একটি পুত্র হয়েছে, তাই টাকা খরচ ক'রে ফেলেছ?'

অন্তর্যামী ঠাকুরের কথা শুনে দাঁ-মশায়ের অন্তর কেঁপে উঠে। বিষম লজ্জায় ও ভয়ে মাথা নিচু ক'রে তিনি নির্বাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। অপ্রতিভ ও শঙ্কিত ভাবে তাঁকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ঠাকুর সস্নেহে তাঁকে বলেন, 'যাও গঙ্গায় স্নান ক'রে এসে মায়ের নাম শুনাও।' দাঁ-মশাই তখন পায়ের ব্যাণ্ডেজ খুলে ফেলেন এবং গঙ্গায় অবগাহন ক'রে অসত্যের গ্লানি ধৌত করেন। তিনি স্নান ক'রে এলে ঠাকুর আদর ক'রে তাঁকে স্বহস্তে কয়েকটি বাতাসা ও ফল প্রসাদ দেন। ঐ প্রসাদ-গ্রহণে তিনি পরম পরিতৃপ্ত হন। তিনি ভাল গান গাইতে এবং পাখোয়াজ বাজাতে পারতেন। ঠাকুরের আজ্ঞায় তিনি শ্যামা-সঙ্গীত আরম্ভ করেন। বিচিত্র ভাবপূর্ণ সঙ্গীত-শ্রবণে ঠাকুরের মধ্যে নানা ভাব প্রকাশ পেতে লাগল—কখন দাস্য, কখন সখ্য, কখন

বাৎসল্য, কখন মধুর, কখন বা প্রেমভাব। ভাবময় ঠাকুরের অপূর্ব লীলা দর্শনে অবিনাশ আত্মহারা হয়ে যান।

শ্রীশ্রীঠাকুরের আজ্ঞায় অবিনাশকে আরও দশটি টাকা দেওয়া হয়। তিনি ঐরূপ ভান করার জন্য নিদারুণ অনুতপ্ত ও লজ্জিত হন। তিনি ঠাকুরের কাছে ঐ জন্য বার বার মার্জনা ভিক্ষা করেন। ঠাকুর তখন তাঁকে অভয় আশীর্বাদ দিয়ে বলেন, 'সত্যকে ধরে থাকবে। সত্য কথাই কলির তপস্যা।'

দাঁ-মশাই বাড়ি ফিরে এসে ঐ টাকা দিয়ে ফটোর মালমসলা কেনেন। নেগেটিভ কাচ-খানির উপরের কিছুটা অংশ ভেঙে যাওয়ার জন্য ছবির মাথার উপর অর্ধচন্দ্রাকৃতি ক'রে কেটে ফেলেন। তা থেকে তিনি ঠাকুরের ছবিটি সযত্নে 'প্রিন্ট' করেন। তিনি নেগেটিভ প্লেট তৈরী করতে জানতেন। ঐ ছবি থেকে পুনরায় ফটো তুলে তিনি সেটির আর একটি নেগেটিভ করেন। শেষোক্ত নেগেটিভখানি থেকে কয়েকটি 'ফুল সাইজ' ফটো প্রিন্ট ক'রে তিনি ভবনাথকে দেন। এইজন্য ঠাকুরের মূল ফটোতে তাঁর মাথার উপর অর্ধ গোলাকার একটি দাগ দেখা যায়।

যা হোক, ভবনাথ ঐ ফটোগুলি নিয়ে মহানন্দে ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হন এবং তাঁকে দেখান। তিনি ঐ ফটো দেখে ভাবস্থ হয়ে পড়েন। ঐরূপ ভাবাবেশে তিনি ঐ ফটোকে কয়েকবার নিজের মাথায় ছোঁয়ান এবং গদ্‌গদ কণ্ঠে বলেন, 'ফটোখানি বেশ তুলেছে। এর ভাব অতি উচ্চ। তাঁতে একেবারে লীন হয়ে গিয়েছে। এতে তাঁরই স্বরূপ ফুটে উঠেছে।'

ভক্ত শিল্পীর সাধনায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাগবতী কায়াখানি এইরূপে সেদিন আলো-ছায়ার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছিল। সেই ফটোকে অবলম্বন ক'রে বিশ্বের কোটি কোটি ভক্ত নরনারী প্রতিনিয়ত শ্রীরামকৃষ্ণের কল্যাণ-মূর্তি ধ্যান চিন্তা ক'রে কৃতকৃতার্থ হচ্ছেন। সেই ফটো আজ সত্য সত্যই ঘরে ঘরে পূজিত হ'তে দেখা যাচ্ছে। ধন্য ভক্ত ভবনাথ! ধন্য শিল্পী অবিনাশ! তাঁরা যুগযুগান্তর ধরে এই ফটোর কল্যাণে নিখিল বিশ্বমানবের অশেষ ধন্যবাদার্হ ও চির কৃতজ্ঞতাভাজন হয়ে থাকবেন।* [ক্রমশঃ]

* এই প্রবন্ধের উপাদান 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' প্রভৃতি গ্রন্থ এবং বিশেষ প্রামাণিক সূত্র হইতে গৃহীত। —লেখক

উদ্বোধনের নবপ্রকাশিত পুস্তক

শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনী (লীলাপ্রসঙ্গ অবলম্বনে)—সঙ্কলয়িতা স্বামী তেজসানন্দ। পৃষ্ঠা ২১৬ ; **মূল্য ৩৲**

শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম হইতে মহাপ্রয়াণ পর্যন্ত যে সকল ঘটনা স্বামী সারদানন্দ-প্রণীত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গে'র পাঁচ খণ্ডে ইতস্ততঃ ছড়াইয়া আছে, তাহা মূল গ্রন্থের ভাষা ও ভাব অবলম্বনে বর্তমান পুস্তকে ২৪টি অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ঘটনাপুঞ্জের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য অতি সামান্যভাবে কিছু নূতন করিয়া লেখা এবং 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত' ও 'Life of Sri Ramakrishna' প্রভৃতি প্রামাণিক পুস্তকের কিঞ্চিৎ সাহায্য লওয়া হইয়াছে। সময়াভাবে যাঁহাদের পক্ষে বৃহৎ মূলগ্রন্থ পাঠ করিবার সুযোগ হইবে না, এই পুস্তকখানি শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী-অংশে তাঁহাদের সেই অভাব মিটাইতে সমর্থ হইবে।

বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী প্রস্তুতি

ডাকটিকিট ঃ বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী উপলক্ষে আগামী জানুআরি মাসে ডাকবিভাগ (The Post and Telegraph Department) কর্তৃক স্বামীজীর চিত্র-সম্বলিত দুই প্রকার ডাকটিকিট বাহির করা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে।

ভারতের জন্য ডাকটিকিটে স্বামীজীর পরিব্রাজক-চিত্র এবং বিদেশের জন্য শিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামীজীর ছবি মুদ্রিত হইবে। নাসিক গবর্নমেণ্ট প্রিন্টিং প্রেসে ছবি-মুদ্রণের ব্যবস্থা হইয়াছে। —P. T. I. হইতে

মাদ্রাজ ঃ স্বামীজীর শতবার্ষিকী উপলক্ষে মাদ্রাজ সরকার স্থানীয় শতবার্ষিকী কমিটিকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য এক লক্ষ টাকা দিয়াছেন ঃ

(১) শিশুবিভাগ সহ পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থাগার পাঠাগার ও বক্তৃতা-গৃহ প্রতিষ্ঠা, (২) Ice-House'-এর সম্মুখে স্বামীজীর ব্রোঞ্জ মূর্তি প্রতিষ্ঠা, (৩) তামিল ভাষায় স্বামীজীর জীবনী প্রকাশ।

নরেন্দ্রপুর ঃ বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠানের জন্য স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গঠিত কমিটি কর্তৃক আলোচিত বিষয়গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ঃ

(১) নির্মীয়মাণ শ্রোতৃভবনটির 'বিবেকানন্দ-শতাব্দী মণ্ডপ' নামকরণ।

(২) শতবার্ষিকী-স্মারক পুরস্কার, বৃত্তি পদক প্রভৃতি বিতরণের ব্যবস্থা।

(৩) 'ভারতের চিন্তাধারায় স্বামীজীর দান'-গ্রন্থ, নব-সাক্ষর ও অল্পশিক্ষিতদের জন্য স্বামীজী-সম্বন্ধে পুস্তক এবং শতবার্ষিকী-স্মারক পত্রিকা প্রকাশন।

(৪) একশত অনুন্নত পরিবার লইয়া আদর্শ গ্রাম সংগঠন। গ্রাম পরিষ্কার, গ্রামসেবা, গ্রাম-উন্নয়ন প্রভৃতি।

(৫) সম-সাময়িক পত্র-পত্রিকায় স্বামীজী-সম্বন্ধে প্রকাশিত তথ্য সংগ্রহ।

তমলুক ঃ গত ১৯শে অগস্ট স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের উদ্যোগে আশ্রমের নবনির্মিত সমাজ-মিলন-কেন্দ্রের দ্বিতল ভবনে বিশিষ্ট জনসমাবেশে অনুষ্ঠিত সভায় বিবেকানন্দ-শতবার্ষিক কমিটির কর্মসচিব স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ মহারাজের বক্তৃতার পর প্রধান অতিথি মাননীয় শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশ্যামাদাস ভট্টাচার্য শতবার্ষিক উৎসব সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য সকলকে উৎসাহিত করেন।

মহকুমা-শাসক শ্রীঅরুণকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে শতবার্ষিক উৎসব যথোপযুক্ত ভাবে উদ্‌যাপনের জন্য সর্বসম্মতিক্রমে একটি সাধারণ কমিটি গঠিত হইয়াছে।

স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ ১৮ই অগস্ট তাম্রলিপ্ত মহাবিদ্যালয়ে ইংরেজীতে 'নব ভারতে স্বামীজীর বাণী' বিষয়ে একটি মনোজ্ঞ ভাষণ দেন।

ঐ তারিখে তিনি স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে প্রায় ৫০০ শ্রোতার সমক্ষে বাংলায় স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন।

মেদিনীপুর ঃ গত ১৯শে অগস্ট স্থানীয় বিদ্যাসাগর-স্মৃতিমন্দিরে মেদিনীপুর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের উদ্যোগে বিশিষ্ট নাগরিকগণের সহযোগিতায় স্বামীজীর শতবার্ষিকী সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠানের জন্য একটি সাধারণ কমিটি গঠিত হইয়াছে। জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে এই উৎসব সাফল্যমণ্ডিত করিবার চেষ্টা হইতেছে।

বারাসত ঃ রামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রমের উদ্যোগে আশ্রম-প্রাঙ্গণে একটি জনসভায় আগামী বর্ষে বারাসত শহর ও মহকুমায় যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম-শতবার্ষিকী যথোচিত ভাবগাম্ভীর্যের সহিত পালন করিবার সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে। এই উপলক্ষে একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে।

শতবার্ষিকীর স্থায়ী স্মারকরূপে উক্ত আশ্রমের পরিচালনায় একটি ছাত্রনিবাস স্থাপনের প্রস্তাবও গৃহীত হইয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

মাদ্রাজঃ গত ১৯শে জুলাই বিশিষ্ট জনসমাবেশে স্বামী কৈলাসানন্দ দীপ জালিয়া মাদ্রাজ বিবেকানন্দ-শতবার্ষিক বালিকা-বিদ্যালয়ের উদ্বোধন করেন।

স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ বলেন, সরকারের সহায়তায় কিভাবে বিদ্যালয়ের জমি সংগৃহীত হইয়াছে এবং তিন সপ্তাহের মধ্যে বিদ্যালয় চালাইবার মতো প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ১৭০টি বালিকা লইয়া বিদ্যালয়ের কাজ শুরু হইবে।

বিশিষ্ট বক্তাগণ ভাষণ দিলে পর ছাত্রীগণ স্বামীজীর রচনা হইতে ইংরেজী ও তামিলে আবৃত্তি করে। সর্বশেষে জাতীয় সঙ্গীত গীত হয়।

সহস্রদ্বীপোদ্যানে বেদান্ত-অধ্যাপনা

আমেরিকার নিউইয়র্ক প্রদেশের অন্তর্গত সহস্রদ্বীপোদ্যান (Thousand Island Park) অতি সুন্দর স্থান। এখানে আছে 'বিবেকানন্দ-কুটির' (Vivekananda Cottage)। ১৮৯৫ খৃঃ এই কুটিরে সাত সপ্তাহ যাবৎ অবস্থান করিয়া স্বামীজী 'দেববাণী' (Inspired Talks) উপদেশ করিয়াছিলেন। বেদান্তানুরাগীদিগের নিকট স্বামীজীর পুণ্যস্মৃতিধন্য এই স্থান পবিত্র তীর্থ।

গত তিন বৎসর যাবৎ প্রতি গ্রীষ্মকালে এখানে নিউইয়র্ক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্রের উদ্যোগে বেদান্ত-অধ্যাপনা হইয়া আসিতেছে। এই বৎসর গত ১২ই হইতে ২৫শে অগস্ট নিউইয়র্ক কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী নিখিলানন্দ এখানে ২৯ জনের একটি ছাত্রসঙ্ঘ পরিচালনা করেন। এ-বারের আলোচিত বিষয় ছিলঃ ছান্দোগ্য উপনিষদের মহাবাক্য 'তত্ত্বমসি'—তুমিই সেই। ক্লাসের সময় ছিল প্রতিদিন সকাল ১০ টা হইতে ১১-৩০ মিঃ এবং বিকাল ৪-৩০ মিঃ হইতে ৬ টা। স্বামীজী যে-ঘরে ক্লাস করিয়াছিলেন, সেই ঘরে ও তাহার পার্শ্ববর্তী ঘরে ক্লাস হইত। সন্ধ্যায় আরতি স্তোত্রপাঠ ও ধ্যান হইত।

কলিকাতা হইতে স্বামী নিত্যস্বরূপানন্দ আমেরিকা পরিভ্রমণে আসিয়াছেন, তিনি এই সময়ে এখানে ছিলেন; 'রামকৃষ্ণ মিশন সংস্কৃতি-ভবন' (Ramakrishna Mission Institute of Culture) ও 'শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদগণের স্মৃতি' সম্বন্ধে তিনি ভাষণ দেন।

বিজ্ঞপ্তি

কার্ত্তিক মাসের 'উদ্বোধন' মাসের শেষ সপ্তাহে গ্রাহক-গ্রাহিকার নিকট পৌঁছিবে। তখনও না পাইলে পত্র দ্বারা জানাইবেন।

—**কার্যাধ্যক্ষ**

বিবিধ সংবাদ

বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী প্রদর্শনী

গত ১৪ই অগস্ট সন্ধ্যায় পার্ক সার্কাস ময়দানে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির পক্ষ হইতে আয়োজিত বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী প্রদর্শনীর উদ্বোধন করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজ বলেন: 'ভারতবর্ষ শুধু অতীতেই যে মহৎ ছিল, তাহা নহে, ভবিষ্যৎ ভারত অতীত অপেক্ষাও মহৎ হইবে'—স্বামীজীর এই বাণী সত্যে পরিণত হইবেই। পাশ্চাত্য জগৎ ভারতবর্ষ সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশক্রমে স্বামীজী ভারতের বৈদান্তিক সাধনা জগতে প্রচার করেন।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন বলেন: ভারতবর্ষে যুগযুগ ধরিয়া যে জ্ঞান সঞ্চিত ছিল, পল্লীগ্রামের শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মাধ্যমেই তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। সমগ্র বিশ্বে ভারতের মর্মবাণী প্রচারের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ স্বামীজীকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। স্বামীজীর নির্দেশ অনুসারে ভারত পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানকে যেমন কাজে লাগাইবে, তেমনি সমগ্র বিশ্বও ভারতের মর্মবাণী গ্রহণ করিতে বাধ্য। দারিদ্র্য ও ধনবৈষম্য দূর করিয়া দেশকে যদি ধনধান্যে সুশোভিত করিতে পারা যায়, তবেই মহান্ ধর্মনেতা সমাজনেতা ও রাজনীতিক পথপ্রদর্শক স্বামীজীর স্মৃতিচারণ সার্থক হইবে।

প্রদর্শনীতে স্বামীজীর আবির্ভাব হইতে তাঁহার জীবনের বিশিষ্ট ঘটনা অবলম্বনে নিপুণ মৃৎশিল্পীদের নির্মিত পুতুলগুলি এমন সুন্দরভাবে পর পর সাজাইয়া রাখা হয় যে, দর্শকদের মনে স্বামীজীর সমগ্র জীবনটি উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। আমেরিকায় ও জার্মানিতে স্বামীজী—এবং চিত্র ও বাণী দ্বারা সুসজ্জিত 'স্টল'-গুলি দর্শকগণের বিশেষভাবে আনন্দ বর্ধন করে। প্রদর্শনীতে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজীর ব্যবহৃত কিছু জিনিসও দেখানো হয়।

১৫ই অগস্ট স্বাধীনতা-দিবসে সন্ধ্যায় কংগ্রেস-মণ্ডপে স্বামী রঙ্গনাথানন্দ 'স্বামী বিবেকানন্দ—বর্তমান ভারতের আধ্যাত্মিক গুরু' সম্বন্ধে ইংরেজীতে সুচিন্তিত ভাষণ দেন। তিনি বলেন: নব ভারত গঠনে সর্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজন মানুষের। স্বামীজী চাহিয়াছিলেন এমন শিক্ষা, যাহাতে প্রকৃত মানুষ তৈরী হয়। স্বাধীনতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে স্বামীজীর নির্দেশিত পথ অবলম্বন করা দরকার। সেই পথ হইতেছে ত্যাগ ও সেবার।

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ বলেন: স্বামী বিবেকানন্দের বাণী স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের উদ্বুদ্ধ করিয়াছে, তাই তাঁহাকে স্মরণ করিয়া প্রদেশ কংগ্রেস আয়োজিত স্বাধীনতা-উৎসবের সূচনা।

পরলোকে সরযূবালা সেন

আমরা দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, শ্রীশ্রীমায়ের কৃপাপ্রাপ্তা ও তাঁহার অন্তরঙ্গ শিষ্যা সরযূবালা সেন দীর্ঘকাল ৺কাশীবাসের পর গত ৬ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৮-৪০ মিঃ সময়ে সজ্ঞানে ইষ্ট স্মরণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করিয়াছেন।

তাঁহার দিনলিপি হইতে 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' প্রথম খণ্ডের উপাদান গৃহীত হইয়াছে। শ্রীশ্রীমা তাঁহাকে প্রথম দিন দেখিয়াই যেন বহুদিনের পরিচিতা বলিয়া সম্বোধন করেন।

তাঁহার দেহমুক্ত আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক। ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

'নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে ও রূপরাশি'

শিল্পী : শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্লক ও মুদ্রণ : বেঙ্গল অটোটাইপ কোং

আদ্যাশক্তি শ্যামা

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

কালেরে কলন করি তুমি কবে কালীরূপে অমূর্তের লীলানন্দ তরে
দাঁড়ায়েছ কারণের কেন্দ্রটিকে করিয়া বিস্তার বিশ্বস্তব-হৃদি পরে,
বোধির অতীত স্তরে সমাধি-মন্দির মাঝে চিদ্‌ঘন তুরীয় ভূমিতে
ব্যক্তাতীত ভূমাচ্ছন্ন ব্রহ্মবিহারের লাগি অর্ধনারী-ঈশ্বর চুমিতে
আজো তাহা মগ্ন মহারহস্যের জালে।

মূলশক্তি চিত্রলেখা তনুতমা!
দেখেছি তোমারে আমি সর্বতত্ত্বময়ী, হে কালের অধীশ্বরী, ওগো অনুপমা,
সংখ্যাতীত দূর কোন্ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে অরূপের আবরণ খুলি,
এসেছিলে বিন্ধ্যাচলে অসুরমর্দিনী হয়ে রণাঙ্গণে দীপ-দোলে দুলি!
অন্ধকারে নিশীথিনী বিদ্যুৎ-নাচন সনে হেমন্তের দিনান্ত-বেলায়
তোমারে যে করেছে বরণ। তুমি গুণাত্মিকা ধরণীতে মায়ার খেলায়
মহামায়ারূপে আসি রক্তঝরা পথপ্রান্তে অপরূপ সৌন্দর্য-সম্ভারে
দানব-সংঘাত হ'তে রক্ষিবারে ধরণীরে আপনার অসুর-সংহারে
করি সংযোজন দেখাইলে মহিমা তোমার। তন্তু রচি ঊর্ণনাভ-সম
নিজ তনু হ'তে ব্যক্ত করি দিলে বিশ্বে তব স্নেহ-মমতার সর্বোত্তম
সমারোহ আপনার জালে রহি আপনি আবৃত। মহাভাবে মাতোয়ারা,
অগ্নিক্ষরা ক্ষণে বহায়েছ এ-সংসারে করুণার কেদার-বাহিনীধারা
মরুময় পটভূমিকায় যেথা ক্লান্ত দুরাশার মতো সীমাহীন পথ
মৌন বেদনায়।

নীহারিকা ছিন্ন করি মেঘের স্তবক ভেদি পুষ্পরথ
সৃজন প্রত্যুষে কবে মহাকাশে মাতরিশ্বা বেগে পূর্বপ্রান্তে চংক্রমণ
জ্যোতিঃপুঞ্জ লয়ে মোরা নাহি জানি, স্রষ্টার ঈক্ষণে তুমি দিলে অনুক্ষণ
প্রাণের চেতনা। তাই তুমি আদ্যাশক্তি, চৈতন্যসত্তার শুদ্ধ মূলাধার,

ছিন্ন যাহা সমাহৃত অখণ্ড সত্তায় তব, হয়েছে সাকার নিরাকার
পরম পুরুষ। ভবপ্রত্যয়েরে তুমি করেছ যে নিরসন, যোগমায়া
ব্রহ্মময়ী 'তত্ত্বমসি', বঙ্গের গাঙ্গেয় তটে এসেছিলে ধরি মর্ত্য কায়া
রামকৃষ্ণ-জায়ারূপে।

রামপ্রসাদের বেড়া গেলে বেঁধে কন্যারূপ ধরি,
আমারি অন্তরে ঘর বেঁধেছ যে অনাহত চক্র মোর সদা আলো করি।
যে জননী গর্ভে ধরি মর্ত্যলোকে আনি মোরে দিয়ে গেল কর্ণে মন্ত্র তব,
তুমি যে তাহার মাঝে আপনারে করেছ প্রকাশ শুনাইতে তত্ত্ব নব
হৃদয়ের বারাণসী-ধামে। হংসীরূপে হংস-সনে পদ্মবনে লীলামুখী
হেরিনু তোমারে সুষুম্নার উৎস-মাঝে তীর্থস্নাত চিত্ত মোর অভিমুখী
তব কুল-কুণ্ডলিনী লীলাকেন্দ্র-বুকে।

বিষ্ণুক্রান্তা-অধিষ্ঠিত দেশে
অরণ্যপল্লীর মহাশ্মশানের শবাসনে মোর পূর্বপুরুষেরা এসে
করেছে অর্চনা তব নিস্পন্দ আবেগে, তুমি যে দিয়েছ দেখা কৃপা করি
ধ্যানের গহন রাত্রে মৃত্যু হ'তে অমৃতের পারে তারা ভাসায়েছে তরী।
জাহ্নবী-যমুনাতটে কত সিদ্ধ সাধকের স্মৃতিকথা কান পেতে শুনি
তুমি যে তাদের চিত্তে নিশিদিন জ্বালায়েছ মহাভাব-জীবনের ধুনি।

অস্তদিগন্তের কোলে নেমে আসে আয়ুসূর্য শঙ্খ বাজে আসন্ন সন্ধ্যার,
তব নাম জপে জপে এ মৃন্ময় দেহে হ'ল রূপান্তর। অলকানন্দার
স্রোতে অবগাহনের ডাক এসেছে আমার,—তুমি মোরে হাত ধরে চলো নিয়ে,
অমৃতের উদ্ভাসনে আনন্দের উজ্জীবনে, মর্ত্যকায়া হেথা ফেলে দিয়ে
চলে যাই আপনার ঘরে, যেথা হ'তে এসেছিনু বৃন্তচ্যুত পত্রসম
কামনার দুরন্ত ঝঞ্ঝায় উড়ে, মোর মৌন সাধনার সিদ্ধেশ্বরী মম!

প্রাণের প্রণাম লহ, মুক্ত করি দাও ভব-বন্ধনের অষ্ট মহাপাশ
জানি এই বিশ্ব-মাঝে সমাহিত রবে মোর স্মৃতিহারা দুঃখ-ইতিহাস,
হেথা হ'তে লভিলাম হিংসাচ্ছন্ন স্বার্থগৃধ্র সভ্যতার রূঢ় আচরণ
হেথা মোর আবাল্যের স্নায়ুসূত্র ছিন্ন হয়ে মর্মান্তিক পেয়েছে বেদন
কালের কুটিল চক্রে। তুমি মোরে দাও ঠাঁই দয়া ক'রে চরণে তোমার,
এ-সংসারে ফিরে যেন অত্যাচার নিত্য সয়ে করি নাক' সদা হাহাকার!

কথাপ্রসঙ্গে

উদ্বোধনের পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা, বিজ্ঞাপনদাতা এবং হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুবর্গকে আমরা ৺বিজয়ার আন্তরিক শুভেচ্ছা নিবেদন করিতেছি।

[অগ্রহায়ণের 'উদ্বোধন' মাসের তৃতীয় সপ্তাহে পৌঁছিবে]

'কে জানে কালী কেমন?'

শৈশব হইতেই আমরা 'মা কালী'র পট বা প্রতিমার সহিত পরিচিত, ভক্তিতে না হউক, ভয়েই—প্রণাম করিতেও অভ্যস্ত। নানা তীর্থে বিশেষ বিশেষ স্থানে ভগ্ন বা অভগ্ন প্রস্তর-প্রতীকে কালীমূর্তির সাদৃশ্য না দেখিয়াও আমরা পাণ্ডা বা পুরোহিতের মন্ত্রপাঠ শুনিয়া আবৃত্তি করিয়া থাকি: 'সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে……।' রোগে বিপদে 'মা, মা' বলিয়া ডাকি, দুঃখকষ্ট দূর করিবার জন্য কাতর প্রার্থনাও জানাই। কোথায় মা, কে এই মা? কেনই বা এত সুন্দর রূপ থাকিতে তিনি ঐ ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন? কেনই বা এত মধুর নাম থাকিতে তিনি এই করাল 'কালী' নামে সন্তানের আহ্বান শুনিতে চান?

এ সকল প্রশ্ন যে একজনেরই মনে একই সময়ে উদিত হয়, তাহা নয়; বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মনে এই সব প্রশ্ন উঠিয়া থাকে। ভারতীয় এবং হিন্দু কৃষ্টির মধ্যে যাহাদের জন্ম, তাহারা শুনিয়া শুনিয়া কতকটা অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে—কালী বা 'মা কালী' জগন্মাতা, দুর্গারই এক মূর্তি দৈত্যনিধনে আবির্ভূতা, কেহ বা শাস্ত্রাদি পড়িয়া বুঝিয়াছেন, ইনি আদ্যাশক্তি—ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরেরও জননী! বিদেশী ও অন্যধর্মাবলম্বীরা 'নগ্ননিষ্ঠুর' এই কালীমূর্তির সম্মুখে সুকুমাররুচিসম্পন্ন দার্শনিক হিন্দুর ভক্তি ও গদ্‌গদচিত্তে প্রণাম দেখিয়া বিস্মিত হন। যাহারা পরধর্ম-অসহিষ্ণু, তাহারা তো প্রকাশ্যেই বিদ্রূপ করে, বিরুদ্ধতা আচরণও করিয়া থাকে।

মূর্তিপূজার এত বিরোধিতা সত্ত্বেও দেখা যাইতেছে, প্রতিমাপূজা বাড়িয়াই চলিয়াছে। সর্বত্র যে যথোচিতভাবে পূজা হইতেছে, সর্বত্র যে সকলে প্রকৃত তত্ত্ব জানে, এ কথা বলা যায় না; তবে সর্বত্র একটা জিজ্ঞাসা আছে: কে এই কালী, কেন তাঁহার এমন রূপ—কেন তাঁহার এমন নাম?

কোথায় ইহার উত্তর মিলিবে? সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণ, শাস্ত্র-পুরাণের রচয়িতা মুনিগণ কি বলিয়াছেন, তাহা অবশ্যই সন্ধান করিতে হইবে। আমাদের সর্বশেষ আশ্রয় সেই মহান্ সাধকগণ, যাঁহারা এই মাতৃতত্ত্ব হৃদয়ে অনুভব করিয়াছেন, এবং হৃদয়ের পরিপূর্ণতায় শত সহস্র সঙ্গীত মাতৃপদে অর্ঘ্য নিবেদন করিয়াছেন, এমনই এক সাধককবি গাহিয়াছেন—'কে জানে কালী কেমন? ষড়্‌দরশনে যার না পায় দরশন'—এই কালীতত্ত্ব বা মাতৃতত্ত্ব জানিবার বিষয় নয়, বুঝিবার ও অন্তরের অন্তরে অনুভব করিবার বস্তু।

শিশু কি জানে তাহার মায়ের ইতিবৃত্ত? সে কি জানে তাহার জন্মতত্ত্ব? তবে সে কি বুঝে না—'আমি মার, মা আমার'? মা আমার জনয়িত্রী—ইহা শিশুর অনুভূতি নয়; শিশু জানে—মা আমার ক্ষুধার অন্ন, মা আমার বিশ্রামের শয্যা! এই শিশুসুলভ মন লইয়াই মাতৃতত্ত্ব বুঝিতে হইবে, দার্শনিকের যুক্তি-শৃঙ্খলার জালে এ তত্ত্ব ধরা পড়িবে না!

তথাপি মানুষ—বা মানুষের মন সেই অধরাকে ধরিবার জন্য কত চেষ্টাই না করিয়াছে ও করিতেছে। কেন? মা যে নিজেই লুকোচুরি খেলা করেন—সন্তানই তো মায়ের একান্ত খেলার সাথী! মাঝে মাঝে কি আমরা দেখি না—হাস্যময়ী জননী ক্রন্দনরত শিশুর সহিত এ ঘরে ও ঘরে লুকোচুরি খেলিতেছেন? শেষে যখন শিশু সন্ধান ছাড়িয়া হতাশ হইয়া কাঁদিতে বসে, তখন লীলাচপলা জননীর আর এক খেলা শুরু হয়, সন্তানকে ক্রোড়ে লইয়া, স্নেহে অভিষিক্ত করিয়া, অশ্রু মুছাইয়া দিয়া, মুখে পীযূষধারা বর্ষণ করিতে করিতে ভাষাহীন আভাসে যেন তাহাকে বলিতে থাকেন, 'দুষ্ট ছেলে—এটুকু বোঝ না—আমি তোমারই, তুমি আমারই! এটুকু বোঝ না, তুমি আমি এক!' স্তনপানরত শিশু মৃদু হাসিয়া বিজ্ঞের মতো যেন বলিতে চাহে, 'সবই জানি, সবই বুঝি, শুধু বুঝিলাম না তোমার লীলার এই নিষ্ঠুরতা।'

ইহা কি শুধু ঐ শিশুরই অকথিত কথা? বিশ্বের প্রতিটি মানুষ অহরহ এই কথাই বলিতেছে—মনে মনে বলিতেছে তাহার অদৃশ্য জননীকে—জগজ্জননীকে। সাধক কবি তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াই ব্যথা ও অভিমানের সুরে গাহিয়াছেন,

কালী, এবার ঘুচালি লেঠা!
ভবে এনে করলি আমায় লোহাপেটা।

শুধু এ যুগের সাধক বা এ দেশের কবিই যে মাকে লক্ষ্য করিয়া ছন্দ রচনা করিয়াছেন, তাহা নয়, মায়ের লুকোচুরি-খেলাও তো আজিকার নয়, এ যে চিরকালের!

শুদ্ধসত্ত্ব দেবতারাও মাকে চিনিতে পারে নাই। তাহারাও মায়ের কাছে অজ্ঞান শিশু। তাহারাও মনে করিয়াছিল, আমাদের শক্তিতেই আমরা শত্রু জয় করিয়াছি। স্নেহময়ী জননী জ্ঞানময়ী মূর্তিতে আসিয়া তাহাদের বুঝাইয়া দিলেন, সকল শক্তি আমারই, আমারই শক্তিতে তোমরা শক্তিমান্! এই শক্তিই সৃষ্টি-কালে সৃজনাশক্ত, এই শক্তিই স্থিতিকালে পালনীশক্তি, এই শক্তিই প্রলয়-কালে সংহারশক্তি!

এই রহস্য অবগত হইয়াই তো ঋষিরা গাহিয়া উঠিলেন, 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রয়ন্ত্য-ভিসংবিশন্তি তদ্ বিজিজ্ঞাসস্ব। তদ্‌ব্রহ্মেতি।'

যাহা হইতে চরাচর জাত হইতেছে—যাহা দ্বারা জীবনধারণ করিতেছে—শেষে যাহাতে লয় পাইতেছে, প্রবেশ করিতেছে—তাহাকে জানো! তাহাই ব্রহ্ম।

এই ব্রহ্ম নির্গুণ না সগুণ? অবশ্যই সগুণ ব্রহ্ম, ইনিই কালী। ইঁহারই সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন: যাকে ব্রহ্ম বলো, তারেই আমি 'কালী' ব'লে কই। ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ। এই সমন্বয়ী সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে মানব-মনকে দর্শনশাস্ত্র ও সাধনার বহু সোপান অতিক্রম করিতে হইয়াছে।

ষড় দর্শনে এ তত্ত্বের দর্শন পাওয়া যায় না, এ কথা ঠিক, তথাপি 'দর্শনে'র সন্ধান কখনও ব্যাহত থাকে নাই। মানব-মন যুক্তির সোপান-পথেই চিন্তা করিতে অভ্যস্ত! সাংখ্যদর্শনেই প্রথম পাওয়া যায়—পুরুষ-প্রকৃতির কথা! নির্বিকার চৈতন্য পুরুষ-সান্নিধ্যেই প্রকৃতির অসংখ্য বিকৃতি 'সৃষ্টিস্থিতিলয়' বা আরও বিস্তারিতভাবে 'জন্ম বৃদ্ধি পরিণাম অপক্ষয় মৃত্যু' নামে পরিচিত। এ তত্ত্ব নির্ভুলভাবে নির্ণীত হইয়াছে যে, যাহা হইতে উৎপত্তি তাহাতেই লয়; একান্ত শূন্য হইতে সৃষ্টি অসম্ভব, অতএব নিঃশেষ শূন্যে লয়ও সম্ভব নয়, সৃষ্টির

মূল আদিকারণভূত নিশ্চয় কিছু আছে। সাংখ্যের সিদ্ধান্ত : প্রকৃতিই সেই মূল উপাদান, কিন্তু প্রকৃতি জড়, চৈতন্যময় পুরুষ-সান্নিধ্যেই প্রকৃতি ক্রিয়াশীল। সৃষ্টিস্থিতিলয় সমুদ্র-বক্ষে তরঙ্গ যেন উঠিতেছে ভাসিতেছে পড়িতেছে। এইখানে অদ্বৈতবেদান্ত আসিয়া সিদ্ধান্ত করিতেছে : তরঙ্গ সমুদ্র ছাড়া নয়—সমুদ্রেরই এক প্রতীয়মান অবস্থা। নিস্তরঙ্গ সমুদ্রও সমুদ্র ; তরঙ্গ-সঙ্কুল সমুদ্রও সমুদ্র—শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় : জল হেললে দুললেও জল, স্থির থাকলেও জল। সাপ এঁকে বেঁকে চললেও সাপ, কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে থাকলেও সাপ! ব্রহ্ম স্ব-স্বরূপে অবস্থান করলেও ব্রহ্ম, সৃষ্টিস্থিতিলয় করলেও ব্রহ্ম! সৃষ্টিস্থিতিলয়-কারিণী কালীব্রহ্মের অভিন্না স্বরূপশক্তি। দার্শনিক ইঁহাকে অনির্বচনীয়া অঘটনঘটনপটীয়সী মায়া বলিয়া অধ্যারোপ-অপবাদ করিবেন। সাধক ইঁহাকে মাতৃরূপিণী মহামায়া বুঝিয়া মাতৃনামের মধুর রস আস্বাদন করিবেন।

বর্তমান যুগে বিশ্বকল্যাণে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার ব্যাকুল আহ্বানে এই মধুর মহান্ মাতৃ-ভাবকেই জাগ্রত করিয়াছেন। দক্ষিণেশ্বরে মা কালীর লীলাকেই কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও সাধনা; শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ সেই মাতৃশক্তি প্রত্যক্ষ করিয়াই তাঁহাকে লোক-কল্যাণে দীর্ঘকাল জাগ্রত থাকিতে প্রার্থনা করিয়াছেন। জননীর অনিমেষ নয়নই যে সন্তানের মানুষ হইবার জন্য একান্ত প্রয়োজন। তন্ত্রপুরাণে বলা হয় কলিকালে অন্যান্য দেবতা নিদ্রিত, 'কলৌ জাগর্তি কালিকা'—কলিকালে এই কালিকা জাগিয়া আছেন। তিনি ঘুমাইলে সব আবার মহাকালের প্রলয়-কল্লোলে ডুবিয়া যাইবে।

তাহার পূর্বে—যে লীলা এখন শুরু হইয়াছে, তাহার পূর্ণ পরিণতি অবশ্যম্ভাবী। অবোধ সন্তান মায়ের করাল রূপ দেখিলে ভয় পায়, তাই মাঝে মাঝে মাকে শান্ত মধুর মূর্তিতেও দেখা দিতে হয়। কিন্তু বীর সন্তান মায়ের রুদ্র মূর্তি দেখিয়া ভীত হয় না—সে জানে দুষ্ট অসুরশক্তি নিধনের জন্য পালনী নারায়ণী শক্তির এ ভাবেরও প্রয়োজন আছে।

সর্বোপরি বুঝিতে হইবে—শুধু সুখ, শুধু আলো, শুধু শুভ কখন প্রকৃত সত্য নয়, সংসারের পূর্ণ রূপ নয়। প্রকৃতির অনাবৃত সৌন্দর্য-সম্ভারে কখন পুষ্পলতার অপূর্ব শোভা, কখনও রুক্ষশাখার করুণ ক্রন্দন, কোথাও শস্য-শ্যামল পূর্ণপ্রান্তর—কোথাও ধূ ধূ মরুভূমির শূন্য শ্মশান। মহাপ্রকৃতির নগ্নরূপেও তাই সৃষ্টিস্থিতিলয়ের পর্যায়-লীলা চলিয়াছে। তাঁহার কটিদেশে করমেখলা কর্মফল-অনুযায়ী জীবসৃষ্টির ইঙ্গিত, পীনোন্নত বক্ষ চিরযৌবনা প্রকৃতির পালনী-শক্তির এবং দন্তুর আননে লোলজিহ্বা অবশ্যই সংহার বা লয়ের প্রতীক! লয়ের অর্থ—আত্মভাবে পুনঃপ্রবেশ! অনাদি অনন্ত বিশ্বব্যাপিনী চৈতন্যশক্তি দেশকালের ঊর্ধ্বে—তাই মেঘবর্ণা আবরণহীনা মুক্তপাশা এলোকেশী মহাকালের বক্ষে নৃত্যরতা!

যুগপৎ রুদ্রমধুর-লীলা—বিপরীতভাবপ্রীতি সাধারণের কাছে দুর্বোধ্য, কিন্তু সাধকের কাছে ইহা সুস্পষ্ট যে, আলোক ও আঁধারের কারণ একই, সুখ ও দুঃখের উৎস একই! মঙ্গল ও অমঙ্গলকে একই মঙ্গলার আশীর্বাদ ও ইচ্ছা বলিয়া যে মনে করিতে পারে, এবং

'সাহসে যে দুঃখদৈন্য চায়,
মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে,
কালনৃত্য করে উপভোগ,
মাতৃরূপা তারি কাছে আসে।'

চতুর্বর্গ অথবা পুরুষার্থচতুষ্টয়

[পূর্বানুবৃত্তি]

ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য

জপের মধ্যে আবার উপাংশু জপ ও মানস-জপ মানস-কর্মের অন্তর্ভূত। যে জপ অপরে শুনিতে পায়, ঐরূপ জপই বাচিক কর্মের অন্তর্গত। এই কায়িক, বাচিক ও মানসিক ত্রিবিধ কর্মই সকাম ভাবে অনুষ্ঠিত হইলে তাহা হইতে অর্থ (টাকাপয়সা, জমি, ধান ইত্যাদি) বা কাম (কাম্য বিষয়) সিদ্ধ হয়। এই কাম্য বিষয়—ইহলৌকিক, যেমন মনোজ্ঞ বেশভূষা, বস্ত্র, খাদ্য, পানীয়, দৃঢ় শরীর ইত্যাদি এবং পারলৌকিক, যেমন স্বর্গ, মহ, জন, তপ প্রভৃতি লোকে জন্ম ও সেই সেই লোকের যোগ্য সুখ প্রভৃতি ধর্ম হইতে লাভ হয়। সুখমাত্রই ধর্মজন্য এবং দুঃখমাত্রই অধর্মজন্য।

তবে যে ইহলোকে দেখা যায়, ধার্মিক ব্যক্তি অনেক সময় অধার্মিক অপেক্ষা অধিক দুঃখ অনুভব করেন, তাহা দুই প্রকারে নিষ্পন্ন হয়। ধর্ম অর্জন করিতে হইলে দুঃখ অবশ্যম্ভাবী ; অবশ্য এই দুঃখ পরিণামে সুখের কারণ হয়। অথবা বর্তমান জন্মে ধার্মিক ব্যক্তি ধর্মের অনুষ্ঠান করিলেও অতীত জন্মের অধর্মরূপ প্রারব্ধবশতঃ এই জন্মে অবশ্যই দুঃখ প্রাপ্ত হন। ধর্ম ও অধর্ম সমপরিমাণে মিলিত হইয়া যখন ফল দেয়, তখন মনুষ্য-জন্মলাভ হয়। কেবল অধর্মের ফলে পশু প্রভৃতি জন্ম হয়। কেবল ধর্মের দ্বারা দেবজন্ম হয়।

আবার এই কায়িক, বাচিক ও মানসিক ত্রিবিধ ধর্মাত্মক কর্ম নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠান করিলেই চিত্তশুদ্ধি হয়। চিত্তশুদ্ধির অর্থ—কামনা-বাসনা নিবৃত্ত হইয়া চিত্তের আত্মাভিমুখতা। চিত্তশুদ্ধি হইলে আত্মজ্ঞানের ইচ্ছা হয় এবং কর্ম পরিত্যাগপূর্বক কেবল জ্ঞান-নিষ্ঠার যোগ্যতা সিদ্ধ হয়। তখন বেদান্ত-বিচার হইতে অথবা শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন হইতে আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হইলে মুক্তি অবশ্যম্ভাবী। এই ভাবে ধর্মও পরম্পরাক্রমে মুক্তিরূপ পুরুষার্থের কারণ হয়।

ভাষ্যকার এই ধর্মকে দুই ভাগে ভাগ করিয়াছেন। যথা প্রবৃত্তি-রূপ ধর্ম ও নিবৃত্তি-রূপ ধর্ম। সকাম ও নিষ্কাম—উভয় প্রকার কর্মই (শাস্ত্রীয়) ভাষ্যকার-মতে প্রবৃত্ত্যাত্মক ধর্ম। আর শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধি (সবিকল্প), শ্রদ্ধা, আত্মবিষয়ক শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ইত্যাদি নিবৃত্ত্যাত্মক ধর্ম। কিন্তু শ্রীধর স্বামী প্রভৃতির মতে নিষ্কাম কর্মও নিবৃত্ত্যাত্মক ধর্ম।

এই শম প্রভৃতি নিবৃত্ত্যাত্মক ধর্ম হইতেই অব্যবহিত পরে আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হওয়ায় উহা সাক্ষাৎ মুক্তির কারণ। অবশ্য 'সাক্ষাৎ' মানে এখানে কেবলমাত্র জ্ঞানের ব্যবধান থাকে। নিষ্কাম কর্মের ও মুক্তির মধ্যে যেমন চিত্তশুদ্ধি, বিবিদিষা, সন্ন্যাস, শ্রবণাদি ও জ্ঞানোৎপত্তির ব্যবধান থাকে, নিবৃত্ত্যাত্মক শমাদি এবং মুক্তির মধ্যে সেরূপ অনেকের ব্যবধান থাকে না ; কেবলমাত্র জ্ঞানের ব্যবধান থাকে। এই জন্য নিবৃত্ত্যাত্মক ধর্ম সাক্ষাৎ মুক্তির কারণ এবং প্রবৃত্ত্যাত্মক ধর্ম পরম্পরায় মুক্তির কারণ। সকাম কর্ম হইতে কোন কালেই মুক্তির আশা নাই। সুতরাং সকাম কর্ম হইতে স্বর্গাদিরূপ কাম- ও অর্থ-লাভই হয়। কাজেই উহা সংসারের কারণ। সগুণ-ঈশ্বরোপাসনা বা ধ্যান প্রভৃতি মানস-কর্মের অন্তর্গত।

কখন কখন কর্ম বলিতে পূর্বোক্ত কায়িক ও বাচিক কর্ম ধরা হয়। সেই পক্ষে উপাসনা কর্ম হইতে পৃথক্। এই পক্ষে কেবল সকাম কর্ম বা কেবল নিষ্কাম কর্ম হইতেও ব্রহ্মলোক (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব-এর লোক) লাভ হইয়া যে ক্রমমুক্তি[১], তাহা হয় না। কেবল ধর্মাত্মক কর্মের দ্বারা স্বর্গলোক পর্যন্ত গতি হয়। কিন্তু কর্ম ও উপাসনা অথবা কেবল উপাসনা হইতে ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তিও হয়। তবে সকাম কর্ম ও উপাসনা বা সকাম উপাসনা হইতে ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তি হইলেও পুনরায় মনুষ্যাদি-লোকে ফিরিয়া আসিতে হয়। নিষ্কাম কর্ম ও নিষ্কামভাবে উপাসনা বা নিষ্কামভাবে কেবল উপাসনার ফলে যদি ব্রহ্মলোক লাভ হয়, তাহা হইলে সেইখানে ঈশ্বরকৃপাদি বশতঃ আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া যাওয়ায় ব্রহ্মার (হিরণ্যগর্ভ বা বিরাট) আয়ুর শেষে মুক্তিলাভ হইয়া যায়। আবার যদি নিষ্কাম কর্ম ও উপাসনার ফলে চিত্তশুদ্ধি প্রভৃতি ক্রমে এই জন্মে জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া যায়, তাহা হইলে আর কোন লোকে গতি হয় না, সাক্ষাৎ মুক্তি হইয়া যায়।

নিষ্কাম কর্ম ও উপাসনার ফলে এই জন্মে জ্ঞান উৎপন্ন হইল না, অথচ জ্ঞানোৎপত্তিতে যদি অধিক বিলম্ব না থাকে, তাহা হইলে ব্রহ্মলোকে গতি না হইয়া মৃত্যুর পর মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া সেই জন্মে অথবা তাহার পর মনুষ্যজন্মে জ্ঞানলাভ করিয়া মুক্ত হইয়া যায়। কারণ ব্রহ্মলোকে যাইলে অনেককাল কৈবল্য-মুক্তির জন্য অপেক্ষা করিতে হয়। তদপেক্ষা মনুষ্যজন্মে অল্পকালেই শরীরত্যাগের পর কৈবল্যমুক্তি হয়।' এইজন্য যাঁহারা অত্যন্ত বৈরাগ্যবান্, তাঁহারা ব্রহ্মলোকে যাইয়া ক্রমমুক্তি চান না, কিন্তু এই জন্মেই মুক্ত হইতে চেষ্টা করেন।

যে আত্মজ্ঞানে মুক্তি হয়, সেই আত্মজ্ঞান অবশ্য কোন একটি নির্দিষ্ট কারণে অথবা কোন নির্দিষ্ট দেশকাল প্রভৃতি অবস্থায় উৎপন্ন হয়, এমন নহে। কিন্তু বিভিন্ন অধিকারীর পক্ষে বিভিন্ন কারণে তাহা হইয়া থাকে। যেমন হিরণ্যগর্ভের জ্ঞান আপনা হইতে উৎপন্ন হয়; কাহারও বা ঈশ্বরকৃপা, কাহারও গুরুকৃপা, কাহারও বিচার, কাহারও অতিশয় পুণ্য, তপস্যা ইত্যাদি হইতে উৎপন্ন হয়। এইভাবে 'ধর্মে'র আলোচনা সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইল। 'অর্থ' ও 'কামে'র সম্বন্ধে পূর্বেই সংক্ষেপে বর্ণনা করা হইয়াছে। সুতরাং এখন চরম ও পরম পুরুষার্থ 'মুক্তি'র সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া প্রবন্ধের সমাপ্তি করা হইতেছে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে—সকল জীব সুখ ও দুঃখনিবৃত্তি চায়। কিন্তু আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তি বা নিরতিশয় সুখপ্রাপ্তি কি উপায়ে হয় অথবা ঐরূপ আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি ও নিরতিশয় সুখপ্রাপ্তি সম্ভব কি না, তাহা শাস্ত্র ব্যতীত কেহই জানিতে পারে না। এইজন্য এই সম্বন্ধে শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ।

মুক্তির স্বরূপ-সম্বন্ধে নানা বাদীর নানা মত। চার্বাক-মতে স্থূল দেহের মৃত্যুকে মুক্তি বলে। জৈন-মতে অষ্টপ্রকার[২] কর্মের ক্ষয়ে লৌকিক আকাশে বদ্ধ না হইয়া ঊর্ধ্বাকাশে গমনই মুক্তি। বৌদ্ধ-মতে নির্দোষ জ্ঞানধারাই মুক্তি। বৈশেষিক-মতে স্বসমানাধিকরণদুঃখ-

১ মুক্তি দুই প্রকার: ক্রমমুক্তি ও সাক্ষাৎমুক্তি। অন্য ভাবে দুই প্রকার: জীবন্মুক্তি ও কৈবল্যমুক্তি। মুক্তির সম্বন্ধে একটু পরেই আলোচনা করা হইতেছে।

২ জ্ঞানাবরণ, দর্শনাবরণ, বেদনীয়, মোহনীয়, আয়ু, নাম, গোত্র, অন্তরায়—এই ৮ প্রকার কর্ম।

প্রাগভাবাসমানকালীন দুঃখধ্বংসকে মুক্তি বলা হয়। প্রাভাকর-মতে ও দুঃখনিবৃত্তিকে মুক্তি বলা হয়। ভাট্ট-মতে নিত্যসুখের অভিব্যক্তিকে মুক্তি বলে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে পার্থসারথিমিশ্র বলেন, ভাট্ট-মতেও আত্মার যাবতীয় বিশেষ গুণের নিবৃত্তিই মুক্তি। ভাস্করাচার্য-মতে ব্রহ্মে জীবাত্মার লয়ই মুক্তি। অদ্বৈতবেদান্ত-মতে অজ্ঞান-নিবৃত্তি হইলে কেবল আত্মার অবস্থানই মুক্তি।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে: এই অজ্ঞান-নিবৃত্তি কি অজ্ঞানের অত্যন্তাভাব অথবা অজ্ঞানের ধ্বংস? যদি অজ্ঞানের অত্যন্তাভাবকেই অজ্ঞান-নিবৃত্তি বলা হয়, তাহা হইলে অত্যন্তাভাব অনাদি বলিয়া জ্ঞানের পূর্বেও বিদ্যমান থাকায় জ্ঞানের পূর্বেও মুক্তি বিদ্যমান ছিল বলিতে হইবে। তাহা হইলে জ্ঞানের আর প্রয়োজন কি? সকলে অনায়াসেই মুক্ত আছে। আর যদি অজ্ঞানের ধ্বংসকে অজ্ঞান-নিবৃত্তি বলা হয়, তাহা হইলে সেই ধ্বংস ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন অথবা অভিন্ন? যদি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হয়, তাহা হইলে দ্বৈতবাদের আপত্তি হয়। যেহেতু ব্রহ্ম এবং অজ্ঞানধ্বংস এই দুইটি পদার্থ হইল। যদি বলা যায়, ব্রহ্ম পারমার্থিক বস্তু, কিন্তু অজ্ঞানধ্বংস পারমার্থিক নহে, উহা মিথ্যা (অনির্বাচ্য বা ব্যাবহারিক)। অতএব দুইটি পারমার্থিক বস্তু না থাকায় দ্বৈতাপত্তি হয় না।

তাহা হইলে প্রশ্ন হইবে, অজ্ঞানধ্বংস যদি মিথ্যা হয়, তবে মুক্তি পদার্থটিও মিথ্যা হইয়া গেল এবং অজ্ঞানের ধ্বংস মিথ্যা হইলে অজ্ঞানের সত্যতাপত্তি। যেমন যেখানে রজত আছে, সেখানে রজতাভাবটি মিথ্যা। ইহার উত্তরে অদ্বৈতবাদী বলেন—না, অজ্ঞানের ধ্বংসটি অধিষ্ঠান-ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া উহা পারমার্থিক। বেদান্ত-মতে মিথ্যাবস্তুর ধ্বংস অধিষ্ঠানস্বরূপ। যেমন মিথ্যারজতের নাশটি ইদমবচ্ছিন্নচৈতন্য-স্বরূপ, তাহা হইতে অতিরিক্ত নহে। সেইরূপ মিথ্যা অজ্ঞানের ধ্বংস ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া দ্বৈতাপত্তি হয় না এবং মুক্তির মিথ্যাত্বাপত্তিও হয় না।

প্রশ্ন হইতে পারে, অজ্ঞানের ধ্বংসটি ব্রহ্ম-স্বরূপ হইলে ব্রহ্ম যেমন অনাদি, জ্ঞানের পূর্বে বিদ্যমান থাকে, সেইরূপ অজ্ঞানের ধ্বংসটিও অনাদি হওয়ায় জ্ঞানের পূর্বে বিদ্যমান থাকে। সুতরাং জ্ঞানের প্রয়োজন কি? ইহার উত্তরে অদ্বৈতবাদী বলেন, উহা অনাদি হইলেও অজ্ঞানের বলে উহার অবিদ্যমানতা ব্রহ্মে আরোপিত হয়। জ্ঞানই সেই আরোপ দূর করে, সেই জন্য জ্ঞানের প্রয়োজন আছে। সুতরাং আত্মজ্ঞানের (জীব ও ব্রহ্মের অভেদ-জ্ঞান) দ্বারা মুক্তিকে সাধ্য বলা হয়।

বেদান্তবাক্য-জন্য জ্ঞান উৎপন্ন হইলেই অজ্ঞান-নিবৃত্তি অবশ্যই হইয়া যায়; আর পরমানন্দ-ব্রহ্মপ্রাপ্তি তাহারই অবশ্যম্ভাবী ফল। আত্মা বা ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ। এই আত্মাতে কোন কালে দুঃখের লেশ নাই, দুঃখের লেশ দূরের কথা, দ্বৈতের লেশ নাই। অজ্ঞানবশতই দ্বৈতের আরোপ করিয়া জীব দুঃখভোগ করে। জ্ঞানের ফলে সমস্ত দ্বৈত নিবৃত্ত হওয়ায় আর কোন দুঃখ, ভয় থাকে না। তখন আত্মা নিজ পরম নিত্য আনন্দে অবস্থান করে। চার্বাক হইতে বেদান্ত পর্যন্ত মুক্তির স্বরূপে বিবাদ থাকিলেও মুক্তিতে যে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয়—এ-বিষয়ে কাহারও বিবাদ নাই। সকলেই সুখের প্রাপ্তি অপেক্ষা আগে দুঃখ দূর করিতে চায়। সুতরাং মুক্তিতে দুঃখের নিবৃত্তি অবশ্যম্ভাবী। উহাই পরম-পুরুষার্থ।

পুনর্জন্ম

স্বামী বিবেকানন্দ

[নিউইয়র্ক হইতে প্রকাশিত দার্শনিক পত্রিকা 'Metaphysical Magazine' এর জন্য লিখিত মার্চ, ১৮৯৫]

'অতীতে তোমার ও আমার বহু জন্ম হইয়া গিয়াছে, হে শত্রুনাশকারী (অর্জুন), আমি সে-সবই অবগত আছি, কিন্তু তুমি অবগত নও।'—গীতা।

সকল দেশে ও সকল কালে যে-সকল কূট সমস্যা মানুষের বুদ্ধিকে বিমূঢ় করিয়াছে, তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা জটিল মানুষ নিজে। যে অগণিত রহস্য ইতিহাসের আদি যুগ হইতে মানুষের শক্তিকে সমাধানের জন্য আহ্বান জানাইয়া ঐ কার্যে ব্রতী করিয়াছে, তন্মধ্যে গভীরতম রহস্য হইল মানুষের স্বরূপ। ইহা সমাধানের অসাধ্য একটি প্রহেলিকামাত্র নয়, ইহা সকল সমস্যার অন্তর্নিহিত মূল সমস্যাও বটে। মানুষের এই স্বরূপটিই আমাদের সর্বপ্রকার জ্ঞান, সর্বপ্রকার অনুভূতি ও সর্বপ্রকার কার্যকলাপের মূল উৎস ও শেষ আধার। এমন কোন সময় ছিল না, এমন কোন সময় আসিবেও না যখন মানুষের নিজের স্বরূপ তাহার সর্বাধিক মনোযোগ আকর্ষণ করিবে না!

মানুষের সকল প্রকার ক্ষুধার মধ্যে সত্যানুসন্ধিৎসারূপ যে-ক্ষুধা মানুষের নিজ সত্তার সহিত নিবিড়ভাবে জড়িত আছে, বহির্বিশ্বের মূল্যায়ন-কল্পে অন্তঃরাজ্য হইতে কোন মানদণ্ড আবিষ্কারের জন্য যে সর্বগ্রাসী আকাঙ্ক্ষা বিদ্যমান, এবং এই পরিবর্তনশীল বিশ্বে একটি অপরিবর্তনীয় স্থির বিন্দু আবিষ্কার করিবার জন্য যে অনিবার্য ও স্বভাবসিদ্ধ প্রয়োজন অনুভূত হয়, সেগুলির দ্বারা পরিচালিত হইয়া মানুষ যদিও মধ্যে মধ্যে স্বর্ণকণিকা-ভ্রমে ধূলিমুষ্টিকে ধরিতে সচেষ্ট হইয়াছে, এমন কি যুক্তি ও বুদ্ধি অপেক্ষাও উচ্চতর রাজ্যের কোন বাণীর প্রেরণা পাইয়াও সে অনেক সময়ই অন্তর্নিহিত দেবত্বের মর্ম অনুধাবন করিতে সক্ষম হয় নাই, তথাপি যতদিন হইতে এই অনুসন্ধান আরম্ভ হইয়াছে, তাহার মধ্যে এমন কোন সময় দেখিতে পাওয়া যায় না, যখন কোন না কোন জাতি বা কতিপয় ব্যক্তি সত্যের বর্তিকা ঊর্ধ্বে তুলিয়া ধরেন নাই।

অতীতে অথবা আধুনিক কালে, বিশেষতঃ প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এমন লোকের কখনও অভাব ঘটে নাই, যাঁহারা পারিপার্শ্বিক ও অপ্রয়োজনীয় খুঁটিনাটি বিষয়ে একদেশদর্শী বিবেচনাহীন এবং কুসংস্কারপূর্ণ অভিমত স্বীকার করিবার ফলে, কখন বা বিবিধ দর্শনমত ও সম্প্রদায়ের বক্তব্যের অস্পষ্টতার দরুন বিরক্তির ফলে, এবং দুঃখের সহিত বলিতে হয়, অনেক সময় সঙ্ঘবদ্ধ পৌরোহিত্যের ভয়াবহ কুসংস্কারাদির প্রভাবে চরম বিপরীত মতে উপস্থিত হইয়াছেন, এবং এই-সকল কারণে হতাশ হইয়া শুধু যে এ-সম্পর্কে অনুসন্ধান পরিত্যাগ করিয়াছেন তাহাই নহে, তাঁহারা ঘোষণা করিয়াছেন, এই কার্য নিষ্ফল এবং অনাবশ্যক। দার্শনিকেরা ক্ষোভ বা বিদ্রূপ প্রকাশ করিতে পারেন এবং পুরোহিতগণ তরবারির সাহায্য পর্যন্ত স্বীকার করিয়া স্বীয় ব্যবসায় পরিচালনা করিতে পারেন, কিন্তু সত্য একমাত্র তাঁহাদেরই

নিকট আবির্ভূত হয়, যাঁহারা সত্যের জন্যই লাভালাভের চিন্তা ছাড়িয়া নির্ভীক হৃদয়ে সত্যেরই পীঠস্থানে উপাসনা করিয়া থাকেন।

মানুষের বুদ্ধি যখন জ্ঞানপূর্বক কোন বিষয়ে প্রযুক্ত হয়, তখনই তাঁহাদের নিকট আলোক উদ্ভাসিত হয়; এবং ধীরে ধীরে হইলেও ক্রমশঃ তাহা অজ্ঞাতভাবে অনুস্রুত হইয়া সমগ্র জাতির মধ্যে সঞ্চারিত হয়। দার্শনিকগণ দেখাইয়া দেন—কিরূপে মহাপুরুষেরা জ্ঞানের সঙ্গে সাধনা করিয়া থাকেন; এবং ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়—কিরূপে নীরবে ধীরে ধীরে সাধারণ জনসমাজে তাঁহাদের সাধনালব্ধ সত্য অনুপ্রবেশ করে।

মানুষ তাহার স্বরূপ সম্বন্ধে যতগুলি মত আজ পর্যন্ত স্বীকার করিয়াছে, তন্মধ্যে এই মতটিই সর্বাধিক প্রসার লাভ করিরাছে যে, আত্মা নামক একটি সত্যবস্তু আছে এবং উহা দেহ হইতে ভিন্ন ও অমর। যাঁহারা এইরূপ আত্মার অস্তিত্বে আস্থাবান্, তাঁহাদের মধ্যে আবার চিন্তাশীল অধিকাংশ ব্যক্তিই বিশ্বাস করেন যে, আত্মা বর্তমান জন্মের পূর্ব হইতেই আছে।

আধুনিক মানবসমাজে যাঁহাদের ধর্ম সুসংবদ্ধ ও সুপ্রতিষ্ঠিত, তাঁহাদের অধিকাংশই ইহা বিশ্বাস করেন, এবং যে-সব দেশ ভগবানের আশীর্বাদে সর্বাধিক উন্নত, সে-সব দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষীরা যদিও আত্মার অনাদিত্বে বিশ্বাস করার প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেই প্রতিপালিত হইয়াছেন, তথাপি তাঁহারা আত্মার পূর্বাস্তিত্বের সমর্থন করিয়াছেন। হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের ইহা ভিত্তিস্বরূপ। প্রাচীন মিশরীয়গণের মধ্যে শিক্ষিতশ্রেণী ইহাতে বিশ্বাস করিতেন, প্রাচীন পারসীকগণ এই সত্যে উপনীত হইয়াছিলেন, গ্রীক দার্শনিকগণ এই ধারণাকে তাহাদের দর্শন-চিন্তার ভিত্তি-প্রস্তররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন; হিব্রুগণের মধ্যে ফ্যারিসিগণ (আচারনিষ্ঠ প্রাচীন ইহুদী ধর্মসম্প্রদায়) ইহাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং মুসলমান ধর্মাবলম্বীদিগের মধ্যে সুফীরা প্রায় সকলেই এই সত্য স্বীকার করেন।

বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভিন্ন বিশ্বাসের উদ্ভব ও পরিপুষ্টির নিমিত্ত মনে হয়, বিশেষ ধরনের পরিবেশের প্রয়োজন আছে। মৃত্যুর পরে শরীরের এতটুকু মাত্র অংশও জীবিত থাকে—এই ধারণায় উপস্থিত হইতেই প্রাচীন জাতিসমূহের কত যুগ কাটিয়া গিয়াছে। আবার দেহ হইতে বিমুক্ত হইয়া মৃত্যুর পরও জীবিত থাকে, এইরূপ কোন বস্তু সম্বন্ধে যুক্তিপূর্ণ ধারণায় উপনীত হইতে আরও কত যুগ-যুগান্তের প্রয়োজন হইয়াছে। এমন একটি সত্তা আছে, যাহার দেহের সহিত সম্পর্ক সাময়িক, এইরূপ ধারণায় উপনীত হওয়া যখন সম্ভব হইল, কেবল তখনই এবং যে-সকল জাতির মধ্যে এইরূপ সিদ্ধান্তের উদয় হইতে পারিল, শুধু তাহাদেরই মধ্যে এই অনিবার্য প্রশ্ন উত্থিত হইয়াছিল: কোথায়? কখন?

প্রাচীন হিব্রুগণ আত্মা সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে অনুসন্ধিৎসা জাগাইয়া মনের স্থৈর্য নষ্ট করেন নাই। তাঁহাদের মতে মৃত্যুতেই সবকিছুর অবসান হয়। কার্ল হেকেল যথার্থই বলিয়াছেন, 'ইহা যদিও সত্য যে, (ইহুদীদের) নির্বাসনের পূর্ববর্তী বাইবেলের প্রাচীন অংশে হিব্রুগণ প্রাণ-তত্ত্বটির পৃথক্ পরিচয় পাইয়াছিলেন এবং তাহাকে তাঁহারা কখনও 'নেফেস' অথবা 'রুয়াখ' অথবা 'নেশামা' নামে অভিহিত করিয়াছেন, তথাপি এই-সকল শব্দ চৈতন্য বা আত্মার ধারণার দ্যোতক না হইয়া বরং প্রাণবায়ুরই দ্যোতক। আবার প্যালেস্টাইনের

অধিবাসী ইহুদীগণের নির্বাসনের পরবর্তী কালের রচনায় কোথাও কোন পৃথক্ সত্তাবিশিষ্ট অমর আত্মার উল্লেখ পাওয়া যায় না; কিন্তু সর্বত্র ঈশ্বর হইতে নিঃসৃত শুধু এমন একটি প্রাণবায়ুর উল্লেখ পাওয়া যায়, যাহা শরীর ধ্বংস হইলে দিব্য সত্তা 'রুয়াখে' অন্তর্হিত হয়।

প্রাচীন মিশর ও ক্যাল্ডিয়ার অধিবাসিগণের আত্মা সম্বন্ধে নিজস্ব বহু অদ্ভুত ধারণা ছিল। কিন্তু মৃত্যুর পরেও মানবের কোন একটি অংশ জীবিত থাকে বলিয়া তাহারা যে ধারণা পোষণ করিত, তাহার সহিত প্রাচীন হিন্দু, পারসীক গ্রীক বা অন্য কোন আর্যজাতির এ-সম্বন্ধীয় ধারণাগুলিকে যেন মিশাইয়া ফেলা না হয়। অতি প্রাচীনকাল হইতেই আত্মার ধারণা সম্পর্কে আর্য ও অ-সংস্কৃতভাষাভাষী ম্লেচ্ছদিগের সুস্পষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। বাহ্যতঃ মৃতদেহের শেষকৃত্য-অনুষ্ঠানের রীতি যেন ইহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ম্লেচ্ছগণ শবকে সযত্নে প্রোথিত করিয়া অথবা তদপেক্ষা জটিলতর বিরাট প্রক্রিয়া অবলম্বনে শবকে মমি-তে পরিণত করিয়া মৃতদেহ সংরক্ষণের জন্য যথাসাধ্য প্রয়াস পাইত, আর আর্যগণ সাধারণতঃ মৃতদেহকে অগ্নিতে ভস্মীভূত করিতেন।

ইহারই মধ্যে আমরা এই একটি প্রকাণ্ড গোপন রহস্যের সন্ধান পাই যে, আর্যজাতির—বিশেষতঃ হিন্দুদের সহায়তা ব্যতীত মিশরীয় হউক, এসীরীয় হউক বা ব্যাবিলনবাসীই হউক, কোন ম্লেচ্ছজাতিই এই ধারণায় উপনীত হইতে পারে নাই যে, আত্মা-নামক এমন একটি পৃথক্ বস্তু আছে, যাহা শরীর-নিরপেক্ষভাবে অবস্থান করিতে পারে।

যদিও হেরোডোটাস বলেন, মিশরীয়গণই সর্বাগ্রে আত্মার অমরত্বের ধারণা করিতে পারিয়াছিল, এবং তিনি মিশরীয়গণের মতবাদ-প্রসঙ্গে এইরূপ বলেন, 'আত্মা দেহ-নাশের পরেও বারংবার এক একটি জীবদেহে প্রবেশ করে এবং তাহার ফলে ঐ জীব বাঁচিয়া উঠে; অতঃপর জলচর স্থলচর ও খেচর—যত প্রাণী আছে, তাহাদের সকলের মধ্যে সে গতায়াত করে, এবং তিনসহস্র বৎসরকাল এইরূপে অতিবাহিত হইলে পুনর্বার মানবদেহে ফিরিয়া আসে', তথাপি মিশরতত্ত্ব সম্পর্কে বর্তমান কালে যে গবেষণা হইয়াছে, তাহার ফলে অদ্যাবধি আত্মার দেহান্তর-গ্রহণ-বিষয়ে মিশরীয় জনসাধারণের ধর্মের মধ্যে কোন চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় নাই। বরং ম্যাসপেরো[১], আর্মান[২] এবং অপরাপর খ্যাতনামা মিশরতত্ত্ববিদের আধুনিকতম এই অনুমানই অনুমোদিত হয় যে, পুনর্জন্মবাদের সহিত মিশরীয়গণ সুপরিচিত ছিল না।

প্রাচীন মিশরীয়গণের মতে আত্মা একটি অন্যসাপেক্ষ বিকল্প সত্তা মাত্র, ইহার নিজস্ব কোন পৃথক্ অস্তিত্ব নাই এবং কোনদিনই দেহের সহিত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিতে পারে না। যতদিন দেহ থাকে, কেবল ততদিনই ইহা জীবিত থাকে, যদি কোন আকস্মিক কারণবশতঃ মৃত দেহটি বিনষ্ট হয়, তবে বিদেহ আত্মাকে দ্বিতীয়বার মৃত্যু ও ধ্বংস বরণ করিতে হয়। মৃত্যুর পর আত্মা সমগ্র পৃথিবীময় যদৃচ্ছা ভ্রমণ করিতে পারে বটে, কিন্তু প্রতি রাত্রে মৃতদেহটি যেখানে আছে তাহাকে সেখানে ফিরিতে হয়; সে সর্বদা দুঃখমগ্ন, সর্বদা ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর এবং আর একবার জীবনকে উপভোগ করিবার জন্য তীব্র বাসনাযুক্ত, অথচ কোনমতেই তাহা পূরণ করিতে পারে না। উহার পুরাতন শরীরের কোন অংশ কোন-রকমে আহত হইলে

১ Maspero　　　　২ A. Erman.

আত্মার অনুরূপ অংশও অনিবার্যভাবে আহত হয়। এই ধারণার দিক হইতেই প্রাচীন মিশরীয়গণের মৃতদেহ সংরক্ষণ করিবার জন্য অতিরিক্ত ব্যাকুলতার কারণ বুঝিতে পারা যায়। প্রথমে মরুভূমিকে শবক্ষেত্র হিসাবে নির্বাচন করা হইয়াছিল, কারণ তথায় বায়ুর শুষ্কতা হেতু মৃতদেহ সহজে বিনষ্ট হইত না, এবং এইরূপে বিদেহ প্রেতাত্মা দীর্ঘজীবন লাভের সুযোগ পাইত।

কালক্রমে জনৈক দেবতা শবদেহ সংরক্ষণের এমন এক উপায় আবিষ্কার করিলেন, যাহার সাহায্যে পূর্বপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিরা তাহাদের স্বজনগণের মৃতদেহ প্রায় অনন্তকালের জন্য সংরক্ষণ করিবার আশা পোষণ করিত; এবং নিদারুণ দুঃখের হইলেও আত্মার জন্য এইরূপ অমরত্বের ব্যবস্থা তাহারা করিত।

পৃথিবীর সহিত আর কোন নিবিড় সম্বন্ধ-স্থাপন অসম্ভব হইলেও এক শাশ্বত খেদ সেই মৃত আত্মাকে সর্বদাই পীড়া দিত; বিদেহী আত্মা সখেদে বলিত: "হে ভ্রাতঃ, তুমি কখনও পানাহার হইতে নিজেকে বঞ্চিত করিও না, মাদকতা, ভালবাসা, সর্বপ্রকার সম্ভোগ এবং দিবারাত্র বাসনার অনুসরণ হইতে বিরত হইও না। দুঃখকে হৃদয়ে স্থান দিও না, কারণ পৃথিবীতে মানুষের জীবনকাল কতটুকু? পশ্চিমে যে (প্রেত-) লোক আছে, উহা সুপ্তিময় ও ঘন ছায়ায় আবৃত; ইহা এমন একটি স্থান, যেখানে একবার অধিষ্ঠিত হইলে সেখানকার অধিবাসীরা তাহাদের 'মমি'রূপে চিরনিদ্রায় মগ্ন হয়, পুনর্বার আর কোনদিনই স্বজনবর্গকে দেখিবার জন্য জাগ্রত হয় না, আর তাহারা তাহাদের পিতা-মাতাকে চিনিতে পারে না, এবং তাহাদের হৃদয়ে স্ত্রী ও সন্তানবর্গের কোন স্মৃতি থাকে না। পৃথিবী তাহার অধিবাসীদিগকে যে প্রাণবন্ত জলধারা দান করে, তাহা আমার নিকট পঙ্কিল ও প্রাণহীন; পৃথিবীতে যাহারা বাস করে, তাহারা সকলেই জলধারার অধিকারী; অথচ আমার নিকট ঐ জলধারাই এখন এক পূতিগন্ধময় গলিত ধারায় পরিণত হইয়াছে। মৃত্যুর এই উপত্যকায় আসিয়া অবধি আমি বুঝিতেই পারিতেছি না, আমি কে এবং কোথায় আছি। আমাকে স্রোতস্বিনীর জল পান করিতে দাও...উত্তরাভিমুখে মুখ করিয়া আমাকে জলাশয়ের ধারে রাখো, যাহাতে মৃদুবায়ু আমাকে স্নেহস্পর্শ দান করিতে পারে এবং আমার হৃদয় দুঃখের কবল হইতে মুক্তি পাইয়া সজীব হইতে পারে।"[৩]

ক্যাল্ডিয়াবাসীরা মৃত্যুর পরে আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে মিশরীয়দের মতো অত গবেষণা না করিলেও তাহাদের মতে আত্মাকে দেহের উপর নির্ভরশীল দ্বিতীয় বস্তু হিসাবেই গ্রহণ করা হয়, এবং ঐ আত্মা কবরস্থানেরই সহিত জড়িত। তাহারাও এই দেহ-নিরপেক্ষ কোন অবস্থার কথা চিন্তা করিতে পারে নাই এবং আশা পোষণ করিত যে, মৃতদেহ পুনরুজ্জীবিত হইবে। যদিও দেবী ইস্তার নানা বিপদ আপদ ও রোমাঞ্চকর অভিযানের অন্তে ইয়া ও দমকিনার পুত্র—তাঁহার মেষপালক স্বামী দমুজিকে পুনর্জীবিত করিতে পারিয়াছিলেন, তথাপি 'অতি ধর্মপ্রাণ এবং ভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিরাও তাহাদের প্রিয়জনদের পুনরুজ্জীবনের নিমিত্ত দেবালয় হইতে দেবালয়ে বৃথাই কাতর আবেদন জানাইয়াছিল।'

---

৩ প্রাচীন লেখা হইতে ম্যাসপেরো কর্তৃক ফরাসীতে, ব্রুগশ্ কর্তৃক জার্মান ভাষায় অনূদিত।

এইরূপে আমরা দেখিতে পাই—প্রাচীন মিশরীয় বা ক্যাল্ডিয়াবাসীরা মৃত ব্যক্তির শবদেহ হইতে কিংবা কবরস্থান হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া আত্মা সম্পর্কে কখনও ধারণা করিতে সক্ষম হয় নাই। সব দিক বিবেচনা করিলে এই পার্থিব জীবনই সর্বোত্তম, এবং মৃত ব্যক্তি সকল সময়ই আর একবার ইহা পাইবার সুযোগের জন্য লালায়িত এবং যাহারা জীবিত তাহারাও দুঃখ-পীড়িত, দেহের উপর নির্ভরশীল এই দ্বিতীয় আত্মার অবস্থিতিকাল বৃদ্ধি করিবার গভীর আশা পোষণ করিত এবং তাহাদিগকে সাহায্যের জন্য যথাসাধ্য যত্ন করিত।

এইরূপ পরিবেশে আত্মা সম্পর্কে উচ্চতর জ্ঞান হওয়া সম্ভব নয়। প্রথমতঃ ইহা অত্যন্ত স্থূল জড়বাদ, তদুপরি ভয় ও যন্ত্রণাপূর্ণ। অসংখ্য অশুভ শক্তির দ্বারা ত্রস্ত হইয়া, ঐগুলিকে এড়াইবার নৈরাশ্যজনক ও উদ্বিগ্ন চেষ্টায় জীবিতদের আত্মাও তাহাদের ধারণানুযায়ী মৃতের আত্মার মতো সারা পৃথিবীতে ঘুরিয়া বেড়াইয়াও কিছুতেই গলিত শব ও শবাধারের গণ্ডির বাহিরে যাইতে পারিতেছে না।

এখন আমাদিগকে আত্মা সম্বন্ধে উচ্চতর ধারণার মূল আবিষ্কারের জন্য অপর একটি জাতির দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে, যাহাদের নিকট ঈশ্বর সর্বকরুণানিলয় সর্বব্যাপী পুরুষ, যাহাদের নিকট তিনি জ্যোতির্ময় দয়ালু ও সহায়ক বিভিন্ন দেবতার মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করেন; মানবজাতির মধ্যে যাহারা সর্বাগ্রে ঈশ্বরকে পিতৃ-সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিল, 'পিতা যেমন তাহার প্রিয় পুত্রের হস্ত ধারণ করেন, আপনিও তেমনি আমার হস্ত ধারণ করুন'; যাহাদের নিকট জীবন ছিল আশার বস্তু, নৈরাশ্যের নয়; ধর্ম যাহাদের নিকট জীবনের প্রমত্ত উত্তেজনার অবসরে বেদনার্ত ব্যক্তির মুখ হইতে অকস্মাৎ নিঃসৃত কতগুলি সবিরাম আর্তনাদ মাত্র নয়, পরন্তু যাহাদের ধারণাসমূহ আমাদের নিকট শস্যক্ষেত্রের সুগন্ধ ও বনানীর সৌরভে আমোদিত হইয়া আসে; যাহাদের স্বতঃস্ফূর্ত বাধাহীন আনন্দপূর্ণ বন্দনাগীতি দিনমণির প্রথম কিরণে উদ্ভাসিত এই শোভাময়ী ধরণীকে অভিনন্দন করিবার কালে পক্ষিকণ্ঠ হইতে যেরূপ কাকলী নিঃসৃত হয়, তাহারই সদৃশ—আজও তাহা অষ্ট সহস্র বৎসরের সরণী ধরিয়া আমাদের নিকট দিব্যধামের নবীন আহ্বানের ন্যায় আসিয়া উপস্থিত হয়; আমরা এবার প্রাচীন আর্যজাতির কথাই বলিতেছি।

আর্যজাতির প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদে তাহাদের প্রার্থনা-মন্ত্র এইরূপে লিপিবদ্ধ আছে: 'আমাকে সেই মৃত্যুহীন অক্ষয় ধামে স্থান দাও, যেখানে দিব্যলোকের জ্যোতি বিদ্যমান এবং যেখানে চিরন্তন দীপ্তি জাজ্বল্যমান।' 'আমাকে সেই ধামে অমর করিয়া রাখো, যেখানে রাজা বিবস্বানের পুত্র বাস করেন, যেখানে দিব্যধামের রহস্যাবৃত অর্চনালয় বর্তমান'। 'আমাকে সেই লোকে অমর করিয়া রাখো, যেখানে তাঁহারা সানন্দে যদৃচ্ছ বিহার করেন'। 'পৃথিবী ও অন্তরিক্ষের ঊর্ধ্বে সর্বাপেক্ষা অন্তরতম যে তৃতীয় দ্যুলোকে নিখিল বিশ্ব জ্যোতির্ময়রূপে অবস্থিত, সেই আনন্দ-লোকে আমাকে অমর করিয়া রাখো।'

এইবারে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, আর্যজাতি ও ম্লেচ্ছগণের ধারণার মধ্যে কিরূপ আকাশ-পাতাল প্রভেদ বিদ্যমান। একের দৃষ্টিতে এই দেহ এবং এই পার্থিব জগৎই একমাত্র সত্য ও কাম্য বস্তু। তাহারা এই বৃথা আশা পোষণ করে যে, মৃত্যুকালে যে জীবনী-শক্তি দেহ

ছাড়িয়া চলিয়া যায় এবং ইন্দ্রিয়সুখে বঞ্চিত হইয়া নির্যাতন ও দুঃখ অনুভব করে, মৃতদেহকে সযত্নে রক্ষা করিলে ঐ জীবনী-শক্তিকে পুনর্বার পৃথিবীতে ফিরাইয়া আনিতে পারা যায়। এইরূপে তাহাদের নিকট জীবন্ত ব্যক্তি অপেক্ষা মৃতদেহই অধিকতর যত্নের অধিকারী হইয়া পড়িল। অপরেরা দেখিল যে, শরীর ত্যাগ করিয়া যাহা প্রস্থান করে, তাহাই মানবের প্রকৃত সত্তা এবং শরীর হইতে বিযুক্ত হইয়া তাহা এমন উচ্চতর সুখানুভবের স্তরে উপস্থিত হয়, শরীরে অবস্থান-কালে সে সুখ কখনও পায় নাই। তাই তাহারা ধ্বংসোন্মুখ শবদেহকে শীঘ্র দগ্ধ করিয়া নষ্ট করিবার ব্যবস্থা করিল।

এখানেই আমরা এমন একটি ভাবের অঙ্কুর দেখিতে পাইতেছি, যাহা হইতে আত্মা সম্পর্কে সঠিক ধারণার উদ্ভব হইতে পারে। যেখানে প্রকৃত মানবকে কেবল শরীর না ভাবিয়া আত্মা-রূপে ভাবা হইয়াছে, যেখানে প্রকৃত মানব ও তাহার শরীরের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য কোন সম্বন্ধ একেবারে নাই—সেখানেই আত্মার মুক্তি-সম্বন্ধীয় মহান্ ভাবের উদ্ভব হওয়া সম্ভব হইয়াছে। এই স্তরে উঠিয়া আর্যগণের দৃষ্টি যখন মৃত ব্যক্তির আবরণভূত বস্ত্রসদৃশ জ্যোতির্ময় দেহকে ভেদ করিয়া তদতীত স্তরে উপনীত হইল এবং আত্মার নিরাকার, পৃথক্, স্বতন্ত্র সত্তার প্রকৃত তত্ত্ব তাহারা বুঝিল, তখনই প্রশ্ন উঠিল—'কোথা হইতে?'

এই ভারতবর্ষে এবং আর্যদিগের মধ্যেই আত্মার পূর্বাস্তিত্বের, অমরত্বের এবং স্বাতন্ত্র্যের ধারণা প্রথম উদ্ভূত হয়। প্রাচীন মিশর সম্পর্কে সম্প্রতি যত গবেষণা হইয়াছে, তাহা হইতে এরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, সেখানে কখনও স্বয়ংসম্পূর্ণ ও পার্থিব জীবন লাভের পূর্বে বিদ্যমান আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাহাদের কোন ধারণা ছিল। কোন কোন রহস্যবিদ্যাবিদ্ অবশ্য এই তত্ত্বের অধিকারী হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের ক্ষেত্রে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ঐ ভাব ভারতবর্ষ হইতেই আসিয়াছিল।

কার্ল হেকেল বলেন, 'আমি নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করি যে, যতই গভীরভাবে মিশরীয় ধর্ম অনুধাবন করা যাইবে, ততই ইহা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইবে যে, মিশরীয় জনসাধারণ যে-ধর্মের অনুসরণ করিত, উহার সহিত পুনর্জন্মবাদের বিন্দুমাত্র সম্বন্ধ নাই। এমন কি রহস্যবিদ্যাবিদ্ কেহ কেহ এই বিদ্যার অধিকারী হইয়া থাকিলেও ইহা ওসিরিস-শিক্ষার নিজস্ব বস্তু নহে, প্রত্যুত-উহা হিন্দুগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত।'

পরবর্তী কালে দেখা যায়, আলেকজান্দ্রিয়াবাসী ইহুদীগণ এই মতবাদে বিশ্বাসী হইয়াছেন যে, প্রত্যেক আত্মার পৃথক্ সত্তা আছে; এবং পূর্বেই আমরা বলিয়াছি, যীশুর সমসাময়িক ফ্যারিসীরা (প্রাচীন আচারনিষ্ঠ ইহুদী ধর্মসম্প্রদায়) শুধু যে আত্মার স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী ছিলেন তাহাই নয়, তাঁহারা ইহাও বিশ্বাস করিতেন যে, আত্মা বিভিন্ন শরীরে গতায়াত করে। এইরূপে অতি সহজেই ইহা বুঝিতে পারা যায়, তাহারা কেমন করিয়া যীশুকে প্রাচীন এক মহাপুরুষের অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়াছিল এবং যীশু স্বয়ং ঘোষণা করিয়াছিলেন, ব্যাপ্টিস্ট জন-এর মধ্যে মহাত্মা ইলিয়াস পুনরাবির্ভূত হইয়াছিলেন—'যদি আপনাদের বুঝিবার মতো ক্ষমতা থাকে, তাহা হইলে জানিবেন, যে-ইলিয়সের পুনরাগমনের কথা ছিল, ইনিই তিনি।'[৪]

৪ ম্যাথু ১১।১৪

হিব্রুগণের মধ্যে আত্মা ও তাহার স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে যে-ধারণাগুলি দেখিতে পাওয়া যায়, সেগুলি নিশ্চয়ই উচ্চতর রহস্যবিদ্যাবিদ্ মিশরীয়গণের নিকট হইতে আসিয়াছিল; মিশরীয়গণ আবার সেগুলি হিন্দুদের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। এগুলি যে আলেকজান্দ্রিয়ার মাধ্যমে আসিয়াছে, তাহা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ বৌদ্ধদের লিপি ও পুস্তকাদি হইতে আলেকজান্দ্রিয়া ও এশিয়া-মাইনরে তাহাদের প্রচারকার্যের স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

এইরূপ কথিত আছে যে, গ্রীকদের মধ্যে পিথাগোরাসই সর্বপ্রথম হেলেনীয়দের নিকট আত্মার পুনর্জন্মবাদ প্রচার করেন। গ্রীকরা আর্য জাতিরই অন্তর্গত বলিয়া ইতিপূর্বেই মৃতদেহের অগ্নিসৎকার করিত এবং প্রত্যেক আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্বে বিশ্বাস করিত। অতএব পিথাগোরাসের শিক্ষার ফলে পুনর্জন্মবাদ মানিয়া লওয়া তাহাদের পক্ষে সহজ ছিল। এপুলিয়াসের মতে পিথাগোরাস ভারতে আসিয়া ব্রাহ্মণদিগের নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন।

এ পর্যন্ত আমরা এইটুকু জানিয়াছি যে, যেখানেই আত্মাকে কেবল শরীরের চৈতন্যপ্রদ অংশবিশেষ না বলিয়া তাহার স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত হইতেছে এবং উহাকেই মানুষের প্রকৃত স্বরূপ বলা হইতেছে, সেখানেই ইহার পূর্বাস্তিত্ব সম্পর্কে বিশ্বাস অপরিহার্যরূপেই আসিয়া পড়িয়াছে; এবং আমরা ইহাও জানিয়াছি যে, যে-সকল জাতি আত্মার স্বাধীন পৃথক্ সত্তায় বিশ্বাস করিতেন, তাঁহারা প্রায়ই তাঁহাদের মৃতদেহ অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ঐ বিশ্বাসের বাহ্য প্রমাণ দিয়া গিয়াছেন। যদিও আর্য জাতিদের মধ্যে প্রাচীন পারসীকগণ সেমিটিক প্রভাব হইতে মুক্ত থাকিয়াও মৃতদেহ-সৎকারের একটি অদ্ভুত প্রথা আবিষ্কার করিয়াছিল, তথাপি যে-নামে তাহারা তাহাদের 'টাওয়ার অব সাইলেন্স'[৫]-কে অভিহিত করে, তাহা হইতেই জানা যায় যে, উহা দহনার্থ দহ্-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছ।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে, যে-সকল জাতি মানুষের স্বরূপ-নির্ধারণে অধিক মনোযোগ দেয় নাই, তাহারা এই জড়দেহকে সর্বস্ব বলিয়া মনে করার ঊর্ধ্বে উঠিতে পারে নাই, এবং যদি বা কখনও অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের আলোকে তাহারা ইন্দ্রিয়াতীত জগতের কিঞ্চিৎ আভাস পাইয়াছে, তবু তাহারা শুধু এই সিদ্ধান্তেই সন্তুষ্ট হইয়াছে যে, সুদূর ভবিষ্যতে কোন প্রকারে এই দেহই অবিনশ্বর হইবে।

অপরদিকে আর একটি জাতি ছিল, যাহারা মানবকে মননশীল জীবরূপে গণ্য করিয়া তাহার স্বরূপ-অনুসারে সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়াছিল; সেই আর্য হিন্দু জাতি শীঘ্রই দেখিতে পাইল যে, এই দেহকে অতিক্রম করিয়া, এমন কি পিতৃপুরুষদের আকাঙ্ক্ষিত তেজোময় দেহকে অতিক্রম করিয়া প্রকৃত মানব-সত্তা বিরাজ করিতেছে; সেই মূলতত্ত্ব, সেই অবিভাজ্য স্বতন্ত্র সত্তাই নিজেকে এই দেহদ্বারা আবৃত করে, এবং জীর্ণ হইলে উহা ত্যাগ করে। এই মূলতত্ত্বটি কি কোন সৃষ্ট পদার্থ? যদি সৃষ্ট বলিতে 'অভাব' হইতে 'ভাবে'র সৃষ্টি বুঝায়, তাহা হইলে তাহাদের নিশ্চিত উত্তর 'না': এই আত্মা জন্ম ও মৃত্যুহীন, ইহা যৌগিক বা মিশ্রিত পদার্থ নয়,

---

৫ পার্শীদের মৃতদেহ যে বেদীতে স্থাপন করিয়া পক্ষীদের আহারের জন্য ঊর্ধ্বে উত্তোলিত হয়, তাহাকে Tower of Silence (দখ্ম) বলে।

কিন্তু স্বাধীন পৃথক্ সত্তাবান্; সেই হেতু তাহাকে উৎপন্নও করা যায় না, ধ্বংসও করা যায় না, ইহা কেবল বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে পরিভ্রমণ করে।

স্বভাবতই প্রশ্ন উঠেঃ ইতিপূর্বে (দেহগ্রহণের পূর্বে) আত্মা কোথায় অবস্থান করিতেছিল? হিন্দু দার্শনিকগণ বলেন, স্থূলদৃষ্টিতে গেলে ইহা নানা দেহ অবলম্বন করিয়া পরিভ্রমণ করিতেছিল অথবা প্রকৃত বা দার্শনিক অর্থে ইহা বিভিন্ন মানসিক স্তর অতিক্রম করিতেছিল।

বেদ ভিন্ন এমন অপর কোন যুক্তি-সিদ্ধ ভিত্তি আছে কি, যাহার উপর হিন্দু দার্শনিকগণ তাঁহাদের পুনর্জন্মবাদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন? আছে। আশা করি, আমরা পরে দেখাইতে পারিব যে, সর্বজনগৃহীত যে-কোন মতবাদেরই মতো ইহারও স্বপক্ষে যুক্তিসিদ্ধ প্রমাণ আছে; কিন্তু সর্বাগ্রে আমরা দেখিতে চাই, আধুনিক কালের কতিপয় শ্রেষ্ঠ ইওরোপীয় চিন্তাশীল ব্যক্তি পুনর্জন্ম সম্বন্ধে কিরূপ চিন্তা করিয়াছেন।

ফিক্‌টে[৬] আত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া বলেনঃ

'ইহা সত্য যে, আত্মার স্থায়িত্বের ধারণা খণ্ডনের নিমিত্ত প্রকৃতি হইতে একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহা সেই সর্বজনবিদিত যুক্তি—কালে যাহার আরম্ভ হইয়াছে, কোন না কোন কালে তাহার অবসানও হইবে; অতএব অতীতে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিলে সঙ্গে সঙ্গে আত্মার পূর্বাস্তিত্বও স্বীকার করা হইয়া যায়। ইহা অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত সিদ্ধান্ত। কিন্তু ইহা আত্মার স্থায়িত্বের বিপক্ষে প্রযোজ্য যুক্তি না হইয়া বরং তাহার নিত্যত্বের স্বপক্ষেই একটি অতিরিক্ত যুক্তি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। বস্তুতঃ কেহ যদি এই অধ্যাত্ম ও শারীর-বিদ্যার অন্তর্গত স্বতঃসিদ্ধ সত্যটি বুঝিতে পারেন যে, প্রকৃতপক্ষে কোন-কিছুরই সৃষ্টি হইতে পারে না, তাহা হইলে এই সত্যও ধরিতে পারিবেন যে, এই স্থূল শরীর অবলম্বনে দৃশ্যমান হইবার পূর্ব হইতেই আত্মা বিদ্যমান ছিল।'

শোপেনহাওয়ার[৭] তাঁহার 'Die Welt als Wille Und Vorstellung' নামক গ্রন্থে পুনর্জন্মবাদ সম্পর্কে বলিতেছেনঃ "ব্যক্তির পক্ষে নিদ্রা বলিতে যাহা বুঝায়, 'ইচ্ছাশক্তি'র পক্ষে মৃত্যু বলিতেও তাহাই বুঝায়। কারণ স্মৃতিশক্তি ও নিজ স্বাতন্ত্র্য যদি সর্বদা ইহার সহিত লাগিয়া থাকিত, তবে প্রকৃত লাভের সম্ভাবনা না থাকিলে ইচ্ছাশক্তি কিছুতেই অনন্তকাল ধরিয়া একই কর্মানুষ্ঠান ও যন্ত্রণাভোগ করার জন্য টিকিয়া থাকিত না। কিন্তু ইচ্ছাশক্তি উহাদিগকে দূরে সরাইয়া দেয়, এবং ইহাই লিথি-নামক বিস্মরণের নদী; এই মৃত্যুরূপ নিদ্রার ভিতর দিয়া ইচ্ছাশক্তি পুনর্বার অপর একটি নূতন বুদ্ধির দ্বারা সজ্জিত হইয়া সম্পূর্ণ এক নূতন জীবরূপে আবির্ভূত হয়; এক নূতন দিন তখন তাহাকে এক নূতন তটভূমির দিকে প্রলুব্ধ করে।

"এইরূপে দেখা যাইতেছে যে, এই নিরন্তর জন্মপ্রবাহই পর পর সেই অবিনাশী ইচ্ছাশক্তির জীবন-স্বপ্নগুলি রচনা করিতে থাকে; এবং যতক্ষণ না নির্দিষ্ট পরিমাণ ও নির্দিষ্ট প্রকারের বিচিত্র ও নিত্যনূতন উপদেশ ও অভিজ্ঞতা লাভের ফলে ইচ্ছাশক্তি নিজেই নিজের বিলোপ ও বিনাশ সাধন করিতেছে, ততদিন এইরূপই চলিতে থাকে।...ইহাও উপেক্ষা করা যায় না যে,

---

৬ I. H. Fichte. ৭ Schopenhauer.

ব্যাবহারিক অভিজ্ঞতা-প্রসূত যুক্তিও এইরূপ পুনর্জন্ম সমর্থন করে। বস্তুতঃ যাঁহারা জীর্ণ হইয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের মৃত্যুর সহিত যাহারা নবাবির্ভূত, তাহাদের জন্মের একটি সম্পর্ক আছে। ব্যাপক মহামারীর পরে মানবজাতির মধ্যে শিশুজন্মের যে আধিক্য দেখা যায়, তাহা হইতেই ইহা প্রমাণিত হয়। চতুর্দশ শতকে প্লেগ-মহামারীর (Black Death) ফলে যখন পূর্ব গোলার্ধের অধিকাংশ মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তখন মানবজাতির মধ্যে অস্বাভাবিকভাবে সন্তানোৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছিল, এবং প্রায়ই যমজ-শিশুর জন্ম হইত। ইহাও লক্ষণীয় যে, এই সময়ে যে-সকল শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাহাদের কেহই পূর্ণসংখ্যক দন্ত লাভ করে নাই; এইরূপে প্রকৃতি আপন শক্তি যথাসাধ্য প্রয়োগ করিয়াও খুঁটিনাটি ব্যাপারে কৃপণতা প্রকাশ করিয়াছিল। ১৮২৫ খৃঃ লিখিত 'Chronik der Seuchen' নামক গ্রন্থে স্নুরার[৮] ইহার বর্ণনা উল্লেখ করিয়াছেন। ক্যাসপারও[৯] তাঁহার ১৮৩৫ খৃঃ লিখিত 'Ueber die Wahrscheinliche Lebensdauer des Menschen' গ্রন্থে এই প্রাকৃতিক নিয়ম সমর্থন করিয়াছেন যে, যে-কোন একটি নির্দিষ্ট জনসমষ্টির মধ্যে দেখা যায়—তাহাদের জন্মসংখ্যার হার তাহাদের মৃত্যুসংখ্যা ও আয়ুষ্কালের হারের উপর অতি সুনিশ্চিত প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে, কারণ জন্মের সংখ্যা সর্বদা মৃত্যুর হারের সহিত সমতা রক্ষা করে; ইহার ফলে সর্বদা সর্বত্র মৃত্যু ও জন্ম সমান হারে বৃদ্ধি বা হ্রাস পায়। বিভিন্ন দেশ এবং উহাদের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে বহু তথ্য সংগ্রহ করিয়া তিনি সন্দেহাতীতরূপে ইহা প্রমাণ করিয়াছেন। তথাপি ইহা অসম্ভব যে, আমার অকাল-মৃত্যুর সহিত এইরূপ একটি বিবাহের ফলপ্রসূতার কোন প্রত্যক্ষ বা কার্যকারণাত্মক সম্পর্ক থাকিবে, যে-বিবাহের সহিত আমার কোন সম্পর্কই নাই; ইহাও অসম্ভব যে, ঐ বিবাহের সহিত আমার মৃত্যুর কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে। এইরূপে এ ক্ষেত্রে অধ্যাত্ম-তত্ত্বই অনস্বীকার্যরূপে এবং অত্যন্ত বিস্ময়করভাবে জাগতিক বিষয়ের ব্যাখ্যার প্রত্যক্ষ ভিত্তিরূপে প্রতীয়মান হয়। প্রত্যেক নবজাত ব্যক্তি সজীবতা ও প্রফুল্লতা লইয়া নবজীবনে আবির্ভূত হয় এবং ঐগুলি উপঢৌকনের মতো উপভোগ করে; কিন্তু জগতে বিনামূল্যে কিছুই পাওয়া যায় না, পাওয়া যাইতে পারে না। এই নবীন জীবনের জন্য অপর একটি নিঃশেষিত জীবনকে বার্ধক্য ও জরারূপ মূল্য দিতে হয়। কিন্তু তাহার মধ্যেই এমন এক অবিনশ্বর বীজ নিহিত থাকে, যাহা হইতে নূতন জীবনের উৎপত্তি হয়—উভয়ে একই সত্তা।"

শূন্যবাদে বিশ্বাসী হইলেও সুবিখ্যাত ইংরেজ দার্শনিক হিউম[১০] অমৃতত্ব বিষয়ে সংশয়াত্মক এক প্রবন্ধে বলেন: 'অতএব এই জাতীয় মতবাদসমূহের মধ্যে একমাত্র পুনর্জন্মবাদই দার্শনিকদের প্রণিধানযোগ্য।' দার্শনিক লেসীং[১১] কবিজনোচিত গভীর অন্তর্দৃষ্টি সহায়ে প্রশ্ন করিতেছেন: 'একমাত্র প্রাচীনতমত্বের দাবিতে স্বীকৃত বিভিন্ন দার্শমিক মতবাদের কুতর্কের প্রভাবে মানুষের বোধশক্তি যে অতীতকালে ক্ষীণ ও দুর্বল হইয়া যায় নাই, সেই অতীতকালে এই মতবাদটি মানুষের অনুভূতির ক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়াছিল বলিয়া কি ইহা এতই পরিহাসের বিষয়?...আমি যতক্ষণ নূতন জ্ঞান, নূতন অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করিবার ক্ষমতা রাখি, ততক্ষণ কেন আমি বারংবার ফিরিয়া আসিব না? একবার জন্মগ্রহণ করিয়াই কি আমি এত বেশী

৮ F. Schnurrer ৯ Casper ১০ Hume ১১ Lessing

পাইয়াছি যে, দ্বিতীয়বার আগমনজনিত ক্লেশের পরিবর্তে আমার আর কিছুই পাইবার থাকিবে না ?'

পূর্ব হইতে বিদ্যমান একই আত্মা বহু জীবনে বহুবার পুনর্জন্ম গ্রহণ করে—এইরূপ মতবাদের পক্ষে ও বিপক্ষে বহু যুক্তি রহিয়াছে, এবং সর্বকালেই চিন্তানায়কদের মধ্যে বহু প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ইহার সমর্থনে অগ্রসর হইয়াছেন ; আমরা যতদূর বুঝিতে পারি, তাহাতে মনে হয়, আত্মা বলিয়া কোন স্বতন্ত্র বস্তু থাকিলে ইহাও অনিবার্য যে, উহা পূর্ব হইতেই বিদ্যমান। আত্মার স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার না করিয়া উহাকে স্কন্ধ (ধারণা) সমূহের সমষ্টি বলিয়া মানিলেও বৌদ্ধদের মধ্যে মাধ্যমিকদিগকে নিজেদের মতবাদ ব্যাখ্যা করিবার জন্য বাধ্য হইয়া আত্মার পূর্বাস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়।

যে যুক্তিবলে প্রমাণ করা হয়, কোন অসীম বস্তুর আদি থাকা অসম্ভব, তাহা অকাট্য। যদিও ইহার খণ্ডনকল্পে এই যুক্তিবিরুদ্ধ মতের আশ্রয় গ্রহণ করা হয় যে, অনন্তশক্তি ভগবানের পক্ষে অসম্ভবও সম্ভব হয়। দুঃখের বিষয়, এই ভ্রমাত্মক যুক্তি বহু চিন্তাশীল ব্যক্তির মুখেও শুনিতে পাওয়া যায়।

প্রথমতঃ যেহেতু ঈশ্বর প্রাকৃতিক সকল ব্যাপারের সর্বজনীন এবং সাধারণ কারণ, অতএব মানবাত্মার নিজের মধ্যে যে-সব বিশেষ রকমের ব্যাপার ঘটিয়া থাকে, সেগুলির প্রাকৃতিক (অসাধারণ) কারণ অনুসন্ধানের প্রশ্ন উঠিতেছে ; কাজেই এক্ষেত্রে ভগবান এই জগদ্রূপ যন্ত্রের নির্মাতা।[১২] এইরূপ মতবাদ সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক। ইহা অজ্ঞতার স্বীকৃতি ব্যতীত আর কিছুই নহে। কারণ মানবীয় জ্ঞানের প্রত্যেক শাখার প্রত্যেক প্রশ্ন সম্পর্কেই আমরা ঐ এক উত্তর দিতে পারি এবং এইরূপে সকল প্রকার অনুসন্ধিৎসা বন্ধ করিয়া ফলতঃ জ্ঞানের পথ সম্পূর্ণ রুদ্ধ করিতে পারি।

দ্বিতীয়তঃ এইরূপ সর্বদা ঈশ্বরের সর্বশক্তিমত্তার দোহাই দেওয়ার অর্থ কতগুলি শব্দের প্রহেলিকা সৃষ্টি করা ব্যতীত আর কিছুই নহে। কারণকে কারণরূপে ঠিক তখনই জানা হয় এবং জানিতে পারা যায়, যখন ঐ কারণটি তাহার কার্য-উৎপাদনের পক্ষে পর্যাপ্ত, এতদতিরিক্ত আর কিছুই নয়। ইহার ফলে আমরা এই সিদ্ধান্তেই উপস্থিত হইতেছি যে, আমরা একদিকে যেমন অনন্ত ফলের চিন্তা করিতে পারি না, অপর দিকে তেমনি সর্বশক্তিমান্ কারণেরও ধারণা করিতে পারি না। আরও দ্রষ্টব্য এই যে, ভগবান সম্বন্ধে আমাদের সকল ধারণাই সসীম ; তাঁহাকে কারণ বলিয়া মানিলেও এই কারণত্বের দ্বারা ভগবানের ধারণা সীমিত হইয়া পড়ে। তৃতীয়তঃ ঐরূপ মতবাদ তর্কের খাতিরে মানিয়া লইলেও যতক্ষণ আমরা ইহা অপেক্ষা অধিকতর যুক্তিসহ ব্যাখ্যা দিতে না পারিব, ততক্ষণ এই অসম্ভব কথা মানিতে বাধ্য নই যে, 'অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হয়' অথবা 'অসীম বস্তু কোন কালের মধ্যে আরম্ভ হয়'।

পূর্বাস্তিত্বের বিরুদ্ধে এই একটি তথাকথিত দৃঢ় যুক্তি খাড়া করা হয় যে, অধিকাংশ মানুষ এ সম্পর্কে সচেতন নয়। এই যুক্তির উপস্থাপয়িতাকে ইহার সারবত্তা প্রদর্শনের জন্য প্রমাণ করিতে হইবে যে, সমগ্র মানবাত্মাটি শুধু স্মরণকার্যেই ব্যাপৃত থাকে। কোন জিনিসের

১২ Deus ex Machina

স্মৃতি যদি তাহার অস্তিত্বের প্রমাণ হয়, তাহা হইলে জীবনের যে যে অংশ এখন স্মৃতির অন্তর্ভুক্ত নহে, তাহার অস্তিত্ব নিশ্চয়ই লোপ পাইয়াছে, এবং যে-কোন ব্যক্তি গভীর মূর্চ্ছাকালে বা বিকারের অন্য কোন অবস্থায় স্মৃতিশক্তি হারাইয়া ফেলে, সে তখন নিশ্চয়ই নিজের অস্তিত্বও হারাইয়া ফেলে।

আত্মার পূর্বাস্তিত্ব অনুমানের জন্য, বিশেষতঃ সচেতন কার্যকলাপের স্তরে তাহার প্রমাণার্থে হিন্দু দার্শনিকগণ যে-সকল মৌলিক সিদ্ধান্ত উপস্থাপিত করেন, তাহা প্রধানতঃ এইরূপ :

প্রথমতঃ ইহা ব্যতীত এই বৈষম্যময় জগতের ব্যাখ্যা কিরূপে সম্ভব হইবে? একজন দয়ালু ও ন্যায়বান্ ঈশ্বর কর্তৃক অধিষ্ঠিত রাজ্যে সদ্‌ভাবে ও মানবসমাজের সম্পদ্‌রূপে গড়িয়া উঠিবার পক্ষে প্রয়োজনীয় সকল সুযোগের মধ্যে একটি শিশু জন্মগ্রহণ করিল, এবং হয়তো সেই একই মুহূর্তে একই মহানগরে অপর একটি শিশু এমন অবস্থার মধ্যে জন্মগ্রহণ করিল, যাহা তাহার ভাল হইয়া উঠিবার পক্ষে প্রতিকূল। দেখিতে পাই—এমন শিশুও জন্মায় যে শুধু কষ্ট ভোগ করে, হয়তো সারা জীবনই কষ্ট পায়, অথচ এজন্য তাহার কোন দোষ নাই। এইরূপ কেন হইবে? ইহার কারণ কি? ইহা কাহার অজ্ঞতা-প্রসূত? যদি শিশুটির দোষ নাই থাকে, তাহা হইলে সে কেন তাহার পিতামাতার কর্মের ফলে এত কষ্ট ভোগ করিবে? বর্তমান দুঃখের অনুপাতে ভবিষ্যতে সুখ লাভ হইবে—এই প্রলোভন দেখাইয়া রহস্যের অবতারণা করিয়া প্রশ্নটিকে এড়াইয়া যাওয়া অপেক্ষা অজ্ঞতা স্বীকার করা অনেক ভাল। কাহারও পক্ষে আমাদের উপর অসঙ্গত ক্লেশভার বলপূর্বক চাপাইয়া দেওয়া নীতিবিগর্হিত তো বটেই, উহাকে অবিচারও বলা চলে; শুধু তাই নয়, ভবিষ্যতে ক্ষতিপূরণ হইবে—এইরূপ মতবাদটিও সম্পূর্ণ যুক্তিহীন।

যাহারা দুঃখের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে, তাহাদের কয়জন উচ্চতর জীবনের অভিমুখে অগ্রসর হইবার জন্য সংগ্রাম করে? কতজনই বা যে-অবস্থার মধ্যে জন্মলাভ করিয়াছে, তাহারই মধ্যে আত্মসমর্পণ করে? যাহারা বাধ্য হইয়া মন্দ অবস্থার মধ্যে জন্মগ্রহণ করার জন্য অধিকতর মন্দস্বভাব এবং নীতিহীন হইয়া উঠে, তাহারা কি তাহাদের আজীবন নীতিহীনতার দরুন ভবিষ্যতে পুরস্কৃত হইবে। সে-ক্ষেত্রে যে এখানে যত দুর্বৃত্ত হইবে, ভবিষ্যতে তাহার পুরস্কার ততই অধিক হইবে।

সুখদুঃখভোগের সকল দায়িত্ব উহার ন্যায়সঙ্গত কারণের উপর, অর্থাৎ আমাদের স্বাধীন কর্ম বা কর্মফলের উপর আরোপ না করিলে মানবাত্মার মহিমা ও মুক্তভাব প্রমাণ করার এবং সংসারের এই অসাম্য ও ভয়াবহতার সামঞ্জস্য স্থাপন করার আর কোন উপায় নাই। শুধু তাই নয়, শূন্য হইতে আত্মার সৃষ্টি-বিষয়ে যত মতবাদই প্রচার করা হউক না কেন, উহাদের প্রত্যেকটি আমাদিগকে অনিবার্যরূপে অদৃষ্টবাদে বা সমস্তই পূর্ব হইতে সুনির্দিষ্ট—এইরূপ মতবাদে লইয়া যাইবে, এবং এক করুণাময় পিতার পরিবর্তে এক বিকটদর্শন নিষ্ঠুর এবং সদাক্রুদ্ধ ঈশ্বরকে আমাদের উপাস্যরূপে উপস্থিত করিবে। অধিকন্তু শুভাশুভ-সাধনে ধর্মের যতটুকু শক্তি আছে, তাহার অনুধাবন করিলে দেখিতে পাই যে, 'আত্মা সৃষ্ট বস্তু'—এই মতবাদের সহিত তাহারই অনুসিদ্ধান্ত 'অদৃষ্টবাদ ও ঈশ্বর কর্তৃক ভাগ্যনির্ধারণ' খ্রীষ্টীয় ও মুসলমান ধর্মাবলম্বীদিগের

মধ্যে এই একই ভয়াবহ ধারণার জন্য দায়ী যে, অধার্মিক ও পৌত্তলিকগণকে বিধিসঙ্গতরূপে তাহাদের তরবারি দ্বারা হত্যা করা চলে, আরও এই মতবাদের ফলে যতপ্রকার নিষ্ঠুর অত্যাচার হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে, সেগুলির জন্যও এই মতবাদই দায়ী।

কিন্তু ন্যায়দর্শন-প্রণেতারা পুনর্জন্মতত্ত্বের সমর্থনে যে-যুক্তিটি বহু বার উপস্থিত করিয়াছেন এবং যাহা আমাদের দৃষ্টিতে এই প্রসঙ্গের সিদ্ধান্ত বলিয়া মনে হয়, তাহা হইল এই যে, আমাদের অভিজ্ঞতা কখনও সম্পূর্ণ বিলীন হয় না। আমাদের কার্যকলাপ (কর্ম) যদিও বাহ্যতঃ বিলুপ্ত হয়, তথাপি অদৃষ্টরূপে বর্তমান থাকে, এবং পুনর্বার কার্যের মধ্যে প্রবৃত্তির আকারে আবির্ভূত হয়, এমন কি ছোট শিশুরাও কতকগুলি প্রবৃত্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করে, যথা মৃত্যুভয়।

এখন যদি প্রবৃত্তিকে বারংবার অনুষ্ঠিত ক্রিয়াকলাপের ফল বলা হয়, তাহা হইলে যে-সকল প্রবৃত্তি লইয়া আমরা জন্মগ্রহণ করি, তাহার অর্থ সেই দিক হইতে ব্যাখ্যা করিতে হয়। স্পষ্টতঃ আমরা ঐগুলি এই জন্মে পাই নাই, সুতরাং অতীতেই সেগুলির মূল অনুসন্ধান করিতে হইবে। এখন ইহাও স্পষ্ট যে, আমাদের কতকগুলি প্রবৃত্তি মনুষ্যোচিত সচেতন প্রয়াসের ফল। ইহা যদি সত্য হয় যে, আমরা এই-সকল প্রবৃত্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তবে ইহা অবিসংবাদিতরূপে প্রমাণিত হয়, অতীতের সচেতন সকল প্রযত্নই ইহার কারণ, অর্থাৎ আমরা যাহাকে মানবীয় স্তর বলি, বর্তমান জন্মের পূর্বেও আমরা সেই মানবোচিত মানস স্তরেই ছিলাম।

অন্ততঃ বর্তমান জীবনের প্রবৃত্তিসমূহকে অতীতের সচেতন প্রয়াসের দ্বারা ব্যাখ্যার ব্যাপারে ভারতের পুনর্জন্মবাদিগণ এবং অধুনাতন ক্রমবিকাশবাদিগণ একমত; একমাত্র পার্থক্য এই যে, যেখানে অধ্যাত্মবাদী হিন্দুরা এগুলি প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র আত্মার সচেতন প্রয়াসের ফল বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, সেখানে জড়বাদী ক্রমবিবর্তনবাদীরা ঐগুলি বংশপরম্পরায় একদেহ হইতে দেহান্তরে সঞ্চারণ বলিয়া অভিহিত করেন। যে মতবাদিগণ 'অভাব' বা শূন্য হইতে সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের স্থান কোথাও নাই।

তাহা হইলে এই বিষয়ে দুইটি মাত্র পক্ষ দাঁড়াইতেছে—পুনর্জন্মবাদ এবং জড়বাদ; ইহারই কোন একটি অবলম্বন করিয়া সিদ্ধান্ত স্থির করিতে হইবে। পুনর্জন্মবাদী বলেন: অতীত সমস্ত অভিজ্ঞতা অনুভব-কর্তার মধ্যে, অর্থাৎ প্রত্যেক পৃথক্ আত্মার মধ্যে প্রবৃত্তিরূপে সঞ্চিত হইয়া আছে, এবং প্রত্যেক আত্মা যখন তাহার অবিচ্ছেদ্য পৃথক্ সত্তা লইয়া নূতন জন্ম গ্রহণ করে, তখন ঐ প্রবৃত্তিগুলিও তাহাতে সঞ্চারিত হয়। আর জড়বাদী বলেন: মানুষের মস্তিষ্কই সকল কর্মের কর্তা এবং জীবকোষ অবলম্বনে এক ব্যক্তি হইতে অপর ব্যক্তিতে পুরুষানুক্রমে ঐ প্রবৃত্তিগুলি সঞ্চারিত হয়।

এইরূপে পুনর্জন্মবাদ আমাদের নিকট অসীম গুরুত্ব লইয়া উপস্থিত হয়, কারণ আত্মার পুনর্জন্ম ও দেহ-কোষ অবলম্বনে প্রবৃত্তির সঞ্চারণ-বিষয়ে যে বিবাদ চলিতেছে, তাহা প্রকৃতপক্ষে অধ্যাত্মবাদ ও জড়বাদের সংগ্রাম। যদি কোষের মাধ্যমে সঞ্চারণই সন্তোষজনক ব্যাখ্যা হয়, তাহা হইলে জড়বাদ অনিবার্য, এবং তখন আত্মতত্ত্বের কোন প্রয়োজন থাকে না। ইহা যদি সন্তোষজনক ব্যাখ্যা না হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক আত্মার একটি নিজস্ব সত্তা আছে এবং আত্মা তাহার বর্তমান জীবনে অতীতের অভিজ্ঞতা বহন করিয়া আনে—এই মতটি সম্পূর্ণ সত্য। এই দুই বিকল্প—পুনর্জন্মবাদ ও জড়বাদ; এই উভয়ের মধ্যে আর কোন কিছুর স্থান নাই। ইহার কোন্‌টি আমরা গ্রহণ করিব?

শ্রীরামকৃষ্ণের ফটো-প্রসঙ্গে

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

তৃতীয় ফটোর অবশিষ্ট বিবরণ

জনৈক ভক্ত একদিন প্রসঙ্গত শ্রীশ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'মা, তোমার কাছে এই যে ঠাকুরের ফটো রয়েছে, এখানি বেশ, দেখলে বোঝা যায়। আচ্ছা এখানি কি ঠিক?'[১]

উত্তরে শ্রীশ্রীমা বলেন, "এটি খুব ঠিক ঠিক। এখানি এক ব্রাহ্মণের ছিল। প্রথম যেমন উঠানো হয়, একখানি সে ব্রাহ্মণটি নিয়েছিল। আগে এখানি খুব কালো (Deep) ছিল, ঠিক যেন কালীমূর্তিটি। তাই ঐ ব্রাহ্মণকে দিয়েছিল। সে ব্রাহ্মণ দক্ষিণেশ্বর থেকে কোথায় যাবার সময় এখানি আমার কাছে রেখে যায়। আমি এখানি ঠাকুর-দেবতার ছবির সঙ্গে রেখে দিয়েছিলুম, পূজা করতুম। নহবতের নীচের ঘরে থাকতুম। একদিন ঠাকুর গিয়েছেন। ছবি দেখে বলছেন, 'ওগো, তোমাদের আবার এসব কি?' আমরা (বোধহয় শ্রীশ্রীমা ও লক্ষ্মীদিদি) ওপাশে সিঁড়ির নীচে রাঁধছি। তারপর দেখলুম, বিল্বপত্র আর কি কি, যা পূজার জন্য ছিল, একবার না দুবার ঐ ছবিতে দিলেন—পূজা করলেন। সেই ছবিই এই। সে ব্রাহ্মণ আর ফিরে এল না। এখানি আমারই রইল।"[২]

ঐ ফটোতে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেব আত্মপূজা করেছিলেন শুনে ভক্তটি বলেন, 'বসা ছবি সম্বন্ধে ঠাকুরও বলেছিলেন—এ অতি উচ্চ অবস্থার ছবি।'[৩] ঐ কথা শ্রীশ্রীমাও স্বীকার করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব যখন চিকিৎসার্থ কাশীপুর উদ্যানবাটীতে অবস্থান করছিলেন, সেই সময় কতকগুলি ভক্ত তাঁর সেবার জন্য ফলমিষ্টি প্রভৃতি নিয়ে তাঁকে দর্শন করতে দক্ষিণেশ্বরে যান। তাঁকে তথায় না পেয়ে তারা সেই সকল দ্রব্য তাঁর ফটোর সম্মুখে রেখে তাঁকে ভোগ নিবেদন করেন। তারপর ঐ প্রসাদ তাঁরা ভক্তিভরে সকলে গ্রহণ করেন। সেই সংবাদ অবিলম্বে কাশীপুরে পৌঁছে। ঐ কথা শুনে শ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্রীশ্রীমাকে বলেন, 'ওরা মা কালীকে ভোগ নিবেদন না ক'রে (আমার) ছবিকে কেন দিলে?'[৪]

তাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের অকল্যাণ হ'তে পারে ভেবে শ্রীশ্রীমা মনে মনে ভয় পান। তাঁর মনোভাব বুঝতে পেরে শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁকে অভয় দিয়ে হাসতে হাসতে বলেন, 'ওগো তোমরা কিছু ভেবো না। এর পর ঘরে ঘরে আমার (ফটোর) পূজা হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবদ্দশা হতেই শ্রীশ্রীমা 'ছায়া কায়া সমান' বোধে শ্রীশ্রীঠাকুরের এই প্রতিকৃতির নিয়মিত পূজার্চনা আরম্ভ করেন। তদবধি তিনি বরাবরই তাঁর এই ফটোর পূজা ক'রে গিয়েছেন। এই প্রতিকৃতিতে শ্রীশ্রীঠাকুরের সাক্ষাৎ অধিষ্ঠান-জ্ঞানে তিনি

১ মায়ের কথা, ২য় ভাগ ৫০-৫১ পৃষ্ঠা।

২ ঐ—৫০-৫১ পৃষ্ঠা।

৩ ঐ—৫০-৫১ পৃষ্ঠা

৪ ঐ—৯৭ পৃষ্ঠা

ভক্তিভরে প্রণাম ও তাঁর আজ্ঞা প্রার্থনা না ক'রে কোন কার্য করতেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্রীক্ষেত্র পুরীধামে কখনও যাননি। শ্রীশ্রীমা পুরীতে অবস্থানকালে একদিন তাঁর ফটোখানি বস্ত্রাঞ্চলে ঢেকে নিয়ে ঐ মন্দিরে গিয়ে তাঁকে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দর্শন করান।[৫] শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই ফটো প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীমা বলেছেন, 'পুরীতে প্রথম দিন গিয়েই সকাল বেলা একটা ঘিয়ের টিনে ঠেসান দিয়ে ঠাকুরের ছবি রেখে পূজা ক'রে তাড়াতাড়ি জগন্নাথ দেখতে গিয়েছিলাম। ঘর দোর সব বন্ধ। এসে দেখি ঠাকুরের ছবি টিনের নীচে। সব্বাই এসে দেখলে। সকলে মনে করলে চোর ঢুকেছে। কিন্তু ঘরের কোথাও জিনিস-পত্রের একটুও নড়চড় হয়নি। শেষে দেখি বড় বড় লাল পিঁপড়ে ধরেছে টিনে—ঘিয়ের টিন কিনা, সেই পিঁপড়ে ঠাকুরের ছবিতে ধরেছিল। তাই ঠাকুর নেমে বসেছেন।'[৬]

কোয়ালপাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ-যোগাশ্রমে শ্রীশ্রীমা ঠাকুরের একটি (উপবিষ্ট) প্রতিকৃতি সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা ক'রে তাঁর বামভাগে একখানি নিজের প্রতিকৃতিও স্থাপন করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহাসমাধিলাভের পর ভক্তগণ তাঁর এই প্রতিকৃতিখানিই তাঁর শয্যায় স্থাপন ক'রে তাঁর যথাবিধি পূজা-বন্দনা আরম্ভ করেন। ঠাকুরের জীবদ্দশায় তাঁকে ঠিক যেভাবে সেবা করা হ'ত, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, প্রেমানন্দ প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদগণ ঐ প্রতিকৃতিতে সেই ভাবেই তাঁর সেবা-পরিচর্যা করতে থাকেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের মঠ ও আশ্রমগুলিতে এবং ভক্তগণের গৃহে গৃহে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই ফটোই সর্বত্র পূজিত হয়ে থাকে। এযাবৎ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের যত মর্মর-বিগ্রহ নির্মিত হয়েছে, সমস্তই এই উপবিষ্ট ফটোরই প্রতিমূর্তি।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই ফটোখানির মহোচ্চ ভাব ভিন্নধর্মাবলম্বী সাধকগণেরও সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পরিব্রাজকরূপে তিব্বতে ভ্রমণকালে স্বামী অখণ্ডানন্দজীর কাছে শ্রীশ্রীঠাকুরের এই প্রতিকৃতিখানি দেখে এক মঠের লামারা পরম চমৎকৃত হন। তাঁরা তখন সবিস্ময়ে তাঁকে প্রশ্ন করেন, 'আপনি এ ছবি কোথায় পেলেন? এ যে অর্হতের (বুদ্ধকল্প মহাপুরুষের) ছবি।' অতঃপর তাঁরা ঐ প্রতিকৃতিখানি তাঁদের উপাসনা-বেদীতে স্থাপন ক'রে পূজার্চনা করেন।

অবিনাশচন্দ্র দাঁ মহাশয়ের স্বহস্তে প্রিন্ট করা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একখানি ফুল সাইজ ফটো ১৫নং শ্যামাচরণ মৈত্র লেন, কাশীপুর, কলিকাতা-৩৬ ঠিকানায় তাঁর পুত্র প্রমথনাথ দাঁ মহাশয়ের গৃহে এখনও আছে। ঐ ফটোতে শ্রীরামকৃষ্ণের মাথার উপর অর্ধ চন্দ্রাকৃতি দাগটি নেই।[৭]

এই ফটো-প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল লিখেছেন—'প্রভুর যে গভীর সমাধিস্থ প্রতিকৃতি, অধুনা যাহা ঘরে ঘরে পূজিত, ভবনাথেরই আগ্রহে ঠাকুরবাড়ির বিষ্ণু-মন্দিরের রোয়াকে গৃহীত হয়; এই জন্য ভক্ত মাত্রেই ভবনাথের নিকট ঋণী।'

---

৫ শ্রীমা সারদাদেবী—২১৪ পৃষ্ঠা

৬ মায়ের কথা ২য়—৫৭-৫৮ পৃষ্ঠা

৭ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই উপবিষ্ট ভঙ্গিমার ফটোখানি তোলার বিস্তৃত বিবরণী ৺অবিনাশচন্দ্র দাঁ মহাশয়ের দুই পুত্রবধূ এবং পৌত্রদ্বয়ের নিকট হ'তে প্রাপ্ত। শ্রীসুশীল-কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রেমের ঠাকুর' গ্রন্থেরও সাহায্য নেওয়া হয়েছে।—লেখক

এ-প্রসঙ্গে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের উক্তিও প্রণিধানযোগ্য : 'তখন সবে মাত্র প্রথম কোডাক ক্যামেরা মার্কেটে (বাজারে) বেরিয়েছে। বরাহনগরের অবিনাশ একটি নূতন ক্যামেরা কিনেছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর (শ্রীরামকৃষ্ণ) নিজের ছবি কাকেও কোন দিন তুলতে দিতেন না। ভবনাথ অবিনাশকে ডেকে এনেছিল শ্রীশ্রীঠাকুরের ছবি তোলার জন্যে। শ্রীশ্রীঠাকুর একদিন দক্ষিণেশ্বরে রাধাকান্তের মন্দিরে বাইরের রকের ওপর বসে সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন। সেই সুযোগে অবিনাশ তাড়াতাড়ি ক্যামেরা ফিট ক'রে নিল। শ্রীশ্রীঠাকুরের যে-ধ্যানস্থ বসা ছবি এখন পূজো করা হয়—ওটি ঐ সময়ের তোলা।[৮]

চতুর্থ ফটোর বিবরণ

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চতুর্থ ফটোটি তোলা হয় কাশীপুর উদ্যানবাটিতে ১লা ভাদ্র, ১২৯৩ সাল (১৬ই আগস্ট, ১৮৮৬ খৃঃ) সোমবার অপরাহ্নে পাঁচটার পূর্বে। এটি তাঁর মহাসমাধিস্থ অবস্থার ফটোগ্রাফ। কাশীপুর মহাশ্মশানে যাত্রার প্রাক্কালে সমবেত ভক্তমণ্ডলী ও দর্শক-বৃন্দ-সহ এটি গৃহীত হয়। ডাক্তার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল সরকারের উৎসাহে ও পরামর্শে এটি তোলা হয়। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথিতে এর বিবরণী পাওয়া যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব ৩১শে শ্রাবণ (সংক্রান্তি) রবিবার রাত্রি প্রায় একটা দু-মিনিটের সময় সমাধিতে নিমগ্ন হন। ঐ সময় তাঁর শ্রীঅঙ্গ থেকে স্নিগ্ধ জ্যাতি নির্গত হ'তে থাকে। সময় সময় তাঁর দেহ পুলকিত এবং কণ্টকিতও হ'তে থাকে। ভক্ত-সেবকগণ সারা রাত্রি একান্ত আকুলভাবে তাঁর সমাধি-ভঙ্গের প্রতীক্ষায় থাকেন।

'ভক্তগণ এখনো আছেন প্রত্যাশায়।
যদ্যপি ফিরিয়া ঘরে আসেন শ্রীরায়॥' —পুঁথি

পর দিবস (১লা ভাদ্র, সোমবার) সংবাদ পেয়ে শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ উপাধ্যায় (কাপ্তেন) সকাল প্রায় আটটার সময় উদ্যানবাটিতে উপস্থিত হন। অভিনিবেশ সহকারে লক্ষণাদি নিরীক্ষণ ক'রে তিনি বলেন, শ্রীদেহে এখনও প্রাণবায়ু বর্তমান। তিনি তাঁর পৃষ্ঠের শিরদাঁড়ায় গব্যঘৃত মালিশের বিধান দেন। ঐ প্রক্রিয়া বেশ কিছুক্ষণ করার পরে ক্রমশঃ সুফল দেখা যায়।

'কিছু পরে লক্ষণে বুঝিলা নির্ধারিত।
এখনো সমাধি-দেহ আছয়ে জীবিত॥' —পুঁথি

বেলা প্রায় সাড়ে বারটার সময় তাঁর ঐ সমাধি মহাসমাধিতে পরিণত হয়। তার পর তাঁর দেহের জ্যোতি ধীরে ধীরে স্তিমিত হ'তে থাকে। প্রায় একটার সময় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার তাঁকে বিশেষরূপে পরীক্ষা করেন। তিনি বিষাদপূর্ণ কণ্ঠে বলেন : বড় জোর আধ ঘণ্টা পূর্বে তাঁর দেহ হ'তে প্রাণবায়ু নির্গত হয়েছে, তিনি দেহত্যাগ করেছেন।

'দুপুর হইয়া প্রায় ঘণ্টার অতীত।
হেনকালে মহেন্দ্র ডাক্তার উপনীত॥
পরীক্ষা করিয়া কন বিষাদে বিভোর।
দেহত্যাগ হইয়াছে আধঘণ্টা জোর॥' —পুঁথি

সুবিজ্ঞ ডাক্তারের কথায় নির্ভর ক'রে ভক্তগণ অবশেষে শ্রীরামকৃষ্ণের পূত নশ্বর দেহের শেষ-যাত্রার আয়োজনে ব্যাপৃত হন। একটি নূতন পালঙ্ক নবশয্যাসম্ভারে ও বিবিধ মাল্য-পুষ্পাদি দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়। তাঁর শুভ জন্মমহোৎসবের দিনে ভক্তগণ তাঁকে যে

৮ মন ও মানুষ—১৫২ পৃষ্ঠা

ভাবে মনোরম বেশ-ভূষায় সজ্জিত করতেন, তাঁকে সেই ভাবে সুসজ্জিত করেন। তাঁকে পীতবর্ণরঞ্জিত নব বস্ত্র পরিধান করিয়ে মনোহর পুষ্পমাল্য, বিবিধ কুসুমাভরণ ও সুবাসিত চন্দনাদিতে বিভূষিত করা হয়। বেলা প্রায় সাড়ে তিনটার সময় ভক্তগণ গভীর শোক-ভারাক্রান্ত চিত্তে তাঁর শ্রীদেহ দ্বিতলের কক্ষ হ'তে নামিয়ে নীচে আনেন এবং ঐ পালঙ্কে স্থাপন করেন।

শ্রীপ্রভুর শেষ-যাত্রার অপরূপ রূপকান্তি ও সুমোহন বেশ-ভূষা দর্শনে নিদারুণ বিষাদের মধ্যেও শোকাতুর ভক্তগণের হৃদয় ক্ষণিকের জন্য আনন্দে ভরে ওঠে। তাঁর সর্বাঙ্গে স্নিগ্ধ জ্যোতিরাশি তখনও বর্তমান, একেবারে বিলীন হয়ে যায়নি। তাঁর বিমোহন রূপশ্রী ও অনিন্দ্য কান্তিচ্ছটা দর্শনে পরম বিমোহিত হয়ে ডাক্তার সরকার সমবেত ভক্তবৃন্দকে পরামর্শ দেন, ঠাকুরের এই অবস্থার একখানি ফটোগ্রাফ তুলিয়ে রাখা একান্ত দরকার। তিনি তার খরচ বাবদ দশটি টাকাও প্রদান করেন।

'ফুলের মালায় বিভূষিত তনুখানি।
এ সজ্জা ভীষণতর না যায় বাখানি॥
অতি বিষাদিত চিত মহেন্দ্র ডাক্তার।
বলিলেন, শ্রীপ্রভুর হেন অবস্থার॥
ফটো রাখিবার আছে অতি প্রয়োজন।
দশ টাকা দিনু এর ব্যয়ের কারণ॥'—পুঁথি

ডাক্তার সরকারের প্রেরণায় ও পরামর্শে ভক্তগণ অতঃপর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ঐ অবস্থার ফটোগ্রাফ গ্রহণের বন্দোবস্ত করেন। ফটোগ্রাফার আনিয়ে সমবেত ভক্তমণ্ডলী ও উপস্থিত দর্শকগণসহ তাঁর শ্রীমূর্তির ফটোগ্রাফ তোলা হয়। একটি মাত্র তুললে পাছে কোন কারণে তা ভাল না ওঠে, এই জন্য ঐ একই অবস্থার আর একটি ফটো নেওয়া হয়। সৌভাগ্যক্রমে দুটিই বেশ ওঠে।

এই ফটোতে দেখা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণদেব মহাসমাধিতে নিমগ্ন। তাঁর পূত নশ্বর দেহখানি একটি সুসজ্জিত পালঙ্কে শায়িত। মুখশ্রী অপার্থিব করুণা-প্রশান্তি ও দিব্য লাবণ্য কান্তিচ্ছটায় সমুজ্জ্বল। তাঁর নয়নযুগল নিমীলিত তাঁর বরাভয়পূর্ণ করদ্বয় সংযুক্ত অবস্থায় অঙ্কদেশে সংলগ্ন। দক্ষিণ পদটি বাম পদের উপরে রক্ষিত। তাঁর পরিধানে মনোহর বসন। তাঁর ললাটদেশ সুরভি-চন্দনে চর্চিত, কণ্ঠ মনোহর কুসুমমাল্যে বিভূষিত।

নব পালঙ্কশয্যাখানিও বিবিধ পুষ্পসম্ভারে ও কুসুমমাল্যাদিতে সুশোভিত। পালঙ্কটির চারিকোণে মশারি টাঙানোর চারিটি কাষ্ঠদণ্ডও দেখা যায়। সম্মুখের দণ্ডদ্বয়েও কুসুমমাল্য বিজড়িত। পালঙ্কখানি বাসভবনের সদর দরজার সোপানাবলীর সন্নিকটে রক্ষিত। ঐ শেষ-শয্যার পার্শ্বে প্রায় অর্ধশতাধিক ভক্ত ও দর্শক দণ্ডায়মান। তাঁরা প্রত্যেকেই নিদারুণ বিষাদে নিমগ্ন। পটভূমিকায় উক্ত বাসভবনের নিম্নতলের একাংশ দৃষ্ট হয়। ঐ অংশে উল্লিখিত ভবনের সদর প্রবেশদ্বার ও একটি জানালা দেখা যায়। পশ্চাতে ভক্তবৃন্দ ও দর্শকগণ উক্ত সোপানমালার উপর সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান রয়েছেন।

সমবেত ভক্তবৃন্দের মধ্যে আছেন—শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র, রাখাল, যোগীন, বাবুরাম, তারক, কালী, নিরঞ্জন, শরৎ, শশী, গঙ্গাধর, বুড়ো-গোপাল, লাটু, রামচন্দ্র দত্ত, বলরাম বসু, দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (মাষ্টার মহাশয়), ভবনাথ চট্টোপাধ্যায়, মনোমোহন মিত্র, সুরেন্দ্র মিত্র, গিরীন্দ্র মিত্র, হরিশ মুস্তাফি, নবগোপাল ঘোষ, মণিমল্লিক, অতুল ঘোষ,

বৈকুণ্ঠ সান্যাল, নিত্যগোপাল, মহিমাচরণ, বিনোদ, ভূপতি, ফকির (যজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্য) ছোটগোপাল, নারায়ণ, অমৃত, পতু প্রভৃতি।

পুরোভাগে বাম দিক থেকে ক্রমান্বয়ে ভবনাথ, নরেন্দ্র, রাম, বলরাম, নিত্যগোপাল, যোগীন, দেবেন্দ্র প্রভৃতি দণ্ডায়মান। এঁরা সকলেই উন্মুক্ত-গাত্র, কেবল বলরামের গায়ে জামা ও মাথায় পাগড়ি দেখা যায়। শ্রীযুক্ত বলরাম সর্বধর্ম-সমন্বয়ের একটি প্রতীক বাম হস্তে ধারণ ক'রে রয়েছেন। ঐ প্রতীকে এক অখণ্ড বৃত্তে শৈবের ত্রিশূল, অদ্বৈতবাদীর ওঁকার, বৈষ্ণবের খুন্তি, ইসলামের অর্ধচন্দ্র ও খ্রীষ্টের ক্রুশ দেখা যায়।

ঐ একই অবস্থার অপর ফটোগ্রাফটিতে কেবল ভক্তবৃন্দের সন্নিবেশে সামান্য পরিবর্তন লক্ষিত হয়। সামনের সারিতে বাম দিক থেকে যথাক্রমে ভবনাথ, বাবুরাম, নিরঞ্জন, নরেন্দ্র, রাম, বলরাম, রাখাল, নিত্যগোপাল, যোগীন, দেবেন্দ্র প্রভৃতি দণ্ডায়মান। এই ফটোতে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রের গলায় আঁচল ঝুলানো রয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তের যে গ্রুপ-ফটো কোন কোন গ্রন্থে প্রকাশিত দেখা যায়, তা উল্লিখিত মূল ফটোদ্বয়েরই অন্তর্গত চিত্র। পূর্ণাঙ্গ চিত্র-দুটি সচরাচর দেখা যায় না।

ঐ গ্রুপ-ফটোর অন্তর্গত শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃতি এরূপ করুণ ও মর্মস্পর্শী যে, ঐ মূর্তি-দর্শনে ভক্তহৃদয় ব্যথিত হয়। কিন্তু তার অন্তর্নিহিত ভাবটি অতি উচ্চ ও প্রেরণাপ্রদ। জগতের কল্যাণে তিনি দুঃসাধ্য ব্যাধি বরণ ক'রে অশেষ ক্লেশ সহ্য ক'রে তিলে তিলে দেহপাত ক'রে গিয়েছেন। এই ছবিখানি জীব-জগতের প্রতি তাঁর অপার অনুকম্পার পরিচয় বহন করে।

পরিশিষ্ট

(দ্বিতীয় ফটোর কথা *)

রবিবার ১৩ই ফাল্গুন, ১২৯০ সাল (২৪শে ফেব্রুআরি, ১৮৮৪)। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ-দেব প্রসঙ্গতঃ মাষ্টার মশাইকে বলেন : রাধা-বাজারে আমাকে ছবি তোলাতে নিয়ে গিছলো। সেদিন রাজেন্দ্র মিত্রের বাড়ি যাবার কথা ছিল—কেশব সেন আর সব আসবে, শুনেছিলুম। গোটাকতক কথা বলবো ব'লে ঠিক করেছিলাম। রাধাবাজারে গিয়ে সব ভুলে গেলাম। তখন বললাম!—'মা তুই বলবি! আমি আর কি বলবো।'[৯]

শ্রীরামকৃষ্ণদেব ২৮শে জুলাই, ১৮৮৫ খৃঃ মঙ্গলবার অপরাহ্নে বাগবাজারে শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর ভবনে ছবি দেখতে আসেন। তথায় বিভিন্ন দেবদেবীর চিত্র দর্শন ক'রে তিনি পরম আহ্লাদিত হন। ঘরের দেয়ালে শ্রীযুক্ত কেশব সেনের নববিধানের ছবিটিও টাঙানো ছিল। শ্রীযুক্ত সুরেশ (সুরেন্দ্র) মিত্র ঐ ছবি সযত্নে আঁকিয়েছিলেন। ঐ ছবিতে শ্রীরামকৃষ্ণ কেশব সেনকে দেখাচ্ছেন, ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়ে সব ধর্মাবলম্বীরা ঈশ্বরের দিকে যাচ্ছেন। গন্তব্য স্থান ও লক্ষ্য এক, শুধু পথ-মত আলাদা।

ঐ ছবি দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন,—'ও যে সুরেন্দ্রের পট!'[১০]

জনৈক ভক্ত সহাস্যে বলেন—'আপনিও ওর ভিতর আছেন।' শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) 'ওই এক রকম, ওর ভিতর সবই আছে! ইদানীং ভাব!' এই কথা বলতে বলতে হঠাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবে বিভোর হয়ে যান।

---

* শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দ্বিতীয় ফটোর বিস্তৃত বিবরণ উদ্বোধনে গত ১৩৬৮ সালের আশ্বিন (শারদীয়া) সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।

৯ কথামৃত ৪র্থ ১১শ খণ্ড, ৫ম পরিচ্ছেদ।

১০ কথামৃত—৩য় ১৮শ খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ।

লোকশিক্ষায় স্বামীজী

অধ্যাপক শ্রীবটুকনাথ ভট্টাচার্য

স্বাধীনতা জাতীয় আত্মলাভের সোপান

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকীর পরই যুগপ্রবর্তক স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম-শতাব্দীর উৎসব স্বাধীন ভারতের জীবনে অপূর্ব সংযোগ। একজন লোকপ্রকাশক, অন্যজন পথিপ্রদর্শক—এই দুইয়ের অবদানে বিশ্বের চতুষ্পথে ও চিন্তার আসরে আত্মনিবিষ্ট ভারত ফিরিয়া পাইয়াছে ন্যায্য স্থান ও সমুচ্চ মর্যাদা। শুধু জগৎ মাঝারে নিজ পরিচয়ের বিস্তারেই এই সংঘটনার সার্থকতা নয়—এদেশের পক্ষে সম্পূর্ণ আত্মলাভের ইহা পরম সুযোগ। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা আত্মবিকাশের পথে বাহ্য অন্তরায় দূর করে—জাতির আত্মশক্তির সর্বাঙ্গীণ প্রসারই প্রকৃত সফলতা। রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্যের লক্ষণ ও প্রচেষ্টা চারিদিকে এখন পরিপুষ্ট হইতেছে—অভ্যুদয়ের ও সমৃদ্ধির উপায় ও উপকরণ হইতেছে সঞ্চিত। স্বাধীন ভারতের আহ্বানে জাতির এই জাগরণকে সমগ্রতা দিবার জন্য বাহ্য উন্নতির সাথে, আত্মিক পরিস্ফূর্তির দিকে দৃষ্টির অপেক্ষা আছে—বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী তাহারই উদ্বোধক।

প্রতিভার একটি লক্ষণ—ইহা সর্বতোমুখী। স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তা ভারতের সকল সমস্যার দিকে প্রযুক্ত হইয়াছিল এবং দেশ-কল্যাণের যে বিরাট চিত্র তিনি অন্তরে পোষণ করিতেন, তাহা যে স্বপ্নবিলাস নয়—সত্য সঙ্কল্প, তাহা কালক্রমে প্রমাণিত হইতেছে। শিক্ষাবিষয়ে তাঁহার বাণী ইহার নিদর্শন।

জীবনে অদ্বৈতবেদান্তের প্রয়োগ

শিক্ষা-সম্পর্কে স্বামীজীর মতবাদ তাঁহার পরিপূর্ণ জীবন-দর্শনের অঙ্গ এবং উহার সহিত একান্তভাবে জড়িত। তাঁহার চিন্তার মধ্যে কতকগুলি মূলসূত্র সহজেই লক্ষিত হয়—এগুলি তাঁহার সকল উপদেশ ও প্রচারের মধ্যে বারংবার নানাভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। মানবাত্মার মহিমা ও অমেয় শক্তি, আন্তর্জাতিক ভাব-বিনিময় ও আদর্শ-সমন্বয় এবং ভারতীয় সংস্কৃতির অপূর্ব গৌরব—এই তিনটিকে তাঁহার চিন্তা-সৌধের স্তম্ভস্বরূপ বলা যাইতে পারে। আবার চরম বিশ্লেষণে এ তিনটিকেই তাঁহার সকল সিদ্ধান্তের বীজ—বৈদান্তিক অদ্বয় ব্রহ্মবাদের বিস্তার ও ব্যাবহারিক প্রয়োগ বলা যাইতে পারে। জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ—আধুনিক জগতে এই মহাতত্ত্বের প্রচারে তিনি ভারতের মুখপাত্র ও অগ্রণী হন।

সকল ভেদের অন্তরালে ও উর্ধ্বে যে অভিন্ন চেতনা নিখিল প্রপঞ্চকে বিধৃত রাখিয়াছে, তাহার তিনি শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা। ধর্ম, সমাজ ও লোকশিক্ষার ক্ষেত্রে এই মূল তত্ত্বের বিবৃতি তাঁহার রচনা ও ভাষণ-নিচয়ে অপূর্ব ঐক্য ও সঙ্গতি আনিয়াছে। এই ব্যাপক সঙ্গতি ও যুক্তির একাগ্রতা তাঁহার উপদেশাবলীর বৈশিষ্ট্য। কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে উহা মুখ্য আলোচ্যের বিষয় নয়।

শিক্ষায় সর্বশ্রেণীর অভ্যুত্থান

শিক্ষা মানবের অন্তর্নিহিত পরিপূর্ণ উৎকর্ষের বিকাশ, ধর্ম মানবের অন্তরে বিরাজিত

দেবত্বের অভিব্যক্তি—তাঁহার এই মহাবাক্য চিরস্মরণীয়। মার্কিন দেশে অভূতপূর্ব প্রচার-সাফল্যের পর মাদ্রাজ হইতে প্রেরিত অভিনন্দনের উত্তরে তিনি লিখিয়া পাঠান—গত শতাব্দীর ত্রিপাদ ধরিয়া ভারতে সমাজ-সংস্কারক ও সংস্কার-সমিতির প্রাচুর্য উপচিয়া পড়িতেছে, কিন্তু উহাদের প্রত্যেকেই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে। কারণ সমাজ-গঠনের প্রকৃত রহস্য তাঁহাদের অপরিজ্ঞাত।

১৮৯৭ খৃঃ শ্রীমতী সরলা ঘোষালকে লিখিত পত্রে তিনি লেখেন: শিক্ষা, শিক্ষা, একমাত্র শিক্ষারই প্রয়োজন। ইওরোপের নানা শহর ঘুরিয়া এবং সেখানে দরিদ্রদিগের মধ্যে স্বাচ্ছন্দ্য ও শিক্ষার-বিস্তার দেখিয়া স্বদেশে নিঃস্ব শ্রেণীর অবস্থা-স্মরণে আমার চোখে জল আসিত। এই পার্থক্যের হেতু কি? আমি ভাবিতাম এবং উত্তর পাইতাম—শুধু শিক্ষা। শিক্ষার ফলে আত্মপ্রত্যয় এবং আত্মপ্রত্যয়ের বলে উহাদের অন্তর্গত ব্রাহ্মণ্য জাগ্রত হইতেছে, আর তাহারই অভাবে আমাদের অন্তরে ব্রাহ্মণ্য ঘুমাইয়া পড়িতেছে।

স্বামীজীর এই আক্ষেপবাণী আজও স্বাধীন ভারতের পক্ষে সমভাবে প্রয়োজ্য। জনশিক্ষা ও গণ-জাগৃতি এখনও এদেশে ভবিষ্যতের গর্ভে। তিনি স্বদেশে ফিরিয়া কুম্ভকোণমে তাঁহার ভাষণে বলেন: ইওরোপের মহামনীষি-গণের মধ্যে এখন অন্য ধরনের আদর্শ পুষ্ট হইতেছে—তাঁহারা বুঝিতেছেন যে, সামাজিক ও রাজনীতিক অবস্থার অদল-বদলের দ্বারা মানব-জীবনের অনিষ্টগুলি দূর করা যায় না। অন্তরাত্মার উৎকর্ষই তাহা ঘটাইতে পারে। বলপ্রয়োগ, শাসনপটুতা বা কঠোর বিধিনিয়মের দ্বারা সমগ্র জাতির পরিস্থিতি বদলাইতে পারা যায় না; আধ্যাত্মিক ও নৈতিক অনুশীলনেই জাতিগত অসৎ প্রবৃত্তির প্রতিবিধান সম্ভব। ভারতে ও ভারতের বাহিরে মানব-জাতির সম্মুখে এই একই সমস্যা এবং জনসংখ্যার অবাধিত বৃদ্ধিতে উহাই উৎকট হইয়া উঠিতেছে। বর্তমানে সরকারী ও বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি অপেক্ষা ধর্মসম্প্রদায়-পরিচালিত বিদ্যায়তনে শিক্ষিত-গণের মধ্যে চরিত্র ও চিন্তার দৃঢ়তা ও বলিষ্ঠতা এবং আদর্শানুগতা যে অধিক দেখা যাইতেছে, ইহা সর্বজনস্বীকৃত সত্য।

শিক্ষাব্রতী সন্ন্যাসী

স্বামী বিবেকানন্দের স্থির স্বচ্ছ অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে ইহা পরিস্ফুট হইয়াছিল গত শতাব্দীর অবসানে। এবং তাঁহার অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত আজ ভারতের দিকে দিকে মূর্ত হইয়া উঠিতেছে। এ-বিষয়ে বক্তৃতা ও কথাপ্রসঙ্গে স্বামীজী তাঁহার অন্তরের অভীপ্সা বহুবার প্রকাশ করেন: কলিকাতার কেন্দ্রে একটি বৃহৎ মঠ আরম্ভ কর। সুশিক্ষিত একজন সাধু ইহার অধ্যক্ষ হউন; তাঁহার অধীনে শিল্পকলা ও প্রয়োগ-বিজ্ঞানের বিভাগ পরিচালিত হইবে—প্রত্যেকটি বিশেষজ্ঞ সন্ন্যাসীর তত্ত্বাবধানে থাকিবে। যতদিন জ্ঞানদানে ত্যাগী পুরুষগণ ব্যাপৃত ছিলেন, ততদিন ভারতের সম্মুখে সকল শুভ সম্ভাবনা ছিল উন্মুক্ত। ত্যাগীর মতো এত অল্প সময়ে কেহ কোন বিষয় আয়ত্ত করিতে পারে না। এ-জাতীয় সাধুসংঘ আমাদের গঠন করিতে হইবে। প্রয়োজন জ্বলন্ত দেশপ্রেম এবং ত্যাগসম্পন্ন কতিপয় তরুণের। দেশের জন্য এত কাজ বাকী রহিয়াছে—তোমার আমার মতো সহস্র সহস্র কর্মী সেজন্য আবশ্যক। আমার কল্পনা হয়—কতকগুলি ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচারিণী গড়িয়া তুলিতে হইবে, ইহারা ক্রমে সন্ন্যাস-ব্রত গ্রহণ

করিবে। জনতার মধ্যে শিক্ষার আলোক বিস্তার করাই হইবে তাহাদের কর্ম—গ্রাম হইতে গ্রামে—সারা দেশে। ব্রহ্মচারিণীগণ নারীজাতির মধ্যে এই কাজ করিবেন। ইতিহাস ও পুরাণ, গৃহস্থালি এবং শিল্পকার্য, গার্হস্থ্য-জীবনের কর্তব্য ও সুনীতি—এ সকল আদর্শ চরিত্রের পরিপুষ্টির জন্য আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে শিখাইতে হইবে।

ভবিষ্যতের জন্য যে পরিকল্পনা স্বামীজীর অন্তরে ষাট বৎসর পূর্বে বীজাকারে উদ্ভূত হয়, আজ দিকে দিকে কলিকাতার চতুষ্পার্শ্বে এবং বাংলার বাহিরে অন্যান্য প্রদেশেও আক্ষরিক ভাবে উহা সত্য হইয়াছে। দিকে দিকে দেখা দিয়াছে মহামহীরুহসকল, আর মূলে রহিয়াছে স্বামী বিবেকানন্দের শুদ্ধ ও সিদ্ধ সঙ্কল্প, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের পবিত্র নামের মহিমা ও তাঁহাতে আত্মনিবেদিত শিষ্য ও সাধুগণের অনাসক্ত লোকহিতনিষ্ঠা। প্রাচীন মন্ত্রপদ নবভাবে সার্থক হইয়াছে—মূলং কৃষ্ণো, ব্রহ্ম চ, ব্রাহ্মণাশ্চ। শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামীজীর বাণী ও মিশনের সাধুসম্প্রদায়—ইহারাই এই বিপুল বনস্পতির বীজ ও ক্ষেত্র। আধুনিক কার্যকরী শিক্ষা কিংবা পরম্পরাগত সংস্কৃত শিক্ষা—উভয়েই গুরুকুলবাস অপরিহার্য বলিয়া স্বামীজী মনে করিতেন।

তরুণশ্রেণীর লক্ষ্যহীনতা

চিন্তাবিহীন, আদর্শবর্জিত, সুখস্পৃহারত যৌবন ও ছাত্রজীবন প্রকৃত মানবতার সোপান হইতে পারে—ইহা এদেশের ধারণা নহে। সংবাদপত্রে প্রকাশ এবৎসর সাধারণ নির্বাচনে ছাত্র-সমাজের ঔদাসীন্য সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। এক ছাত্রী বলিয়াছেন (The Statesman—23. 2. 1962)—ছাত্রগণ স্তব্ধ ও জড় বুঝিবা ভ্রান্তিতে আচ্ছন্ন। অনায়াস জীবন এবং কর্মক্ষেত্রে উন্নতি-সাধনে তাহাদের অধিক আগ্রহ। তাহারা অসাড় স্ফূর্তিপ্রিয় ও লঘুচিত্ত হইয়া পড়িতেছে। ইহাদিগকে কৃপার পাত্র মনে করি। বর্তমানে যে কর্মশৈথিল্য ও নৈতিক ঔদাসীন্য জাতির জীবন-ধারায় দেখা দিয়াছে, তাহা অভূতপূর্ব উপসর্গ—এমত নহে।

জাতীয় চরিত্র ও কর্মশক্তির উন্নয়নের জন্য স্বামীজী ছাত্রাবস্থায় গুরুগৃহবাস একান্ত আবশ্যক মনে করিতেন—এই বিক্ষিপ্ত চিত্তের সংশোধনের জন্য। আমরা চাই বেদান্তের সাথে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, মূলমন্ত্র-স্বরূপ ব্রহ্মচর্য, শ্রদ্ধা এবং আপন আত্মাতে প্রত্যয়। আমাদের আবশ্যক বৈদেশিক শাসন-নিরপেক্ষ হইয়া আমাদের নিজস্ব বিদ্যার সকল শাখার চর্চা এবং উহার সাথে ইংরেজী ভাষা ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের অনুশীলন; আমাদের আবশ্যক কার্যকরী শিক্ষা এবং শিল্পোন্নতির সহায়ক সকল বিষয়ের সহিত পরিচয়।

উচ্চ শিক্ষা বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা লর্ড কার্জন সঙ্কুচিত করিতে উদ্যত হইলে স্বামীজী অভিমত প্রকাশ করেন: এই উচ্চ শিক্ষা রহিল বা গেল, তাহাতে কি আসিয়া যায়? লোকে কিছু শিল্পপটুতা যদি অর্জন করে, যাহাতে তাহারা কাজের যোগাড ও অন্নের সংস্থান করিতে পারে এবং চাকরির জন্য তাহাদের কাঁদাকাটি করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে হয় না—উহাই বরং ভাল।

মানবিকতা ও কারিগরি শিক্ষা

বিশ্ববিদ্যালয় বনাম কারিগরি শিক্ষার প্রশ্ন আজও দেশের সমক্ষে সেই ভাবেই রহিয়াছে—মানবিক ও সামাজিক বিদ্যার প্রসার কাম্য বা শিল্পকলার দক্ষতা জনসাধারণের মধ্যে বিস্তৃত হওয়া সদ্যঃপ্রয়োজন, ইহার সমাধান সরকার ও শিক্ষাব্রতী উভয়ের শিরঃপীড়ার কারণ।

স্বামীজীর ভবিষ্যদ্দৃষ্টি কতদূর পর্যন্ত উদ্ভেদ করিয়াছিল, তাহার সাক্ষ্য সর্বত্র প্রচুর।

কিন্তু শিক্ষা বলিতে তিনি মানুষ-গঠনই বুঝাইতে বিপুল প্রয়াস করিয়াছিলেন। আমাদের কাজ হইবে প্রধানতঃ চরিত্রনীতি ও ধীশক্তির উন্মেষণ। পৃথিবীর সমস্ত সম্পৎ ভারতের একটি ছোট গ্রামকেও উন্নত করিতে পারিবে না—যদি জনতা আত্মশক্তি প্রয়োগ করিতে না শিখে। মগজে যে তথ্যরাশি ভরিয়া দেওয়া হয় এবং তথায় জীর্ণ না হইয়া বিপ্লবের সৃষ্টি করে—তাহা শিক্ষা নয়। আমাদের প্রয়োজন এমন শিক্ষা, যাহা জীবন গড়িয়া তুলে, মানুষ প্রস্তুত করে, চরিত্র পুষ্ট করে, ভাবসমূহ আয়ত্ত করিতে পারে—এহেন শিক্ষা। আত্মিক ও লৌকিক উভয় শিক্ষাই আমাদের নিজ অধিকারে আনিতে হইবে।

ফরাসী জাতির প্রতিভা-দর্শনে স্বামীজী মুগ্ধ হন এবং অন্যান্য উন্নত দেশের বাহ্য সমৃদ্ধি ইহার তুলনায় ন্যূন না হইলেও চিত্তোৎকর্ষে তাহাদের স্থান কত পিছনে—তাহা লক্ষ্য করেন। প্রচুর ধন, পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানের উৎকর্ষ এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য—সকলই তাহাদের আছে সত্য, কিন্তু এমন মার্জিত মানুষটি কোথায় পাওয়া যায়? এ যে প্রাচীন গ্রীকের মনুষ্যত্বেরই এ-যুগে পুনরাবির্ভাব।

মানুষ-গঠন

স্বামী বিবেকানন্দের সকল ভাষণে এই মানুষ-গড়ার লক্ষ্য ধ্রুব নক্ষত্রের মতো স্থির ও সর্বোপরি দীপ্যমান। 'বর্তমান ভারত' শীর্ষক প্রবন্ধের শেষে তাঁহার উক্তি সর্বজন-বিদিত: হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও; মা, আমার দুর্বলতা কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।

বেদান্ত-প্রচারের লক্ষ্য-বিষয়ে বক্তৃতায় তিনি বলেন: আমাদের দেশের এখন প্রয়োজন—লৌহদৃঢ় পেশী, ইস্পাতের মতো স্নায়ু, বিপুল ইচ্ছাশক্তি, কিছুতেই যাহার প্রতিরোধ করিতে পারে না, বিশ্বের সকল প্রহেলিকা সকল রহস্য যাহা উদ্ভেদ করিতে পারে এবং যে-কোন প্রকারে যাহা নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারে, এ হেন দেহ-মন—সমুদ্রতলে নামিয়া হোক কিংবা মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়াই হোক। তাই বেদান্তের অদ্বৈতভাব-প্রচার আবশ্যক জনগণের চিত্ত উদ্বুদ্ধ করার জন্য, তাহাদের আত্মার গৌরব প্রমাণ করিবার জন্য।

দুর্জয় পৌরুষ

বর্তমান যুগে মানুষের এই অসীম মনোবল ও দুর্জয় সাহস মহাশূন্যের অভিযান ও অন্তরীক্ষে পৃথিবী-পরিক্রমার চেষ্টায় প্রযুক্ত হইতেছে। ভারতের সাধক-জীবনে যুগে যুগে ইহা প্রমাণিত হইয়াছিল মানবাত্মার মহিমার সন্ধানে—দেহের সকল ভোগ, সকল ক্লেশ, পার্থিব সকল কামনা তুচ্ছ করিয়া পরম স্বাতন্ত্র্যের প্রতিষ্ঠায়। স্বামী বিবেকানন্দ এই সন্ন্যাস-পরম্পরার শক্তিমান প্রতিনিধি ও বিশ্বসভায় অপূর্ব প্রচারক।

শিক্ষার ত্রিধারা

শিক্ষা-পদ্ধতি সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত ও উপদেশের মর্ম ভারতের এই সনাতন সাধনার স্রোতেরই অনুবৃত্তি ও বিস্তার। ইহাতে তিনটি ধারা—তিনটি তত্ত্ব মিশিয়া রহিয়াছে: (১) একাগ্রতা সকল জ্ঞানের সোপান। জ্ঞানের আলোক মানুষের অন্তরের বিকাশ—আত্মার জ্যোতিঃ। (২) আত্মসংযমের দ্বারা বিভূতি বা অসাধারণ শক্তি লাভ হইয়া থাকে। (৩) সর্বজীবে ঐক্য বা নিখিলব্যাপ্ত অখণ্ড চৈতন্যের বোধ বিশ্বপ্রেমের উৎস—ইহার

শক্তিতে মানুষ সর্বজয়ী হয়। এই তিনটি মূলতত্ত্বের বিবৃতিই কর্মক্ষেত্রে বেদান্তের উপযোগিতা-সম্বন্ধে স্বামীজীর বিভিন্ন বক্তৃতায় প্রদর্শিত। এই সকল বিদ্যার পরিণত ফল আয়ত্ত করিতে হইলে সর্বাগ্রে আবশ্যক শ্রদ্ধা—ভারতের ঐতিহ্যে, চিরন্তন প্রথায়, শিক্ষাদাতা গুরুতে, নিজ শক্তিতে ও অসীম সম্ভাব্যতায়।

হোমা পাখি

পরমহংসদেবের 'কথামৃতে' যে হোমা-পাখির উল্লেখ আছে—উহা মানুষের এই অমেয় ক্ষমতার প্রতীক। অনন্ত গগনে এই বিহঙ্গের জন্ম—নিরন্তর ঊর্ধ্বগতি ইহার ধর্ম। ডিম ফুটিয়া যতক্ষণ না বাহির হয়—ততক্ষণ ইহা পড়িতে থাকে, কিন্তু তাহার পরই অসীম আকাশে উড়িতে থাকাই ইহার স্বভাব—নিরন্তর, অশ্রান্ত, অপ্রতিহত উড্ডয়ন। 'মনের একাগ্রতাই জ্ঞানের রত্নভাণ্ডারের একমাত্র চাবি। এই একমাত্র আহ্বান, এই দ্বারে করাঘাত প্রকৃতির সকল দ্বার উন্মুক্ত করে এবং আলোকের বন্যাস্রোত বহাইয়া দেয়।'

আত্মার বিকাশে জ্ঞানের স্ফুরণ

তিনি আরও বলিয়াছেন: আত্মার বিকাশের সাথে দেখিবে বিজ্ঞান, দর্শন, সকল পদার্থ অনায়াসে আয়ত্ত হইবে। এই আত্মার প্রকাশে যত্ন কর, দেখিবে বোধশক্তি সকল বিষয়ে প্রবেশ করিবে।

আর একস্থলে তিনি বলেন: তরঙ্গসঙ্কুল সাগর কোন জাতি জয় করিতে পারে, বিশ্বের মৌলিক উপাদানসকল আয়ত্তে আনিতে পারে, আপাতদৃষ্টে বহু জন্মের হিতসাধনের সমস্যাগুলি যতদূর সম্ভব সমাধান করিতে পারে, তথাপি আত্মজয়েই যে ব্যক্তির জীবনে সভ্যতার সর্বোচ্চ স্তর—ইহা উপলব্ধি করিতে না পারে। ইহা ভারতের শাশ্বত বাণী—'আত্মা বশীকৃতো যেন, জিতং তেন জগত্রয়ম্।'

আন্তর্জাতিক বিদ্বেষ ও বিরোধের পরিহার আজ মানবজাতির জীবন-মরণের প্রশ্ন। সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান আশা প্রকাশ করিয়াছেন যে, মহাকাশে বিভিন্ন রাষ্ট্রের ব্যোমযাত্রিগণ যখন একযোগে অভিযানে পৃথিবীর পরিসর অতিক্রম করিবেন, তখন সংগ্রামশীল জাতীয়তা-বুদ্ধিও স্বতই অন্তর হইতে অপসৃত হইবে। ইহা মনোবিজ্ঞানের দ্বারা সমর্থিত হইবে কিংবা আশাবাদীর স্বপ্ন-মাত্র প্রমাণিত হইবে, তাহার নির্ণয় সুদূর ভবিষ্যতের অপেক্ষা করে না। স্বামী বিবেকানন্দের উক্তি এ-বিষয়ে যথার্থ তত্ত্বের প্রকাশক।

অন্তরের পরিবর্তনে জগতে শান্তি

সাম্প্রতিক চিন্তাশীল মনীষিগণও ক্রমশঃ এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতেছেন—মানুষের অন্তঃপ্রকৃতির পরিবর্তন ভিন্ন সংসারের অনর্থরাশি নিরাকৃত হইতে পারে না। সে পরিবর্তনের অর্থ আত্মজ্ঞান ও আত্মজয়। বেদান্তের বাণী ও স্বামীজীর প্রচার ইহারই নির্দেশ। তিনি যে শিক্ষা-প্রণালী অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা লৌকিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে ও তাহার ভিত্তিরূপে এই মানব-সত্তার বিচিত্র ও বিপুল মহিমার পরিবেষণ। বেদান্তের অদ্বয়বাদের মধ্যে মনুষ্য-আত্মার উচ্চতম আকাঙ্ক্ষা যেরূপ পরিস্ফূর্ত হইয়াছে, তাহার তুলনা হয় না।

অদ্বয়তত্ত্ব নীতিতত্ত্বের ভিত্তি

পরমকুড়ি-অভিনন্দনের উত্তরে স্বামীজী বলেন: একমাত্র সেই ধর্মেরই শিক্ষা দেওয়া উচিত, যাহা অভয়ের বাণী ঘোষণা করে।

বাহ্য জগতে বা ধর্মজগতে ভয়ই অধোগতি ও পাপের কারণ। ভীতি হইতেই দুর্দশা, ভীতি হইতেই মৃত্যু, ভীতি হইতেই অনর্থ। ভীতির কারণ কি? আমাদের স্বরূপের অজ্ঞতা। উপনিষদ্ই বিশ্বের একমাত্র সাহিত্য, যাহাতে 'অভী' শব্দ বারংবার প্রযুক্ত হইয়াছে, অন্য কোন ধর্মগ্রন্থে ঈশ্বর বা মানবের বিশেষণরূপে 'অভী' শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই। সিন্ধুতীরে বিশ্ববিজয়ী সেকেন্দারের সম্মুখীন সেই সন্ন্যাসীই আমার মানসনেত্রে ভাসিয়া উঠে—দিগ্‌বসন, শিলাপটে আসীন, কাঞ্চন ও সম্মানের প্রলোভনে এবং মৃত্যুর সন্ত্রাসে বিদ্রূপের হাসিতে উদ্ভাসিত। তাঁহার কথা—'জড়জগতের সম্রাট্! কে আমাকে মারিতে পারে? জন্ম-জরাহীন আত্মা আমি, আমি অমেয়, আমি বিভু, আমি সর্ববিদ্। বীর্যের আকর উপনিষদ্‌বাজি। সমগ্র জগৎকে বলিষ্ঠ করিবার শক্তি উহাতে। সারা পৃথিবী সঞ্জীবিত, বল- ও শক্তিসম্পন্ন হইতে পারে ইহার প্রেরণায়। মুক্তি—দেহ, মন ও আত্মার মুক্তি উপনিষদের মূল মন্ত্র।

বিশ্বমানবতা, জীবে প্রেম, মানব-পরিবারের ঐক্য—বর্তমান যুগের বিশিষ্ট মতবাদ, কিন্তু প্রচারের বস্তু হইলেও অনুষ্ঠানে দাঁড়াইতেছে না। কারণ যে-শিক্ষায় এই উদার আমিত্বের প্রসারে মানুষ অভ্যস্ত হয়, তাহা যুক্তিতর্কে, স্বার্থসুবিধার তুলাদণ্ডে নির্ণীত হইতে পারে না। অন্তরের পরিবর্তন, হৃদয়বৃত্তির অনুশীলন, অধ্যাত্ম-দৃষ্টির উন্মীলন ইহার উপায়। অদ্বৈতবাদ উহার সোপান।

স্বামীজী বলেন: আমার ভাইকে কেন ভালবাসিব? যেহেতু সে ও আমি এক। সমগ্র বিশ্বে এই ঐক্য, এই অখণ্ড সংহতি বর্তমান। পায়ের তলার নগণ্য কীট হইতে এ যাবৎ দৃষ্টিগোচর সর্বোচ্চ জীব পর্যন্ত পৃথক্ দেহ সকলের, কিন্তু তাহারা একই আত্মা। এই স্তরে পৌঁছানোমাত্র—আমি সেই, আমি বিশ্বের আত্মা, আমি চিরানন্দময়, আমি নিত্য মুক্ত—এই বোধ হইলেই প্রকৃত প্রেম জন্মে, ভয় দূর হয়, সকল দুঃখের হয় নিবৃত্তি। সারা পৃথিবীতে এই ভাব বিতরণের জন্য শত শত মৈত্রী-করুণার অবতার, শত শত মহাপুরুষের প্রয়োজন।

ভূমার উপলব্ধিতে নিরন্তর অভ্যস্ত বলিয়া, অদ্বৈত দর্শনে চিত্ত সতত উদ্‌বুদ্ধ বলিয়া স্বামীজী সমস্ত মানবজাতির বিপুল প্রয়োজন মানস-নেত্রে যথাযথ প্রত্যক্ষ করেন। এবং যে সঙ্কীর্ণতায় আপনাকে ও নিজগোষ্ঠীকে শ্রেষ্ঠ ও সভ্যতার শেষ পরিণতি ধারণা জন্মায় সতত তিনি তাহার অতীত ও ঊর্ধ্বে অবস্থিত ছিলেন।

ত্যাগীর অবদান চিরন্তন

বিরাট বিশ্বের সাযুজ্য হইতেই অহমিকা অভিমান অপসৃত হয়। লস্ এঞ্জেলেস্ হইতে লিখিত পত্রের উপসংহারে তাঁহার উক্তি: ভারাক্রান্ত সবাই এস এবং তোমাদের বোঝা আমাতে ন্যস্ত কর, তারপর স্বচ্ছন্দমত বিচরণ কর এবং সুখী হও, আর আমি যে কখনও ছিলাম ভুলিয়া যাও। স্বামীজী বলিয়াছেন: ভারতের ইতিহাসে এমন সময় কখনও হয় নাই, যখন ধর্মোপদেশক মহাপুরুষবৃন্দ দৃষ্ট হন নাই। ধর্মবীর সাধু-তপস্বিগণই সমাজের সমর্থ শিক্ষক, ইঁহাদের শিক্ষা আচারে, জীবন-ধারায়, নীরব আদর্শের সৃষ্টিতে। এই শিক্ষক-পরম্পরা লোক-কল্যাণের উৎস। ইহার উচ্ছেদ নাই, কারণ ইহার উচ্ছেদে সমাজের শুভবুদ্ধি হয় ক্ষুণ্ণ ও স্তব্ধ।

স্বামী বিবেকানন্দের সুদূর স্বচ্ছদৃষ্টি ভবিষ্যতেও এই ধারা অব্যাহত থাকিবে এবং

মহত্তর পুরুষের উদ্ভবে বিপুল প্রবাহে পরিণত হইবে—এই কল্পনায় বিভোর ছিল। তাঁহার বাণী আশার বাণী—অবিচ্ছিন্ন ধারায় ঋষি-তপস্বী, বুদ্ধ-খৃষ্ট পর্যায়ের মহাত্মাগণের আবির্ভাবের বার্তা। 'বিবেকানন্দগণের অভাব হইবে না, যদি জগতের প্রয়োজন থাকে। ঐ যে যুবকদল এখানে সঙ্গীত আলাপ করিয়াছিল, যাহাদের অপদার্থ মনে কর, প্রভুর ইচ্ছা হইলে তাহারা প্রত্যেকে এক একজন বিবেকানন্দে দাঁড়াইতে পারে।'

স্বামী বিবেকানন্দের প্রচার মানব-মহত্ত্বের বিকাশের আশ্বাস—তাঁহার শিক্ষা মনুষ্যত্বের পরমোৎকর্ষের বিবর্তনে দেবত্বের পরিস্ফুরণ। সন্ন্যাসী শিক্ষক ও শিক্ষালয় অহংমমত্ববর্জিত সমাজ-সেবার প্রকৃষ্ট উপায়—ইহার সাহায্যে মানবতার দিব্য পরিণতি ছিল তাঁহার লক্ষ্য।

শক্তি দিয়ে শক্তিপূজা

শ্রীনবগোপাল সিংহ

মন্থর-গতি স্বচ্ছ নদীর সোনালি স্রোতে
শুভ্র মেঘের পাল তুলি ঐ আকাশপথে,
উদয়-রবির স্বর্ণ-কিরণে সে অবগাহি
সুরলোক হ'তে দেবীর তরণী এসেছে বাহি।

কানন-চমরী চামর চুলায় কাশের ফুলে
শ্যামল পত্রে সহকারে শত কেতন দুলে।
অঙ্গে সুনীল অপরাজিতার বসন প'রে
শারদ দুহিতা হিম-তুহিতায় বরণ করে।

ধরিতে মায়ের কোমল চরণ কমল ফোটে
বনকেতকীর স্ফুরিত অধরে সুরভি ছোটে,
রামধনুকের সাতটি বরণ হরণ করি
আলিম্পনের স্বপ্ন জাগায় আকাশপরী।

শুভ্র বলাকা মালাগাঁথে ঐ নীলাম্বরে
বন-নহবতে দোয়েল পাপিয়া শানাই ধরে।
শারদ-সভায় পূজিতে মায়ের চরণদুটি
বন-অঙ্গনে শত শেফালীর কি লুটোপুটি?

এসেছে জননী আনন্দময়ী মোদের ঘরে
শূন্য হৃদয় আনন্দে আজ পূর্ণ ক'রে।
দশপ্রহরণে সজ্জিতা ওরে যে দশভুজা
শুধু, অশ্রু অর্ঘ্যে হয় কি কখনো তাহার পূজা?

মায়ের আগমনে

শ্রীমতী অমিয়া ঘোষ

বরষের পরে এসেছ জননী
হরষে ধরণী হাসিছে তাই;—
তুমি মা সবার ভরসা শান্তি,
তুমি মা সবার পরম ঠাঁই!
এসেছ দুর্গা দুর্গতি-হরা
বিঘ্ন-বিপদ করিতে ত্রাণ,
বরাভয়-কৃপা কল্যাণে তব
করো মা দীপ্ত নিখিল-প্রাণ।
এসেছ শরতে সারদা-দুলালী!
শারদ-শেফালী হাসিছে তাই;
সাজিল ধরণী, কুসুম-অর্ঘ্যে
লভিতে তোমার চরণে ঠাঁই।

শ্রীমন্মহাপ্রভু-কৃত শিক্ষাষ্টকের রূপায়ণ

[পূর্বানুবৃত্তি]

শ্রীমতী সুধা সেন

ভগবানের প্রতি জীবের যখন অহৈতুকী ভালবাসার উদয় হয়, তখনই ভগবানের সঙ্গে একটি সম্বন্ধজ্ঞানের স্ফুরণ হয়। বৈষ্ণব মহাজনগণ সেই সম্বন্ধকে চারটি ভাগে ভাগ করিয়াছেন : দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর। দাস্যে যে প্রেমের সূচনা, মধুরে তাহারই চরম পূর্ণতা। মহাপ্রভু বলেন, দাস্যভক্তিই সাধারণ জীবের কাম্য। কারণ

'জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস,
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ।'

—চৈঃ চঃ

স্বরূপতঃ জীব ও ভগবানে কোন ভেদ নাই, চিদংশে জীব ও ভগবান অভেদ, কিন্তু ঈশ্বর বিভুচৈতন্য, জীব অণুচৈতন্য, ঈশ্বর মায়াধীশ, জীব মায়াবশ। মায়া ঈশ্বরেরই বহিরঙ্গা শক্তি, তাই মায়া ঈশ্বরকে কবলিত করিতে পারে না, কিন্তু জীব অণুচৈতন্য বলিয়া মায়া তাহাকে কবলিত করিবার শক্তি রাখে। জীব স্ব-স্বরূপ ভুলিয়া যায় বলিয়া, ভগবানকে ভুলিয়া যায় বলিয়াই মায়া তাহাকে সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ করে।

'কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্মুখ,
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ।'

—চৈঃ চঃ

এই মায়ার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে ভগবানের শরণ গ্রহণ করিতে হয়—আন্তরিক ব্যাকুলতার সঙ্গে ভগবদ্-দাসত্ব প্রার্থনা করিতে হয়। গীতায় শ্রীভগবান স্বমুখেই এই আশ্বাস দিয়াছেন—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

—হে পার্থ, আমার এই দুরত্যয়া মায়ার হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে হইলে একমাত্র আমারই শরণ লও।

জীবের কল্যাণের আশায় প্রভু জীবভাব, ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া কৃষ্ণের কাছে দাস্য ভক্তির জন্য আকুল প্রার্থনা করিলেন—পঞ্চম শ্লোকে :

অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং
পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজ-
স্থিতধূলীসদৃশং বিচিন্তয়॥

কবিরাজ গোস্বামী ইহা ভাবানুবাদে লিখিয়াছেন,

'তোমার নিত্য দাস মুঞি তোমা পাসরিয়া
পড়িয়াছোঁ ভবার্ণবে মায়াবদ্ধ হৈয়া,
কৃপা করি কর মোরে পদধূলি সম,
তোমার সেবক, করোঁ তোমার সেবন।'

—চৈঃ চঃ

—হে নন্দাত্মজ কৃষ্ণ! আমি জীব স্বরূপতঃ তোমার নিত্যদাস, কিন্তু মায়া দ্বারা কবলিত হইয়া আমি বিষম ভবসমুদ্রে পতিত হইয়াছি। তুমি কৃপা করিয়া আমাকে তোমার চরণতলের ধূলি করিয়া লও, আমাকে তোমার সেবার অধিকার দাও।

জীবের প্রকৃতি যেন অনাদিকাল হইতেই কৃষ্ণ-বহির্মুখ হইয়া রহিয়াছে; শ্রুতিও বলেন :

পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূ-
স্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদ্
আবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্॥ (কঠ ২।১।১)

—বহির্মুখ ইন্দ্রিয়সমূহকে পরমেশ্বর বিনাশ করিয়াছেন, সুতরাং জীব বহির্বিষয়সমূহই দর্শন করে, অন্তরাত্মাকে নহে। কোন বিবেকী অমৃতত্বের অভিলাষী হইয়া ইন্দ্রিয় সংযমপূর্বক প্রত্যগাত্মাকে দর্শন করেন।

যদি কোন জীব জন্ম-জন্মান্তরের সুকৃতিবলে সাধু গুরুর কৃপায় কৃষ্ণের সন্ধান লাভ করেন, তবেই মায়ার দাসত্ব হইতে তাঁহার মুক্তি হয় এবং ভগবদ্‌-দাসত্ব লাভ করিয়া তিনি ধন্য হন।

ঈশ্বর করুণাময়, জীবের দুঃখে তাঁহার হৃদয় কাঁদে, তাই অবতার-রূপে গুরুরূপে সাধুরূপে অবতীর্ণ হইয়া তিনি জীবের কল্যাণ-সাধনে ব্রতী হন, শিষ্য যদি ভুল পথে পদক্ষেপ করে, তবে গুরু কেশাকর্ষণ করিয়াও শিষ্যকে ঠিক পথে ফিরাইয়া আনেন।

গোবিন্দ (শ্রীমৎ ঈশ্বরপুরী-প্রেরিত প্রভুসেবক গোবিন্দ নহেন) অকৃতদার, আজন্ম ব্রহ্মচারী প্রভুর পরম ভক্ত, একবার প্রভুর তীর্থযাত্রা-পথে সঙ্গী হইয়া চলিয়াছেন। দিনের পর দিন অনশনে অর্ধাশনে চলিয়াছেন প্রভুর সঙ্গে নীরবে পরমানন্দে ;—প্রভুর যাহা গতি, ভৃত্যেরও তাহাই !

যেদিন অযাচিত যাহা কিছু আসে, তাহাই নিবেদন করিয়া প্রভু প্রসাদ গ্রহণ করেন, তারপরে গ্রহণ করেন গোবিন্দ, যেদিন কিছু আসে না, সেই দিন হরিনামামৃত-পানেই কাটিয়া যায়।

আজ মিলিয়াছে কিছু অন্ন, মধ্যাহ্নে গ্রামান্তে বৃক্ষছায়াতলে সেই অন্ন প্রস্তুত করিয়া প্রভু কৃষ্ণের কাছে নিবেদন করিলেন। তারপর সেই নিবেদিত প্রসাদের সামান্য মাত্র গ্রহণ করিয়া আচমনান্তে গোবিন্দের দিকে হাত বাড়াইলেন—মুখশুদ্ধির জন্য একখণ্ড হরীতকীর প্রয়োজন। গোবিন্দ চিন্তায় পড়িলেন—সামান্য একখণ্ড হরীতকী তাহাও তাঁহার কাছে নাই, তিনি এমনই হতভাগ্য সেবক।

মধ্যাহ্নের প্রখর সূর্যতাপ অগ্রাহ্য করিয়াই গোবিন্দ দূর গ্রামের দিকে ছুটিলেন, কোন মতে হরীতকী সংগ্রহ করিয়াই আবার ছুটিয়া আসিলেন প্রভুর কাছে, একখণ্ড হরীতকী প্রভুর হাতে দিতে পারিয়া এতক্ষণে গোবিন্দের মন সুস্থ হইয়া উঠিল।

পরদিন আবার চলিয়াছেন, অগ্রে প্রভু, পশ্চাতে গোবিন্দ। গ্রাম অরণ্য অতিক্রম করিতেছেন প্রভু—না তীর্থ পরিক্রমা, কে জানে? যাহাকে সম্মুখে দেখিতেছেন, তাহাকেই কৃষ্ণনাম দিতেছেন ; দুই হাতের অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া যেন লইয়াছেন কৃষ্ণ-প্রেমধন, তাহাই অকাতরে বিলাইয়া দিতেছেন। শুধু মানুষকে নহে, বনের হিংস্র পশু পাখি পর্যন্ত সেই পরমধন-লাভে বঞ্চিত হইতেছে না। নামের বন্যায় সমস্ত দেশ প্লাবিত হইয়া যাইতেছে। যাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন, যাঁহাকে একবার মাত্র স্পর্শ করিলেন, তিনিই যেন স্পর্শমণি হইয়া গেলেন। নামের রসে সিক্ত হইয়া সেই সুকৃতিমান্ যাঁহাকে স্পর্শ করিলেন তিনিও বলিতে লাগিলেন, 'কৃষ্ণ, কৃষ্ণ'। বনের ব্যাঘ্র সিংহও নির্ভয়ে অহিংসায় প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে—প্রভু তাহাদের কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলো !' অমনি তাহাদেরও কণ্ঠ হইতে বাহির হইয়া আসিল আনন্দধ্বনি যেন অব্যক্ত নাম !

প্রায় দিনশেষে আজও আসিয়া উপস্থিত হইলেন এক গ্রাম-প্রান্তে। ভিক্ষান্ন প্রস্তুত করিয়া, ভোগ নিবেদন করিয়া সামান্য প্রসাদ গ্রহণান্তে আজও আবার প্রভু হাত বাড়াইলেন গোবিন্দের দিকে। আজ আর গোবিন্দের দেরি হইল না, সঙ্গে সঙ্গেই প্রভুর হাতে এক

খণ্ড হরীতকী দিয়া গোবিন্দ আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিলেন। প্রভু যেন বিস্মিত হইয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, 'একি গোবিন্দ, কাল যখন চাহিলাম, তখন তো হরীতকী দিতে তোমার অনেক বিলম্ব হইয়াছিল, আজ চাহিবামাত্র কোথা হইতে তাহা সংগ্রহ করিলে?' আজ প্রভুর সামান্য সেবা করিতে পারিয়াছেন, তাই আনন্দিত গোবিন্দ বলিলেন, 'প্রভু, আপনার কষ্ট হইবে ভাবিয়া গতকল্যকার সংগৃহীত হরীতকীর দুই একটি খণ্ড আমি রাখিয়া দিয়াছিলাম, তাই আজ এত শীঘ্র তাহা আপনার হাতে দিতে পারিলাম।'

প্রভু হাসিলেন, গোবিন্দ অধিকতর উৎফুল্ল হইলেন, কিন্তু তখন কি গোবিন্দ জানিতেন, কি বজ্র লুকানো রহিয়াছে ঐ মধুর হাসির অন্তরালে? ধীরে ধীরে প্রভু বলিলেন, 'গোবিন্দ! আমি নিষ্কিঞ্চন সন্ন্যাসী, সঞ্চয়-ধর্ম আমার পক্ষে নিষিদ্ধ। তুমি আমার সঙ্গী, কিন্তু সঞ্চয়বুদ্ধি তোমার আজও দূর হয় নাই, তুমি গৃহে ফিরিয়া যাও, সংসারী হও, আমার সঙ্গে আর তোমার যাওয়া চলিবে না।'

উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ হইতে গোবিন্দ অতল সাগরে নিক্ষিপ্ত হইলেন। তিনি তো নিজের জন্য এতটুকু সঞ্চয় করেন নাই, প্রভুর পথযাত্রার ক্লেশ এতটুকু লাঘব করিবার আশাতেই তিনি এই সঞ্চয়টুকু করিয়াছিলেন মাত্র। 'প্রভু দয়া কর! আমি অজ্ঞান, না জানিয়া যে অপরাধ করিয়াছি, তাহার পুনরাবৃত্তি হইবে না। ক্ষমা কর, তোমার দীনাতিদীন দাসকে চরণছাড়া করিও না'—প্রভুর চরণে গোবিন্দ কাতর মিনতি করিতে লাগিলেন।

মধুর কোমল কণ্ঠ, কিন্তু তাহাতে বজ্র কঠোর আদেশের সুর! প্রভু বলিলেন, 'গোবিন্দ, আমার আদেশ অমান্য করিও না, তুমি গৃহে ফিরিয়া যাও, তীর্থপরিক্রমান্তে পুনরায় আমি তোমার কাছে আসিব।'

গোবিন্দের চোখের জলে ধরণী সিক্ত হইল, কিন্তু প্রভু সিক্ত হইলেন না। বার বার ফিরিয়া ফিরিয়া আকুল দুই তৃষিত নয়নে প্রভুর দিকে চাহিতে চাহিতে গোবিন্দ নিষ্ক্রান্ত হইলেন। অস্তগামী সূর্যের শেষ রশ্মি-লেখার সঙ্গে প্রভুর সুবর্ণ কান্তি-রেখা দূর দিগন্তে মিলাইয়া গেল—মিলাইয়া গেল গোবিন্দের শেষ আশা, প্রভু ফিরিয়া ডাকিলেন না।

অগ্রদ্বীপে এক কুটিরে গোবিন্দ বসিয়া থাকে অধীর প্রতীক্ষায়, কবে প্রভু আসিবেন। স্বকৃত অপরাধের গুরুত্ব বুঝিতে চায় না মন, প্রাণ সহিতে পারে না প্রাণারামের বিচ্ছেদ-দহন; তবু ধৈর্য ধরিতে হয়, প্রভু বলিয়াছেন—ফিরিয়া আসিবেন। প্রভু আসিলেন, গোবিন্দ আসিয়া লুটাইয়া পড়িলেন, প্রভুর চরণতলে। প্রভু গোবিন্দকে সান্ত্বনা ও আশ্বাস দিয়া গোপীনাথের এক সুন্দর বিগ্রহ স্বহস্তে গোবিন্দের গৃহে প্রতিষ্ঠা করিলেন—বলিলেন, 'গোবিন্দ! তুমি কায়মনোবাক্যে এই শ্রীবিগ্রহের সেবা কর, ইঁহার মধ্যেই তুমি আমাকেও পাইবে। আর এক কথা, তুমি আমার বাক্য পালন করিয়া সংসারী হও, বিবাহ কর, তোমার ইহাতে কল্যাণ হইবে। আজন্ম ব্রহ্মচারী, সংসার-নিরাসক্ত গোবিন্দ স্তম্ভিত হইলেন, 'একি কঠোর আদেশ, কঠিন পরীক্ষা দুর্বলের প্রতি? প্রভু! দয়া কর, ফিরাইয়া লও তোমার এই আদেশ', গোবিন্দ কাতর মিনতি করিতে লাগিলেন।

প্রভু বলিলেন, 'গোবিন্দ! সংসার কি তাঁহাকে ছাড়া? গোপীনাথের সংসার গোপীনাথ দেখিবেন, তুমি তাঁহার সেবক, ভৃত্য মাত্র। শুদ্ধ দাস-অভিমানে তুমি

সংসার-ধর্ম পালন করো, ভুলিও না তুমি কৃষ্ণদাস ; ইহাতেই তুমি পরম কল্যাণ, পরম প্রেম লাভ করিয়া ধন্য হইবে।'

গোবিন্দকে আশীর্বাদ করিয়া প্রভু অগ্রদ্বীপ ত্যাগ করিলেন। মুহ্যমান মুর্ছাহত গোবিন্দ অপলক নেত্রে প্রভুর গমন-পথের দিকে চাহিয়া রহিলেন অসহায় অনাথের মতো। যন্ত্রণাময়ী রজনীর তন্দ্রাহীন প্রহরগুলি ধীরে ধীরে পার হইতে লাগিল, ক্রমে যেন শিথিল দেহমনে যন্ত্রণাবোধও আর রহিল না।

অবশেষে একদিন এই অব্যক্ত বেদনারও অবসান হইল, গৌর নাই, কিন্তু গোপীনাথ তো আছেন! গোবিন্দ উঠিলেন—ঐ তো ; পরম প্রত্যাশায় স্নিগ্ধ করুণ দুই নয়ন মেলিয়া সুন্দর সুকুমার শ্যামতনু গোপীনাথ চাহিয়া আছেন গোবিন্দের দিকে—'আমাকে কি তুমি গ্রহণ করিবে না গোবিন্দ? আমিই যে তোমার গৌর!'

গোবিন্দ দ্রুতচরণে আসিয়া বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন গোপীনাথকে—যেন জাগ্রত জীবন্ত এক মধুর স্পর্শসুখে গোবিন্দ আত্মহারা হইয়া গেলেন—আনন্দে গোবিন্দের হৃদয়-মন উৎফুল্ল হইয়া উঠিল—এখন প্রভুর আদেশ পালন করিতে আর কি ভয়?

গোপীনাথের সেবায় গোবিন্দ আপনাকে ঢালিয়া দিলেন। মন প্রাণ সেবানন্দে ডুবিয়া থাকিতেই চাহে, কিন্তু প্রভুর আদেশ ; গোবিন্দ বিবাহ করিলেন।

কালক্রমে একটি পুত্রকে পৃথিবীর আলোতে আনিয়াই গোবিন্দ-গৃহিণীর নয়নের আলো নিভিয়া গেল। মৃতা পত্নীর বক্ষ হইতে অসহায় কোমল ক্ষুদ্র শিশুটিকে গোবিন্দ আপন-বক্ষে তুলিয়া লইলেন, চোখের জলে বক্ষ ভাসিয়া গেল—'আহা রে! নিরপরাধ এই কোমল বিহঙ্গটিকে তো বাঁচাইতে হইবে!' গোবিন্দ যেন সমস্ত হৃদয় দিয়া ইহাকে আবৃত করিয়া রাখিলেন। সারা দিনরাত্রি কোথা দিয়া কাটিয়া যায়, গোবিন্দ তাহা বুঝিতেও পারেন না—পুত্রের সেবায় ঢালিয়া দিয়াছেন আপনাকে, 'আহা ইহার যে মা নাই—আমি না দেখিলে কে ইহাকে দেখিবে?'

গোপীনাথের নিত্য পূজা সেবাও করেন, কিন্তু মন প্রাণ উৎকর্ণ হইয়া থাকে পুত্রের দিকে। গোপীনাথের শৃঙ্গার করিতে করিতে হঠাৎ চমকিত হইয়া দেখেন—'কোথায় গোপীনাথ: অলকা তিলকা পুষ্প আভরণে এতক্ষণ ধরিয়া কাহাকে সজ্জিত করিতেছেন তিনি, গোপীনাথের বিগ্রহে এ যে দেখি পুত্রমুখ?' গোপীনাথের অগ্রে ভোগ নিবেদন করিয়া বসিয়া আছেন নীরবে, চোখের উপরে ভাসিয়া উঠিতেছে পুত্রের ক্ষুধাতুর মুখ! ক্বচিৎ কখন বা পুত্রস্নেহের প্লাবনে যখন হৃদয় মন পরিপ্লুত হইয়া উঠিয়াছে, তখন যেন মনের গহনে অতিসন্তর্পণে উঁকি দিতেছে একখানি সকরুণ মুখচ্ছবি, অবহেলিত গোপীনাথের মুখ! পুত্রে গোপীনাথে আরম্ভ হইল দ্বন্দ্ব, কিন্তু জয়লাভ করিল পুত্র ; গোবিন্দ যেন এই নবলব্ধ পুত্রস্নেহের কাছে হার মানিলেন—'আমি তো চাহি নাই, তথাপি তুমিই যখন সংসার জুটাইয়াছ গৌর, আনিয়া দিয়াছ এই পরম ধন, তখন তাহাকে ফেলিব কেমন করিয়া, আমি ছাড়া আর কে আছে ইহার?'

গোপীনাথের সংসার এখন গোবিন্দের সংসার হইল, এবং সংসারের কেন্দ্রে রহিল পুত্র।

বালক পাঁচ বৎসরের হইল—তাহার কচি কণ্ঠের মুখর আনন্দ-কাকলিতে গোবিন্দের নিরানন্দ গৃহ ভরিয়া উঠিল। কোমল কণ্ঠের আদরে, আহ্বানে, অভিমানে গোবিন্দের

পিতৃহৃদয় এক অনাস্বাদিত মাধুর্যরসে ক্রমেই পূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল। এক মুহূর্তও পুত্রকে কাছ ছাড়া করিতে প্রাণ চায় না, মন অধীর হইয়া উঠে, কিন্তু তবু ছাড়িতে হইল—পঞ্চমবর্ষীয় বালকটিকে সহসা মৃত্যু হরণ করিয়া লইয়া গেল।

চোখের সম্মুখে সমস্ত বিশ্ব যেন এক ঘনঘোর কৃষ্ণ অন্ধকারে আবৃত হইয়া গেল—'আলো কি কোথাও নাই, নাই কি বুক ভরিয়া গ্রহণ করিবার মতো কোথাও এতটুকু বাতাস?' গোবিন্দ মূর্ছিত হইয়া ধূলায় লুটাইয়া পড়িলেন, দিনরাত্রি কাটিয়া গেল, গোবিন্দ উঠিলেন না।

সহসা যেন বহু দূরাগত এক মৃদু করুণ স্বর কানে বাজিল 'গোবিন্দ!'

কে? এই করুণ কোমল কণ্ঠে কে ডাকে পুত্রের মতো স্বরে? চৈতন্য লাভ করিয়া গোবিন্দ অধীরচিত্তে ধূলিশয্যা হইতে উঠিয়া বসিলেন –তখনও যেন মূর্ছার ঘোর কাটে নাই! ইহা কি স্বপ্ন? বড বেদনাহত নয়নে চাহিয়া আছেন গোপীনাথ, বড় করুণ স্বরে ডাকিতেছেন—'গোবিন্দ! তুমি কি উঠিবে না? আমাকে আর কত উপবাসী রাখিবে? আমার যে বড় কষ্ট হইতেছে!'

'ও! তুমি? তোমার কষ্ট? তা হোক, গোপীনাথ! আমার যে বুক ভাঙিয়া যাইতেছে—এত কষ্ট যে প্রাণ পর্যন্ত বাহির হইতে পারিতেছে না, তাহা কি দেখিতেছ না তুমি? কেন, কেন দিলে, আবার দিয়াই বা নিলে কেন গোপীনাথ? আমি তো তোমার কাছে সংসার, পুত্র কিছুই চাহি নাই! নির্দয় নিষ্ঠুর তুমি, এতটুকু তোমার দয়া নাই?' গোপীনাথের মুখখানি আরও করুণ হইয়া উঠিল, বলিলেন, 'কে নিষ্ঠুর গোবিন্দ; আমি, না তুমি? পুত্র লাভ করিয়া আমাকে কি তুমি ভুলিয়া যাও নাই?'

'না, না গোপীনাথ—মিথ্যা কথা বলিও না, কোনদিন কি তোমার পূজা-সেবার ত্রুটি করিয়াছি আমি? পুত্রের সঙ্গে সঙ্গে তোমার সেবার আয়োজনও কি আমি করি নাই?'

'কিন্তু! তুমি জানো গোবিন্দ, ভাগের কারবারে আমি নাই। হয় আমি, নয় পুত্র—দুইজনকে তো তুমি পাইতে পারো না? এখন ওঠ! আমার দিকে তাকাও, আজ হইতে আমিই তোমার পুত্র!'

'তুমি? তুমি তো পাষাণ-প্রতিমা—অচল বিগ্রহ; কি আছে তোমার—স্নেহ, প্রেম, ভালবাসা, কৃতজ্ঞতা? আমার জন্য আমার পুত্র যাহা করিত, তুমি যে কখনও তাহা করিবে না, তাহা আমি জানি।'

গোপীনাথ এতক্ষণে যেন পথ খুঁজিয়া পাইলেন—মৃদু হাসিয়া বলিলেন, কি করিতে হইবে বলো না; একবার বলিয়াই দেখ না—করি কি, না?

'তুমি আমার মৃত্যুর পরে শ্রাদ্ধ করিবে, পিণ্ড দান করিবে আমার?' 'প্রতিশ্রুতি দিলাম—পুত্রের সমস্ত কর্তব্যই পালন করিব।'

বিস্মিত গোবিন্দ চাহিয়া দেখিলেন মুখের দিকে—সেখানে কি কেবলই ছলনা, কেবলই ফাঁকি, না কি আছে কিছু স্নেহ দয়া প্রেম? সেই কোমল সুন্দর মুখে কি দেখিলেন গোবিন্দ—কে জানে, সদ্যোলব্ধ পুত্রশোকের তীব্রতা যেন মুহূর্তে দিবাস্বপ্নের মতোই মিলাইয়া গেল!

গোপীনাথের চরণে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিলেন গোবিন্দ—

'তোমার নিত্যদাস মুঞি তোমা পাসরিয়া
পড়িয়াছোঁ ভবার্ণবে মায়াবদ্ধ হৈঞা।'

হে করুণাময়, কৃপা করিয়া আমার অপরাধ

ক্ষমা কর, আমার অজ্ঞান-অন্ধকার আমার কর্তৃত্বাভিমান দূর করিয়া আমাকে তোমার চরণের দাস করিয়া লও প্রভু!

আবার গোপীনাথের সেবায় গোবিন্দ নিজেকে ঢালিয়া দিলেন—পুত্রস্নেহ যেন দ্বিগুণ হইয়া গোপীনাথকে ঘিরিয়া রহিল। শাশ্বত চিরসুন্দর গোপাল; ইঁহাকে তো হারাইবার ভয় নাই, জরা ইঁহাকে বিকৃত করিতে পারে না—মৃত্যু ইঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না! ইঁহাকেই ভুলিয়া গিয়াছিলেন গোবিন্দ, কিন্তু গোপীনাথ ভুলেন নাই—তাই আঘাতের পর আঘাত দিয়া ফিরাইয়া আনিলেন আপন একান্ত সান্নিধ্যে! ফিরাইয়া আনিতেই হয়—প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন স্বমুখে (গীতা ১৮।৬৬):

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

প্রভুও বলিয়াছেন:

'কৃষ্ণ তোমার হও যদি বোলে একবার,
মায়াবন্ধ হৈতে কৃষ্ণ তারে করে পার।
শরণ লঞা করে কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ—
—কৃষ্ণ তারে তৎকালে করে আত্মসম।'

কথিত আছে, গোবিন্দের দেহত্যাগ হইলে গোপীনাথ 'ধড়া' গলায় দিয়া অশৌচ ধারণ করিয়া, হবিষ্যান্ন গ্রহণ প্রভৃতি যথাবিধি শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান পালন করিয়া শ্রাদ্ধ-দিবসে স্বহস্তে গোবিন্দের আত্মার উদ্দেশ্যে পিণ্ড দান করিয়াছিলেন।

গোবিন্দের পুত্রের ভূমিকায় গোপীনাথের অভিনয় নিখুঁত হইয়াছিল এবং গোবিন্দের প্রাণ বুঝিয়াছিল—ইহা অভিনয় নয়, প্রাণারামেরই লীলা। সেই লীলারসে গোবিন্দ আপনাকে নিমজ্জিত করিয়া দিলেন, প্রাণ প্রাণারামে লগ্ন হইয়া গেল, আর বিচ্ছেদের আশঙ্কা রহিল না। এই কৃষ্ণ-দাসত্বের কথাই প্রভু বলিলেন, ইহা লাভ করিলে জীবের আর চাওয়া-পাওয়ার কিছুই বাকী থাকে না।

দাস্য-ভক্তির প্রার্থনা করিতে করিতেই ভক্তভাবে প্রভুর মনে হইল তাঁহার তো দাস্য-ভক্তি নাই—কৃষ্ণসেবা! কই তাহা তো আজও লাভ করা হইল না! অধীর চিত্তে ক্রন্দন করিয়া প্রভু ডাকিতে লাগিলেন, ওগো কৃষ্ণ! কবে আমার এমন দিন আসিবে, যেদিন—

'নয়নং গলদশ্রুধারয়া
বদনং গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা
তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি॥' (৬ষ্ঠ শ্লোক)

—হে ভগবান! এমন দিন আমার কবে আসিবে, যখন তোমার নাম গ্রহণ করিতে করিতে বিগলিত অশ্রুধারায় আমার নয়ন পরিপ্লুত হইবে, বদন গদ্গদ বাক্যে রুদ্ধ হইবে—সমস্ত দেহ পুলকদ্বারা ব্যাপ্ত হইবে?

জীবভাবে, ভক্তভাবে দাস্য প্রার্থনা করিতে করিতেই প্রভুর চিত্তে প্রেমের আবির্ভাব হইল। তিনি স্বয়ং প্রেমময়, মহাভাব-স্বরূপা, শ্রীমতী রাধার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করিয়াই তাঁহার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-রূপে অবতরণ, তথাপি জীব-শিক্ষার্থেই তিনি ভক্ত-ভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন। আজ সেই ভাবেই দেখাইতেছেন যে, ভক্ত যখন প্রকৃত দাস্য-ভক্তি লাভ করেন, এবং কৃষ্ণসেবা-বাসনাই যখন তাঁহার অন্তরে একান্তভাবে জাগ্রত হয়, তখন সর্বরসের মূলাধার দাস্য-ভক্তিই ধীরে ধীরে সাধককে কৃষ্ণে মমত্বময় সম্বন্ধের দিকে সখ্য বাৎসল্য মধুর রসের অহৈতুকী প্রেমের পথে অগ্রসর করিয়া লইয়া চলে। তখনই সাধক 'অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম'

লাভের জন্য উন্মুখ হইয়া উঠেন, এবং তাহা লাভের আশায় এত ব্যগ্র হন যে, সাধকের তখন পার্থিব সুখদুঃখ, ভালমন্দ এমন কি দেহবোধ পর্যন্ত থাকে না।

একদিন প্রভু নিজের চোখের সম্মুখে এইরূপ ব্যাকুলতার একটি চিত্র দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন এবং সহচরদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, 'এই শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম, ইহা লাভ করাই জীবের কাম্য।'

একদিন প্রভু জগন্নাথ-মন্দিরে নিত্যকার অভ্যাসমত গরুড-স্তম্ভে হেলান দিয়া দুই নয়ন ভরিয়া শ্রীবিগ্রহের রূপসুধা পান করিতেছেন। সেদিন মন্দিরে অত্যন্ত ভিড়—তিল ধারণেরও স্থান নাই। এক রমণী ভিড়ের চাপে কেমন করিয়া গরুড-স্তম্ভে আরোহণ করিয়াছেন, কেমন করিয়াই বা নীচে দণ্ডায়মান শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্কন্ধে তাঁহার দুই পদ রাখিয়াছেন, কিছুই তাঁহার খেয়াল নাই, একাগ্র অনিমেষ নয়নে চাহিয়া আছেন জগন্নাথের দিকে। প্রভুরও পরিবেশ বা নিজদেহে বিন্দুমাত্র অভিনিবেশ নাই। হঠাৎ প্রভুর সেবক গোবিন্দের দৃষ্টিপথে যখন ইহা পড়িল, গোবিন্দ অস্থির হইয়া উঠিলেন। যে কঠোর সন্ন্যাসী স্ত্রীলোকের মুখদর্শন করা দূরে থাকুক—'স্ত্রী' শব্দ পর্যন্ত যিনি মুখে উচ্চারণ করেন না, বৃদ্ধা পরম বৈষ্ণবী মাধবী দাসীর নিকটে একদিন মাত্র ভিক্ষা করার অপরাধে যিনি প্রিয়তম ছোট হরিদাসকে জন্মের মতো বর্জন করিয়াছেন—আজ এ কি দৈব দুর্বিপাক; তাঁহারই অঙ্গ স্পর্শ করিয়া রহিয়াছেন এক রমণী! সর্বনাশের আশঙ্কায় গোবিন্দ অধীর হইয়া উঠিলেন। তিনি দ্রুত রমণীকে নামাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

প্রভুর এতক্ষণ বাহ্যজ্ঞান ছিল না, এখন গোবিন্দের অস্থিরতায় কিঞ্চিৎ যেন বাহ্যজ্ঞান হইল, চাহিয়া ব্যাপারটি বুঝিলেন, কিন্তু মুহূর্তে আনন্দ-জ্যোতিতে মুখখানি দীপ্ত হইয়া উঠিল, সহচরগণকে স্তম্ভিত বিস্মিত করিয়া প্রশান্ত স্বরে প্রভু বলিলেন :

আদিবশ্যা*! এই স্ত্রীকে না কর বর্জন,
করুক যথেষ্ট জগন্নাথ দরশন।

এতক্ষণে সেই রমণীরও চেতনা ফিরিয়া আসিল। নিজের কৃতকার্যের অপরাধে ও লজ্জায় তিনি শিহরিয়া উঠিলেন, 'এ কি মহা সর্বনাশ'—দ্রুত গরুড-স্তম্ভ হইতে নামিয়াই তিনি মহাপ্রভুর চরণে লুটাইয়া পড়িলেন—নিজকৃত মহা অপরাধের জন্য অশ্রু-বিজড়িত কণ্ঠে বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

প্রভু তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া স্বরূপ, গোবিন্দ প্রভৃতির দিকে ফিরিয়া বলিলেন :

'জগন্নাথে আবিষ্ট ইহার তনু মন প্রাণ,
মোর কান্ধে পদ দিয়াছে, ইহা নাহি জ্ঞান।
অহো! ভাগ্যবতী এই! বন্দো ইহার পায়,
ইহার প্রসাদে ঐছে আর্তি আমারো বা হয়।'

বলিতে বলিতেই আর্তিতে বিদীর্ণ হইতে লাগিল প্রাণ—বলিলেন, 'হায় জগন্নাথ, হায় শ্যামসুন্দর! তোমার দর্শন-লালসায় কবে এই ভক্তিমতী নারীর মতো আমার তীব্র আর্তি হইবে প্রভু? কবে আমি এই রমণীর মতো বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া তোমার শ্রীমুখপঙ্কজের রূপসুধা পান করিব, হে নাথ!'

বলিতে বলিতে, কাঁদিতে কাঁদিতেই প্রভুর আবেশ ছুটিয়া গেল, এতক্ষণ যেন বৃন্দাবনের কোন মাধবী-কুঞ্জে শ্যামসুন্দরকে দর্শন করিতেছিলেন; এখন চাহিয়া দেখেন—বলরাম সুভদ্রা সহ সম্মুখে জগন্নাথ বিরাজমান।

---

* স্নেহসূচক গালি।

মুহূর্তে মন বিষণ্ণ হইয়া উঠিল—এ তো বৃন্দাবন নহে—এ যে কুরুক্ষেত্র! এখানে কোথায় 'গোপবেশ বেণুকর, নবকিশোর নটবর?' এখানে যে দেখি—অশ্ব হস্তী, রথ রাজবেশ, রাজৈশ্বর্যের ছড়াছড়ি! হায় হায়! আর কি বৃন্দাবনের কুঞ্জে কুঞ্জে শ্যামসুন্দরের মোহন-বাঁশরী 'রাধা রাধা' বলিয়া বাজিয়া উঠিবে না,—'রজনী শাঙন ঘন, ঘন দেয়া গরজন রিমঝিম' মন্দ্রিত বরষায় আর কি নীল নিচোলে হেমতনুখানি আবৃত করিয়া শ্রীমতী অভিসারে যাইবেন না?

রাধারস-জারিত-তনুমন প্রভু ভূমিতলে উন্মত্তের ন্যায় বসিয়া পড়িলেন—

'ভূমির উপরে বসি, নিজ নখে ভূমি লেখে,
অশ্রুগঙ্গা নেত্রে বহে, কিছু নাহি দেখে।
পাইলুঁ বৃন্দাবন নাথ, পুনঃ হারাইলুঁ,
কে মোর নিলেক কৃষ্ণ, কোথা মুঞি আইলুঁ?
স্বপ্নাবেশে প্রেমে প্রভুর গর গর মন
বাহ্য হইলে হয় যেন হারাইল ধন!' —চৈঃ চঃ

রায় রামানন্দ স্বরূপের কণ্ঠ ধরিয়া প্রভু কাঁদিতে লাগিলেন।

'প্রাপ্ত কৃষ্ণ হারাইয়া তার গুণ স্মরিয়া
মহাপ্রভু সন্তাপে বিহ্বল,
রায় স্বরূপের কণ্ঠ ধরি, কহে, হা হা হরি হরি,
ধৈর্য গেল হইল চপল।' —চৈঃ চঃ

(ক্রমশঃ)

দীপাবলী

শ্রীবৃন্দাবন গুপ্ত

এ আলো চিন্ময়,
জানি না কোথায় উৎস,
শুধু মোর গভীর মননে
আনন্দের স্পর্শনে স্পন্দনে
দেখি এর রূপ জ্যোতির্ময়।
মৃত্যুহীন ক্ষয়হীন
সংখ্যাহীন শিখার উৎসারে
জ্বলিতেছে ব্রহ্মাণ্ডের
বৈচিত্র্যের আধারে আধারে।

বিপুল বিস্ময় আর বিপুল পুলকে
চেয়ে চেয়ে দেখি চারিধারে
—কী অপূর্ব দীপাবলী
ঊর্ধ্বে নিম্নে অন্তরে বাহিরে।
জগৎ ব্যাপিয়া এই জ্যোতির প্রবাহ
বহে চলে লহরে লহরে—
অনাদি কালের সাথে
চলিতেছে কী মহা উৎসব!

গীতা-জ্ঞানেশ্বরী

[দ্বাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ—পূর্বানুবৃত্তি]

শ্রীগিরীশচন্দ্র সেন

অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ।
সর্বকর্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্‌ ॥ ১১ ॥

অথবা হে পাণ্ডুকুমার, আমাকে কর্ম অর্পণ করা যদি সহজ না হয়, তবে আমার ভজনা কর; হে কিরীটী, বুদ্ধির সম্মুখে ও পশ্চাতে, কর্মের প্রারম্ভে ও অন্তে, যদি আমাকে (বন্ধন) স্মরণ করা কঠিন মনে হয়, তবে ইহাও থাকুক, আমার মহত্ত্বের কথা ছাড়িয়া দাও; পরন্তু বুদ্ধিকে ইন্দ্রিয়-নিগ্রহের কর্মে লাগাইয়া দাও; আর যখন যেমন কর্মের অনুষ্ঠান করিবে, সঙ্গে সঙ্গে সেই সকল কর্মের ফল ত্যাগ করিতে থাকিবে; ফল পাকিলে বৃক্ষ বা লতা যেমন তাহা ফেলিয়া দেয়, তেমনি নিষ্কাম কর্ম সিদ্ধ হইলে তাহাকে ত্যাগ করিয়া যাও; পরন্তু আমাকে স্মরণ করা বা আমার উদ্দেশে কর্ম করা—ইহার কিছুই করিতে হইবে না, সমস্ত শূন্যেই যাইতে দাও। (১৩০)

প্রস্তরে পতিত বর্ষা বা অগ্নির মধ্যে বীজ-বপনের ন্যায়, কর্মকে স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর ন্যায় মানিয়া লও; আত্মজার বিষয়ে পিতা যেমন নিরভিলাষী (নিষ্কাম), সমস্ত কর্মে তেমনি নিষ্কাম হইয়া থাকো। অগ্নির জ্বালা (শিখা) যেমন আকাশে ব্যর্থই মিলাইয়া যায়, তেমনি কর্মকেও শূন্যের মধ্যে বিলীন হইতে দাও; হে অর্জুন, এই ফলত্যাগ সত্যই সহজ মনে হয়, পরন্তু যোগের মধ্যে এই যোগই সর্বশ্রেষ্ঠ; এই ভাবে ফল ত্যাগ করিলে সেই কর্ম আর বাড়িতে পারে না—সেই কর্ম হইতে আর কর্ম উৎপন্ন হয় না। বাঁশের ঝাড় যেমন একবার ফলিলেই বন্ধ্যা হয়, তেমনি এই শরীরের পর আর শরীর ধারণ করিতে হয় না; অধিক কি বলিব? এই জন্মমৃত্যুর যাতায়াত বন্ধ হয় (প্রস্তর দ্বারা পথ বন্ধ করা হয়); হে কিরীটী, অভ্যাসের সিঁড়িতে উঠিয়া জ্ঞানপ্রাপ্তি হয়, আর জ্ঞানের দ্বারা ধ্যানে সাক্ষাৎকার হয়; সমস্ত ভাব (মনোবৃত্তি) যখন ধ্যানকে আলিঙ্গন করে, তখন সর্ব কর্ম দূরে চলিয়া যায়; কর্ম দূরে গেলেই ফলত্যাগ সম্ভব হয়, ফলত্যাগেই সম্পূর্ণ শান্তি পাওয়া যায়; সুতরাং ইহাই শান্তিপ্রাপ্তির ক্রম, হে সুভদ্রাপতি, এইজন্য অভ্যাসই এ-বিষয়ে মূল সাধন।

শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ্‌জ্ঞানাদ্‌ ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্‌ ॥ ১২ ॥

হে পার্থ, অভ্যাস হইতে জ্ঞান অধিকতর কঠিন, জ্ঞান হইতে ধ্যানের বৈশিষ্ট্য অধিক। (১৪০) ধ্যান হইতে কর্মফলত্যাগ উৎকৃষ্ট, ত্যাগ হইতেই শান্তিসুখোপভোগ হয়; হে ধীর, এই পথে চলিতে চলিতে যে মধ্যপথে শান্তির বিশ্রাম-গৃহ প্রাপ্ত হইয়াছে,

অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ॥ ১৩ ॥

—যে সর্বভূতের মধ্যে কাহাকেও দ্বেষ করিতে জানে না, চৈতন্যের ন্যায় যাহার আপন-পর জ্ঞান (ভেদভাব) নাই ; উত্তমের সঙ্গ করিব, আর অধমকে অবজ্ঞা করিব—বসুধার ন্যায় যাহার এরূপ মনোভাব নাই ; রাজার দেহ চালনা করিব, আর দরিদ্রকে দূরে রাখিব—কৃপালু প্রাণবায়ু যেমন কখনও এরূপ বিচার করে না ; গাভীর তৃষ্ণা মিটাইব, আর ব্যাঘ্রকে বিষ হইয়া মারিব—জল যেমন এরূপ করিতে জানে না ; হে পাণ্ডব, দীপ যেমন বলে না—'ঘরেই শুধু প্রকাশ দেখাইব, অন্যত্র অন্ধকার হইয়া থাকিব' ; তেমনি সমস্ত ভূতমাত্রেই সমভাবে যাহার মৈত্রী, যে আপনিই কৃপার ধাত্রী-স্বরূপ ; আর যাহার অহংভাব নাই ; এবং যে কোন কিছুই 'আমার' বলে না, যাহার সুখদুঃখের জ্ঞান নাই ; যে পৃথিবীর ন্যায় ক্ষমাশীল, যে সন্তোষকে আপন অঙ্গে আশ্রয় দিয়াছে ; (১৫০)

সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৪ ॥

—বর্ষা বিনাই সমুদ্র যেমন নিরন্তর জলে পরিপূর্ণ থাকে, তেমনি উপকার বিনাই যে সন্তুষ্ট ; আপন শপথ দিয়া যে অন্তঃকরণকে বশীভূত রাখে, এবং এ-বিষয়ে সত্যই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ; যাহার হৃদয়-মন্দিরে জীব ও পরমাত্মা একাসনে বিরাজ করে ; এই ভাবে যোগসমৃদ্ধ হইয়া যে নিরন্তর আমাতেই মন ও বুদ্ধি অর্পণ করে ; অন্তরে ও বাহিরে উত্তমরূপে যোগসিদ্ধ হইয়া আমার প্রতি যাহার সপ্রেম অনুরাগ ; হে অর্জুন, সেই আমার ভক্ত, সে যোগী, সে মুক্ত। সে বল্লভা, আমি কান্ত—সে আমার এমনি প্রিয় ; শুধু ইহাই নহে, উপমা দ্বারা বলিতে গেলে সে আমার প্রাণের সমান প্রিয়—এ-কথা বলিলেও অল্পই বলা হয় ; প্রেমিক ভক্তের কাহিনী শুধু ভুলাইবার যাদুমন্ত্র—ইহাই এত কথা বলাইতেছে ; সেই জন্যই আমি হঠাৎ এই উপমার কথা বলিয়াছি, নতুবা এই প্রেমের কি কোন তুলনা আছে ? এখন একথা থাক, হে কিরীটী, প্রেমিক ভক্তের কথায় প্রেমের দ্বিগুণ বল বৃদ্ধি হয়। (১৬০)

ইহার পর কদাচিৎ যদি প্রেমিক শ্রোতা পাওয়া যায়, তবে কি তাহার মাধুর্যের তুলনা হয় ? সুতরাং হে পার্থ, তুমিই প্রিয় (ভক্ত), তুমিই (প্রেমিক) শ্রোতা, তদুপরি প্রিয় কথার প্রসঙ্গ উঠিয়াছে ; এখন আমি যাহা বলিতেছি, তাহাতে আমার হৃদয় আনন্দে ভরিয়াছে—এই কথা বলিতেই ভগবান (আনন্দে) দুলিতে লাগিলেন, এবং বলিলেন, যাহাকে আমার হৃদয়ে বসাই, সেই ভক্তের লক্ষণ শুন ঃ

যস্মান্নোদ্‌বিজতে লোকো লোকান্নোদ্‌বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥ ১৫ ॥

সমুদ্র ক্ষুব্ধ হইলে জলচর প্রাণিগণ ভীত হয় না, আর সমুদ্রও যেমন জলচরগণের প্রতি বিরক্ত হয় না ; তেমনি এই উন্মত্ত জগৎ যাহার মনে খেদ উৎপন্ন করে না, এবং যাহার ব্যবহারে

লোকে দুঃখিত হয় না; কিংবহুনা, হে পাণ্ডব, অবয়বের প্রতি শরীরের ন্যায় যে জীব হইয়া জীবের প্রতি বিরক্ত হয় না; জগৎই নিজের দেহস্বরূপ মনে করিয়া যে প্রিয় ও অপ্রিয়ের মধ্যে ভেদ ভুলিয়া যায়, হর্ষ ও ক্রোধকে দূরে ঠেলিয়া রাখে; এই ভাবে যে (সুখদুঃখের) দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত ও ভয়োদ্বেগরহিত, তদুপরি যে আমার ভক্ত; তাহার প্রেমে আমি মোহিত—সেই প্রেমের কথা কি বলিব? শুধু ইহাই নহে, সে আমার প্রাণের প্রাণ। (১৭০)

যে আত্মানন্দে তৃপ্ত, যাহার জীবন সার্থক হইয়াছে, যে পূর্ণতারূপ পত্নীর বল্লভ হইয়াছে;

অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৬ ॥

হে পাণ্ডব, যাহার অন্তঃকরণে অপেক্ষা (বাসনা) প্রবেশ করে না, (যে অনপেক্ষ, বাসনারহিত), যাহার অস্তিত্বেই সুখের বৃদ্ধি হইতে থাকে; গঙ্গায় স্নান করিলে শুচি হয়, পাপ-তাপও যায়, পরন্তু সেখানে ডুবিবার ভয় আছে; মোক্ষ দান করিতে কাশীধাম সত্যই উদার এবং শ্রেষ্ঠ, পরন্তু ঐ স্থানে দেহত্যাগ করিতে হয়; হিমালয় পাপক্ষালন করে, পরন্তু সেখানে যাইতেও জীবন-হানি হয়, সজ্জন ভক্তের নির্মল মন (শুচিতা) সেরূপ নহে (তাহাতে সেরূপ ন্যূনতা নাই)।

ভক্তির গভীরতার পার নাই, তথাপি সন্ত ভক্তের ডুবিবার ভয় নাই, সে প্রত্যক্ষ মোক্ষ লাভ করে; সন্তগণের অঙ্গস্পর্শেই গঙ্গা পাপমুক্ত হয়, তাহাদের শুচিত্বের কথা আমি কি করিয়া বলিব? সুতরাং এইপ্রকার শুচিতার জন্য যে তীর্থের আশ্রয় হয়, যে মনের পাপরাশি দিগন্তরে সরাইয়া দিয়াছে; অন্তর-বাহিরে যে শুদ্ধ, সূর্যের ন্যায় নির্মল, এবং 'পাযালু'র ন্যায় তত্ত্বার্থ দেখিতে সক্ষম; যাহার মন সর্বব্যাপী আকাশের ন্যায় ব্যাপক ও উদাসীন (অনাসক্ত); (১৮০)

পাপ হইতে মুক্ত বিহঙ্গমের ন্যায় যে সংসার-ব্যথা হইতে মুক্ত, যে নিরাশার (আশা-শূন্যতার) প্রতিমূর্তি; গতায়ু মনুষ্যের যেমন লজ্জা থাকে না, তেমনি যে সতত আত্মসুখে পূর্ণ থাকিয়া কোন দুঃখ দেখিতে পায় না; আর কর্মারম্ভের জন্য যাহার অঙ্গে কোন অহঙ্কার থাকে না; ইন্ধন বিনা অগ্নি যেমন নিবিয়া যায়, তেমনি মোক্ষের অঙ্গীভূত (মোক্ষপ্রাপ্তির সাধনের আবশ্যক অঙ্গ) বলিয়া লিখিত 'শান্তি' যাহার ভাগে আসিয়াছে; হে অর্জুন, যে এই প্রকারে 'সোঽহং' ভাবে পূর্ণ হইয়া ('সোঽহং' ভাবের সরোবরে নিমজ্জিত হইয়া) দ্বৈতভাবের অপর তীরে গিয়া উঠিয়াছে; কিংবা যে ভক্তি-সুখের জন্য আপনাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া এক অংশকে সেবকের কার্যে নিযুক্ত করে, অন্য এক অংশকে আমার নাম দিয়া (ব্রহ্মস্বরূপ মনে করিয়া) ভক্তিহীন লোককে আমার ভজনার উত্তমরীতি[১] দেখাইয়া দেয়, এমন যে যোগী—তাহার প্রতি আমার অত্যধিক আসক্তি, সে আমার নিধান (আশ্রয়), কিংবহুনা, এইরূপ ভক্ত লাভ করিলেই আমার সমাধান (শান্তি) হয়; তাহার জন্যই আমি (অবতার হইয়া) রূপ গ্রহণ করি, তাহার

১ ভক্তিমার্গের উত্তম আচরণ।

জন্যই আমাকে এখানে আসিতে হয়; সে আমার এমন প্রিয় যে, আমি আমার প্রাণ তাহার জন্য আরতি করিয়া উৎসর্গ করি।

যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥

যে আত্মস্বরূপ-প্রাপ্তির ন্যায় অন্য কোন উত্তম বস্তু আছে বলিয়া জানে না, এইজন্য কোন বিশেষ বিষয় উপভোগে আনন্দ পায় না; (১৯০)

যে আপনিই বিশ্ব হইয়া যায়, এবং যাহার ভেদভাব চলিয়া যাওয়ায় যে পুরুষ দ্বেষকে দূরে সরাইয়া রাখিয়াছে; আপনার সত্যস্বরূপ কল্পান্তেও নষ্ট হয় না জানিয়া যে বিগত বস্তু বা বিষয়ের জন্য শোক করে না; যাহার পর (অধিক) আর কিছুই নাই, সেই আত্মস্বরূপ আপনার মধ্যে লাভ করিয়া যে আর কোন বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করে না; সূর্যের যেমন দিন বা রাত্রি হয় না, তেমনি যাহার ভাল বা মন্দ এরূপ কোন ভেদবুদ্ধি নাই; এইরূপ যে শুদ্ধ নিশ্চল জ্ঞানস্বরূপ হইয়া সর্বদা আমার ভজনা করে; তাহার তুল্য আমার দ্বিতীয় কোন প্রিয় বান্ধব নাই, তোমার নামে শপথ করিয়া আমি সত্য বলিতেছি।

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জিতঃ ॥ ১৮ ॥

হে পার্থ, যাহার মধ্যে বৈষম্যের কোন ভেদভাব নাই, যে শত্রু ও মিত্রকে সমান চক্ষে দেখে; কাটিবার জন্য যে আঘাত করে, কিংবা যে বৃক্ষ রোপণ করিয়াছে—এ উভয়কেই যেমন বৃক্ষটি সমানভাবে ছায়া প্রদান করে; অথবা ইক্ষুদণ্ড যেমন যে পালন করে আর যে (রস বাহির করিবার জন্য) পেষণ করে, উভয়ের পক্ষে সমানভাবে মধুর; তেমনি হে অর্জুন, শত্রুমিত্রের প্রতি যাহার এমন মনোভাব, মানাপমান যাহার পক্ষে সমান; (২০০)

গগন যেমন ছয় ঋতুতেই সমান, তেমনি যে শীতোষ্ণের মধ্যে সমান ভাবে থাকে; হে পাণ্ডুসুত, দক্ষিণ ও উত্তর বায়ুতে অটল মেরুর ন্যায় যে সুখদুঃখ প্রাপ্ত হইয়া মধ্যস্থ (নির্বিকার) হইয়া থাকে; মাধুর্যে চন্দ্রকিরণ যেমন রাজা ও ভিখারীর পক্ষে সমান, তেমনি যে সর্বভূতে সমভাবাপন্ন; জল যেমন সকলের সমভাবে সেব্য, তেমনি যাহাকে সর্বলোক প্রশংসা করে; যে অন্তর্বাহ্য বিষয়ের সঙ্গ (আসক্তি) ও সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া একাকী নিঃসঙ্গ হইয়া একান্তে বাস করে;

তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ ॥১৯॥

যে নিন্দাকে গায়ে মাখে না, স্তুতিতে আনন্দিত হয় না—আকাশ যেমন নির্লিপ্ত থাকে, তেমনি নিন্দা ও স্তুতিকে এক পঙ্‌ক্তিতে সমান গণ্য করিয়া জনগণের মধ্যে[২] মৌন থাকিয়া প্রাণপ্রবৃত্তির (সাংসারিক ব্যবহারের) বিচার করে; যে সত্যমিথ্যা কিছুই না বলিয়া মৌনী

---

২ প্রাণবৃত্তির সহিত জনারণ্যে সমানভাবে বিচরণ করে।

হইয়া থাকে ; উন্মনা (মনের লয়) অবস্থার ভোগে তৃপ্ত হয় না ; বর্ষার অভাবে সমুদ্র যেমন শুষ্ক না, তেমনি যে যথালাভে তুষ্ট হয়, অলাভে (অপ্রাপ্তিতে) ক্ষুণ্ণ হয় না ; আর বায়ু যেমন একস্থানে অবরুদ্ধ থাকে না, তেমনি যে কোন একস্থান আশ্রয় করিয়া থাকে না ; (২১০)

বিশ্বই আমার ঘর—এ-সম্বন্ধে যে স্থিরবুদ্ধি, কিংবহুনা, যে নিজেই চরাচর বিশ্ব হইয়া গিয়াছে ; তদুপরি হে পার্থ, আমার ভজনে যাহার পূর্ণ আস্থা, তাহাকে আমি মাথার মুকুট করি।

উত্তম পুরুষের সম্মুখে যদি মস্তক অবনত করা হয়, তাহাতে আশ্চর্যের কি আছে ? পরন্তু লোকে তাহার চরণামৃতকে (তীর্থের ন্যায়) সম্মান করে ; শ্রদ্ধার বস্তুকে কি করিয়া আদর করিতে হয়, তাহা সদাশিব শ্রীশঙ্করকে গুরু করিলেই জানা যায় ; তবে ইহা এখন থাকুক, মহেশের মহিমা বর্ণনা করিতে গেলে তাহা আত্মস্তুতির ন্যায় হইবে ; রমানাথ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—এইজন্য হে অর্জুন, শুধু ইহাই বলি যে, আমি এইরূপ ভক্তকে মস্তকে ধারণ করি ; যে চতুর্থ পুরুষার্থ সিদ্ধি (মোক্ষ) আপন হস্তে লইয়া ভক্তিপথে প্রবেশ করে, এবং তাহা জগতে বিতরণ করে, কৈবল্যের অধিকারী সে মোক্ষরূপ দ্রব্যের ব্যাপার করে, পরন্তু জল যেমন নিম্নাভিমুখী, সেও তেমনি নম্র হইয়া থাকে ; এই জন্যই আমি তাহাকে নমস্কার করি। তাহাকে মাথার মুকুট করি ; তাহার গুণের (গুণবর্ণনারূপ) অলঙ্কারে আমার বাণীকে অলঙ্কৃত করি, তাহার কীর্তি আমি কর্ণে শ্রবণ করি। (২২০)

তাহাকে দর্শন করিবার ইচ্ছায় অচক্ষু আমি চক্ষু স্বীকার করিয়াছি। হাতের কমলপুষ্প দ্বারা তাহাকে পূজা করি ; তাহার অঙ্গ আলিঙ্গন করিবার জন্য দু-হাতের উপর আরও দুটি হস্ত ধারণ করিয়াছি ; তাহার সঙ্গসুখের জন্য আমাকে দেহ ধারণ করিতে হইয়াছে, অধিক কি বলিব ? তাহার প্রতি আমার প্রেম অতুলনীয় ; তাহার ও আমার মধ্যে যে এই মৈত্রী (প্রেম), ইহাতে বিচিত্র কি আছে ? পরন্তু তাহার চরিত্র যে শ্রবণ করে, যে ভক্ত-চরিত্রের প্রশংসা করে, তাহাকেও আমি প্রাণাপেক্ষা প্রিয় মনে করি, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই ; তোমাকে এখন যে ভক্তিযোগ-সম্মত যোগের কথা আদ্যন্ত বলিলাম ; এই যোগস্থিতির এমনি মহিমা যে, তাহাতে অবস্থিত ভক্তকে আমি প্রীতি করি কিংবা তাহার ধ্যান করি অথবা তাহাকে মস্তকে ধারণ করি।

যে তু ধর্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ ॥২০॥

যাহারা এই রম্য কথা, এই ধর্মানুকুল অমৃতধারা শ্রবণ করিয়া প্রতীতিগম্য (অনুভবসিদ্ধ) করে (অন্তরে অনুভব করে) ; আমি যেমন নিরূপণ করিয়াছি, তেমনি মানসিক স্থিতিতে আনন্দে রমণ করে ; উত্তম ক্ষেত্রে বীজ বপন করিলে যেমন হয়, যাহাদের অন্তরে ইহা শ্রদ্ধার সহিত সাদরে বিস্তার লাভ করে, যাহারা ইহা হৃদয়ে স্থিরভাবে ধারণ করিয়া ইহার অনুষ্ঠান করে ; (২৩০)

হে পার্থ, এই জগতে তাহারাই ভক্ত, তাহারাই যোগী, তাহাদের জন্য আমার সদাই

উৎকণ্ঠা; যে মহাপুরুষগণের ভক্তিকথার সহিত (প্রেম) মৈত্রী থাকে, তাহারাই তীর্থস্বরূপ, তাহারাই পুণ্যক্ষেত্র, জগতে তাহারাই পবিত্র; আমি তাহাদের ধ্যান করি, তাহাই আমার দেবতার্চনা।

এই ভক্তগণ ব্যতীত অন্য কাহাকেও উত্তম মনে করি না; তাহারাই আমার ব্যসন, তাহারাই আমার নিধান (আশ্রয়), অধিক কি বলিব? তাহারা আমার সহিত মিলিত হইলেই আমার শান্তি হয়। হে পাণ্ডুসুত, এই প্রেমিক ভক্তদের কথা যে শ্রবণ করিয়া অনুমোদন করে, তাহাকে আমার পরমদেবতার ন্যায় জানিবে।

সঞ্জয় কহিলেন—এইভাবে নিজজনানন্দ (ভক্তজনের নয়নানন্দ); জগতের আদিকারণ মুকুন্দ বলিলেন; হে রাজন্, যিনি স্বতই নির্মল, নিষ্কলঙ্ক, লোকের প্রতি কৃপালু, শরণাগতের প্রতি স্নেহশীল, শরণ্য; যিনি সুরগণের সহায়শীল, লোক প্রতিপালন করাও যাঁহার লীলা, শরণাগতকে রক্ষা করাই যাঁহার খেলা, যিনি ভক্তজনবৎসল, প্রেমিকের নিকট প্রাঞ্জল (অনায়াসলভ্য) সত্য-সেতু (পরমাত্মা-প্রাপ্তির সত্যরূপ সেতু), নিখিল-কলানিধি, যাঁহার ধর্ম ও কীর্তি শুভ্র ও নির্মল, অগাধ দানশীলতায় যিনি সরল, অতুল পরাক্রমে প্রবল হইয়াও যিনি বলির কাছে বন্ধন স্বীকার করিয়াছেন; সেই ভক্তের সম্রাট্, বৈকুণ্ঠনায়ক শ্রীকৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন এবং ভাগ্যবান্ অর্জুন শ্রবণ করিতে লাগিলেন। সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন, এখন ইহার পর আরও যাহা নিরূপণ করা হইল, তাহাই শুনুন; সেই রসাল কথা এখন সরল মারাঠী ভাষায় আমি বলিতেছি, আপনারা অবধান করুন; জ্ঞানদেব বলিতেছেন—আমি সন্ত আপনাদের শরণাগত হইতেছি, আমার স্বামী শ্রীনিবৃত্তিদেব ইহাই আমাকে শিখাইয়াছেন। (২৪০)

—দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত—

হৃদয়-তীর্থ

সেখ সদর উদ্দীন

পুণ্য-লোভে কোথায় ছোটো
মন যে উচাটন,
ঘরের কোণেই আছে তোমার
কাশী-বৃন্দাবন!

অশ্রু মুছাও আজ তাহাদের
নেইক' যাদের নাথ,
দেখবে আপন হৃদয়-মাঝেই
আছেন বিশ্বনাথ!

কাছের মানুষ জানতে হবে
দূরে ছুটে নয়,
আপন-হৃদয় গহন কোণই
সর্বতীর্থময়!

* * *

কবিসাধক রামপ্রসাদ

শ্রীমতী উমা চৌধুরী

প্রকৃতি ও পুরুষের নিত্যসংযোগের পরিস্ফূর্তি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড—মহাসৃষ্টি। সচ্চিদানন্দ পুরুষ স্বয়ং লীলাবেশ সংবরণ করিয়া মায়াধারে কর্মপ্রবৃত্তি নিয়োজিত করিয়াছেন। তাই স্মেরহাস্যা মাতৃমূর্তির নবরূপায়ণ ঘটিয়াছে মহারুদ্রী-মূর্তিতে! লীলাময়ীর নিত্যচপল পদপঙ্কজ আপন বিশাল বক্ষে ধারণ করিয়া মহাদেব মহাধৈর্যে মহাধ্যানে বিভোর। সাংখ্যের সেই প্রধান প্রতিপাদ্য, বেদবেদান্তের সেই সনাতন তত্ত্ব হিন্দু-শাস্ত্রের ধর্মীয় চিন্তায় একটি সরল অথচ শাশ্বত রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। ভাবলোকচারী কবিগণ শাস্ত্রের নীরস তত্ত্বজ্ঞানের মধ্যে বৈষ্ণব রসভাবনার সংযোজন ঘটাইয়া শৈবসাধনার নবধারণার উন্মেষ ঘটাইলেন।

সেই নবদিগন্তের এক সার্থক দিশারী কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন। মাতৃনির্ভর শিশুর ন্যায় দেবতার সহিত আপন হাসি-অশ্রু-বেদনার আদান-প্রদান করিয়া নিঠুরার সহিত মাতৃরূপে ভাবাসঙ্গ লাভ করিলেন। ভক্তকবি শিশুসুলভ স্নেহ-প্রেমে ও আদর-অনুযোগে মাতাকে অভিষিক্ত করিয়া তুলিয়াছেন। দেবতাকে তাঁহার অন্তরের বস্তুরূপে গ্রহণ করিয়াছেন।

ভক্তের এই আন্তরিক আহ্বান উপেক্ষা করিতে না পারিয়া দেবতাকেও দেবত্বের উচ্চ শিখর হইতে নামিয়া মানুষের ঠাকুরালি গ্রহণ করিতে হইয়াছে। দেবতার সহিত ভক্ত শিশুর মান-অভিমানেরও অন্ত নাই! কবির জগৎকে মাতা অসংখ্য ব্যথাবেদনায় পূর্ণ করিয়া সন্তানের কোরক-কোমল হৃদয়খানিকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিয়াছেন—অধীর নৈরাশ্যে অসহায় সন্তান সেজন্য মাতাকে লজ্জা ও তিরস্কারে অভিষিক্ত করিতেও ছাড়েন নাই। কিন্তু শত তিরস্কার ও অভিযোগের পরেও সহস্র যন্ত্রণার সান্ত্বনা তো সেই মাতা—সব হতাশার আশা! মাতৃরূপা দেবী সন্তানকে সস্নেহ সমাদরে অভিষিক্ত করিয়া পুনরায় তাহাকে স্বহস্তে বিসর্জন দিতেছেন শ্মশানে!

সংসারের বিচিত্র কর্মভারে তাহাকে ব্যাপৃত করিয়া আবার তাহাকে ভস্মভূষণ সন্ন্যাসীর বেশে সাজাইয়া দিতেছেন। পাষাণীর এই নিষ্ঠুর লীলার মহিমা অবোধ্য। তথাপি দুঃখদাত্রীর প্রতি কোন বিরূপতা, কোন অনাস্থা নাই! দুঃখের দহনে দগ্ধচিত্ত কবি কখনও মাতাকে 'সর্বনাশী' বলিয়া তিরস্কার করিয়াছেন, কিন্তু মন তো সেই সর্বনাশীর চরণছাড়া হয় না!

সংসার-নেশায় বদ্ধচিত্ত ভক্ত কখনও পরম হতাশায় বলিয়া ফেলে—'মলেম ভূতের ব্যাগার খেটে।' কিন্তু মায়ের চরণপরশের কি মোহিনী মায়া। সর্বকর্মের উদ্যোক্ত্রী যিনি, কর্মফলভোক্ত্রীও যে তিনিই! তাই আবার কর্মযোগ! আবার 'জীবন-জমিনে' সোনাফলানোর সাধনা! বৈরাগ্যই জীবনের শেষ কথা নয়। মাতৃপদে অনন্যা ভক্তিই মুক্তিপথের একান্ত পাথেয়! রামপ্রসাদের দুঃখবাদে কোথাও রিক্ততা নাই! দুঃখজয়ের সঞ্জীবনমন্ত্রেই তো জীবনের আনন্দ!

রামপ্রসাদের শাক্তপদাবলী মানুষকে দুঃখজয়ের প্রেরণা দিয়াছে—জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে এক নূতন চিন্তাধারা ও নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর সূচনা করিয়াছে। সামগ্রিক ভাবচেতনা ও হৃদয়ানুভূতিগুলি ব্যষ্টিহৃদয়ের রূপক গ্রহণ

করিয়া অধিকতর সজীব ও প্রাণবন্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এদিক হইতে রামপ্রসাদী সাধনসঙ্গীতগুলির অভিনবত্ব অবশ্যস্বীকার্য। রামপ্রসাদের সাধনায় ভক্তিভাবনা তন্ত্রসাধনার সুরে সুর মিলাইয়াছে।

মাতৃসাধনায় রামপ্রসাদের বিদগ্ধজনোচিত মনন-প্রাধান্য নাই। তাঁহার ধর্মবোধ সহজ, সরল ও ভাবময়। চিত্তবৃত্তিতে সাধনার অশেষবিধ প্রক্রিয়াও আছে। সাধ্য-সাধকের ভেদ ঘুচাইয়া সাধ্যা কালীর মাতৃমূর্তিকেই তিনি গ্রাহ্য বলিয়া মানিয়াছেন। ভক্তিরসের উৎস তাঁহার হৃদয়,—শাস্ত্রের বিধান বা দর্শনের সুগভীর ধারণা তাঁহার জন্য নহে। ভক্তিমন্ত্রের সাধনাতেই তাঁহার কণ্ঠ মুখর! বিশ্বের সুকঠিন তত্ত্বকে সহজ গীতিধারায় ভাসাইয়া তিনি রুদ্র-সুন্দরের সাধনায় ব্রতী হইয়াছেন।

কবি-হিসাবে রামপ্রসাদ কত বড়, যশের বিচারে তিনি কত ভাগ্যবান্, কাব্যধর্মিতায় তাঁহার কাব্য রসোত্তীর্ণ কিনা, তাহা বাস্তবচিত্র-কল্প কিনা, তাহাও বিদগ্ধজনের বিচার্য। কিন্তু রামপ্রসাদের সঙ্গীতগুলির পদে পদে সরল প্রাণের সোচ্ছ্বাস ভক্তি-নিবেদনের পূর্ণ আত্ম-সমর্পণের আকুতি পরিলক্ষিত হয়। অপর দিকে আবার রূপক অধ্যাত্মভাবচিত্রও সেখানে প্রস্ফুট হইয়া রহিয়াছে। দেবলোকের উমা-মেনকার হৃদয়-বেদনা যেন প্রসাদী-সাহিত্যে শতধারে উৎসারিত। বাংলার কুটীরে-কুটীরে, সবুজ শ্যামলতার সমারোহে বালিকা-হৃদয়ের আশা-আকাঙ্ক্ষা মূর্ত হইয়া ফুটিয়া উঠে। শারদ প্রভাতে ঝরা শেফালির ছন্দে-ছন্দে উমা-মেনকার আগমনীধ্বনি অনুরণিত হইয়া উঠে। স্বর্গের দেবী উমা-মেনকার আনন্দ-আশা যেন দুঃখসুখবিজড়িত মর্ত্যমানবের প্রাণকথা হইয়া গিয়াছে!

রামপ্রসাদের আগমনী-বিজয়া-গীতাবলী কাব্যসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ, লোক-সাহিত্যের একান্ত আশ্রয়।

ভক্তির সুরাসব পান করিরা 'মন মাতালে মাতাল' কবি রুদ্রভৈরবের অঙ্গে ভাববিলাসের বিভূতি লেপন করিয়া তাহাকে মানব-সংসারের অন্তরের ধন করিয়া তুলিয়াছেন। ভক্তি-মাতাল কবি ভক্তি-নেশার আস্বাদ তৃষিত মানবের হৃদয়-দুয়ারে বিকিকিনি করিয়া ফিরিয়াছেন। যাহা সুন্দর অথচ ভৈরব, তাহাই মানবের সাধনার ধন। ভয় ও বরাভয়ের অকম্প্র-জ্যোতি দেবী সংসারক্লিষ্ট মানবের প্রেরণা ও সান্ত্বনার স্থল। সেই মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেরণার পরিপ্রেক্ষিতে মানব-জীবনের চরম সত্যোপলব্ধি সার্থক ও শাশ্বত রূপ পরিগ্রহ করুক, চিরন্তন দুঃখানুভূতির গভীরতা হইতে মানুষ জগৎ ও জীবনের প্রকৃত স্বরূপ অনুধাবন করিতে সক্ষম হউক।

ভক্তভাস্কর কবি হৃদয়ের সকল মাধুর্য ও বিবিধ বর্ণকলার সমাবেশে যে চিন্ময়মূর্তির বিকাশ ঘটাইলেন, তাহা প্রেম ও নির্ভরতার পরমাশ্রয়। সেই প্রেমকল্যাণ রূপমাধুর্যে জগতের সকল কুশ্রীতা বিদূরিত হইয়া জগতে 'সত্যশিবসুন্দরের' মহামন্ত্র সত্য হইয়া প্রকাশিত হউক। অন্ধকারের কালিমা হইতে মুক্তি লাভ করিয়া মানুষ জ্যোতির পথে, দ্যুতির পথে, প্রকাশের পথে উত্তরণ করুক। অনশ্বর সত্যকে মুছিয়া ফেলিয়া জীবনে সে যাহা সত্য, যাহা শাশ্বত, সেই 'অনাদিমধ্যান্তোঽনন্তবীর্যঃ' পরম কল্যাণময়কে উপলব্ধি করতে প্রয়াসী হউক। অমৃতের উত্তরাধিকারিগণ উদাত্ত কণ্ঠে আবার গাহিয়া উঠুক :

আমার মা ত্বং হি তারা
ত্রিগুণধরা পরাৎপরা
তোরে জানি মা,
ও দীনদয়াময়ী,
তুমি দুর্গমেতে দুঃখহরা।

ছায়া-নট

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

প্রলুব্ধ চিত্তের ক্ষোভ হতবাক্ নিস্পন্দ সকালে
শতাব্দীর শ্যেনচক্ষে রেখে যায় ভয়াল ভ্রূকুটি,
অস্তসূর্য-রক্তরাগ ফুটে উঠে দিক্‌চক্রবালে
ভাঙিতে মঙ্গলঘট সমুদ্যত কার বজ্রমুঠি ?

অকাল বোধনে ডাকে ছিন্নমস্তা দেবীরে তাহারা
আত্মঘাতী বলিদানে তারা চায় বরাভয় দান,
পূজায় যদি বা বিঘ্ন ঘটে তাই শক্ররে পাহারা
চতুর্দিকে রাখিয়াছে, সহি' শত আত্ম-অপমান।

দেশ-জাতি-মনুষ্যত্ব-মমত্ববোধের অজুহাতে
অসন্দিগ্ধ চিত্তে আনে মিথ্যা সংশয়ের কুজ্ঝটিকা,
অ-দৃষ্ট প্রভুর পায়ে বিনম্র অসংখ্য প্রণিপাতে
প্রতিদিন ধূলিলিপ্ত ললাটের বাড়ে অহমিকা।

ভুবনমোহিনী রূপ তাহাদের চোখে নাহি পড়ে
মায়ের মন্দিরে তারা তুলিতেছে মিথ্যা কোলাহল,
দেশের মাটিতে তারা স্বজন-সংগ্রামে দুর্গ গড়ে
বিরোধে ও প্রতিরোধে সুধাপাত্রে তোলে হলাহল।

রাজেন্দ্রাণী জননীরে পাঠাইতে চাহে নির্বাসনে
শূন্য রত্ন-সিংহাসনে যারা করে পূজা অভিলাষ,
উদাত্ত মন্ত্রের ব্যাখ্যা তারা করে হীন দুর্ভাষণে—
শূন্যগর্ভ প্রতিশ্রুতি ঘনাইয়া আনে সর্বনাশ।

সর্বনাশী ছিন্নমস্তা নিজরক্ত-লোভাতুরা আজি
বামাচারী পূজারীর মন্ত্রে জাগে শাণিত কৃপাণ,
বধ্যভূমে মৃত্যুছন্দে দামামা উঠিল ঐ বাজি
সদাশিব নিদ্রামগ্ন স্তব্ধ আজও প্রলয়-বিষাণ।

পথভ্রান্ত অগণিত যাত্রী-দল যাক ঘরে ফিরে
মেলিয়া সজাগ দৃষ্টি, মুছি' অন্তরের মলিনতা
দিগন্তে ঈশান-কোণে মেঘ জমিতেছে ধীরে ধীরে
ঝড় উঠিয়াছে কোথা, বায়ুস্তরে তারই চঞ্চলতা।

ভৈরবের নিদ্রাভঙ্গ হইতে বিলম্ব যদি ঘটে
হে কালের অধীশ্বর, তুমিও কি রহিবে ভুলিয়া ?
মেঘের নির্মোক ভাঙি' হানো বজ্র স্তব্ধ ছায়ানটে
আত্মঘাতী এ সংগ্রামে বসুন্ধরা উঠুক দুলিয়া।

সমালোচনা

Holy Kamarpukur (The village in which Sri Ramakrishna was born) by Swami Tejasananda, Published by Swami Saradeswarananda, President, Sri Ramakrishna Math, P.O. Kamarpukur, Dt. Hooghly. Pp. 32, Price 65 nP.

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম-লীলাভূমি কামারপুকুর একাধারে অযোধ্যা ও বৃন্দাবন, বারাণসী ও নদীয়া, দক্ষিণেশ্বর ও দ্বারকা—শৈব-শাক্ত-বৈষ্ণব ভাবের সঙ্গম-স্থল। অতীতের পুণ্যস্মৃতি বক্ষে লইয়া আজ দ্বন্দ্বমুখর বিংশ শতাব্দীতে সংসার-তাপদগ্ধ মানুষের নিকট পরম শান্তি ও আনন্দের উৎসস্বরূপ এই তীর্থ। আলোচ্য সচিত্র পুস্তিকাটিতে কামারপুকুরে দর্শনীয় বিষয়গুলি সুন্দরভাবে বিবৃত।

যাঁহারা বাংলা ভাষা জানেন না, সেই সব ভক্তের নিকট পুস্তিকাটি তীর্থদর্শনের নির্দেশিকা। লেখকের বাংলায় 'শ্রীধাম কামারপুকুর' পুস্তিকার প্রথম সংস্করণ অল্প-কালের মধ্যে নিঃশেষিত হওয়ায় উহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। আশা করি ইংরেজী সংস্করণটিও ভক্তবৃন্দের আনন্দ বর্ধন করিবে।

জীবনমৃত্যুর সন্ধিস্থলে : শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন। প্রকাশক : শ্রীরাইমোহন আচার্য, সি. আই. টি. বিল্ডিংস, ব্লক নং ৩, ফ্ল্যাট নং ৩২, কলিকাতা ১০ ; পৃষ্ঠা ১৭৩ + পরিশিষ্ট ; মূল্য ৩৲।

মানুষের জীবনে কত রকমের ঘটনাই ঘটে। তারই ঘাতপ্রতিঘাতে বিচিত্র কল্লোর্মি সৃষ্টি ক'রে এগিয়ে চলে জীবনপ্রবাহ। কিন্তু মাঝে মাঝে দুর্লভ মুহূর্তে সেই সব ঘটনা আমাদের অন্তর্মুখী ক'রে তোলে, এই জনমে জন্মান্তর ঘটে যায়। 'দেশ' পত্রিকার পূর্বতন সম্পাদক শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেনের জীবনে এমন একটি ঘটনা ঘটেছিল—'১৩৫৬ সনের ৫ই আষাঢ় আমার জীবনের বড়ই একটি সৌভাগ্যের দিন। ঐ দিন অপরাহ্ণকালে ট্রামের নীচে পড়িয়া আমার ডান পা-খানা কাটা যায়।' এই আকস্মিক দুর্ঘটনাকে উপলক্ষ্য করেই লেখকের অন্তরে ভগবৎপ্রেমের নিখিলসঞ্চারী মাধুর্যচেতনা জেগে উঠল। দেহচেতনা পরম-চেতনার আলোকে নিঃশেষে মিলিয়ে গেল। এই ঘটনাটিকে কেন্দ্র ক'রে অধ্যাত্ম অনুভূতির প্রেরণাময় এক নতুন জীবনের সূচনা। 'জীবনমৃত্যুর সন্ধিস্থলে' সেই নবজীবনের অমৃত বাণী।

ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অভয়ের কথা' ও 'ঠাকুরানীর কথা' বইদুটিতে বৈদান্তিক ও বৈষ্ণব সাধনতত্ত্বের প্রাঞ্জল আলোচনাভঙ্গী বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যের চিরবিস্ময়ের বস্তু। এই গ্রন্থদুটির সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র সেন মহাশয়ের 'জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে' একত্র স্মরণীয়। বৈষ্ণব সাধনতত্ত্বের সঙ্গে স্নিগ্ধগম্ভীর ভাষাধ্বনির সহযোগের ফলে এ বই বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদে পরিণত হয়েছে। সাধক, ভক্ত, সাহিত্যপ্রেমিক সর্বজনের সশ্রদ্ধ অভিনিবেশের যোগ্য এ গ্রন্থের বহুলপ্রচার একান্ত প্রার্থনীয়। শোভন প্রচ্ছদপট ও মুদ্রণ-সৌকর্যের জন্য প্রকাশক মহোদয় আমাদের ধন্যবাদভাজন।

—প্রণবরঞ্জন ঘোষ

সময় ও সুকৃতি : জ্যোতির্ময়ী দেবী প্রণীত। প্রকাশক : শ্রীগোপালদাস মজুমদার, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬। পৃষ্ঠা ১৪৯, মূল্য টাকা ৩·৫০।

ধর্মমূলক ও ভ্রমণ-রসাশ্রিত বিবিধ রচনার এই গ্রন্থটিতে জীবনচর্যালব্ধ কতিপয় অভিজ্ঞতা স্নিগ্ধ নিরাভরণ ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে। যে চৌদ্দটি ধর্মমূলক প্রবন্ধে গ্রন্থটি সম্পূর্ণ, তার শেষের চারটি প্রধানতঃ ভ্রমণ-রসাত্মক। এগুলি ইতিপূর্বেই বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। 'অভয়দান'-ই যে শ্রেষ্ঠদান, বহুদর্শিতার নিকষে এই তত্ত্বের যাথার্থ্য নিরূপিত হয়েছে গ্রন্থটির প্রথম প্রবন্ধে। জীবনে সত্যের উদ্ভাস যে সুকৃতি- ও সময়-সাপেক্ষ—এই সত্য বিবৃত হয়েছে গ্রন্থের নাম-নিবন্ধে। শিখ-আর্য-সমাজী-হিন্দু নির্বিশেষে ধর্মপ্রাণা পাঞ্জাবী মহিলামহলের একটি অন্তরঙ্গ পরিচয় ফুটে উঠেছে 'পঞ্চনদ-বাসিনীদের সৎসঙ্গে', এবং 'পাঞ্জাবে সৎসঙ্গ' প্রবন্ধে দেশ-কাল-মানুষ ও দেশাচার সম্পর্কে কিছু নূতন কথা থাকলেও এর শেষার্ধ পূর্বপ্রবন্ধেরই অনুবৃত্তি-সদৃশ। প্রবন্ধ-দুটি একত্র সন্নিবিষ্ট হলেই সঙ্গত হ'ত। কর্মপথে বন্ধু দুর্লভ হলেও অহৈতুকী বন্ধুত্বের সুদুর্লভ স্পর্শ হয়তো বা কিছু মেলে ধর্মপথে—গল্পের মাধ্যমে বিষয়টি মনোহর হয়ে উঠেছে 'বন্ধু' নিবন্ধে। 'ভাইবোনের পূজা ও বিদ্যার্থী' প্রবন্ধে সর্বভারতের পটভূমিকায় সরস্বতী, গণেশ, লক্ষ্মী ও কার্তিকেয় পূজার কিছু তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। ভ্রমণেচ্ছুগণের প্রয়োজনীয় তথ্য-সহ কেদার-বদরী ভ্রমণের বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে 'হিমালয়ের আহ্বান' নামক প্রবন্ধত্রয়ে। আর 'পথ ও মানুষ' নিবন্ধটি কেদার-বদরী ভ্রমণের তথা গ্রন্থেরও উপসংহার।

গ্রন্থটিতে কিছুসংখ্যক মুদ্রাকরপ্রমাদ দৃষ্ট হয়। বৈঠকীচালের রচনায় বাক্যমধ্যস্থ পদগুলির স্বাভাবিক ক্রমের কিঞ্চিৎ ব্যত্যয় অনুমোদিত হলেও তা নিয়মানুবর্তীও বটে। আলোচ্য গ্রন্থের কয়েক স্থলে সেই আসত্তি-ব্যত্যয় অনিয়ন্ত্রিত হয়েছে। এ ছাড়া সূচী অনুযায়ী শেষ নিবন্ধ 'পথ ও মানুষ—(২)' প্রাপ্ত পুস্তকে অনুপস্থিত।

এই 'গয়া-গঙ্গা-প্রভাসাদি' সাধু-সন্ত-ঐশ কথা বিশেষভাবে রেখাপাত করবে তাঁদের মনেই, যাঁদের মর্মকথাটি হ'ল—তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা। গ্রন্থটির প্রচ্ছদপট ও বাঁধাই সুন্দর। এরূপ গ্রন্থের বহুল প্রচার অবশ্যই কাম্য।

—রমাপ্রসাদ ঘোষ

শাশ্বতী (তৃতীয় বর্ষ—১৩৬৮) **:** টাকী রাম-কৃষ্ণ মিশন উচ্চ বিদ্যালয় পত্রিকা ; পৃষ্ঠা ৬৭।

কবিতা গল্প ও প্রবন্ধগুলিতে ছাত্রদের লেখার প্রতি আগ্রহ লক্ষিত হয়। রবীন্দ্রনাথ-সম্বন্ধে অনেকগুলি লেখা আছে। 'নচিকেতসো ব্রহ্মজ্ঞানলাভঃ' সংস্কৃত-রচনাটি সুলিখিত। ছাত্রদের এইরূপ সংস্কৃত-রচনা পত্রিকায় মুদ্রিত হইলে তাহাদের সংস্কৃত-পাঠের আগ্রহ বৃদ্ধি পাইবে। 'Direct method of teaching English in Indian Schools' প্রবন্ধে ইংরেজী ভাষা শিক্ষা দিবার নিয়ম সংক্ষেপে সুন্দরভাবে বিবৃত। বানান ভুল সম্বন্ধে এবং সম্পাদনায় আরও সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

কার্যবিবরণী

কানপুর: রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম ১৯২০ খৃঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। আধ্যাত্মিকতা, শিক্ষাবিস্তার ও চিকিৎসা-ব্যবস্থা এই কেন্দ্রের প্রধান কর্মধারা। এপ্রিল '৬১—মার্চ '৬২ কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রতিদিন পূজা উপাসনা, রবিবারে ধর্মালোচনা এবং সাময়িক উৎসব সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

আশ্রম-পরিচালিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আলোচ্য বর্ষে ৫৩৭ জন ছাত্র ছিল। ছাত্রদের লেখাপড়া স্বাস্থ্য ও নৈতিক চরিত্র—সব দিকেই বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়। পরীক্ষা-ফল ৯৪%।

লাইব্রেরিতে ৫,৭৩২ বই আছে, ২,৫০৯ বই পড়িবার জন্য দেওয়া হয়। পাঠাগারে ৮টি সংবাদপত্র ও ১৭টি সাময়িক পত্রিকা লওয়া হয়।

চিকিৎসা-বিভাগে মোট ১,৫৬,১৯২ রোগী বিনাব্যয়ে চিকিৎসা লাভ করে; ইহাদের মধ্যে ৮০% নারী ও শিশু। অস্ত্র-চিকিৎসা ও ইঞ্জেকশন যথাক্রমে ১,৮৭৯ ও ১০,৬৭৮।

'হরিজন-আখড়া'র কার্য সুনিয়মে পরিচালিত হয়।

সরিষা: রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের ১৯৫৬-৫৮ খৃঃ কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতিষ্ঠাকাল ১৯২১ খৃঃ হইতে আশ্রমটি প্রধানতঃ শিক্ষবিস্তার কার্যে রত। ১৯৫৮ খৃঃ ইহার কর্মধারা নিম্নরূপ:

বালকদের বহুমুখী বিদ্যালয়: সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা। ছাত্রসংখ্যা ২৫৬। ছাত্রাবাসে ১২৫ জন বিদ্যার্থী ছিল।

সিনিয়র বেসিক স্কুল: ছাত্রসংখ্যা ৯১।

বালিকাদের বহুমুখী বিদ্যালয়: সাহিত্য, গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান, চারুকলা শিক্ষার ব্যবস্থা। ছাত্রীসংখ্যা ২১৭। ছাত্রীনিবাসে ৬৫ জন ছাত্রীর মধ্যে ৫ জন ফ্রি ও ৭ জন আংশিক খরচে ছিল।

মহিলাদের আবাসিক জুনিয়র বেসিক ট্রেনিং কলেজ: ৫১ জন শিক্ষালাভ করিয়াছে।

জুনিয়র বেসিক স্কুল: ছাত্র ১৯৭, ছাত্রী ১৮৩। প্রি-বেসিক নার্সারি স্কুল: শিশু ৩৬।

টেকনিক্যাল স্কুল: তাঁতের কাজ, সেলাইয়ের কাজ প্রভৃতি শেখানো হয়।

সমাজশিক্ষা: বয়স্ক পুরুষদের জন্য ৬টি এবং মহিলাদের ৪টি কেন্দ্র পারচালিত হয়। গড়ে ১৬৭ জন শিক্ষালাভ করে (মহিলা ৫৩)।

গ্রন্থাগার: ৬টি শাখাকেন্দ্র-সহ প্রধান গ্রন্থাগারের মোট পুস্তক-সংখ্যা ৪,৩০৪। গড়ে নিয়মিত পাঠকসংখ্যা ১,৩১৪; ১৩২টি গ্রামের লোক বই পড়িবার সুযোগ লাভ করে।

শ্রুতি-চাক্ষুষী শিক্ষা: বিভিন্ন গ্রামে ১১০টি শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র দেখানো হয়।

বিবেকানন্দ সমাজসেবা-কেন্দ্র: (১৭, নন্দলাল মল্লিক লেন এবং ৯।১, রমেশ দত্ত স্ট্রীট, কলিকাতা ৬) স্বামীজীর শিক্ষাদর্শে উদ্বুদ্ধ পাথুরিয়াঘাটা রামকৃষ্ণ মিশন ছাত্রাবাসের বিদ্যার্থী দ্বারা রামবাগান বস্তিতে অনুন্নত সম্প্রদায়ের সেবাকল্পে এই কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪২ খৃঃ। বর্তমানে ইহা নরেন্দ্রপুর (২৪ পরগনা) রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের শাখা-কেন্দ্ররূপে পরিচালিত হইতেছে। ১৯৬০-৬১ খৃঃ কার্যবিবরণীতে প্রকাশিত ইহার কার্যধারা:

(১) বিবেকানন্দ নার্সারি স্কুল (৩ হইতে ৬ বৎসরের শিশুদের জন্য): ছাত্রসংখ্যা ৫২।

(২) বিবেকানন্দ বেসিক স্কুল: ছাত্রসংখ্যা ২৭৯।

(৩) ছাত্রাবাস: ২৫ জন অনুন্নত শ্রেণীর ছাত্র এখানে বিনা-খরচে থাকিয়া শিক্ষালাভের সুযোগ পাইতেছে। ২ জন উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে।

(৪) বয়স্কদের জন্য দুইটি নৈশ বিদ্যালয়।

(৫) সমাজশিক্ষার ক্লাস: চলচ্চিত্র, কথকতা, বক্তৃতা, থিয়েটার, প্রদর্শনী ও দেওয়াল-পত্রিকার মাধ্যমে শিক্ষাবিস্তার করা হয়।

(৬) গ্রন্থাগার ও পাঠাগার: গ্রন্থাগারে ১,০০১ বই আছে। পাঠাগারে দৈনিক পাঠক-সংখ্যা ২১।

(৭) মেয়েদের জন্য সমাজশিক্ষা: ১৫ জনকে সমাজশিক্ষা দেওয়া হইতেছে।

দাতব্য চিকিৎসালয়: ১৯৬০ খৃ: ১৩,০১৬ রোগী চিকিৎসিত হইয়াছে, প্রতিদিন ২২৫ শিশুকে দুধ দেওয়া হয়।

আমেরিকায় বেদান্ত

নিউইয়র্ক: রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্র। কেন্দ্রাধ্যক্ষ: স্বামী নিখিলানন্দ; সহকারী: স্বামী বুধানন্দ। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অবলম্বনে বক্তৃতা প্রদত্ত হয়। ধ্যান এবং গীতা ও উপনিষদের ক্লাস যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়।

মার্চ: হিন্দুধর্ম ও হিন্দুধর্মাবলম্বী; শ্রীরামকৃষ্ণ ও আধুনিক সমস্যা; গুরুর আবশ্যকতা আছে কিনা? অনুষ্ঠান, ধ্যান ও অনুভূতি।

এপ্রিল: যথার্থ ধর্ম সর্বদা সর্বত্র সাহায্য করে; ধ্যানের তিনটি অবস্থা; উন্নত ব্যক্তিত্ব-লাভের উপায়; সাহসের সহিত মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়া; মৃত্যুর পরের জীবন; কিভাবে সুন্দর নিশ্চিন্ত জীবন যাপন করা যায়?

মে: 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যের অর্থ ও সাধনা; ভগবৎপ্রেম; বুদ্ধ ও বর্তমান জগৎ; অনাসক্তি অভ্যাস।

জুন: যোগের মূলতত্ত্ব; হিন্দুধর্মে ঈশ্বর-সম্বন্ধে ধারণা; শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমা; আত্মার বন্ধন ও মুক্তি।

জুলাই: আত্মানুভূতির পথে সতর্কতা; 'আমিই লক্ষ্য, আমিই পথ'।

এতদ্ব্যতীত জুন ও জুলাই মাসে আরও কয়েকটি বক্তৃতা প্রদত্ত হয়: আমাদের কাছে আসে দুই বিপরীত ভাবের আহ্বান; অবসর-কালে আধ্যাত্মিক অবলম্বন; বেদান্ত কি জীবনে প্রয়োগ করা যায়? আধ্যাত্মিকতা দ্বারা আমাদের কি লাভ হইবে?

ব্রেজিলে বেদান্ত-প্রচার

দক্ষিণ আমেরিকাস্থ আর্জেন্টিনা বেদান্ত-কেন্দ্রের পরিচালক স্বামী বিজয়ানন্দ গত জুলাই, অগস্ট এবং সেপ্টেম্বরের প্রথমার্ধে ব্রেজিলের প্রধান শহর রিও-ডি-জেন্যারোতে অবস্থান করেন। স্থানীয় বেদান্তানুরাগী ভক্তগণ 'রামকৃষ্ণ আশ্রম' নাম দিয়া একটি প্রতিষ্ঠান কিছুকাল যাবৎ পরিচালনা করিতেছেন। পর্তুগীজ ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্য এবং বেদান্তের কিছু কিছু পুস্তকও প্রকাশ করা হইয়াছে। স্বামী বিজয়ানন্দের এবারকার অবস্থানের সুযোগ লইয়া ব্রেজিলের নানা স্থান হইতে জিজ্ঞাসু ব্যক্তিরা ধর্মপ্রসঙ্গ ও উপদেশের জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি নিয়মিত ধর্মালোচনা ব্যতীত সর্বসাধারণের জন্য শহরে ৫টি বক্তৃতাও দেন। বক্তৃতাগুলি ধর্মজিজ্ঞাসু নরনারীদের মধ্যে প্রভূত উৎসাহের সৃষ্টি করে। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনালোকে বেদান্তের শিক্ষা ধীরে ধীরে ব্রেজিলে সমাদৃত হইতেছে—ইহা বিশেষ আনন্দের বিষয়।

স্বামী অখিলানন্দের দেহত্যাগ

আমরা অতি দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, স্বামী অখিলানন্দ (নীরদ মহারাজ) গত ২৩শে সেপ্টেম্বর ৫-১৫ মিঃ (বস্টন সময়) ৬৮ বৎসর বয়সে যুক্তরাষ্ট্রে বস্টন হাসপাতালে দেহত্যাগ করিয়াছেন। এক বৎসরাধিক কাল তিনি নানাবিধ অসুখে ভুগিতেছিলেন, তাঁহাকে বস্টন হাসপাতালে ভরতি করা হয়। সেপ্টেম্বরের প্রথমদিকে তিনি হাসপাতাল হইতে মুক্তি পান এবং তাঁহাকে নার্সিং হোমে আনা হয়। কিছুদিন পর ফুসফুসের পীডায় আক্রান্ত হইলে পুনরায় তাঁহাকে হাসপাতালে ভরতি করা হয়, সেখানেই তাঁহার দেহাবসান ঘটে।

তিনি শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের নিকট মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন, ১৯১৯ খৃঃ শেষের দিকে ভুবনেশ্বর মঠে রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে যোগদান করেন, ভুবনেশ্বর হইতে শ্রীশ্রীমহারাজ কর্তৃক মাদ্রাজ মঠে প্রেরিত হন, সেখানে ১৯২৫ খৃঃ পর্যন্ত অবস্থান করেন। ১৯২১ খৃঃ তিনি শ্রীশ্রীমহারাজের নিকট সন্ন্যাস-দীক্ষা লাভ করেন এবং ১৯২৬ খৃঃ স্বামী পরমানন্দের সহকারী-রূপে আমেরিকায় প্রেরিত হন।

১৯২৮ খৃঃ স্বামী অখিলানন্দ প্রভিডেন্সে বেদান্ত-সোসাইটি এবং ১৯৪১ খৃঃ বস্টনে রামকৃষ্ণ বেদান্ত-সোসাইটি স্থাপন করেন। তাঁহার প্রেমপূর্ণ হৃদয় ও মধুর স্বভাব সর্বস্তরের মানুষকে আকর্ষণ করিত, বহু লোক তাঁহার অনুরাগী বন্ধুতে পরিণত হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের সাধুগণেরও তিনি বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। সঙ্ঘের বিভিন্ন কার্যে তিনি অকাতরে সাহায্য দান করিয়াছিলেন। বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির-নির্মাণে তাঁহারই প্রচেষ্টা প্রধানভাবে কার্যকর হইয়াছিল। তাঁহার দেহাবসানে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছে।

তাঁহার দেহমুক্ত আত্মা শাশ্বত শান্তি লাভ করিয়াছে। ওঁ শান্তিঃ ! শান্তিঃ !! শান্তিঃ !!!

স্বামী নিরন্তরানন্দের দেহত্যাগ

আমরা দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, স্বামী নিরন্তরানন্দ (গৌর মহারাজ) গত ১৭ই অক্টোবর সন্ধ্যা ৬-৪৫ মিঃ সময়ে বরানগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে ৬৩ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। তিনি অনেক দিন যাবৎ অসুস্থ ছিলেন। শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের নিকট তিনি ১৯২৯ খৃঃ মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন।

মর্টন ইন্স্টিটিউশনে পাঠকালে তিনি 'কথামৃত'কার 'শ্রীম'র সান্নিধ্যে আসেন এবং স্বামীজীর ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হইয়া দেশসেবামূলক কার্যে ব্রতী হন। প্রথম জীবনে তিনি রাজনীতিতে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, পরে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের আদর্শে টাকী ও খড়দহে রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ গঠন করেন। ১৯৩৮ খৃঃ তিনি বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘভুক্ত হইয়া সর্বতোভাবে মঠ ও মিশনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন, ঐ বৎসরই বরানগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের কর্মভার গ্রহণের জন্য প্রেরিত হন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত দীর্ঘ ২৪ বৎসর কাল এই কেন্দ্রের অধ্যক্ষপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। স্বামী নিরন্তরানন্দের অমায়িক ও সরল ব্যবহার সকলেরই হৃদয় স্পর্শ করিত। তাঁহার দেহত্যাগে রামকৃষ্ণ মিশনের বিশেষ ক্ষতি হইল।

তাঁহার দেহমুক্ত আত্মা চিরশান্তি লাভ করিয়াছে। ওঁ শান্তিঃ ! শান্তিঃ !! শান্তিঃ !!!

বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী-প্রস্তুতি

বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী কমিটির সম্পাদক স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ বলেন : আগামী জানুআরি মাসে স্বামীজীর শতবার্ষিক উৎসব শুরু হইবে, ইহা ভারত সরকার কর্তৃক জাতীয় উৎসবরূপে ঘোষিত হওয়া উচিত। স্বামীজী সমগ্র জাতিকে মোহনিদ্রা হইতে জাগাইয়াছেন, এই মহামানবের উদ্দেশে ভারতবাসীর যথাযোগ্য শ্রদ্ধা-নিবেদন কর্তব্য।

আমেরিকা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া স্বামীজী মাদ্রাজে 'Ice House' নামে পরিচিত বাড়িটিতে অবস্থান করিযাছিলেন ; মাদ্রাজ ও ইহার পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলি স্থির করিয়াছেন যে, এই গৃহটির নাম পরিবর্তন করিয়া 'বিবেকানন্দ-ভবন' (Vivekananda-House) রাখা হইবে। সমুদ্রোপকূলে এই ভবনের সম্মুখে স্বামীজীর ১০ ফুট উচ্চ ব্রোঞ্জ মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে।

কেরালায় ত্রিবান্দম বিশ্ববিদ্যালয় 'বিবেকানন্দ সংস্কৃতি-প্রতিষ্ঠান' (Vivekananda Institute of Culture) স্থাপনের জন্য এক একর জমি দিয়াছেন।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী-সভার যোগাযোগ ও প্রচার দপ্তর (The Ministry of Information and Broadcasting) কর্তৃক স্বামীজীর জীবনী অবলম্বনে প্রামাণিক চলচ্চিত্র (Documentary film) প্রস্তুত করা হইতেছে।

কলিকাতা পৌর-প্রতিষ্ঠান (Calcutta Corporation) প্রস্তাব করিয়াছেন, দক্ষিণ কলিকাতায় গোল পার্কে স্বামীজীর একটি পূর্ণাবয়ব মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হইবে এবং ইহার চারিদিকে ত্রিশটি মর্মর-ফলকে স্বামীজীর বিশেষ বাণী লিপিবদ্ধ থাকিবে।

বিদেশ হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় যে, ইংলণ্ড, রাশিয়া, ফ্রান্স, আয়ার্ল্যাণ্ড, আমেরিকা, জাপান, সিঙ্গাপুর, কাম্বোডিয়া, থাইল্যাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া, সিংহল এবং দক্ষিণ আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে স্বামীজীর শতবার্ষিক উৎসবের প্রস্তুতি চলিতেছে।

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় প্রস্তাব করিয়াছেন যে, স্বামীজীর নামে বেদান্তদর্শন-সম্বন্ধে বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হইবে। শ্রোতৃভবন প্রভৃতি নির্মাণের জন্য ১০০,০০০ পাউণ্ড পাওয়া গিয়াছে। আগামী বর্ষে লণ্ডনে একটি ধর্মমহাসভা অনুষ্ঠিত হইবে। —Hindusthan Standard হইতে

বক্তৃতা-সফর

বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী কমিটির সম্পাদক স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ গত জুলাই মাসে নিম্নলিখিত স্থানসমূহে বক্তৃতা দেন। অধিকাংশ স্থানে তাঁহার ভাষণ প্রধানতঃ স্বামীজীর শিক্ষাদর্শ অবলম্বনে স্কুল-কলেজে প্রদত্ত হয় :

আমেদাবাদ, নাসিক, দেওলালি, উলুবেড়িয়া, তমলুক, কালনা, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, বাটানগর, বজবজ, বিষ্ণুপুর, কামারপুকুর, বাঁকুড়া।

সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে তিনি মাদ্রাজ প্রদেশের নিয়োদ্ধৃত স্থানগুলিতে আয়োজিত সভায় ২।৩টি করিয়া বক্তৃতা দেন ; অনেক স্থানে শতবার্ষিকী উৎসবের জন্য কমিটি গঠিত হয় :

মাদ্রাজ, চিদাম্বরম, কুম্ভকোনম, তাঞ্জোর, ত্রিচিনাপল্লী, রামেশ্বরম্, মাদুরা, তিরুনাভেলী, কুমারিকা অন্তরীপ, নাগারকয়েল, ত্রিবান্দ্রম্, কয়ম্বাতুর, কালাডি, ত্রিচুর, সালেম।

বিবিধ সংবাদ

কার্যবিবরণী

বিবেকানন্দ সোসাইটি (২১, বৃন্দাবন বসু লেন, কলিকাতা ৬): স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ রূপায়িত করিবার জন্য জনসাধারণের পক্ষ হইতে যে-সকল সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে বিবেকানন্দ সোসাইটির নাম প্রাচীনতার দিক হইতে উল্লেখযোগ্য; ১৯০২ খৃঃ প্রতিষ্ঠিত এই সমিতির ১৯৬১ খৃঃ কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার কর্মধারা প্রধানতঃ প্রচার-শিক্ষা-ও সেবামূলক।

আলোচ্য বর্ষে সাপ্তাহিক ও সাময়িক ধর্মসভায় গীতা, উপনিষৎ, নারদীয় ভক্তিসূত্র, তুলসী-রামায়ণ, শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত প্রভৃতি আলোচিত হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপন করা হয়।

সোসাইটির দাতব্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয়ে ১৯৬১ খৃঃ ১২,২১২ রোগীকে ঔষধ দেওয়া হয়। গ্রন্থাগারে ইতিহাস, জীবনী, ধর্ম, দর্শন ও সাহিত্য বিষয়ে ৫,০২০ নির্বাচিত পুস্তক আছে; আলোচ্য বর্ষে ২,৪২০ পুস্তক পাঠকদিগকে পড়িতে দেওয়া হয়। পাঠাগারে অনেকগুলি পত্র-পত্রিকা নিয়মিত আসে। সোসাইটির বর্তমান গ্রাহক-সংখ্যা ৩৭৪।

কলিকাতায় ১৫১ নং বিবেকানন্দ রোডে নিজস্ব জমিতে সোসাইটির বহু-ঈপ্সিত 'বিবেকানন্দ-স্মৃতিমন্দির' (Swami Vivekananda Memorial Hall) নির্মাণের কার্য আরম্ভ হইয়াছে। এতদর্থে সমিতির সম্পাদক অর্থ-সাহায্যের জন্য আবেদন করিয়াছেন।

পৃথিবীর লোকসংখ্যা

পৃথিবীর লোকসংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে। গত বৎসর লোকসংখ্যা ছিল ৩,০০ কোটির উপর, গত ১০ বৎসরে লোকসংখ্যা ছয়ভাগের একভাগ বাড়িয়াছে।

১৯৬০-৬১ খৃঃ আদমশুমারিতে দেখা গিয়াছে, প্রতি বৎসর ১·৮% হারে পৃথিবীর লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এক বর্গ কিলোমিটারে গড়ে বর্তমানে ২০ জন লোক থাকে, সেই তুলনায় ১০ বৎসর পূর্বে ১৮ জন থাকিত।

আমেরিকার মধ্য অঞ্চলে লোকসংখ্যা সর্বাপেক্ষা দ্রুতগতিতে বাড়িয়াছে—২·৭% বৃদ্ধি। সর্বাপেক্ষা কম বৃদ্ধি উত্তর-পশ্চিম ইওরোপে—০·৭%।

এশিয়ার লোকসংখ্যা ৩·৫ কোটি বাড়িয়াছে। এখনও মধ্য ইওরোপই সর্বাপেক্ষা জনবহুল অঞ্চল, প্রতিবর্গ কিলোমিটারে ১৩৭ জন বাস করে। নেদারল্যাণ্ড সর্বাপেক্ষা ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। অনেক দ্বীপ ও প্রধান নগর ইহা অপেক্ষাও ঘনবসতিপূর্ণ, যথা: জিব্রাল্টর, হংকং, সিঙ্গাপুর।

অষ্ট্রেলিয়া, বেচুয়ানাল্যাণ্ড, গ্রীনল্যাণ্ড, দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা সর্বাপেক্ষা জনবিরল প্রশস্ত ভূভাগ।

দক্ষিণ এশিয়ার প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ১০৯ জন বাস করে, ১৯৫৫ খৃঃ ১২ জন বৃদ্ধি, মধ্য ইওরোপে মাত্র ৫ জন।

মৃত্যুর হার কমিতেছে, জন্মহার বাড়িতেছে। জন্মহার মৃত্যুহারের দ্বিগুণ। ১৯৬১ খৃঃ জন্মহার প্রতি হাজারে ৩৬ এবং মৃত্যুহার ১৮।

—রয়টার হইতে সঙ্কলিত

আত্মা কি অমর ?

স্বামী বিবেকানন্দ

বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্তুমর্হতি। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা, ২।১৭

সংস্কৃত ভাষার সুপ্রসিদ্ধ মহাকাব্য মহাভারতে বর্ণিত আছে—কিরূপে (বকরূপী) ধর্ম কর্তৃক জগতের আশ্চর্যতম বিষয়-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়া ঐ মহাকাব্যের নায়ক যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন—জগতে সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় এই যে, জীবনের প্রায় প্রতি মুহূর্তে চারিদিকে মৃত্যু ঘটিতেছে দেখিয়াও মানুষের অটল বিশ্বাস যে, সে নিজে মৃত্যুহীন। প্রকৃতপক্ষে ইহাই মানব-জীবনের প্রচণ্ড বিস্ময়! বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দর্শনে ইহার বিপক্ষে অশেষ প্রকার যুক্তি প্রদর্শিত হইলেও এবং ইন্দ্রিয়াতীত জগতের মধ্যে চিরবিদ্যমান রহস্য-যবনিকা যুক্তিসহায়ে ভেদ করিতে অক্ষম হইলেও মানুষ দৃঢ়নিশ্চয় করিয়া বসিয়া আছে যে, সে কখনও মরিতে পারে না।

আমরা সমগ্র জীবন ব্যাপিয়া অনুশীলন করিতে পারি, তথাপি শেষ পর্যন্ত জন্ম-মৃত্যুর সমস্যাটিকে ইতিবাচক বা নেতিবাচক কোন যুক্তিমূলক প্রমাণের স্তরেই দাঁড় করাইতে পারি না। মানব-সত্তার স্থায়িত্ব বা অনিত্যতার পক্ষে বা বিপক্ষে আমরা যত খুশি লিখিতে, বলিতে, প্রচার করিতে বা শিক্ষা দিতে পারি; ইহার যে-কোন পক্ষ অবলম্বন করিয়া আমরা প্রচণ্ড বিরোধে মত্ত হইতে পারি; ইহার পূর্ব পূর্ব নাম অপেক্ষা ক্রমেই শত শত জটিলতর নূতন নূতন নাম আবিষ্কার করিয়া আমরা ক্ষণকালের জন্য আত্মপ্রবঞ্চনার মধ্যে এই শান্তি লাভ করিতে পারি যে, আমরা চিরকালের জন্য সমস্যাটির সমাধান করিয়া ফেলিয়াছি; আমরা পূর্ণ উদ্যমে ধর্মরাজ্যের কোন একটি অদ্ভুত কুসংস্কারকে আঁকড়াইয়া ধরিতে পারি, অথবা ইহা অপেক্ষাও অধিকতর আপত্তিজনক কোন বৈজ্ঞানিক কুসংস্কারকে মানিয়া লইতে পারি, কিন্তু অবশেষে দেখিতে পাই, আমরা যুক্তিরূপ এক সঙ্কীর্ণ ক্রীড়াক্ষেত্রে এমন একটি অনন্ত কন্দুক-ক্রীড়ায় লিপ্ত রহিয়াছি, যাহাতে বুদ্ধিরূপ খুঁটিগুলিকে বারংবার দাঁড় করাইতে চেষ্টা করিতেছি, আর পরক্ষণেই উহারা কন্দুকাঘাতে ধরাশায়ী হইতেছে!

কিন্তু এই যে মানসিক শ্রম ও কষ্টভোগ, যাহা বহু ক্ষেত্রে ক্রীড়া অপেক্ষাও অধিকতর সঙ্কট উৎপন্ন করে, উহার পশ্চাতে এমন একটি সত্য আছে, যাহার সম্বন্ধে বাদবিসংবাদ করা চলে না, যাহা সমস্ত বিসংবাদের অতীত। আর ইহাই হইল মহাভারতে উল্লিখিত সেই সত্য —সেই অত্যাশ্চর্য ব্যাপার: মানুষের পক্ষে ধারণা করা অসম্ভব যে, সে শূন্যে বিলীন হইয়া যাইবে। এমন কি আমার নিজের বিনাশের কথা ভাবিতে গেলেও আমাকে সাক্ষিরূপে এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সেই বিনাশ-ক্রিয়াটিকে লক্ষ্য করিতে হইবে।

এখন এই অদ্ভুত ব্যাপারের অর্থ অনুধাবনের পূর্বে এই একটি বিষয়ে অবহিত হওয়া আবশ্যক যে, নিখিল জগৎ এই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, বহির্জগতের সত্তা অপরিহার্যরূপে অন্তর্জগতের সত্তার সহিত বিজড়িত। এই উভয় সত্তার কোন একটিকে বাদ দিয়া এবং অপরটিকে স্বীকার করিয়া জগৎসম্বন্ধে কোন মতবাদ গড়িয়া তুলিলে উহা আপাততঃ যতই বিশ্বাসযোগ্য মনে হউক, ঐ মতবাদের স্রষ্টা নিজেই দেখিতে পাইবেন, অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ এই উভয় জগতের স্থায়িত্বকে যদি প্রেরণাশক্তির অন্যতম কারণরূপে স্বীকার না করা হয়, তবে তাঁহার স্বকল্পিত প্রক্রিয়া অবলম্বনে একটিও সচেতন ক্রিয়া সম্ভব নহে। যদিও ইহা সম্পূর্ণ সত্য যে, যখন মানব-মন আপনার সীমা অতিক্রম করে, তখন সে দেখে—দ্বৈত জগৎ এক অখণ্ড একত্বে পরিণত হইয়া গিয়াছে, তথাপি ঐ উপাধিবিহীন সত্তাকে যখন ইহজগতের দৃষ্টিতে দেখা হয়, তখন সমগ্র দৃশ্য জগৎ—অর্থাৎ আমাদের পরিচিত এই জগৎ, জ্ঞাতার জ্ঞেয় বিষয়মাত্ররূপেই জ্ঞাত হয় এবং জ্ঞাত হইতে পারে। সুতরাং এই জ্ঞাতার ধ্বংসের কল্পনা করিতে পারার পূর্বে আমাদিগকে বাধ্য হইয়া জ্ঞেয় বিষয়ের ধ্বংস কল্পনা করিতে হইবে।

এ পর্যন্ত তো খুবই সহজ। ইহার পর ব্যাপারটি কঠিন হইয়া পড়িতেছে। সাধারণতঃ আমরা নিজেদিগকে শরীর ব্যতীত অন্য কিছু ভাবিতে পারি না। আমি যখনই নিজেকে অমর বলিয়া ভাবি, তখন 'আমি' বলিতে দেহরূপ আমাকেই গ্রহণ করি। কিন্তু শরীর যে সমগ্র প্রকৃতির মতোই অস্থায়ী এবং সর্বদা বিনাশের দিকেই অগ্রসর হইতেছে, ইহা তো প্রত্যক্ষ সত্য।

তাহা হইলে এই স্থায়িত্ব কোথায় নিহিত?

আমাদের জীবনের সঙ্গে এমন আর একটি আশ্চর্য বিষয়ের সংযোগ রহিয়াছে, যেটিকে বাদ দিলে 'কে বাঁচিতে পারে, কে এক মুহূর্তের জন্যও জীবনে আনন্দ উপভোগ করিতে পারে?'[১]— সেটি হইল মুক্তির আকাঙ্ক্ষা।

এই আকাঙ্ক্ষাই আমাদের প্রতি পদক্ষেপ নিয়মিত করে, আমাদের গতিবিধি সম্ভব করে, পরস্পরের সহিত আমাদের সম্পর্ক নির্ধারণ করে। শুধু তাহাই নহে, ইহা যেন মানবজীবন-রূপ বস্ত্রের টানা ও পোড়েন। বুদ্ধিলব্ধ জ্ঞান ইহাকে তিল তিল করিয়া নিজ ক্ষেত্র হইতে হঠাইয়া দিতে চায়, ইহার রাজ্য হইতে একটির পর একটি দুর্গ অধিকার করিতে চায় এবং (মানুষের) প্রতিটি পদক্ষেপ কার্য-কারণের রেলপথের লৌহবন্ধনে আবদ্ধ করে। কিন্তু আমাদের এ-সব প্রচেষ্টায় মুক্তি হাসিয়া উঠে, আর কি আশ্চর্য! মুক্তিকে যদিও আমরা অশেষ বিপুলভার বিধি ও কার্য-কারণের নিয়মের চাপে শ্বাসরুদ্ধ করিয়া হত্যা করিতে চাহিয়াছিলাম, তথাপি সে এখনও নিজেকে ঐগুলির ঊর্ধ্বে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। ইহার অন্যথা কিরূপে হইতে পারে? সসীমকে যদি নিজের অর্থ পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে হয়, তাহা হইলে সর্বদাই তাহাকে অসীমের উচ্চতর ব্যাপক পরিপ্রেক্ষিতে তাহা করিতে হইবে। বদ্ধ কেবল মুক্তের দ্বারাই ব্যাখ্যাত হইতে পারে। যাহা কার্যরূপে পরিণত হইয়া গিয়াছে, তাহা ব্যাখ্যাত হইতে পারে কার্যাতীত বস্তুর দ্বারা। এখানে আবার সেই একই অসুবিধা আসিয়া পড়িল।

---

১ কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। তৈত্তি. উপ.—২।৭

মুক্ত কে ?—শরীর ? অথবা মনও কি মুক্ত ? ইহা সকলের কাছেই সুস্পষ্ট যে, বিশ্বের অন্যান্য যে-কোন বস্তুর ন্যায় এই দুইটিও নিয়মের অধীন।

এখন সমস্যাটি একটি উভয়-সঙ্কটের আকার ধারণ করিতেছে। হয় বলো, সমগ্র বিশ্ব একটি সদা-পরিবর্তনশীল জড়সমষ্টি ব্যতীত আর কিছুই নহে, ইহা কার্য-কারণের অনিবার্য নিগড়ে চির-আবদ্ধ, ইহার একটি কণিকারও কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাই ; অথচ অচিন্তনীয়রূপে ইহা নিত্যত্ব ও মুক্তির এক অবিচ্ছেদ্য প্রহেলিকা সৃজন করিয়া চলিয়াছে, অথবা বলো—এই বিশ্ব ও আমাদের মধ্যে এমন কিছু রহিয়াছে, যাহা নিত্য এবং মুক্ত। ফলে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, মানুষের মনে নিত্যত্ব ও মুক্তি সম্বন্ধে যে স্বভাবসিদ্ধ মৌলিক বিশ্বাস রহিয়াছে, তাহা প্রহেলিকা নহে। বিজ্ঞানের কর্তব্য হইল উচ্চতর সামান্যীকরণের সাহায্যে জাগতিক ঘটনাগুলির ব্যাখ্যা করা। সুতরাং কোন ব্যাখ্যা-কালে যদি অপরাপর তথ্যের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষার উদ্দেশ্যে ব্যাখ্যার জন্য উপস্থাপিত নূতন তথ্যের কিয়দংশকে নষ্ট করিয়া ফেলা হয়, তবে ঐ ব্যাখ্যা আর যাহা কিছু হউক, বিজ্ঞান নামধেয় হইতে পারে না।

অতএব যে-কোন ব্যাখ্যাতে এই সদা-বিদ্যমান এবং সর্বদা-আবশ্যক মুক্তির ধারণাকে উপেক্ষা করা হয়, তাহা উপরি-উক্ত প্রকারে ভ্রান্ত, অর্থাৎ অপর তথ্যগুলির ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে উহা নূতন তথ্যের একাংশকে অস্বীকার করে ; সুতরাং উহা ভ্রান্ত। অতএব আমাদের প্রকৃতির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া অপর একমাত্র পক্ষটিকে স্বীকার করা চলে, তাহা এই যে, আমাদের মধ্যে এমন কিছু আছে, যাহা মুক্ত এবং নিত্য।

কিন্তু তাহা শরীর নহে, মনও নহে। শরীর প্রতি মুহূর্তে মরিতেছে, মন নিয়ত পরিবর্তনশীল। শরীর একটি যৌগিক পদার্থ, মনও তাই ; অতএব তাহারা কখনও পরিবর্তনশীলতার ঊর্ধ্বে উঠিতে পারে না। কিন্তু এই স্থূল জড়বস্তুর ক্ষণিক আবরণের ঊর্ধ্বে, এমন কি মনের সূক্ষ্মতর আবরণেরও ঊর্ধ্বে, সেই আত্মা বিরাজমান, যাহা মানুষের প্রকৃত সত্তা, যাহা চিরস্থায়ী ও চিরমুক্ত। তাঁহারই মুক্ত স্বভাব মানুষের চিন্তা এবং বস্তুর স্তরের মধ্য দিয়া অনুস্রুত হইতেছে এবং নামরূপের বর্ণলেপ সত্ত্বেও স্বীয় শৃঙ্খলহীন অস্তিত্ব বিঘোষিত করিতেছে। অজ্ঞানের ঘনীভূত স্তরের আবরণ সত্ত্বেও তাঁহারই অমরত্ব, তাঁহারই পরমানন্দ, তাঁহারই শান্তি, তাঁহারই ঐশ্বর্য, উদ্ভাসিত হইয়া স্বীয় অস্তিত্বের সাক্ষ্য দিতেছে। এই ভয়শূন্য, মৃত্যুহীন, মুক্ত আত্মাই প্রকৃত মানুষ।

যখন কোন বহিঃশক্তি কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না, কোনও পরিবর্তন ঘটাইতে পারে না, তখনই স্বাধীনতা বা মুক্তি সম্ভব। মুক্তি শুধু তাহারই পক্ষে সম্ভব, যে সর্বপ্রকার বন্ধনের—সমস্ত নিয়মের এবং কার্য-কারণের নিয়ন্ত্রণের অতীত। অর্থাৎ অন্য প্রকারে বলিতে গেলে বলা যায়, যে অবিকারী সেই শুধু মুক্ত এবং সেইজন্যই অমর হইতে পারে। মুক্ত, অবিকারী ও বন্ধনহীন এই যে জীবাত্মা, এই যে মানবাত্মা, ইহাই মানুষের প্রকৃত স্বরূপ ; ইহার জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই। 'এই মানবাত্মা অজর, অমর, শাশ্বত ও সনাতন।'

[The New York Morning Advertiser পত্রিকায় এ-বিষয়ে যে আলোচনা হয়, তাহাতে যোগ দিয়া স্বামীজী এই প্রবন্ধ লিখেন।]

কথাপ্রসঙ্গে

অগ্নিপরীক্ষা

পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ আমাদের জননী ও জন্মভূমি। প্রত্যক্ষ দেবতা এই দেশ-জননীকে লক্ষ্য করিয়াই ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে স্বামীজী বলিয়াছিলেন : অন্যান্য দেবতা ভুলিলেও ক্ষতি নাই, আগামী পঞ্চাশ বৎসর এই জননী জন্মভূমিই তোমাদের একমাত্র আরাধ্য দেবতা হউন। স্বামীজীর এই অমোঘবাণী ভারতের মুক্তি-আন্দোলনে প্রভূত শক্তি সঞ্চার করিয়াছে এবং সত্যই পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে ভারতবাসী দীর্ঘ দিনের জড়তা হইতে জাগিয়া উঠিয়া পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙিয়া ফেলিয়াছে।

স্বাধীন জাতিগুলির মধ্যে ভারতের আসন আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। শান্তিপ্রিয় ভারত বিশ্বে শান্তি-প্রতিষ্ঠায় সর্বদা চেষ্টাশীল ও অগ্রণী! ইতিহাসের নিষ্ঠুর পরিহাসে সেই ভারতকে আজ অবাঞ্ছিত যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হইয়াছে। ভারতবাসীর আজ অগ্নিপরীক্ষা!

স্বাধীনতা রক্ষা করিতে হইলে সর্বদা সজাগ থাকিতে হইবে। ভিতরে বাহিরে—কোন দিক হইতে যেন এই রক্ষাব্যূহে ভাঙন না ধরে, তাহাই দেখিতে হইবে। ব্যক্তিগত বীরত্ব সত্ত্বেও আভ্যন্তরীণ অনৈক্য ও দুর্বলতার জন্য ভারতকে বারংবার বৈদেশিক আক্রমণকারীর নিকট নতি স্বীকার করিতে হইয়াছে। ইতিহাসের সেই শিক্ষা আমরা যেন ভুলিয়া না যাই।

সহস্র বৎসরের পরাধীন অবনত এই জাতিকে তুলিবার জন্য সুপ্ত দেশবাসীকে শুনাইয়া স্বামীজী বজ্রনির্ঘোষে বলিয়াছিলেন : ভারতমাতা অন্ততঃ সহস্র যুবক বলি চান, বলি—মনে রেখ—মানুষ বলি, পশু নয়। স্বামীজী চাহিয়াছিলেন, অন্ততঃ সহস্র যুবক এই পতিত নিদ্রিত জাতির সেবায় আত্মোৎসর্গ করিবে! লোকের করতালির সম্মুখে বা সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়া নয়, নীরবে লোক-চক্ষুর অন্তরালে ভারতমাতার অর্থাৎ ভারতবাসীর সেবায় তিলে তিলে জীবন বিসর্জন দিবে, তাহারই বিনিময়ে জাগিয়া উঠিবে এক নূতন ভারতবর্ষ—সর্বক্ষেত্রে অজেয় অপরাজেয়।

পরাধীনতার দুর্বহ ভার দূরীভূত হইবার পর ভারত ধীরে ধীরে বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্ররূপে গড়িয়া উঠিতেছে—সমাজতন্ত্রই তাহার উদ্দেশ্য। সমাজের রূপান্তর ঘটিবে, রক্ত-পিচ্ছল বিপ্লবের পথে নয়, শান্ত স্বাভাবিক ক্রমবিকাশের পথে—ইহাই ভারতের শাশ্বত নীতি। কিন্তু সকলের তো আর এই নীতি বা এই আদর্শ নয়। কেহ বা দেখিয়া শেখে, কেহ ঠেকিয়া শেখে! বহু বিবর্তন ও পরিবর্তনের সাক্ষী ভারত স্বল্পতম বাধার পথকেই কল্যাণের পথ বলিয়া বাছিয়া লইয়াছে, সেই পথেই তাহার যাত্রা পতন-অভ্যুদয়ে তরঙ্গায়িত হইয়া আগাইয়া চলিয়াছে! বহু জাতির উত্থান-পতন সে দেখিয়াছে, বহু জাতির সদম্ভ প্রতি-দ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন তাহাকে হইতে হইয়াছে। প্রতিবারই সে আপাত-পরাজয়কে বিজয়-গরিমায় মণ্ডিত করিয়াছে।

এই ঐতিহাসিক চেতনাকে আশ্রয় করিয়াই আমাদিগকে বর্তমান পরিস্থিতির সম্মুখীন হইতে হইবে। ভারতের সহনশীলতা বা উদারতাকে অনেকেই দুর্বলতা বলিয়া মনে করে; তাই আমাদের আজ প্রয়োজন—উপযুক্ত

স্থানে কালে শক্তি-প্রদর্শন। সাপ যদি বা না কামড়ায়, আত্মরক্ষার জন্য তাহাকে অবশ্যই ফোঁস করিতে হইবে। তবেই কেহ তাহাকে নির্যাতিত পদদলিত করিতে সাহস করিবে না।

চীন ভারতের চিরদিনের প্রতিবেশী, অবশ্য উভয়ের মাঝে পৃথিবীর উচ্চতম পর্বতমালা প্রাচীরের মতো বিরাজিত। সৈন্যবাহিনীর পক্ষে তাহা দুর্গম, কিন্তু সত্যান্বেষীর নিকট এই দুর্লঙ্ঘ্য বাধা চিরদিন নতি স্বীকার করিয়াছে। চীনের কত সাধক সত্যের অন্বেষণে ভারতে আসিয়াছেন। ভারত হইতে কত সন্ন্যাসী কত ধর্মপ্রচারক ভিক্ষু নূতনতর মানুষের দুর্বার আকর্ষণে তুষারশ্রেণী লঙ্ঘন করিয়া তিব্বতে চীনে ও জাপানে গিয়াছেন—বুদ্ধের বাণী, ভারতের সাধনা, বেদান্তের আত্মতত্ত্ব প্রচার করিতে, সকলের সহিত অমৃতত্ব ভাগ করিয়া ভোগ করিতে। আজ সে-আদর্শ অনাদৃত।

কিন্তু আজ এই বিজ্ঞানের যুগে যখন পৃথিবীর অন্যতম আশ্চর্য বস্তু চীনের প্রাচীর তাহার প্রয়োজনীয়তা হারাইয়াছে, যখন হিমালয়ের উচ্চতম শিখরে দেশবিদেশের পতাকা উত্তোলনের প্রতিযোগিতা হইতেছে, তখন আর কত দিন হিমালয় অলঙ্ঘনীয় প্রাচীররূপে ভারতের উত্তর সীমান্ত রক্ষা করিবে? আমাদের সেই একচক্ষু হরিণের মতো হইলে চলিবে না। যে দিক হইতে সে বিপদের আশঙ্কা করে নাই, সেই দিক হইতেই শিকারীর তীর তাহাকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল।

তাছাড়া মনে রাখিতে হইবে, পর্বতের মধ্য দিয়া, নদীর উপত্যকা দিয়াই আবহমান কাল *'শকহূনদল পাঠান-মোগল'* এই দেশে *আসিয়াছে, দ্রাবিড়-চীন* এই ভারতের অঙ্গে তাহাদের শোণিত-ধারা মিশাইয়াছে; ভারতের জনসংঘে তাহারা লীন হইয়া গিয়াছে! ভারতের মহামানবতা তাহাদের স্বীকার করিতে হইয়াছে।

কিন্তু বর্তমানের এই আক্রমণ পূর্ব পূর্ব অভিযানের মতো নয়—এমনকি চেঙ্গিস-তৈমুরের মতও নয়! বিংশশতাব্দীর চীন-মানসে আর বুদ্ধ, কংফুছে বা লাওৎসেকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না! তাহার স্থানে এখন যাহা রহিয়াছে, তাহা উৎকট পাশ্চাত্য শিক্ষা-সভ্যতার গরহজম! সংযত শিক্ষা ও নীরব আত্মীকরণ সত্ত্বেও পাশ্চাত্যের অনুকরণের জন্য জাপানকে অনেক মূল্য দিতে হইয়াছে। চীন আজ আরও ব্যাপকভাবে পাশ্চাত্যের জড়বাদী জীবনাদর্শের তরঙ্গাভিঘাতে ভাসিয়া চলিয়াছে। তাহার পায়ের নীচে আজ মাটি নাই! সে আজ উন্মার্গগামী—আদর্শভ্রষ্ট!

* * *

বর্তমান সংঘাতকে শুধু সীমান্ত-যুদ্ধ বা চীনের সাম্রাজ্যলিপ্সা বলিয়া মনে করিলে ঠিক হইবে না। ইহার পিছনে রহিয়াছে জড়বাদী সাম্যবাদের বিশ্বজিগীষার দৃপ্ত পদক্ষেপ। সাম্যবাদ ভাল কি মন্দ—সে-প্রশ্নের বিচার এখানে হইতেছে না, কিন্তু জড়বাদী জীবনাদর্শ যে মানুষকে শেষ পর্যন্ত অমানুষে পরিণত করে, ইতিহাসে তাহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। এই জড়বাদ কল্যাণের মুখোস পরিয়া মানুষকে ও সমাজকে অকল্যাণের কর্দমে টানিয়া ফেলে, সেখান হইতে সাধারণ মানুষকে টানিয়া তুলিতে আবার বহু যুগের বহু সাধনার প্রয়োজন। এই পরিপ্রেক্ষিতেই আমাদিগকে বর্তমান পরিস্থিতির সম্মুখীন হইতে হইবে। এই সীমান্ত আক্রমণে শুধু যে ভারতের গণতন্ত্র আক্রান্ত হইয়াছে তাহা নয়, ভারতের জীবনাদর্শও বিপন্ন। আজ

সহসা সীমান্ত-যুদ্ধ থামিয়া যাইতে পারে, কিন্তু জড়বাদের যে ক্ষয়বীজ আমাদের সমাজে, আমাদের যুবকদের মনে প্রবেশ করিতেছে, তাহা যদি উপযুক্ত শিক্ষা-দীক্ষা সহায়ে রোধ করা না যায়, তবে আজ না হয় কাল মহাব্যাধির বীজাণুর মতো ঐ ভাব আমাদের দেশের জলবায়ুতে ছড়াইয়া পড়িবে ; তখন আর সীমান্ত-রক্ষার প্রশ্নই থাকিবে না।

বিংশশতাব্দীর যান্ত্রিক যুদ্ধে একদল সৈন্য যুদ্ধ করে প্রথম সারিতে, দ্বিতীয় সারিতে বৃহত্তর একদল প্রস্তুত থাকে, তাহারও পিছনে একদল রসদ সংগ্রহ করে, আর বৃহত্তম দলকে নাগরিক জীবন নিয়ন্ত্রিত করিতে হয়। বর্তমানের এই স্নায়ু-যুদ্ধে প্রতিরোধ শুধু বাহিরে নয়, ভিতরেও প্রতিরোধ-বাহিনী গড়িয়া তুলিতে হইবে। আজ সব দিক্ দিয়া ভারতের অগ্নি-পরীক্ষা। সামরিক প্রস্তুতির সঙ্গে সঙ্গে মানসিক শক্তি বাড়াইতে হইবে ; তবে নিশ্চয় আমরা এই অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিব।

ভারত যাহাকে এতদিন তাহার বন্ধু মনে করিয়াছিল, যে সত্যই দুই সহস্র বৎসর ধরিয়া তাহার বন্ধুই ছিল, সে আজ সহসা তাহার প্রাচীন ঐতিহ্য অস্বীকার করিয়া জড়বাদী জীবনাদর্শের বিষক্রিয়ায় শত্রুতে পরিণত হইয়াছে, সীমান্ত-যুদ্ধের নামে ভারতের স্বাধীনতা, ভারতের কৃষ্টি, ভারতের সবকিছু নষ্ট করিতে উদ্যত। আমাদেরও দীর্ঘ দিনের সংগ্রামের জন্য সর্বতোভাবে প্রস্তুত হইতে হইবে।

এখন আর কাহারও ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখাইয়া সমালোচনা করিবার সময় নয়, মনে করিতে হইবে, দোষ কাহারও নয়, দোষ আমারই, আমাদের সকলেরই। কেন আমরা সংহত নই, কেন জাতীয় স্বার্থে সচেতন নই ? সেই দোষ দূর করিবার জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা করিতে হইবে।

ভারত কি কি কারণে পূর্বে স্বাধীনতা হারাইয়াছে, চোখের সামনে সেগুলি রাখিয়া পরিহার করিতে হইবে। আঞ্চলিক ভাবে প্রচণ্ড বীরত্ব সত্ত্বেও প্রস্তুতির অভাব ও নিজেদের মধ্যে অনৈক্যের জন্যই ভারত বারংবার বিদেশীর পদানত হইয়াছে। আজ আর যেন আমরা সে ভুল না করি। আর একটি ভাব সাধারণের মানুষের মনকে দুর্বল করে, তাহা অদৃষ্টবাদ বা ভবিতব্যে বিশ্বাস। কোথায় কে কি বলিয়াছে, তাহা শুনিয়া হাল ছাড়িয়া দেওয়া মানুষের লক্ষণ নয়। মানুষ শেষ পর্যন্ত সংগ্রাম করে। সংগ্রাম করিতে করিতে আদর্শের জন্য যাঁহারা জীবন বিসর্জন দেন, তাঁহারাই ইতিহাসে মানুষ বলিয়া পরিচিত। আজ আমাদের সেই মানুষ হইতে হইবে, মানুষ হইলেই প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িবে—কর্তব্যপরায়ণতা, আজ্ঞাবহতা বাড়িবে, মানুষ হইলেই ত্যাগ ও সেবার আদর্শ লইয়া শত শত লোক অগ্রসর হইবে। একদল বীর নিহত হইবে, অন্য দল তাহাদের রক্তাক্ত হস্ত হইতে পতাকার ভার লইবে—এই দৃশ্য-কল্পনায় স্বামীজীর 'বীরবাণী' ঝঙ্কৃত হইয়াছে :

ঐ পড়ে বীর ধ্বজাধারী
অন্য বীর তারি ধ্বজা লয়ে আগে চলে।

সর্বোপরি দুর্জয় আশাই আমাদের শক্তি ও সাহস দিবে। শুধু আশা নয়, আমাদের জাতির ভবিষ্যতের প্রতি অটুট বিশ্বাস চাই। সেই মহৎ বিশ্বাসের কথাই স্বামীজী কতভাবে কত বার বলিয়াছেন : আমার দেশমাতৃকা রানীর মতো পদবিক্ষেপে পশুমানবকে দেবমানবে রূপান্তরিত করিবার জন্য মহিমময় ভবিষ্যতের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন, স্বর্গ বা মর্ত্যের কোন শক্তির সাধ্য নাই—এ জয়যাত্রার গতিরোধ করিতে পারে।

গীতার সাংখ্যযোগে আত্মতত্ত্ব

শ্রীমতী জাহ্নবী দেবী

অর্জুনকে যুদ্ধে নামাইবার জন্য ভগবান এই অধ্যাত্মবাদের অবতারণা কেন করিলেন, অনেকে ইহা বুঝিতে পারেন না এবং মনে করেন, ইহা অসঙ্গত হইয়াছে। এইরূপ ধারণা অপনোদনের চেষ্টায় এবং ভগবানের কথাগুলি যুক্তির ক্রমানুসারে বিন্যস্ত করিয়া এই লেখাটি রচিত হইয়াছে।

সংক্ষেপে ভগবানের বক্তব্য এই: যাহা দুঃখ করিবার ব্যাপার নহে, তাহা লইয়া এ-সময়ে দুঃখ করিতেছ, অথচ মুখে জ্ঞানীর মতো কথা বলিতেছ। যুদ্ধে কে বাঁচিবে, কে মরিবে? যে বাঁচিবে সে কি করিবে? যে মরিবে তাহার কি গতি হইবে? তাহার বিধবার ও শিশুপুত্র-দিগের কি দশা হইবে?—পণ্ডিতেরা এ-সব দুঃখসূচক আলোচনা করেন না।

আমাদের এই জন্ম প্রথম বা শেষ জন্ম নয়। ইহা অভিনয়ের মতো; অভিনয় করিতে নানা বেশে, নানা সম্বন্ধে আমাদের বার বার মঞ্চে আসিতে হয়। তোমার ভিতরকার যে আসল 'তুমি', সে অর্জুন নয়, সে এই জন্মে অর্জুনের পোশাক পরিয়া আসিয়াছে। পূর্বজন্মে সে অন্য পোশাকে ছিল, পরজন্মে সে অন্য পোশাকে আসিবে। বস্তুতঃ দেহমধ্যস্থ দেহী কখনও কাহারও সহিত কোন সম্পর্কে আবদ্ধ নয়। যখন প্রকৃত অবস্থা এইরূপ, তখন স্বজন-প্রীতির মোহ যেন কাহাকেও মুহ্যমান না করে।

দেহ চিরকাল এক রকম থাকে না। কাল আমি বালক ছিলাম, আজ আমি যুবক হইলাম কেন?—ইহা লইয়া কেহ শোক করে না। কৌমারের পরে যৌবন, যৌবনের পরে জরা অপরিহার্যভাবে আসিবেই। অপরিহার্য মৃত্যুও সেইরূপ একদিন আসিবেই। মৃত্যু স্বাভাবিক ব্যাপার। যুদ্ধে মৃত্যু, ধীর ব্যক্তিকে কাতর করিবার মতো এমন কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়।

শীতগ্রীষ্ম-বোধ বা সুখদুঃখ-বোধ বা জরা-মরণের যন্ত্রণা-বোধ অনন্তকালের নয়। এই বোধে দুঃখ-যন্ত্রণা - যাহা অপরিহার্য, তাহা সহ্য করিতেই হইবে।

পরিবর্তনশীল বিনশ্বর দেহ লইয়াই তোমার যত চিন্তা; পরিবর্তনশীল যাহা, তাহাকে অসৎ বলে, কারণ তাহা কখন চিরস্থায়ী হয় না। আর যাহা অপরিবর্তনশীল, তাহাকে 'সৎ' বলে। যেমন 'দেহী'—আমাদের ভিতরের যাহা আসল 'আমি'। তত্ত্ববিদেরা এইসব কথা চূড়ান্তভাবে বুঝিয়াছেন।

তাঁহারা জানিয়াছেন: দেহী অবিনাশী, দেহ বিনাশশীল। দেহী জন্মায় না, মরে না; ইহা অজ, নিত্য, ইহার ক্ষয়বৃদ্ধি নাই। দেহ জন্মায়, মরে; ইহা ক্ষয়বৃদ্ধিশীল। দেহী মরে না, মারেও না; দেহ মরে। দেহী দেহকে জীর্ণবস্ত্রের মতো ফেলিয়া চলিয়া যায়। দেহ শত চেষ্টাতেও সমর্থ হয় না দেহীকে ডাকিয়া আনিয়া সেই ত্যক্ত বস্ত্র আবার পরিধান করাইতে। দেহী অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য, নিত্য, সর্বগত, স্থাণু ও সনাতন; দেহ কিন্তু তার বিপরীত। দেহী অব্যক্ত, অচিন্ত্য, অবিভাজ্য এবং অতি আশ্চর্য; কারণ পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা তাহার নাগাল পাই না। দেহ কিন্তু সেরূপ নয়, পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা তাহার অনেক কিছু জানিতে পারি।

যখন চিরকাল এইরূপ হইয়া আসিয়াছে এবং চিরকাল এইরূপ হইবে, তখন ইহাতে শোক করিবার কি আছে? শোকের দ্বারা ইহা অন্যরূপ হইবে না।

দেহী একদিন দেহকে জীর্ণ বস্ত্রের মতো ছাড়িয়া যাইবেই। অতি-স্নেহের আত্মীয়ের দেহেই হউক বা নিজের দেহেই হউক, দেহীকে জোর করিয়া বা কাঁদিয়া-কাটিয়া ধরিয়া রাখা যাইবে না। এই সত্যের যখন ঠিক ঠিক উপলব্ধি হইবে, তখন যন্ত্রণা ও মৃত্যুর ভীতি থাকিবে না।

এই জ্ঞান যাঁহারা আয়ত্ত করিতে চাহেন, তাঁহারা সাংখ্যযোগী বা জ্ঞানযোগী; 'সাংখ্য' শব্দের অর্থ জ্ঞান। সাংখ্য-জ্ঞানের মুখ্য অর্থ—সদসদ্-বিবেক; গৌণ অর্থ—জ্ঞানের জন্য কর্ম ত্যাগ করা; যেমন—তুমি অর্জুন করিতে চাহিতেছ।

জ্ঞানে স্থিত থাকিয়া কর্মসন্ন্যাস করার অর্থ এই যে, সেই সব কর্ম না করা, যাহাতে বন্ধন হয়। কিন্তু যে-কর্ম বন্ধন আনে না, বা যে-কর্ম বুদ্ধিযোগে করা যাইতে পারে, যাহাতে বন্ধন হইবে না, সেই কর্ম করিতে সাংখ্য-মতে কোন দোষ নাই। সেই কর্ম করাই উচিত।

ধর্মযুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের করাই উচিত, না করিলে মহাপাপ। তাহা ছাড়া তুমি এখন যদি যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ কর, লোকে তোমাকে কাপুরুষ বলিবে। তাহারা বলিবে, তুমি তোমার বিপক্ষে অবস্থিত মহারথিগণকে এবং বিপুল সৈন্য সমাবেশ দেখিয়া ভয় পাইয়া পলাইয়া যাইতেছ। তোমার পূর্বেকার সমস্ত যশ নষ্ট হইয়া যাইবে। তুমি ক্ষত্রিয়, তোমার জন্য:

হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং
জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ॥

অধ্যাত্ম-বিদ্যা শুধু আত্মজ্ঞান নহে; ইহা মানুষকে শেখায়—কিভাবে জীবনযাপন করা উচিত। নিষ্কামভাবে স্বধর্ম-পালন এই বিদ্যার একটি বড় কথা, এই অধ্যাত্মবিদ্যা-লাভের প্রধান প্রধান উপায় সাংখ্যযোগ—কর্ম ও জ্ঞান সহ ভক্তিযোগ; আর সকল যোগের শ্রেষ্ঠ—গুণাতীত হওয়া ও সমত্বদৃষ্টি লাভ করা। যত্নশীল হইয়া সেই দৃষ্টি লাভ করিয়া সুখদুঃখ লাভক্ষতি জয়পরাজয় সমজ্ঞান করিয়া ঈশ্বর স্মরণ করিয়া যুদ্ধ কর, কর্তব্য কর্ম করিয়া যাও—কোন পাপ হইবে না।

ইহাই সেই সাংখ্য-বিচার। পার্থ, ইহা ধারণা হইলে তোমার স্বজন-প্রীতির মোহ ও স্বধর্ম-ত্যাগের ইচ্ছা তোমাকে প্রভাবিত করিতে পারিবে না। তুমি পাপভয়েও কাতর হইয়াছ; তাই তোমাকে বিচারের কথাতেই বলিযাছি যে, যদি মনে রাগ-দ্বেষ না রাখিয়া সমত্বজ্ঞান-সম্পন্ন হইযা কাজ কর, তাহা হইলে 'নৈবং পাপমবাপ্স্যসি'। যদি তুমি নিষ্কাম নির্লিপ্তভাবে কর্তৃত্বাভিমান-বর্জিত হইয়া ভগবানকে সমস্ত কর্ম সমর্পণ করিয়া, তাঁহাকে মনে রাখিয়া কাজ করিয়া যাও, তাহা হইলে স্বধর্ম পালনে তো কথাই নাই, কোন কর্ম তোমাকে বন্ধনে ফেলিবে না। এই ভাবে কাজ করাকে 'বুদ্ধিযোগে কাজ করা' বলে। এই বুদ্ধিযোগ স্থিতপ্রজ্ঞভাব আনে, আর কর্মকে কর্মযোগে উন্নীত করে।

স্ত্রীশিক্ষা-প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীতামসরঞ্জন রায়

ভারতের কল্যাণ স্ত্রীজাতির অভ্যুদয় না হ'লে সম্ভব হবে না। একপক্ষে পক্ষীর উর্দ্ধ্ব আকাশে উত্থান সম্ভবপর নয়। সেই জন্য রামকৃষ্ণাবতারে স্ত্রীগুরু-গ্রহণ, সেই জন্য নারীভাব-সাধন, মাতৃভাব-প্রচার।

—স্বামী বিবেকানন্দ

* * *

ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর বহুবিস্তৃত শিক্ষা-ক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দের অভিনব চিন্তাধারা অজস্র ধারায় প্রবাহিত হয়েছিল। তার সুস্পষ্ট স্বাক্ষর আজ আমাদের জাতীয় জীবনের সম্পদ্‌রূপে গৃহীত।

স্ত্রীশিক্ষার জটিল সমস্যাদি সম্পর্কে তাঁর যে সুচিন্তিত অভিমত ছিল, যে বিশ্লেষণ ও নির্দেশ ছিল, বর্তমান প্রবন্ধে তারই অবতারণা করা হয়েছে।

স্বামীজীর আবির্ভাব-কালে সমগ্র ভারতবর্ষে স্ত্রীশিক্ষা এবং জনশিক্ষার অধোগতি একটি মর্মান্তিক পর্যায়ে পৌঁছেছিল, এক জটিল সমস্যার সৃষ্টি করেছিল।

সে শোচনীয় পরিণতির পরিপ্রেক্ষিতে স্বামীজীর সংবেদনশীল মনে স্বতই এ-প্রশ্নটি উত্থিত হয়েছিল :

যে-দেশে একদিন গার্গী, মৈত্রেয়ী, বাক্‌, খনা, লীলাবতী প্রভৃতির ন্যায় মনস্বিনী মহিলা জন্মগ্রহণ করেছিলেন, আত্মায় স্ত্রীপুরুষ-ভেদ নেই—এই যে-দেশের ঋষিকুল ধ্যানসহায়ে উপলব্ধি করেছিলেন সভ্যতার প্রত্যূষলগ্নে, সে-দেশের উত্তরযুগের শিক্ষাব্যবস্থায় স্ত্রীজাতির প্রতি নির্মম ঔদাসীন্য ও তাচ্ছিল্য অনেকটা যেন প্রহেলিকার মতোই প্রতীত হয়েছিল স্বামীজীর কাছে।

সুতরাং স্ত্রীশিক্ষায় গুরুত্ব এবং তার বিবিধ সমস্যা-সম্পর্কে মাত্র মৌখিক অভিমত প্রকাশ করেই তিনি ক্ষান্ত হ'তে পারেননি, তাঁর প্রকৃতিতে সেটা সম্ভবও ছিল না, পরন্তু ভগিনী নিবেদিতার মাধ্যমে নিজ জীব-দ্দশাতেই স্ত্রীশিক্ষার এক মহাযজ্ঞের তিনি সূত্রপাত করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ-মিশন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার প্রায় সমসাময়িক কালেই শ্রীরামকৃষ্ণ-বালিকা-বিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কলিকাতার উত্তরাংশে নারী-শিরোমণি দেবী সারদামণিকে কেন্দ্রে নিয়ে, তাঁর প্রসারিত কল্যাণ-হস্তের শুভস্পর্শ ও আশীর্বাদ গ্রহণ ক'রে।

একদা প্রাচীন ভারতবর্ষে তার ধর্মাচরণে সমাজ- ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় নারীর প্রভূত সম্মান স্বীকৃত ছিল। মাতৃরূপে ভগবানের উপলব্ধি, বহু বিচিত্র নারীবিগ্রহে মহাশক্তির উপাসনা ভারতের ধর্মসাধনায় এক বৈশিষ্ট্য ও অভিনবত্ব সঞ্চারিত করেছিল। সে গৌরবময় কাহিনীর স্বাক্ষর রয়েছে ভারতবর্ষের ইতিহাসের পৃষ্ঠায়।

সেমিটিক ও আর্যগোষ্ঠীর আচারানুষ্ঠানের তুলনামূলক আলোচনা-প্রসঙ্গে স্বামীজী বলেছিলেন সেমিটিক গোষ্ঠীর ধর্ম ও সমাজ-ব্যবস্থায় নারীকে একেবারে অপাঙ্‌ক্তেয় ক'রে রাখা হয়েছিল। সে মানব-গোষ্ঠীর ধর্মানু-ষ্ঠানাদির ব্যাপারে নারীর কোন অধিকারই

স্বীকৃত ছিল না, সেখানে তার প্রবেশই যেন বহুলাংশে নিষিদ্ধ ছিল।

কিন্তু আর্যগোষ্ঠীর অনুশাসন সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। সেখানে সস্ত্রীক ধর্মাচরণই বিধি ছিল, শাস্ত্রানুমোদিত বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা ছিল। যাগে যজ্ঞে, ক্রিয়াকর্মে সহধর্মিণীর প্রয়োজন ছিল অপরিহার্য। তার কারণ সে-যুগে আর্যসমাজে চতুরাশ্রম-প্রথা প্রচলিত ছিল। পুত্রলাভের প্রয়োজনটি ঘোষণা করা হ'ত ব্যাপকভাবে, কখন কখন অতি বিকৃত ভাবেও বটে। কাজেই স্ত্রীকে সর্বাবস্থায় স্বামীর সহগামিনী হ'তে হ'ত। যজ্ঞকালে তাকে পার্শ্বে থাকতে হ'ত সহায়িকারূপে, ধর্মাচরণে অনুগামিনী হ'তে হ'ত সহধর্মিণীর অধিকার নিয়ে। আবার তীর্থযাত্রায় বা বনবাসের পথেও তিনি প্রায়শঃ সহযাত্রী হতেন, সুখদুঃখের সম-অংশভাগিনীরূপে।

তাই শ্রীরামচন্দ্রের অরণ্যযাত্রায় সীতা তাঁর সঙ্গে গিয়েছেন। পাণ্ডবদের বনগমনে দ্রৌপদীকে পঞ্চস্বামীর পশ্চাদ্বর্তিনী দেখা যায়। আবার সীতার একক নির্বাসনকালে অশ্বমেধ-যজ্ঞে ব্রতী হয়ে শ্রীরামচন্দ্রকে যে স্বর্ণসীতা প্রস্তুত ক'রে নিতে হয়েছিল, সেটিও নিঃসংশয়ে নারী-মর্যাদার এক বিচিত্র নিদর্শন।

অবশ্য পৌরাণিক যুগের শেষ পর্যায়ে এ-ব্যবস্থার প্রভূত পরিবর্তন ঘটেছিল। তখন বৈদিক ক্রিয়াকর্মাদিতে বিবাহিতা পত্নীর প্রয়োজন আবশ্যিক থাকলেও নানা কৌশলে গৃহদেবতা, শালগ্রামশিলা প্রভৃতির পূজাধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত করা হয়েছিল। কিন্তু তথাপি ভারতীয় সমাজে নারীর মর্যাদা তখনও বহুলাংশে অব্যাহত ছিল।

সর্বোপরি ভারতীয় জীবনদর্শনে এবং ভারতের সমাজ-পরিকল্পনায় নারীর মাতৃরূপটিই সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকার লাভ করেছিল প্রাচীন যুগে।

আরও একটি বিষয় ছিল। সে স্বর্ণময় যুগে নারীর নিজস্ব জ্ঞানোৎকর্ষের মহিমাও উপেক্ষণীয় ছিল না। সে-কালে ভারতবর্ষের উর্বরভূমিতে নানা পর্যায়ে বহু বিদুষী ও তপস্বিনী নারীর উদ্ভব হয়েছিল ব'লে সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

জনক রাজার মহতী সভায় বিদুষী গার্গী মহাপ্রাজ্ঞ ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যকে নিগূঢ় শাস্ত্রবিচারে আহ্বান করেছিলেন।

যাজ্ঞবল্ক্যের অন্যতমা পত্নী দেবী মৈত্রেয়ী সার্থক-সাধিকা ছিলেন, যথার্থ-তত্ত্বজিজ্ঞাসু ছিলেন।

দুর্জ্ঞেয় ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করবার অপরিমেয় শক্তি তপস্যা-সহায়ে তিনি লাভ করেছিলেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে তার বিচিত্র কাহিনী অক্ষয় অক্ষরে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

উত্তর-মহাকাব্যের যুগেও এমন একাধিক মহীয়সী মহিলার দর্শন পাওয়া যায়—যাঁদের ধর্মবুদ্ধি, কর্তব্যজ্ঞান ও চরিত-মহিমা কালের ভ্রূকুটি অতিক্রম ক'রে একেবারে আমাদের বর্তমান যুগের দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছেছে।

কৌশিক-পতিব্রতা ও ধর্মব্যাধের উপাখ্যানে, সাবিত্রী-সত্যবানের কাহিনীতে নারী-চরিত্রের যে নিদর্শন রয়েছে, নল-দময়ন্তীর উপাখ্যানে, হরিশ্চন্দ্র-শৈব্যার আখ্যায়িকায়ও তার যে গৌরবের পরিচয় আছে, আজ বিংশ শতাব্দীর অতি-আধুনিকতার কালেও তার তুলনা খুব সুলভ নয়। সর্বোপরি সীতা, রামময়-জীবিতা সীতা, চিরদুঃখিনী সীতা, সে অনুপম অতুলনীয় চরিতকাহিনী সমগ্র ভারতীয় নারী-সমাজকে যেন সর্বকালের জন্য

এক অম্লান জ্যোতিতে উদ্ভাসিত ক'রে রেখেছে। সে আদর্শ অনতিক্রম্য, অনন্য, তার আর তুলনা হয় না।

পরবর্তী যুগেও লোপামুদ্রা, বিশ্ববারা, সংঘমিত্রা প্রমুখ যশস্বিনী নারীর উল্লেখ আছে। উল্লেখ আছে তাঁদের অতুল জীবন-মাহাত্ম্যের, নানা লোকহিতকর শুভ কার্যাবলীর এবং তাদেরই মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট হয়ে আছে সে-যুগের নারী-সমাজে শিক্ষা, উৎকর্ষ ও জ্ঞানবত্তার প্রসার কতটা ছিল, তারই পরিচয়।

তথাপি এ-সকল প্রমাণ সত্ত্বেও এ-কথা কিন্তু অনস্বীকার্য যে, সে-যুগের সামগ্রিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় স্ত্রীশিক্ষার স্থান ও প্রাধান্য কিরূপ ছিল, নারী-সমাজের সম্মুখে শিক্ষা-সুযোগ কতটা প্রসারিত ছিল, তার বিস্তারিত বিবরণ সহজলভ্য নয়। ইতিহাসের মুখর ভাষণ এক্ষেত্রে যেন অনেকাংশে স্তব্ধ হয়ে আছে।

কি প্রাক্-বৌদ্ধযুগে, কি উত্তর-বৌদ্ধযুগে কোনকালেই এ-বিষয়ে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় না। এমন কি সেকালে দেশের নানাস্থানে যে-সকল বৃহদায়তন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বা বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল—কি উত্তরভারতে কি দক্ষিণ-ভারতে—তাদেরও কোনটিতে স্ত্রীশিক্ষার কোন বিশেষ এবং ব্যাপক ব্যবস্থা ছিল কিনা, সে-সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা যায় না।

কোন নারী-শিক্ষার্থী বা নারী-অধ্যাপিকার বিবরণ কি তাদের গ্রন্থশালায় রক্ষিত আছে? তাদের ইতিকাহিনী কোথাও কি সবিস্তারে পাওয়া যায়?

সর্বজনবিদিত যে-ইতিহাস—এ-সম্বন্ধে বিশেষ কোন আলোকপাত করতে সে সক্ষম নয়।

সুতরাং স্বভাবতই এ-কথা মনে হয় যে, প্রাচীন স্বর্ণময় যুগের অবসানে নানা অবস্থা-বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নারীর শিক্ষাব্যবস্থাও যেমন সঙ্কুচিত হয়েছিল, তার সম্মানের আসনটিরও তেমনি স্থানচ্যুতি ঘটেছিল।

অমিত শক্তিধর পুরোহিতকুলের আধ্যাত্মিক অবনতির সে কাল।

তখন পৈতৃক অধিকার, পৈতৃক সম্মান ও বংশগত আধিপত্য বজায় রাখবার জন্য নিম্নতর বর্ণের সঙ্গে চরম সংঘর্ষে তারা লিপ্ত হয়েছে। অসহিষ্ণুতা ও ঈর্ষাপরায়ণতার বশবর্তী হয়ে অপর সকলকে শাস্ত্রাধিকার থেকে তারা বঞ্চিত করেছে। অধোগতির সে দুঃখময় দিনে ব্রাহ্মণ-সমাজ কূপমণ্ডূকতা-বশে ব্রাহ্মণেতর বর্ণের নিকট শিক্ষার দ্বার যেমন রুদ্ধ করেছিল, নারীজাতিকেও তেমনি শিক্ষা-সুযোগ থেকে যথাশক্তি বঞ্চিত করেছিল।

স্বামীজী বলেছিলেন: In the period of degradation when the priests made the other castes incompetent to study the Vedas, they deprived the women also of all their rights.

'যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে নন্দন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তে ন পূজ্যন্তে সর্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥'

অথবা

'কন্যাপ্যেবং পালনীয়া, শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।'

মনুস্মৃতির এ-সকল নির্দেশবাণী উক্ত অবাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়া থেকে উদ্ভূত হয়েছে ব'লে মনে করবার সঙ্গত কারণ রয়েছে।...

এর পরই এক দীর্ঘযুগের ব্যবধান, গুপ্ত-সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতবর্ষে এক ঊষর অনাবৃষ্টির কালের বিস্তৃতি। তারই মধ্যে নানা উত্থান-পতনের ঘাত-প্রতিঘাতে ভারতের রাষ্ট্রব্যবস্থায় প্রভূত পরিবর্তন হ'ল। এরই মধ্যে মুসলমান-যুগ এল, চলে গেল; ইংরেজ-শাসনের

যুগও উপস্থিত হ'ল। কালান্তর এসে গেল জাতীয় জীবনের নানাক্ষেত্রে।

শিক্ষাক্ষেত্রেও তার ব্যত্যয় ঘ'টল না। সেখানেও ব্যাপক পরিবর্তন উপস্থিত হ'ল। নিঃসন্দেহে তখন স্ত্রীশিক্ষা একটি বহুলাংশে অপ্রয়োজনীয় এবং উপেক্ষার বিষয় হয়ে দাঁড়াল, এবং অবহেলিত তুচ্ছতার অন্তরালে অবলুপ্তপ্রায় অবস্থা প্রাপ্ত হ'ল। তখনকার রাষ্ট্রব্যবস্থায় নারীজাতির পক্ষে আত্মরক্ষা এবং মর্যাদা-রক্ষাই যেন এক নিদারুণ শঙ্কার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং সে পরিস্থিতিতে ভারতীয় হিন্দুসমাজ তার ধর্মের শুচিতা এবং অন্তঃপুরের পবিত্রতা রক্ষার জন্যই শঙ্কায় ও উৎকণ্ঠায় দিশেহারা হয়ে পড়েছিল।

ফলে বাহিরের বিস্তৃততর ক্ষেত্র পরিহার ক'রে অন্তঃপুরের নিভৃত নিরালার মধ্যেই ভারতীয় নারী তখন নিজ কর্মক্ষেত্র সীমিত করেছিলক—রতে বাধ্য হয়েছিল।

সমগ্র মুসলমান-রাজত্বকালেই ঐ সঙ্কোচনের অবরুদ্ধতা অব্যাহত ছিল। তারপর ইংরেজ-শাসন প্রবর্তিত হ'ল এদেশে। খানিকটা নিঃশঙ্কার পরিবেশও সৃষ্ট হ'ল। কিন্তু ততদিনে কঠিন পর্দাপ্রথার অন্তরালে ভারতীয় নারী একান্তভাবে অন্তঃপুর-চারিকা হয়ে পড়েছে। রক্ষণশীল সমাজপতিদের চক্ষে তার শিক্ষা-প্রয়োজনীয়তা প্রায় অবাঞ্ছিতের পর্যায়ভুক্ত হয়েছে, আখ্যাত হয়েছে সমাজ-কল্যাণের প্রতিকূল ব'লে।

সুতরাং ইংরেজ-আমলের শিক্ষা-সুযোগ উচ্চস্তরের অতি সামান্য অংশেই সীমিত হয়ে গেল। যাঁরা বুদ্ধিজাবী, আভিজাত্যে আনুগত্যে ও কাঞ্চনকৌলিন্যে শাসকগোষ্ঠীর কাছাকাছি যাবার দাবি রাখে, তাদেরই সমাজে ও সংসারে কতকাংশে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন হ'ল। আর অবশিষ্ট বৃহত্তর নারী-সমাজ শিক্ষাহীনতার প্রগাঢ় তমিস্রায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে রইল।

বহু শতাব্দীর পুঞ্জীভূত কুসংস্কার, বিকৃত শিক্ষা বা অশিক্ষার ছিদ্রহীন. কৃষ্ণ আবরণ তাদের যেন আবৃত ক'রে রেখে দিল।

কিন্তু আর একদিকে আর এক প্রক্রিয়ার সূত্রপাত হ'ল সমসাময়িক কালে—প্রায় সমান্তরাল ধারায়। নদীর এক পার ভেঙে অন্যপারে নূতন দেশের আকস্মিক আবির্ভাবের মতো সে প্রক্রিয়া। আমরা ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর যুগলক্ষণের কথা বলতে চাচ্ছি। সমগ্র পৃথিবীর মানব-সভ্যতায় তখন যে মহা-বিবর্তন শুরু হয়েছে, তারই ইঙ্গিত দিতে চাচ্ছি। তখন ধর্মের কেন্দ্রে মানুষ প্রতিষ্ঠা লাভ করতে চলেছে। শাস্ত্র নয়, দেবতা নয়, পুরোহিত নয়,—মানুষ।

শিক্ষার কেন্দ্রে আসন পরিগ্রহ করতে চলেছে শিশু,—পুঁথি নয়, নিয়ম নয়, শিক্ষক বা অন্য কিছু নয়, শিক্ষার্থী শিশু। আবার রাষ্ট্রব্যবস্থায়ও উপেক্ষিত গণদেবতা (the have-nots) আপন অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে যাত্রা করেছে, আর তাকে অবলম্বন ক'রে সকল আভিজাত্য ও কাঞ্চনকৌলিন্যের বিশেষাধিকার চূর্ণ করতে এগিয়ে আসছে এক অভিনব ঐতিহাসিক মতবাদ।

সর্বোপরি শূদ্র-জাগরণ ও নারী-জাগরণ সূচিত হচ্ছে অতি ব্যাপক বিস্তৃতিতে নানা দেশে, নানা মানবগোষ্ঠীর মধ্যে। ঠিক সেই সময়ে বিগত শতাব্দীর প্রান্তভাগে পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের প্রায় সর্বত্র বিক্ষুব্ধ নারী-সমাজও আত্মস্বাতন্ত্র্য-প্রতিষ্ঠার জন্য প্রকাশ্য বিদ্রোহের দুর্গম পথে পা বাড়িয়েছে। তাদের নবজাগ্রত-চেতনায় সমাজব্যবস্থার

প্রতি কঠিন অভিযোগ ধ্বনিত হচ্ছে। পুরুষের সঙ্গে সম অধিকার ও মর্যাদা তারা দাবি করছে—জীবনের ও রাষ্ট্রের সর্বক্ষেত্রে।

ইবৃসেন, বার্নাড-শ প্রমুখ প্রখ্যাত লেখকদের লেখনী তাদের দাবির পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছে।

কিন্তু ভারতবর্ষে? ভারতবর্ষ তখনও নিশ্চিন্ত ঔদাসীন্যে নিশ্চেষ্ট, তার তন্দ্রালসতা তখনও কাটেনি। কর্মোদ্যম বহুদূরে অপেক্ষমাণ, শুধু কচিৎ কোথাও অতি ক্ষীণ কণ্ঠে সবেমাত্র জাগরণের মৃদু প্রভাত-কাকলি শোনা যাচ্ছে—

'না জাগিলে সব ভারত-ললনা,

এ ভারত বুঝি জাগে না, জাগে না।'

আর তারই মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দের কম্বুকণ্ঠ সহসা ধ্বনিত হ'ল বাংলায়, ধ্বনিত হ'ল সমগ্র ভারত-ভূখণ্ডে, এমনকি গোলার্ধের অপর সীমান্ত অবধি। সে গম্ভীর কণ্ঠস্বর শুধু আহ্বান-মন্ত্রের উচ্চারণে সীমাবদ্ধ নয়, তার মধ্যে ক্রম-বিন্যাসে স্ত্রীশিক্ষার নানা সমস্যা-সম্পর্কেও তাঁর সুচিন্তিত মতামত নিহিত।

স্ত্রীশিক্ষার আদর্শ কি হবে, পাঠ্যসূচী কেমন হওয়া বাঞ্ছনীয়, শিক্ষয়িত্রীই বা কিভাবে নির্বাচিত হবেন—এ-সবই সে-সকল মতামতের অঙ্গীভূত। আবার সেই সঙ্গে সঙ্গে সেই মতামতের মধ্যে অপরিসীম কূপমণ্ডূকতার বিরুদ্ধে ধিক্কারও বড় কম ছিল না।

মনে হয়, দীর্ঘনিদ্রার অলসতা থেকে সেই ধিক্কারেই ভারতবর্ষ প্রথম জাগ্রত হয়েছিল, প্রথম সচকিত হয়ে উঠেছিল স্ত্রীশিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা-সম্পর্কে।···

'স্মৃতি-ফৃতি লিখে, নিয়মনীতিতে বদ্ধ ক'রে এদেশের পুরুষগণ মেয়েদের একেবারে উৎপাদন-যন্ত্রবিশেষে পরিণত ক'রে তুলেছে। মহামায়ার সাক্ষাৎ প্রতিমা জীবন্ত বিগ্রহ নারী। তাদের না তুললে দেশের আর কোন উপায় নেই, কোন পথ নেই।···তোদের জাতের যে অধঃপতন ঘটেছে, তার প্রধান কারণ এই সব শক্তি-মূর্তির চরম অবমাননা।'

'নারীকে সম্মান প্রদর্শন করেই জগতের অন্যান্য জাতিরা মহত্ত্ব অর্জন করেছে। যারা তা করেনি, তাদের অধোগতি কেউ রোধ করতে পারবে না।'

'দক্ষিণদেশে দেখেছি, উচ্চ জাতির নীচের উপর কী অত্যাচার! মন্দিরে মন্দিরে দেবদাসীদের নাচের কী ধূম! যে ধর্ম গরীবের দুঃখ দূর করে না, মানুষকে দেবতা করে না, তা কি আবার ধর্ম?'

'কালঃ সুপ্তেষু জাগর্তি কালো হি দুরতিক্রমঃ।'

'তিনি জাগছেন, তাঁর চক্ষে কে ধুলো দেয় বাবা! অথচ আমেরিকার উদাহরণ দেখ। সেখানে নারীর মর্যাদা কোন প্রকারে পুরুষের চাইতে ন্যূন নয়, হীনতর নয়। সেখানে পুরুষ ও নারী সমশিক্ষায় ও সম-মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। পরিপূর্ণ স্বাধীনতায় পুরুষ ও নারী পাশাপাশি একযোগে পা ফেলে এগিয়ে চলেছে।'

'সে-দেশের মেয়ের মতো মেয়ে জগতে নেই। কি পবিত্র, কি স্বাধীন স্বাপেক্ষ, আর দয়াবতী—মেয়েরাই সে-দেশে সব। বিদ্যা-বুদ্ধি সব তাদের ভিতর।'

'এদেশের বরফ যেমন সাদা, তেমনি হাজার হাজার মেয়ে আছে, যাদের মনও তেমনি পবিত্র, তেমনি সাদা···এদেশে কত সুন্দর পারিবারিক জীবন আমি দেখেছি, কত শত মা দেখেছি—যাদের নির্মল চরিত্রের নিঃস্বার্থ অপত্য-স্নেহের বর্ণনা কোন ভাষার মাধ্যমে করা সম্ভব নয়।···

কত শত কন্যা ও কুমারী দেখেছি, যারা 'ডায়না'দেবীর ললাটের তুষার-কণিকার মতো নির্মল আবার বিলক্ষণ শিক্ষিতা এবং সর্বপ্রকার মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিসম্পন্না।

আর আমাদের দেশে···?

···আমরা মহাপাপী, স্ত্রীলোককে ঘৃণ্যকীট, নরকমার্গ ইত্যাদি ব'লে ব'লে অধোগতি হয়েছে।..'

শ্রুতি বলেছেন: ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী ইত্যাদি।

আর আমরা বলছি, 'কেনৈষা নির্মিতা নারী!' 'শক্তি' শব্দের অর্থ জানো?··· 'শাক্ত' মানে মদ-ভাঙ নয়, 'শাক্ত' মানে যিনি ঈশ্বরকে সমস্ত জগতে বিরাজিত মহাশক্তি ব'লে জানেন এবং সমগ্র স্ত্রীজাতিকে সেই মহাশক্তির বিকাশস্বরূপ দেখেন।···এরা তাই দেখে; তাই এরা সুখী, বিদ্বান্ স্বাধীন ও উদ্যোগী।

আর ভারতবর্ষে? বঙ্গদেশে···এখানে আমরা স্ত্রীলোককে নীচ অধম মহাহেয় আখ্যায় অভিহিত করেছি। হীন পরমুখাপেক্ষিতা ও অসহায়তার মধ্যে জীবনযাপন করবার শিক্ষা দিয়েছি যুগ যুগ ধরে।

আর তার ফলে আমরা পশুত্বের পর্যায়ে নেমেছি। দাসত্ব, উদ্যমহীনতা ও দারিদ্র্যের চরম দুর্দশার মধ্যে জগতের অশেষ করুণার পাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছি।···' এমনি ধরনের অজস্র উক্তি এই কালে স্বামীজীর কণ্ঠ থেকে নির্গত হয়েছিল আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের মতো।

অথচ এ-কথাও সত্য যে, চিরদিনই ভারতবর্ষে নারী-সমাজের এমন অবর্ণনীয় দুরবস্থা ছিল না, স্ত্রীশিক্ষা এমন নির্মম উপেক্ষার বিষয় ছিল না, সে-কথা সংক্ষেপে ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। (ক্রমশঃ)

মায়া

শ্রীরমেন্দ্রকুমার শর্মা পুরকায়স্থ

কে তুমি গো লীলাময়ি, জগতের মাঝে
খেলিছ আপন খেলা নিত্য নবসাজে।
নিত্য লীলায়িতরূপে, ছন্দে ভঙ্গিমায়,
ভুলায়ে রেখেছ জীবে কোন্ মদিরায়!
খুঁজেছি তোমারে কত কাননে কান্তারে
শৈলমেঘজটাজাল হিমাদ্রিশিখরে,
ফেনিল তরঙ্গরাশি সাগর-বেলায়
শরতের হিমবিন্দু আলোর খেলায়
ফুলের হাসির মাঝে, শ্রাবণে, জলদে,
তটিনীর ছলছল কলকল নাদে—
পেয়েছি আভাস, পাইনি সন্ধান তব,
হে কল্পনে। হেরি তব লীলা নব নব।
যাহা কিছু ব্যক্তাব্যক্ত এ মর-জগতে,
খুলিছে মুদিছে আঁখি তোমারি ইঙ্গিতে॥

নজরবন্দী মন

শ্রীঅনিমেষ শর্মা

বুদ্ধ-নির্দিষ্ট অষ্টাঙ্গিক মার্গের সপ্তমাঙ্গ—'সম্মা-সতি' বা পূর্ণ মনোযোগ দ্বারা মনকে সম্যক্‌ভাবে জানা। মনকে নাড়াচাড়া করাই সাধনা; মনকে শুদ্ধ করা, সংযত করা, ব্যাপক করাই কৃতকৃত্য হইবার উপায়। সংশোধিত—পবিত্রীকৃত মনই সেই 'দিব্যচক্ষু', যাহার দ্বারা সর্বত্র ব্রহ্মদর্শন হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন, 'শুদ্ধ মন ও শুদ্ধ আত্মা এক।' খৃষ্টধর্ম-শাস্ত্রেও ইহাই অনুশাসন: 'Be ye transformed by the renewing of your mind.' (Romans 12 : 2)

কিন্তু মনকে তত্ত্বাবভাবিত করিয়া 'ধ্রুবা স্মৃতি' লাভ করিতে হইলে মনের দিকে একটু দৃষ্টি দেওয়া দরকার—এই সহজ সত্যটি ভুল হইয়া যায়। প্রথমেই প্রয়োজন মনকে জানা. সবচেয়ে পরিচিত হইয়াও মন আমাদের কত অজানা! মনকে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্তাধীন করিয়া একটি বিশিষ্ট ভাবে তাহাকে পরিচালিত করিবার জন্য দীর্ঘ সাধনার প্রয়োজন, কিন্তু এ সাধনার প্রস্তুতি 'সতি-পত্তান' বা মন দেখার অভ্যাসের অনুশীলনে বিশেষ তাৎপর্য রহিয়াছে। এখন আমার উদ্দেশ্য মনকে নিয়ন্ত্রণ করা নহে, শুধু মনকে দেখা। মনে যখন যে চিন্তা উঠিতেছে—ভালমন্দ-নির্বিচারে, তাহাতেই পুরা মনোযোগ দিতে হইবে, অন্য কিছুই ভাবিব না। অন্য কোন চিন্তায় মন যাইলে আবার তাহাতেই মন নিবিষ্ট করিব, কিন্তু ঐ যে মন অন্যত্র যাইতেছে, তাহা যেন আমার নজর এড়াইয়া না যায়। আসল কথা—মন এখন আমার 'নজরবন্দী'; আমার দৃষ্টি এড়াইয়া কিছু করিবার কথাই ওঠে না।

মনের ছোট বড় সকল চিন্তাপরম্পরা সজাগ হইয়া মনকে অনুক্ষণ দেখার অভ্যাস আধ্যাত্মিক জীবন-গঠনে কত বিভিন্নভাবে সাহায্য করে—বিবেচনা করিলে ইহার মূল্য বুঝা যাইবে।

এভাবে দ্রষ্টার মতো মনের ভাবগতিক দেখার অভ্যাস যত হইবে, ততই মন হইতে নিজের পৃথকৃত্ব-বোধ ক্রমশঃ উপলব্ধি হইবে এবং তাহাতে মনের উপর প্রভুত্বের সম্ভাবনাও দেখা দিবে। স্বামী যতীশ্বরানন্দ তাঁহার লেখা 'The Secret of Inner Poise' নামক প্রবন্ধে যথার্থই মন্তব্য করিয়াছেন: As we learn to disentangle ourselves from our emotions, we get an upperhand on them.... If we can face our worst emotions and still remain poised, we can make a new start and proceed with energy.

দ্বিতীয়তঃ সর্বদা ধীর হইয়া লক্ষ্য করিবার অভ্যাস করিবার ফলে যে অধৈর্য আমাদের পাইয়া বসিয়াছে, তাহার অধিকাধিক হ্রাস হইয়া অবিবেচনাপূর্বক কার্য করা বন্ধ হইবে। কোন ভাব মনে উঠিবামাত্র তখনই কার্যে তৎপর না হইয়া ভাবটি বুঝিবার—ইহার প্রকৃতি, কিভাবে ইহা উঠিল, কিভাবে দানা বাঁধিতেছে, তাহা বেশ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখার আগ্রহ প্রথমে মিটাইবার ঝোঁক এখন হইয়াছে। ফলে চিন্তাভাবনার সময় পাওয়া যায় এবং এভাবে নূতন ছাঁচে চরিত্র গঠিত হয়।

মনের ক্রিয়া কিরূপ, কিভাবে এবং কত ভাবে মন ফাঁকি দেয়—এ-সব সম্বন্ধে বিস্ময়জনক আবিষ্কার এ-ধরনের সজাগতার ফলে নিষ্পন্ন হয়।

সতত মনকে নিরীক্ষণ করিবার আর একটি মহৎ লাভ অনিত্যতাবোধের উপলব্ধি—অনুক্ষণ পরিবর্তন হইতেছে, চলিয়া যাইবার জন্যই বৃত্তি-পরম্পরার উদয়, এই অনুভূতি। পরিবর্তন খুব স্পষ্ট ও বৃহৎ হইলে তবেই পরিবর্তন হইল লোকে বুঝিতে পারে, নতুবা লোকে পরিবর্তন ধরিতেই পারে না। আমরা নিত্যতাবোধেই মারা গেলাম! বিশেষ বৃত্তি যখন উঠিয়াছে—হয়তো বিষাদের ভাব—তখন উহা বরাবর থাকিয়া যাইবে, এই বোধ আমাদের সংস্কার-গত হইয়া গিয়াছে। নিরন্তর মন দেখার অভ্যাসে এ সংস্কার শিথিল হইবে, কিছুই যে মুহূর্তকাল একই ভাবে থাকে না, তাহা স্পষ্ট হইবে। আর অনিত্যতাবোধ ঠিক ঠিক অনুভূত হইলে আসক্তি ও বিদ্বেষ চলিয়া যায়। স্থায়িত্ব যেখানে নাই, সেখানে আসক্তি থাকিতে পারে কি? আর আসক্তি না থাকিলে বিদ্বেষের অবকাশ কোথায়? অতএব পরিবর্তনবোধ আসিলেই দুঃখান্ত হইয়া যায়, অনিত্যতাবোধে মানব 'সমভাব'-সম্পন্ন হয়।

সর্বশেষ যে চিত্তবিক্ষেপ সাধনার প্রধান অন্তরায়, দ্রষ্টার মতো মনের বৃত্তি ও ভাব শুধু দেখার অভ্যাসই তাহার প্রভাব ক্ষীণ করিতে পারে। বিখ্যাত ইংরেজ লেখক হাক্স্‌লি (Huxley) মনের বিক্ষেপকে দুইভাবে বিভক্ত করিয়াছেন। একটি হইল, অর্থহীন এলো-মেলো চিন্তা—মনের মর্কট-চাঞ্চল্য, নিরর্থক 'হ য ব র ল'-ভাবনা। এই অসংলগ্ন অনিচ্ছা-কৃত মনের বাজে খরচ 'distractions' নামে অভিহিত।

দ্বিতীয় ধরনের বিক্ষেপ কোন বিশেষ রিপুর প্রাবল্যে তৎপ্রভাবিত অনর্থকর চিন্তা। প্রথম শ্রেণীর বিক্ষেপ দৃষ্টি এড়াইয়া যায়, কিন্তু ইহারাই অধিকতর মারাত্মক, ইহাদের নিয়ন্ত্রণও দুঃসাধ্য। অতীত ও ভবিষ্যতের চিন্তাই এ ধরনের বিক্ষেপের প্রধান উপকরণ। চিত্তের একাগ্রতার এই ভীষণ শত্রুর কবল হইতে মুক্তির নিশ্চিত উপায়, মনকে নিকটের কোন বস্তুতে দৃঢ়ভাবে নিবিষ্ট করা। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, 'সম্মা-সতি' অনুশীলনের মূল কথাই হইল, যখন যে চিন্তা আসিতেছে তাহাতেই পুরা মনোযোগ দেওয়া। বর্তমানই সকল মনটা ভরিয়া রাখিবে, অতীত বা ভবিষ্যতের স্থান নাই।

দ্বিতীয় শ্রেণীর বিক্ষেপ কাটাইবার পক্ষেও আমাদের আলোচিত উপায়ই বোধ হয় অধিক-তর ফলপ্রদ। যাহা ধ্যানের প্রতিবন্ধক হইতেছে, সেই চিত্তক্ষোভ-উৎপাদক ভাবটিই (যেমন বিদ্বেষ, ক্রোধ বা লোভ) ধ্যেয় বিষয় হোক; চিত্তবিক্ষেপ নিবারণপূর্বক চিত্তকে স্থির করিবার ইহা কার্যকর উপায়। বিক্ষেপ দূর করিবার চেষ্টা মনকে আরও বিক্ষিপ্ত করে, ইহা বোধ হয় আমাদের সকলেরই অভিজ্ঞতা, কিন্তু শান্তভাবে বিক্ষেপের বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করিতে থাকিলে উহার গাঢ়তা ফিকে হইয়া পড়িবেই এবং উহা অচিরে বিদায়গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবে।

'The heart of Buddhist Meditation' নামক বিশেষ মূল্যবান্ যে পুস্তকটির সমালোচনা Statesman-পত্রিকায় অনেকেই সম্প্রতি পাঠ করিয়াছেন, তাহাতে 'সম্মা-সতি' অনুশীলনের বিস্তারিত আলোচনা রহিয়াছে। পুস্তকটির জার্মান লেখক স্বয়ং ব্রহ্মদেশে গিয়া অভিজ্ঞ আচার্যের নির্দেশাধীনে 'সম্মা-সতি'র

অনুশীলন করিয়া উপকৃত হইয়াছেন। চিত্ত-বিক্ষেপ-প্রশমনে ইহার কার্যকারিতা সম্বন্ধে গ্রন্থকারের মন্তব্য অনুধাবনীয় :

This dispassionate and brief form of mere 'registering' will often prove more effective than a mastering of will, emotion or reason, which frequently only provokes antagonistic forces of the mind to stiffer resistances.

অর্থাৎ কোন বিক্ষেপ যখন মনের ধৈর্যহানির কারণ হইয়াছে, তখন আদৌ ব্যতিব্যস্ত না হইয়া আলগাভাবে কিছুক্ষণ তাহাতে একটু মন দিয়া শুধু জানিয়া লওয়া যে মনের কুবুদ্ধি হইয়াছে, তাহার উপস্থিতি-সম্বন্ধে সচেতন হওয়া অথচ একেবারেই আমল না দেওয়া—এই স্পষ্ট উপেক্ষাই ঠিক ঔষধ। মনের বিক্ষেপ দূর করার জন্য সচেষ্ট হওয়ার ফল প্রায়ই উলটো হইয়া যায়। বিচার, ইচ্ছাশক্তি ও অস্বস্তি-বোধ—এ-সবের দ্বারা বিক্ষেপ প্রশমিত না হইয়া বরং গুরুত্বলাভ করে। বাধা দিলে আরও অনর্থ-উপদ্রবেরই সৃষ্টি হয়।

প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া কেহ কেহ নূতনভাবে চিন্তার খোরাক পাইবেন এবং অনুশীলনের আগ্রহও বোধ করিবেন ভাবিয়া এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইয়াছে। কৌতূহলী পাঠক স্বামী বিবেকানন্দের 'Six Lessons on Raja Yoga' বা রাজযোগ-সম্বন্ধীয় ছয়টি ভাষণের চতুর্থ ভাষণটি পাঠ করিলে আলোচিত বিষয়ে সুন্দর নির্দেশাদি পাইবেন।

জাগো নিবেদিতা

শ্রীভবতোষ শতপথী

মহাশক্তি-স্বরূপিণী, এস ভগ্নী—এস নিবেদিতা—
সাগর-সম্ভবা কন্যা, মহাসিন্ধু সিংহনাদে ডাকে !
উত্তাল তরঙ্গ-ভঙ্গে—ছিন্ন ভিন্ন ক্ষুব্ধ মানবতা—
ছন্নছাড়া যন্ত্রণায় : চরম চিন্তার ঘূর্ণিপাকে !

নরহন্তা দানবের নির্মম নিষ্ঠুর অত্যাচারে—
উৎপীড়িত ভ্রাতৃকুল : রুধিরাক্ত প্রতিহিংসা-পাপ !
প্রাণোচ্ছল সান্ত্বনায়—এস ভগ্নী, রুদ্ধ অন্ধকারে—
আলোক-প্রোজ্জ্বল স্পর্শে শান্ত হোক রিক্ত মনস্তাপ !

সূর্য-স্নাত পূতমন্ত্রে—জাগো ভগ্নী, আনন্দ-ভৈরবী—
বিমুক্ত বিহঙ্গ-কণ্ঠে—প্রত্যূষের প্রগাঢ় প্রার্থনা ;
অমৃত-অর্ণবতীর্থে ধাবমানা চেতনা-জাহ্নবী—
সক্রিয় সত্তার স্রোতে : শঙ্খ-শুভ্র অনন্ত প্রেরণা ;

মহাশক্তি-স্বরূপিণী, জাগো ভগ্নী—জাগো নিবেদিতা
যুক্তি দাও—মুক্তি দাও—আনন্দ-উজ্জ্বল অমরতা।

সূর্য

ডক্টর মতিলাল দাশ

মুক্ত নীলাম্বরে যখন জ্যোতির ছটায় দিগন্ত ভাস্বর হয়, তখন মানুষ বিস্ময়ে ও অনুরাগে সূর্যের দিকে চেয়ে থাকে, জবাকুসুমসঙ্কাশ মহাদ্যুতি সেই ধ্বান্তারিকে দিবাকর ব'লে প্রণতি জানায়। যুগে যুগে কালে কালে সূর্য এমনই মহিমায় মানুষের চিত্তে বিরাজ করেছেন। সন্তোষে, কল্যাণে, প্রেমে তিনি জগৎকে পূর্ণ করেন, সেই দীপ্তদাহ জ্যোতিষ্ককে ঋষি কণ্বপুত্র প্রস্কণ্ব আহ্বান করছেন :

তরণির্বিশ্বদর্শতো জ্যোতিষ্কৃদসি সূর্য।

বিশ্বমা ভাসি রোচনম্॥ ঋগ্বেদ ১।৫০।৪

—হে সূর্য! তুমি জ্যোতির কারণ! তুমি নিমেষে মহৎ পথে ভ্রমণ কর, তুমি আরোগ্য-দানে ত্রাণ কর, তুমি সকলের প্রকাশক, তুমি দীপ্যমান, সমস্ত অন্তরিক্ষে প্রভা বিকাশ ক'রছ।

কিন্তু কেবল তো বাইরের জ্যোতি নয়, চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মা সূর্য মানুষের অন্তরের দীপ হয়ে থাকেন, অন্তর্যামী তিনি সকলের প্রেরক, তিনি সংসার-সাগরে পারের কাণ্ডারী, সমস্ত মুমুক্ষু মানুষই তাঁর সাক্ষাৎকার প্রার্থনা করেন এবং তিনি চৈতন্য স্ফুরণ করেন।

কিন্তু সেই অন্তরতম পরমপুরুষের কথা পরে হবে, আসুন আমরা প্রস্কণ্বের কথাই শুনি। সপ্তাশ্ব সূর্যকে ঊর্ধ্বে বহন করছে—তাঁর কিরণও তাঁকে প্রকাশ করছে—সারা জগৎ যেন তাঁকে দেখতে পায়, তিনি দ্যুতিমান্ দেবতা, তিনি সকলকে জানেন, সকলকে ধন দেন।

তিনি যখন আসেন, তখন নক্ষত্রগণ রাত্রিকে সাথে নিয়ে তস্করের মতো পালিয়ে যায়। দীপ্তিমান্ অগ্নির মতো সূর্যের প্রকাশক কিরণাবলী সকল জগৎকে ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করছে।

সূর্যের উদয়-সমারোহ কি সুন্দর! তিনি দেবগণের সম্মুখে, মানুষগণের সম্মুখে সমস্ত স্বর্গলোকের দৃষ্টির জন্য উদিত হন।

তিনি পাবক, অনিষ্ট-নিবারক বরুণ তিনিই। তিনি জনগণের পোষয়িতা। সেই জগৎ-চক্ষু সূর্যকে আমরা প্রণতি জানাই। সূর্যের আলোকেই দিবা ও রাত্রির সৃষ্টি, দ্যুলোক ও অন্তরিক্ষে বিস্তীর্ণ হয়ে তিনি বিশ্বমানবকে দর্শন করছেন। তিনি সর্বপ্রেরক নিজ রথে সপ্তাশ্ব যোজিত ক'রে স্বচ্ছন্দে ভ্রমণ করেন, সেই অশ্বের নাম হরিৎ, তাদের কেশমালা কিরণে তৈরি।

এই প্রার্থনা গভীর সত্যের মর্মে ফুটে ওঠে—তিনি বলেন :

উদ্বয়ং তমসস্পরি জ্যোতিষ্পশ্যন্ত উত্তরম্।

দেবং দেবত্রা সূর্যমগন্ম জ্যোতিরুত্তমম্॥

ঋগ্বেদ ১।৫০।১০

—উত্তরা এই পরমা জ্যোতি, দিব্য আলোক : সে আলোক দেবেন কে? দেবেন—যিনি দেবগণের মধ্যে সবার চেয়ে দ্যুতিমান্, যিনি পাপরহিত, তমসার উপর যাঁর অবস্থান। সেই লোকোত্তর জ্যোতি দর্শন ক'রে আমরা সেই জ্যোতির সাযুজ্য লাভ ক'রব।

যার যেমন উপাসনা, তার প্রাপ্তিও তেমনই। যখন আমরা সূর্যের পরাশক্তির দিব্য আলোকের ভজনা ক'রব, তখন আমরা সেই পূর্ণ আলোকে অভিষিক্ত হয়ে জ্যোতির্ময় ভাস্করের সাথে সম্মিলিত হবো। তখন

অন্তরে জাগবে পরিস্ফুট পরজ্ঞানের অদ্ভুত আলোক, যা জগতের সব মাধুরীর উৎস, সেই অপরিমেয় আনন্দের উপলব্ধি ক'রব।

বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সূর্যের সব চেয়ে যে উপকরণ শ্রেষ্ঠ মনে হবে, তা হ'ল তাঁর আরোগ্য-শক্তি। সূর্যকিরণ সর্বরোগহর। ঋষি প্রস্কণ্ব এ-কথা জানতেন, তিনি তাঁর সূক্তের তিনটি ঋকে এই অনাময়-শক্তির বন্দনা করেছেন। এই ব্যাধি-নিবারণী শক্তির সম্পর্কে ঋষির প্রার্থনা :

উদ্যন্নদ্য মিত্রমহ আরোহন্নুত্তরাং দিবম্।
হৃদ্রোগং মম সূর্য হরিমাণং চ নাশয়॥

—হে তিমির-বিদারী উদার-অভ্যুদয় সূর্য! তোমার দীপ্তি সকলের অনুকূল; তুমি উদিত হও, উন্নততর দ্যুতিলোকে আরোহণ ক'রে আমার অন্তরে অবস্থিত হও, হৃদয়ের ব্যাধি আর শরীরের কান্তিহরণশীল বাহ্য রোগ সবই দূর কর।

সূর্য দিবাকর, গগনমণ্ডলের প্রত্যক্ষীভূত জ্যোতিষ্কের মধ্যে সব চেয়ে তেজস্বী, দীপ্তিময়; তাই সর্বকালে এবং সর্বদেশে দেব দিবাকর মানুষের অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত উপাসনা আকর্ষণ করেছেন। তামস-হর দ্যুতির জন্য তিনি নানা দেশে পূজা পেয়েছেন। আর্যজাতির অন্যান্য শাখাতেও সূর্যের অপ্রতিহত প্রভাব। গ্রীক জাতির নাম Hellenese, কারণ তাঁরা নিজেদের সূর্যবংশীয় মনে করতেন, তাঁদের দেবতার নাম Helios. লাটিন-ভাষায় তিনি Sol, টিউটন জাতির কাছে উপাস্য ভাস্করের নাম Tyr, ইরানীদিগের নিকট নাম খুরসেদ।

'সূর্য'-নামে ঋগ্বেদে দশটি সূক্ত আছে। তা ছাড়া আদিত্য, সবিতা, বিবস্বান্ ও বিষ্ণু—এই সব নামেও সূর্যের স্তুতি বর্তমান। যাস্ক ও সায়ণ—উভয়েই বলেছেন যে, অরুণোদয়ের সূর্যই সবিতা, উদয় থেকে অস্ত পর্যন্ত যে-মূর্তি তাই সূর্য। সবিতার নামে ঋগ্বেদে ১১টি সূক্ত আছে। একজন পণ্ডিত বলেছেন যে, সবিতা Aurora Borealis নামক উত্তর মেরুর আলোকচ্ছটার নাম; বিষ্ণু ঋগ্বেদের একটি নগণ্য দেবতা, তাঁর নামে একটিও সম্পূর্ণ সূক্ত নেই, মাত্র পাঁচ-ছয়টি সূক্তে অন্যান্য দেবতার সঙ্গে বিষ্ণুর উল্লেখ আছে। সূর্যের উদয়গিরিতে আরোহণ, মধ্য আকাশে স্থিতি এবং অস্তাচলে অস্তগমন—এই তিনটি ত্রিবিক্রম বিষ্ণুর পদবিক্ষেপ ব'লে বলা হয়েছে। এই উপমাই পরে বামন-অবতারের পুরাণ-কাহিনীর সৃষ্টি করেছে। আমাদের আচমনের সর্বজন-পরিচিত মন্ত্রটি বিষ্ণুস্তুতিতে রচিত একটি ঋক্ :

ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
দিবীব চক্ষুরাততম্॥ ১।২২।২০

—আকাশে সর্বথা বিস্তৃত চক্ষু যেরূপ দেখতে পায়, কবিগণ তেমনই বিষ্ণুর পরম পদ দেখতে পান।

ঋগ্বেদে ছয়টি সম্পূর্ণ সূক্তে আদিত্যের স্তব আছে এবং দুটি সূক্তের অংশেও আছে। এক আদিত্য বললে বরুণকেই বুঝানো হয়। যমের পিতা বিবস্বান্, সরণ্যু ত্বষ্টার কন্যা এবং বিবস্বানের পত্নী।

সূর্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথা পূর্বমকল্পয়ৎ।

—প্রত্যেক নূতন সৃষ্টিতে ধাতা পূর্ব কল্পের অনুরূপ নূতন সৃষ্টি করেন। সেই ভাবে তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে সৃষ্টি করেছিলেন। অখণ্ডনীয়া অসীমা অদিতি সূর্যের মাতা। অশ্বিদ্বয় সূর্যের পুত্র।

আঙ্গিরস কুৎস প্রথম মণ্ডলের ১১৫ সূক্তে সূর্যের অর্চনা করেছেন। তিনি বলছেন : সূর্য বিচিত্র তেজঃপুঞ্জরূপ, জ্যোতির্ময়; তিনি মিত্র, বরুণ ও অগ্নির মতো দীপ্তনয়ন; তাঁর প্রোজ্জ্বল কিরণে দ্যাবাপৃথিবী ও অন্তরিক্ষ ভরে

গেছে—তিনি সচল ও অচল সকলেরই যেন আত্মা।

নর যেমন নারীর পশ্চাতে গমন করে, সূর্য সেইরূপ লাবণ্যময়ী উষার পিছনে আসছেন, এই সুন্দর প্রভাতকালে দেবতা-ভক্ত সাধকেরা যজ্ঞকর্মের আয়োজন করছেন—যুগ যুগ ধরে এই যজ্ঞবিধি প্রচলিত রয়েছে, তারা দেবতার নিকট সুফল প্রার্থনা করছেন।

সূর্যের কল্যাণরূপ হরিৎবর্ণ অশ্ব, সেই বিচিত্র অশ্বে তিনি গন্তব্য মার্গে চলেছেন। আমরা তাঁকে অন্তরের উচ্ছ্বসিত প্রণাম জানাই। রসহরণশীল সেই রশ্মিনিচয় আকাশ-পৃষ্ঠে উঠেছে এবং দ্যাবাপৃথিবীর উপর সদ্য বিচরণ করছে।

সূর্যের দেবত্ব ও মহত্ত্ব অতুলনীয়। মানুষের কাজ অপরিসমাপ্ত থাকে, তিনি আপন স্বাতন্ত্র্যে অস্তগমন করেন। যখন তিনি রথ থেকে তাঁর হরিৎ-নামক অশ্বগণকে মোচন করেন, তখন রাত্রি তার তিমির-বসনে সর্ব-লোক আবৃত করে।

উদয়-সময়ে মিত্র ও বরুণের দর্শনার্থ, সকল লোকের সম্মুখে পূর্ণ প্রকাশের নিমিত্ত নভো-মণ্ডলের মধ্যভাগে সূর্য আপন জ্যোতির্ময় রূপ প্রকাশ করছেন। তাঁর রশ্মিরাজি একদিকে অনন্ত দীপ্তিমান্ বল ধারণ করে, অন্যদিকে অন্ধকারের কৃষ্ণবর্ণে সূর্যাস্তে জগৎ প্লাবিত করে। সূর্যকিরণের অপূর্ব মাহাত্ম্য! আলো ও অন্ধকারের আগমন ও অবসান একাই তিনি নিষ্পাদন করেন।

হে দ্যুতিময় দেবগণ, অদ্য অরুণোদয়ে তোমরা আমাদিগকে পাপ থেকে নিবৃত্ত ক'রে পালন কর। মিত্র, বরুণ, অদিতি, সিন্ধু, পৃথিবী ও দ্যুলোক আমাদিগকে রক্ষা করুন।

কুৎস এখানে স্বতঃবিরোধের সামঞ্জস্য বিধান ক'রে সূর্যের মহিমা ব্যক্ত করছেন। সূর্যের এতাদৃশ বৈভব যে, তিনিই দিবা ও রাত্রি নিষ্পাদন করছেন।

অভিতপা ঋষি দশম মণ্ডলের সপ্তত্রিংশ সূক্তে যে অনবদ্য সূর্যস্তব রচনা করেছেন, তার লোকোত্তর উদার ব্যাপ্তি ভক্তের হৃদয়ে ঝঙ্কার তোলে। এই স্তুতির ছন্দে ছন্দে এক অপূর্ব আলোকে আমাদের সত্তার বহুমুখী সম্ভাবনা এক অনির্বচনীয় সুষমায় সহস্রদল মেলে ফুটে ওঠে।

সূর্যদেবে কর নমস্কার। তাঁর প্রশংসা কর, তিনি যে মিত্র ও বরুণের দ্রষ্টা, যাঁর দীপ্তি মহান্, যিনি দূর থেকে সকল বস্তু দর্শন করেন, যিনি দেবজাত, যিনি দ্যুলোকের পুত্রস্বরূপ। যাঁর কেতু বিশ্বকে প্রকাশিত করে। স্তবে এবং যজ্ঞে তাঁর পূজা কর।

আমার সত্যবচন আমাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করুক। যেখানে দ্যাবাপৃথিবী বিরাজিতা, সেখানে দিবারাত্রির লীলা চলছে। সেখানে সবল সব প্রাণী বিশ্রাম লাভ করছে, সেখানে নিত্যকাল জলের স্পন্দন, সেখানে সূর্যোদয়-সমারোহ। হে ভাস্কর! যখন তুমি গতিশীল অশ্বে তোমার রথে গমন কর, তখন কোন অসুর বা রাক্ষস তোমার সমীপে আসতে পারে না, তোমার সেই অসাধারণ জ্যোতি তোমায় অনুবর্তন করে, সেই জ্যোতি ধারণ ক'রে তুমি উদিত হও।

যেন সূর্য জ্যোতিষা বাধসে তমো জগচ্চ
বিশ্বমুদিয়র্ষি ভানুনা।
তেনাস্মদ্বিশ্বামনিরামনাহুতিম্
অপামীবামপ দুঃস্বপ্ন্যং সুব॥

ঋগ্বেদ ১০।৩৭।৪

—হে দিনমণি! যে জ্যোতিঃ দ্বারা তুমি

তিমিরান্ধকার বিদূরিত কর, যে তেজের দ্বারা চরাচরকে উদ্ভাসিত কর, সেই আলোক-ধারায় আমাদের দীনতা মোচন কর, দারিদ্র্য-ব্যাধি অপগত কর, আমাদের সকল রোগ আরোগ্য কর, সকল ব্যাধি বিনাশ কর, দুঃস্বপ্ন দূর কর। যজ্ঞহীন যে-জীবন, সে-জীবন নিবেদিত এবং আত্মাহুতিতে সার্থক হোক। আত্মবিসর্জনের পথেই তো তোমাকে পাই, স্বার্থকলুষে যখন কলুষিত, তখন তো তোমার আবির্ভাব ঘটে না।

এই শ্লোকে ঋষি চেতনার ঊর্ধ্বায়নের ইঙ্গিত করছেন। হোমহীন যে জীবন—ভোগসর্বস্ব যে জীবন, তা অন্ধকার—বিলুপ্তির পথ, তাই যজ্ঞ ও হোমের সুরভিতে মুখর আত্মনিবেদনের মাধ্যমেই আমরা পাবো চিৎশক্তির উৎসারিত দীপ্তি, জ্ঞান ও আনন্দ। সেই বীর্যের সাধনাই মানুষের কাম্য।

তং নো দ্যাবাপৃথিবী তন্ন আপ ইন্দ্রঃ শৃণ্বন্তু
মরুতো হবং বচঃ।
মা শূনে ভূম সূর্যস্য সংদৃশি ভদ্রং জীবন্তো
জরণামশীমহি॥ ঋগ্বেদ ১০।৩৭।৬

—শুনুন আমাদের অন্তরের আহ্বান দ্যাবা-পৃথিবী। শুনুন সলিলধারা, ইন্দ্র এবং মরুদ্গণ, —সূর্যের কৃপাদৃষ্টিতে আমরা যেন গভীর দুঃখভাগী না হই, আমরা যেন দীর্ঘ জীবন লাভ করি, অমরত্ব লাভ করি এবং চিরন্তন কল্যাণ লাভ করি।

মানুষের অন্তরে অন্তরে ফুটুক অভীপ্সা, অধ্যাত্মচিন্তার উন্মেষ, পূর্ণতার প্রতি সুগভীর প্রীতি। আত্মচেতনার অখণ্ড ব্যাপ্তিতে আসুক ভদ্র শ্রুতি, ভদ্র দৃষ্টি এবং ভদ্র অনুভূতি। দিব্যজীবনের ঋতময় ছন্দে তার হোক জাগরণ, প্রবুদ্ধ সুন্দর আয়ুতে সে হোক আয়ুষ্মান্ আর পরিপূর্ণতায় পূর্ণ সুষমায় তার হোক অমর জীবন। অমরত্ব মৃত্যুর পরে প্রাপ্তব্য সার্থকতা নয়। এই মানবজীবনেই বৈরাগ্য এবং অভয়ের পথে তৃষ্ণা-পারাবার পার হয়ে এখানেই মানুষ অমৃতকে অধিগম করে।

বিশ্বাহা ত্বা সুমনসঃ সুচক্ষসঃ প্রজাবন্তো
অনমীবা অনাগসঃ।
উদ্যন্তং ত্বা মিত্রমহো দিবে দিবে জ্যোগ্‌জীবাঃ
প্রতি পশ্যেম সূর্য॥ ১০।৩৭।৭

—হে সূর্য! আমরা যেন সর্বদা তোমায় যজন করি, প্রীতিযুক্ত মন দিয়ে তোমায় ভজন করি, প্রশস্ত চক্ষে তোমায় দর্শন করি, সন্তানসন্ততি পরিবৃত হয়ে ব্যাধিহীন দেহে অপরাধহীন হৃদয়ে তোমায় যেন পূজা করি। হে মিত্রগণের পূজিত তপন! আমরা যেন দিন দিন তোমার উদয়-মাধুরী সম্ভোগ করি, চিরজীবী হয়ে যেন তোমার রমণীয় দর্শন পাই।

বৈদিক পিতামহেরা ছিলেন জীবনবাদী। বিস্ময়ের অন্বেষণে জড়কে তাঁরা প্রত্যাখ্যান করেননি—প্রাকৃত-জীবনের সব কিছুকে তাঁরা রূপান্তরিত করতে চেয়েছিলেন—তাইতো দীর্ঘ জীবনের কামনা। প্রজ্ঞা-জগতের রূপশতদল সূর্যের কাছে তাই তাঁদের প্রার্থনা ছিল দিব্য-প্রজ্ঞার জ্যোতিঃসম্পাতের জন্য। সূর্য দেবেন অমরত্ব, তাইতো চিরজীবী হয়ে তাঁরা পান করবেন রসামৃতের অফুরন্ত রস-ধারা।

অভিতপা ঋষির আনন্দোদ্বেল অনুভূতির অভিব্যক্তি চলছে :

হে সূর্য! তুমি বিচক্ষণ, তোমার দৃষ্টি সর্বত্র প্রসারিত, তুমি মহৎ জ্যোতি ধারণ কর, তুমি ভাস্বর, তুমি প্রতি চক্ষুর নিকটই সুখকর, তোমাকে যেন আমরা নিত্য দর্শন করি, হে সুদর্শন! তুমি যখন বৃহৎ বলে আরোহণ কর, তখন যেন প্রতিদিন আমরা তোমার সেই দিব্য সুন্দর ও মধুর মূর্তি দর্শন করি। হে

হরিকেশ! তুমি প্রজ্ঞানের দ্বারা বিশ্বকে প্রকাশ ক'রছ আবার প্রতি রাত্রে তাকে অন্ধকারাচ্ছন্ন ক'রছ, তুমি অতিশ্রেয়স্কর বস্তু দান ক'রে প্রতিদিন উদিত হও।

শং নো ভব চক্ষসা শং নো অহ্না শং ভানুনা
শং হিমা শং ঘৃণেন।
যথা শমধ্বঞ্ছমসদ্ দুরোণে তৎ সূর্য দ্রবিণং
ধেহি চিত্রম্ ॥ ১০।৩৭।১০

—হে মরীচিমালী! তুমি তোমার তেজদৃষ্টি দিয়ে আমাদের কল্যাণ কর, তোমার দিবস আমাদের মঙ্গলময় হোক, তোমার তীব্রদাহন কিরণ আমাদের ক্ষেমঙ্কর হোক, তোমার শীতলতা ও তোমার উত্তাপ উভয়েই আমাদের শঙ্কর হোক। আমরা গৃহেই থাকি বা পথেই চলি, আমাদের সকল অবস্থান শুভকর হোক। তাই মঙ্গলসাধনের জন্য তুমি আমাদিগকে দাও অজস্র সম্পৎ, বিচিত্র দ্রব্য এবং বিপুল ধনসম্ভার।

হে দেবগণ! সূর্যের অনুরোধে তোমরা আমাদের জন্মে জন্মে উপকারী হও। আমাদের অধীনস্থ দ্বিপদ ও চতুষ্পদ উভয়কে সুখী কর। আমাদের পুত্রকন্যা এবং অধীন প্রাণিবর্গ সকলেই আহার করুক, পান করুক, হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ হোক, আমাদের গৃহে তারা সকলেই রোগশান্তি নিমিত্ত সুখ এবং বিষয়-যোগজনিত সুখ, উভয়ই অপাপ হয়ে ভোগ করুক—এই বর প্রদান কর।

হে দেবগণ, তোমরা বসুদাতা—আমরা কায়মনোবাক্যে যে-সব পাপ আচরণ করি, আমাদের সেই পাপ তুমি আমাদের শত্রুগণকে দাও। যে-সব শত্রু দানধর্মবিমুখ এবং আমাদের অনিষ্ট কামনা করে, সূর্যাজ্ঞায় সেই শত্রুগণের হৃদয়ে আমাদের কৃত পাপ প্রতিষ্ঠিত কর।

এই প্রার্থনায় ঋষি হিংসাপরবশ স্বতোজাত হিংসার নিকট নিজের মহৎ মানবতাকে বিসর্জন দিয়ে নিম্নস্তরে নেমে এসেছেন। এখানে হিংসা ও প্রতিশোধের বর্বরতা অহিংসা ও প্রেমের উদারতাকে ভুলেছে। এখানে ঋষি পাপবুদ্ধির ঊর্ধ্বে উঠতে পারেননি —দিব্য আচরণের মাধুর্য থেকে শুধু নয়, মানব-আচরণের নৈতিকতা থেকেও নিম্নে নেমে গেছেন।

চক্ষু ঋষি পাঁচটি ঋকের একটি সূক্তে এক আশ্চর্য স্তব লিখেছেন। দশম মণ্ডলের ১৫৮ সূক্ত এটি! ঋষি বলছেন:

সূর্যো নো দিবস্পাতু বাতো অন্তরিক্ষাৎ।
অগ্নির্নঃ পার্থিবেভ্যঃ ॥১
জোষা সবিতর্যস্য তে হরঃ শতং সবাঁ অর্হতি।
পাহি নো দিদ্যুতঃ পতন্ত্যাঃ ॥২
চক্ষুর্নো দেবঃ সবিতা চক্ষুর্ন উত পর্বতঃ।
চক্ষুর্ধাতা দধাতু নঃ ॥৩
চক্ষুর্নো ধেহি চক্ষুষে চক্ষুর্বিখ্যৈ তনুভ্যঃ।
সং চেদং বি চ পশ্যেম ॥৪
সুসন্দৃশং ত্বা বয়ং প্রতি পশ্যেম সূর্য।
বি পশ্যেম নৃচক্ষসঃ ॥৫

—সূর্য সর্বপ্রেরক শোভনীয় দেব। তিনি আমাদিগকে দ্যুলোকবাসী শত্রু থেকে রক্ষা করুন। বায়ু মধ্যম-স্থানান্তর্বর্তী বাধা অপসারিত করুন। পৃথিবীব্যাপী অগ্নি আমাদিগকে পার্থিব বিপদ হ'তে রক্ষা করুন।

হে সবিতা! তুমি আমাদের পূজা গ্রহণ কর। তোমার রসহরণশীল তেজ অদ্ভুত। সে তেজ শত যজ্ঞের যোগ্য; শত্রুদের বজ্ররূপ যে-সকল অস্ত্র আমাদের উপর পড়ছে, তুমি তা থেকে আমাদিগকে রক্ষা কর।

সবিতা আমাদের চক্ষে প্রকাশ-শক্তি দিন, ইন্দ্রসহচর পর্বতদেব আমাদের দৃষ্টিশক্তি

সবল করুন, অন্যতম আদিত্য ধাতা আমাদের চক্ষুরিন্দ্রিয় সবল ও সমর্থ করুন।

আমাদের চোখে রূপোপলব্ধির জন্য প্রকাশক তেজ দাও, সকল বস্তুর দর্শনের জন্য আমাদের দেহে চক্ষুরিন্দ্রিয় স্থাপন কর। আমরা যেন সকল বস্তুকে সমন্বয়ের দৃষ্টিতে দেখতে শিখি। আবার বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিশেষ ক'রে উপলব্ধি করি।

হে সূর্য, তুমি সুদর্শন হয়ে প্রকাশিত হও। তোমাকে যেন আমরা সুন্দরভাবে দর্শন করতে শিখি; মানুষের যা কিছু দর্শনীয়, সে-সব যেন আমরা বিশেষ ক'রে দেখতে শিখি।

এই ক্ষুদ্র সূক্তটি অর্থগৌরবসমৃদ্ধ। জ্ঞানের দুটি পথে সমন্বয় ও বিশ্লেষণ। সংসারে বস্তু যখন তার অগণ্য বিভিন্নতায় দেখা দেয়, তখন আমরা বিহ্বল হয়ে পড়ি, বিচ্ছিন্নকে এক ক'রে—খণ্ডকে অখণ্ড ক'রে আমরা দর্শনশাস্ত্র গড়ে তুলি। সেই দার্শনিক দৃষ্টি আমাদিগকে তৃপ্ত করে, আমাদের জ্ঞানকে সংহত করে, বিশৃঙ্খলায় আনে শৃঙ্খলা।

যাকে আমরা অচ্ছিদ্র মনে করি, সংহত মনে করি—তা যে সমষ্টি, সে উপলব্ধি আমাদের সাধারণতঃ হয় না। প্রত্যেককে বিভাজিত ক'রে আমরা তার অংশকে জানতে পারি। এইভাবে সমন্বয় ও বিশ্লেষণের পথে জ্ঞানের পূর্ণতা আসে।

ঋষি এই পরিপূর্ণ জ্ঞানের কামনা করছেন। কিন্তু এই কামনা সফল হ'তে পারে না, যদি না আমাদের দৃষ্টিশক্তি নির্মল ও প্রখর হয়, বহুব্যাপক এবং গভীর হয়। মানুষের যে সর্বাবগাহী সম্যক্ জ্ঞান চাই। চেতনা ও অনুভবের সকল রাজ্যে তার গতি হবে অবাধ। তার কাছে সকল রহস্যের আবরণ হবে অনাবৃত। ঋষি এই সূক্তে সেই দিব্য সম্ভূতির বীর্যকে প্রার্থনা করছেন।

বিভ্রাট্ ঋষি দশম মণ্ডলের ১৭০ সূক্তে চারটি ঋকে এক চমৎকার স্তুতি প্রকাশ করছেন। ঋষির দৃষ্টি সূর্যের গরিমোজ্জ্বল জ্যোতির দিকে, বারংবার বিভ্রাট্ এই কথা ব্যবহার ক'রে বিশেষভাবে তাঁরই দীপ্যমানতার প্রতি পাঠকের মন আকর্ষণ করেছেন। এ জ্যোতি তো দহন নয়, এ যে সুকুমার স্বাদু ও সুন্দর, তাইতো সোমময় মধু তিনি পান করছেন।

সূর্যের অবাঙ মনসোগোচর অনির্বচনীয়তার রহস্যঝলমল দ্যোতনায় ঋষি মুগ্ধ, তাই তিনি যজ্ঞপতির জন্য প্রার্থনা করছেন প্রকৃষ্ট পরমায়ু। সূর্য যে বহুরূপে বিরাজমান, তিনি যে প্রজাপালক, তাঁরই করুণা বৃষ্টিধারায় নেমে আসে পৃথিবীতে—মহাবায়ু সূর্যকে প্রেরণ করেন। সূর্যের শক্তির এই অনুভূতি আনে সাধকের হৃদয়ে এক অতুলনীয় আনন্দ, তখন তার হৃদয়ে শক্তি, জ্যোতি, শান্তি ও আনন্দের এক বিপুল সংবেগ ফুটে ওঠে এক অকল্পনীয় দ্যোতনায়।

সূর্যের বর্ণনায় ঋষির কণ্ঠে বাগ্‌বিভূতি জাগছে—এক একটি শব্দের ভিতরে কত না সংহত ব্যঞ্জনা, কত না বিচিত্র ইঙ্গিত। এ যেন এক অলৌকিক প্রাদুর্ভাব। যিনি বিরাজমান, সেই সূর্যের পরম রমণীয় কান্তি—তিনি যে বৃহৎ, ভূমা। অল্পতা তাঁকে ব্যাপ্ত করে না, তিনি যে অদিতি—সীমা তাঁকে বাঁধে না। জগতে যত অন্ন, যত সম্পৎ, যত বিভূতি, সবই তো সেই পরমদাতার দান, দ্যুলোককে তিনি ধারণ ক'রে আছেন। সূর্যমণ্ডলে অবস্থিত অবিনশ্বর সত্যস্বরূপ তিনি, শত্রুকে তিনি নিধন করেন, বৃত্রকে নাশ করেন,

দস্যুদিগকে পীড়ন করেন, অসুরঘাতী বিপথ-নাশক সেই তমোনাশক জ্যোতি জ্বলছে।

প্রাকৃত মনের এষণা এ নয়, ঋষির মহত্তর তপে খুলে গেছে বোধির চিন্ময় উৎস। তাই তিনি আলোক-দেবতার প্রশান্ত সৌরদাপ্তিকে সম্যক্ এবং সত্যভাবে উপলব্ধি করতে পারছেন।

ইদং শ্রেষ্ঠং জ্যোতিষাং জ্যোতিরুত্তমং
বিশ্বজিৎ ধনজিৎ উচ্যতে বৃহৎ।
বিশ্বভ্রাড়্ ভ্রাজো মহি সূর্যো
দৃশ উরু পপ্রথে সহ ওজো অচ্যুতম্॥১০।১৭০।৩

—ইনি যে বরণীয়তম—সকলের শ্রেষ্ঠ, ইনি যে জ্যোতির উত্তম জ্যোতি। আলোকপারাবারের সমস্ত অমৃত এখানে সংহত—তাইতো গ্রহনক্ষত্রের আলো এঁরই কৃপায় ঝলসিত, বিশ্ববিজয়ী ধনজয়ী সূর্যকে বৃহৎই বলা যায়।

জগতের যেখানে যা কিছু দীপ্তি, এঁরই দীপ্তিতে ভাস্বর, ইনি যে জ্যোতির্ময়—মহান্, সকলের দর্শনের জন্য ইনি আপনাকে বিস্তার করেছেন, ওজস্বী সূর্য তিমিররাশিকে অভিভূত করেন, এঁর তেজ অবিনাশী—সে তেজ অসীম ব্যোমে ব্যাপ্ত হয়ে আছে।

হে সূর্য! তোমার তেজে সর্ব জগৎকে উদ্ভাসিত ক'রে দ্যুলোকের রুচির স্থানে আরোহণ করেছ, তোমার প্রতাপেই সকল কর্ম নির্ধারিত পথে সুসম্পন্ন হয়, সকল ভুল গুণেই পরিপুষ্টি লাভ করে।

সূর্য দেন পরম পুষ্টি, মানুষের মানবতাই চরম পরিণাম নয়, মানুষের রয়েছে আরও নিরঙ্কুশ ঊর্ধ্বগতি। মানুষের লক্ষ্য দিগ্বলয়-রেখার মতো, যত তার কাছে যাই, ততই সে দূরে দূরান্তরে বিসর্পিত হয়। সে যাত্রা অসীম অনন্তের পানে; প্রাপ্তির আরাম তার নয়, তার জন্য অবিশ্রান্ত অপ্রাপ্য গতি।

ঋষিকুলগৌরব বশিষ্ঠের প্রার্থনাও এক দিব্য প্রেরণায় উদ্বেলিত। বশিষ্ঠ বলছেন: হে সূর্য! তোমার উদয়বিভায় জগৎ প্রদীপ্ত ক'রে বলো—আমরা পাপশূন্য। হে অদিতি! তোমার মহিমা তো সীমাকে অতিক্রম করে, আমরা যেন মিত্র ও বরুণের নিকট সত্যস্বরূপ অপাপ হই। হে অর্যমা! তোমার স্তব ক'রে যেন তোমার প্রিয় হই।

চিৎশক্তির স্ফুরণ ঘটে চিৎশক্তির চিন্তা ও ভাবনায়। মনন, ধ্যান, নিদিধ্যাসনের ফল এইভাবেই প্রত্যক্ষ হয়। অখণ্ড সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ সূর্যজ্যোতির ভাবনায় আমরাও ধীরে ধীরে লাভ করি শক্তি ও কান্তির ক্রমিক উপচয়।

সূর্য ঊর্ধ্ব দিকে বৃহৎ এবং বহু তেজ আশ্রয় করেন, মনুষ্যলোকে সমস্ত ব্যক্তিকে আশ্রয় করেন। দিবসে উদীয়মান আদিত্য একই রূপে বিরাজিত থাকেন। দ্যুতিমান্ তিনি সকলের কর্তা, আবার তিনিই কৃত। তিনি শক্তি ও প্রজ্ঞায় সুকৃত হয়েছেন।

তুমি আমাদের পুরোভাগে উদিত হও। তোমার কিরণজালে প্রোজ্জ্বল ক'রে অভ্যুদয় কর। তোমার উত্তরণ হোক অমৃতলাভের পানে। তুমি আমাদিগকে অপাপ ব'লে ঘোষণা কর। মিত্র, বরুণ, অর্যমা ও অগ্নির নিকট আমাদিগকে নিরপরাধ ব'লে উল্লেখ কর।

বশিষ্ঠ সূর্যের আর যে-সব বিশেষণ প্রয়োগ করেছেন, সেগুলিও খুব সুন্দর। তিনি সুভগ, ভাগ্য তাঁর শোভন, তিনি আমাদের পূজাভাগ সুন্দরভাবে গ্রহণ করেন। তিনি বিশ্বচক্ষু—জগতের সবই তাঁর দর্শনপথে পড়ে।

ভগবান কোন ভক্তি-বিশেষের দেবতা নন; পুরোহিতেরা অন্যায়ভাবে মানুষ ও ভগবানে বিভেদ সৃষ্টি করেছেন। তিনি সাধারণ—সকলের সমান সম্পৎ, সেই মহানুভব দেবতা ধর্মের ন্যায় অমারাশি বিনাশ করেন। তিনি মহান্ কেতু, তিনি ভ্রাজমান, দূরগামী, ত্রাণকর্তা ও প্রকৃত তেজস্বী। তিনিই মানুষকে স্ব-স্ব কর্মে প্রবৃত্ত করেন।

(ক্রমশঃ)

বেদান্ত-সংজ্ঞা-মালিকা

স্বামী ধীরেশানন্দ

[শ্রাবণ-সংখ্যার পর—চতুর্বিধ সংজ্ঞা]

প্রতিবন্ধো বর্তমানো বিষয়াসক্তিলক্ষণঃ।
প্রজ্ঞামান্দ্যং কুতর্কশ্চ বিপর্যয়দুরাগ্রহঃ ॥ ৩২ ॥

বিষয়াসক্তি,[১] প্রজ্ঞামান্দ্য,[২] কুতর্ক[৩] এবং বিপর্যয়দুরাগ্রহ[৪]—**জ্ঞানোৎপত্তি**-বিষয়ে এই চারিপ্রকার **বর্তমান** প্রতিবন্ধ কথিত হইয়া থাকে।

১. ভোগ্যবিষয়ের প্রতি দৃঢ় অভিনিবেশ বা অনুরাগই **বিষয়াসক্তি**-নামে কথিত হয়।

২. বোধিত বিষয়ে বুদ্ধির অপ্রবেশ, শাস্ত্রের তাৎপর্য গ্রহণে ও ধারণে বুদ্ধির মন্দতা **প্রজ্ঞামান্দ্য**-নামে খ্যাত।

৩. প্রতিপাদিত বিষয়টি বিপরীতরূপে গ্রহণ বা শ্রুতিবিরোধী তর্ককে **কুতর্ক** বলে।

৪. আমি শ্রোত্রিয়, পণ্ডিত ও বৈরাগ্যবান্—এইরূপ দেহেন্দ্রিয়াদিতে আত্মত্ব-বুদ্ধি এবং আত্মা কর্তৃত্বাদিমান্, এইরূপ যুক্তিরহিত অভিনিবেশ **বিপর্যয়দুরাগ্রহ**-নামে প্রসিদ্ধ। এই চারিটির একটিও বিদ্যমান থাকিলে তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয় না। (পঞ্চদশী ৯।৪৩, ৪৪ দ্রষ্টব্য) শমদমাদি অভ্যাস দ্বারা বিষয়াসক্তি, পুনঃ পুনঃ শ্রবণের দ্বারা প্রজ্ঞামান্দ্য, মনন দ্বারা কুতর্ক এবং নিদিধ্যাসন অভ্যাস-সহায়ে বিপর্যয়-দুরাগ্রহ নিবৃত্ত হইয়া থাকে।

পুরুষার্থশ্চ শব্দস্য প্রবৃত্তৌ যন্নিমিত্তকম্।
বর্ণাস্তথাশ্রমাস্তে চ প্রত্যেকং স্যুশ্চতুর্বিধাঃ ॥ ৩৩ ॥

পুরুষার্থ,[১] শব্দপ্রবৃত্তির নিমিত্ত,[২] বর্ণ[৩] ও আশ্রম[৪]—ইহাদের প্রত্যেকটিই চারিপ্রকার।

১. ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—ইহাই পুরুষার্থচতুষ্টয়।

২. জাতি, গুণ, ক্রিয়া ও সম্বন্ধ—এই চারিটিই সর্ববিধ শব্দপ্রবৃত্তির নিমিত্ত হইয়া থাকে। অর্থাৎ জাতি-গুণাদির কোনটি থাকিলে তবেই সেই বস্তুটি শব্দ-সহায়ে বলা চলে।

৩. বর্ণচতুষ্টয়—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র।

৪. ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—আশ্রমচতুষ্টয়-নামে খ্যাত। উপনয়নানন্তর নিয়মপূর্বক গুরুসান্নিধ্যে নিবাস করত সাঙ্গ-বেদাধ্যয়নকারী দ্বিজ-বালকই প্রথমাশ্রমী **ব্রহ্মচারী**। নৈষ্ঠিক ও উপকুর্বাণ ভেদে ব্রহ্মচারী দ্বিবিধ। ব্রহ্মচর্য-ব্রত ধারণপূর্বক বিধিবৎ বেদাধ্যয়ন-সমাপনান্তে যিনি গার্হস্থ্যাভিলাষী, তাঁহাকে **উপকুর্বাণ ব্রহ্মচারী** বলে এবং যাবজ্জীবন গুরুগৃহবাসী বেদাধ্যায়ী দ্বিজ **নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী** নামে খ্যাত।

ব্রহ্মচর্যব্রত-সমাপনান্তে বিধিবৎ সংস্কৃত ও গার্হস্থ্যাশ্রমপ্রবিষ্ট পুরুষই দ্বিতীয়াশ্রমী বা **গৃহস্থ**।

পুত্রের হস্তে স্ত্রীর ভার অর্পণপূর্বক বা সস্ত্রীক যিনি তপস্যার্থ বনে প্রস্থান করেন, তিনিই তৃতীয়াশ্রমী বা **বানপ্রস্থী**।

যিনি গৃহাদি **সর্ববস্তু** পরিত্যাগপূর্বক **মুণ্ডিতমস্তক** এবং গৈরিক বস্ত্র, কৌপীনাচ্ছাদন, দণ্ড-কমণ্ডলু ধারণকরত ভিক্ষামাত্রবৃত্তিপরায়ণ হইয়া নির্জন বা তীর্থস্থানে বাস করেন ও কেবল বেদান্ত শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনাদি সহায়ে কালাতিপাত করেন, তিনিই চতুর্থাশ্রমী বা **সন্ন্যাসী** নামে কথিত।

সাধনানি চ চত্বার্যেবানুবন্ধচতুষ্টয়ম্।
অন্তঃকরণং চ তদ্বৎ সঙ্কল্পাদিচতুষ্টয়ম্ ॥ ৩৪ ॥

মোক্ষের সাধন,[১] অনুবন্ধ,[২] অন্তঃকরণ[৩] ও সঙ্কল্পাদি[৪]—এইগুলিও চতুর্বিধরূপে প্রসিদ্ধ।

১. সাধনচতুষ্টয়: নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, ইহামুত্রফলভোগবিরাগ, শমাদি ষট্-সম্পত্তি ও মুমুক্ষুত্ব। আত্মা নিত্য, অচল, অবিনাশী ও জগৎ বিনাশী—এইরূপ জ্ঞানের নামই **নিত্যানিত্য-বস্তুবিবেক**। এই বিবেকই উক্ত চারিপ্রকার সাধনের মূল। কারণ প্রথমে বিবেক উৎপন্ন হইলে বৈরাগ্যাদি অপর সাধনগুলি হইতে পারে। বিবেক উৎপন্ন না হইলে পরবর্তী সাধনগুলি হইতে পারে না। এই বিবেকাভ্যাসের ফলে জগতের অনিত্যতা বোধ হয়, পরে 'ব্রহ্মসূত্র'াদি গ্রন্থের অবলম্বনে বিচারদ্বারা জগতের মিথ্যাত্বের জ্ঞান হয়। অনিত্যতা ও মিথ্যাত্ব এক নহে। অনিত্যবস্তুর ব্যাবহারিক সত্তা থাকে, মিথ্যার প্রাতিভাসিক সত্তামাত্র স্বীকার্য। 'আছে', তাই দেখা যায়—ইহা ব্যাবহারিক সত্তা এবং নাই কিন্তু দেখা যায়, তাই আছে বলা হয়—ইহা প্রাতিভাসিক সত্তা।

দেহাদি ব্রহ্মলোক পর্যন্ত অর্থাৎ ইহলৌকিক ও পারলৌকিক যাবতীয় অনিত্যবস্তুবিষয়ক ভোগাকাঙ্ক্ষাত্যাগের যে ইচ্ছা, তাহাকেই **ইহামুত্রফলভোগবিরাগ** বা বৈরাগ্য বলা হয়। ইহাই দ্বিতীয় সাধন।

তৃতীয় সাধন শমাদিষট্সম্পত্তি: শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি, শ্রদ্ধা ও সমাধান। পুনঃ পুনঃ দোষদর্শনসহায়ে বিষয়সমূহ হইতে বিরক্ত হইয়া মনকে স্বলক্ষ্যে স্থির করার নাম **শম**। জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়-সমূহকে বিষয় হইতে প্রত্যাবৃত্ত করত স্ব-স্ব গোলকে (স্থানে) স্থাপনই **দম**। চিন্তা ও বিলাপরহিত হইয়া ও অপ্রতিকার-পূর্বক (প্রতিকারের চেষ্টা না করিয়া) শীত গ্রীষ্ম ক্ষুধা তৃষ্ণা ইত্যাদি দ্বন্দ্বসমূহকে শরীরের সামর্থ্য অনুযায়ী সহ্য করিবার যে শক্তি, তাহাকে **তিতিক্ষা** বলে। ধনজনাদি সাধনসহিত কর্মসকল ত্যাগ করিয়া ও বিষয়কে বিষবৎ জ্ঞান করিয়া তাহা হইতে যে পরাঙ্‌মুখতা, তাহাই **উপরতি**। বাহ্যবিষয়ক কোন স্মৃতি না হওয়া—ইহাই উত্তম উপরতি। দৃঢ়-সত্যত্ববুদ্ধিপূর্বক গুরু ও বেদান্তবাক্যে বিশ্বাসের নাম **শ্রদ্ধা**। এই শ্রদ্ধাই জ্ঞানের মুখ্য কারণ। আহার-বিহারাদি সর্বকালে শুদ্ধ ব্রহ্মে বুদ্ধি-স্থাপনই **সমাধান**-নামে কথিত হইয়া থাকে। উহা কেবল কৌতূহলবশতঃ বেদান্তবাক্য শ্রবণাদি-সহায়ে চিত্তের সস্নেহ লালনমাত্র নহে।

চতুর্থ সাধন মুমুক্ষুত্ব: ব্রহ্মপ্রাপ্তি ও বন্ধননাশ—ইহাই মোক্ষের স্বরূপ। তত্ত্বজ্ঞানলাভপূর্বক অহঙ্কারাদি দেহ পর্যন্ত যাবতীয় অজ্ঞান-কল্পিত বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিবার ইচ্ছা **মুমুক্ষুত্ব**-নামে প্রসিদ্ধ। (বিবেকচূড়ামণিঃ ২০-২৮ দ্রষ্টব্য)।

২. *বিষয়, সম্বন্ধ, প্রয়োজন ও অধিকারী*—ইহাই অনুবন্ধচতুষ্টয়-নামে কথিত। **জীব ও** ব্রহ্মের অভেদ-প্রতিপাদনই বেদান্তের **বিষয়**। পরমানন্দ-প্রাপ্তি ও অনর্থ-নিবৃত্তিই **প্রয়োজন।** অজ্ঞান ও তৎকার্য—এই প্রপঞ্চই জন্মমরণরূপ দুঃখের হেতু বলিয়া অনর্থ। এই অনর্থের নিবৃত্তি ও আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মপ্রাপ্তিই মোক্ষ। তাহাই বেদান্তের মুখ্য প্রয়োজন। জ্ঞান অবান্তর প্রয়োজন বলা যাইতে পারে।

বেদান্তের সহিত ব্রহ্মের বোধ্য-বোধকভাব, প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদকভাব **সম্বন্ধ** বিদ্যমান। বেদান্ত—বোধক বা প্রতিপাদক এবং ব্রহ্ম—বোধ্য বা প্রতিপাদ্য। এইরূপে মোক্ষ ও অধিকারীর প্রাপ্য-প্রাপকভাব সম্বন্ধ, অধিকারী ও বেদান্তবিচারের মধ্যে কর্তৃ-কর্তব্যরূপ সম্বন্ধ ইত্যাদি জ্ঞাতব্য।

যে ব্যক্তি মলিনতাবিহীন ও বিক্ষেপশূন্য, কিন্তু যাঁহার আবরণরূপ অজ্ঞান রহিয়াছে, পূর্বোক্ত সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন সেই ব্যক্তিই বেদান্তের **অধিকারী**। 'অনু' অর্থাৎ পশ্চাৎ, **'বন্ধ'** অর্থাৎ সম্বন্ধ। যাহারা পরস্পর সম্বন্ধ থাকে, তাহারাই অনুবন্ধ-পদবাচ্য। যথা, এই বিষয়াদি-চতুষ্টয়। এইগুলি না জানিলে বিবেকী ব্যক্তির কোন গ্রন্থপাঠে প্রবৃত্তি হয় না।

৩. *মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার*—অন্তঃকরণ-চতুষ্টয়। সূক্ষ্ম পঞ্চভূতের মিলিত সত্ত্বাংশে ইহাদের উৎপত্তি হইয়া থাকে। বেদান্তমতে অন্তঃকরণ ব্যাপক বা অণুপরিমাণ নহে। ইহা মধ্যম পরিমাণ অর্থাৎ শরীরতুল্য পরিমাণ।

৪. সঙ্কল্প, অধ্যবসায়, অভিমান ও অনুসন্ধান—সঙ্কল্পাদি-চতুষ্টয়। কর্তব্যাকর্তব্যরূপে অনিশ্চিত চিন্তনই **সঙ্কল্প-বিকল্প**—ইহা মনের ধর্ম। কোন বিষয়ে নিশ্চয় করার নাম **অধ্যবসায়**—ইহা বুদ্ধির ধর্ম। দেহেন্দ্রিয়াদিতে আত্মাধ্যাস বশতঃ যে 'অহং'-বুদ্ধি, উহাই **অভিমানরূপ অহঙ্কার। বিষয়ানুসন্ধান** বা বিষয়-চিন্তন—ইহা চিত্তের ধর্ম।

বেদাশ্চত্বার এবাত্র প্রমাণানি তথৈব হি।
সমাধিনাশকং প্রোক্তং বিঘ্নানাং হি চতুষ্টয়ম্ ॥ ৩৫ ॥

বেদসকল,[১] প্রমাণসমূহ[২] এবং নির্বিকল্প সমাধির বিঘ্ননিচয়[৩] চতুর্বিধ প্রসিদ্ধ।

১. ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব—চতুর্বেদ। বেদ অর্থাৎ জ্ঞান, শ্রুতি, আম্নায়। মীনশরীরাবচ্ছেদে (মৎস্যরূপে) কথিত ভগবদ্‌বাক্যই বেদ—ইহা নৈয়ায়িকগণ বলেন। ধর্ম-ও ব্রহ্ম-প্রতিপাদক অপৌরুষেয় বাক্যই বেদ—ইহা মীমাংসকগণ বলেন। ব্রহ্মার মুখনিঃসৃত ধর্মজ্ঞাপক শাস্ত্রই বেদ—ইহা পৌরাণিকগণ বলেন।

ঋক্—একবিংশতিশাখাত্মক, নিয়তাক্ষরপাদবিশিষ্ট মন্ত্রসমূহই ঋগ্‌বেদ নামে কথিত হয়। পৈল ঋষি ইহার প্রবর্তক ও আয়ুর্বেদ ইহার উপবেদ।

যজুঃ—নবাধিকশতশাখাত্মক, অনিয়তাক্ষরপাদবিশিষ্ট, কৃষ্ণ ও শুক্ল—দুই ভাগে বিভক্ত, গীতিরহিত মন্ত্রবহুল বেদের নামই যজুর্বেদ। বৈশম্পায়ন ইহার প্রবর্তক। অস্ত্রাদিপ্রয়োগ-সংহার-জ্ঞাপক ধনুর্বেদ ইহার উপবেদ।

সাম—সহস্রশাখাময় ও গীতিবিশিষ্ট মন্ত্রবহুল বেদকে সামবেদ বলা হয়। জৈমিনি ইহার প্রবর্তক ও গান্ধর্ব বেদ ইহার উপবেদ।

অথর্ব—পঞ্চাশৎশাখাত্মক ও অভিচার-উচ্চাটনাদি-জ্ঞাপক বেদকে অথর্ববেদ বলা হইয়া থাকে। সুমন্ত ঋষি ইহার প্রবর্তক ও শিল্পশাস্ত্র ইহার উপবেদ।

[কর্ম, উপাসনা ও জ্ঞানাত্মক বেদ মন্ত্র অর্থাৎ সংহিতা এবং ব্রাহ্মণ-ভেদে দ্বিবিধ। আরণ্যক ব্রাহ্মণেরই অন্তর্গত। মন্ত্রের প্রয়োগই ব্রাহ্মণে থাকে। মন্ত্র শ্লোক (ঋক্), গদ্য (যজুঃ) ও গান (সাম)-ভেদে ত্রিবিধ। এই মন্ত্র-ব্রাহ্মণাত্মক বেদই যজ্ঞকালে পুরোহিতের কার্যানুসারে ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব ভেদে চতুর্বিধ হয়। যিনি ঋগ্‌বেদ পাঠ করেন, তাঁহাকে 'হোতা' বলে. যিনি যজুর্বেদের কার্য করেন, তাঁহাকে 'অধ্বর্যু' বলে; যজ্ঞকালে সামগানকারীকে 'উদ্‌গাতা' বলে। বিধি ও অর্থবাদ-ভেদে ব্রাহ্মণভাগও দ্বিবিধ। বিধি ত্রিবিধ, যথা—অপূর্ব, নিয়ম ও পরিসংখ্যা। গুণবাদ, অনুবাদ ও ভূতার্থবাদ-ভেদে অর্থবাদও ত্রিবিধ। এই ভূতার্থবাদ মধ্যেই বেদান্তের স্থান। ('অর্থসংগ্রহ' প্রভৃতি মীমাংসা-গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)

বেদের তাৎপর্য প্রবৃত্তিতে নহে, কিন্তু নিবৃত্তিতে। বেদের প্রবৃত্তিবোধক বাক্যগুলিও পুরুষকে নিষিদ্ধ কর্ম হইতে নিবৃত্ত করত বিহিত কর্মে প্রবৃত্ত করাইয়া থাকে এবং যথাকালে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে সেই বিহিতকর্ম হইতেও নিবৃত্ত করিয়া পুরুষকে জ্ঞাননিষ্ঠ করে। অতএব বেদের সমস্ত বাক্যেরই তাৎপর্য নিবৃত্তিতে। সেইজন্য মনুও বলিয়াছেন,

'ন মাংসভক্ষণে দোষো ন মদ্যে ন চ মৈথুনে।
প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা॥'

এইরূপে দেখা যায় চারিবেদের মুখ্য তাৎপর্য জ্ঞেয় ব্রহ্মজ্ঞান, অবান্তর তাৎপর্য ধ্যেয় ব্রহ্মজ্ঞান ও কর্ম। চারি উপবেদের তাৎপর্যও ব্রহ্মজ্ঞানেই হইয়া থাকে। যথা—আয়ুর্বেদের তাৎপর্য বৈরাগ্যে। কারণ আয়ুর্বেদোক্ত রীতিতে রোগাদি নিবৃত্ত হইয়াও পুনরায় উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং লৌকিক উপায়গুলি তুচ্ছ—ইহা প্রতিপাদন করাই আয়ুর্বেদের তাৎপর্য। এইরূপে বৈরাগ্য উৎপাদন দ্বারা ইহা ব্রহ্মজ্ঞানের হেতু হইয়া থাকে। ধনুর্বেদ দুষ্টজন হইতে প্রজাপালনরূপ ক্ষত্রিয়ধর্মের জ্ঞাপক। ইহাও অন্তঃকরণশুদ্ধি দ্বারা জ্ঞানোৎপত্তি করত মোক্ষজনক হয়। অতএব মোক্ষই ইহার তাৎপর্য। দেবতার আরাধনা ও নির্বিকল্প-সমাধির সিদ্ধিই গান্ধর্ব বেদের প্রয়োজন। সুতরাং চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদনপূর্বক জ্ঞানোৎপাদন দ্বারা মোক্ষই গান্ধর্ব বেদের তাৎপর্য। শিল্পশাস্ত্রাদি ধনপ্রাপ্তির উপায়-বোধক। কিন্তু কুশল ব্যক্তিরও দৈব অনুকূল না হইলে ধনপ্রাপ্তি হয় না। সুতরাং ইহারও তাৎপর্য বৈরাগ্যে, কারণ সদুপায়ে উপার্জিত অর্থও ভোগ করিতে করিতে ক্রমশঃ ভোগের অনিত্যতা জ্ঞান হয় ও বৈরাগ্যের উদয় হয়। এইরূপে শিল্পশাস্ত্রাদিও বৈরাগ্যদ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানে পর্যবসিত হইয়া থাকে।]

২. প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ—প্রমাণচতুষ্টয়। ইহা ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনের মত। বেদান্তমতে প্রমাণ ছয়টি : পূর্বোক্ত চারটি এবং অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধি।

৩. বিঘ্নচতুষ্টয় :—লয়, বিক্ষেপ, কষায় ও রসাস্বাদ—এই চারিটিই নির্বিকল্প সমাধি-লাভের পথে বিঘ্নস্বরূপ। চিত্তবৃত্তির নিদ্রাই লয়। এতদ্ভিন্ন আর একপ্রকার লয় আছে। যমনিয়মাদি অষ্টাঙ্গ-সহিত নির্বিকল্প-সমাধি অভ্যাস-সহায়ে তপ্তলৌহে প্রক্ষিপ্ত জলবিন্দুর ন্যায় অথবা তৈলরহিত নির্বাপিত দীপকলিকার ন্যায় প্রত্যগভিন্ন পরমানন্দস্বরূপ ব্রহ্মে চিত্তবৃত্তির

লয়। **ইহা** অবশ্য কাম্য। ইহা বিঘ্নরূপ নহে। আলস্যবশতঃ বাহ্য শব্দাদিবিষয়গ্রহণে **অশক্ত হইয়া** এবং প্রত্যগাত্মস্বরূপ চিন্তনেও অসামর্থ্যহেতু মূর্ছার ন্যায় চিত্তবৃত্তির অজ্ঞানে **লয়**-রূপ নিদ্রাই সমাধি-লাভের পথে বিঘ্ন। চিত্তবৃত্তির আত্মভিন্ন অন্যবস্তুর আলম্বনই **বিক্ষেপ**। সূক্ষ্মরাগাদিবশতঃ জড়ীভাব অর্থাৎ চিত্তবৃত্তির স্তব্ধীভাব **কষায়** নামে খ্যাত। বিক্ষেপ ও কষায়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, অন্তঃকরণের ব্যহ্য বিষয়াকার বৃত্তিকে বিক্ষেপ বলে, আর যে-স্থলে প্রযত্ন দ্বারা অন্তঃকরণ-বৃত্তি অন্তর্মুখ হইয়াও রাগাদির উদ্ভূত সংস্কার-বশতঃ রুদ্ধ হইয়া পড়ে, ব্রহ্মাকারে আকারিত হয় না, তাহাকে কষায় বলে। বিক্ষেপ ও কষায় দোষ নিবৃত্তির উপায়—বিষয়ের মিথ্যাত্বজ্ঞান ও দোষদর্শন-অভ্যাস। বিষয়কে মিথ্যা, ইন্দ্রজাল বা স্বপ্নসম জ্ঞান করা অর্থাৎ বিষয় নাই অথচ দৃষ্ট হইতেছে—এইরূপ বুঝা। এই জ্ঞান অভ্যস্ত হইলে চিত্ত আর বিক্ষিপ্ত হয় না। শুধু বিষয়ে দোষদর্শন, বিষয়কে নশ্বর বা দুঃখদ-মাত্র জ্ঞান করিলেই হইবে না, কিন্তু বিষয় মিথ্যা—এই জ্ঞান করিতে হইবে। অনিত্যতাদিজ্ঞানে সত্যতাবুদ্ধি থাকে, সুতরাং রাগাদি দূর হয় না। কিন্তু মিথ্যাজ্ঞানে সত্যতাবুদ্ধি থাকে না ও তাহাতে রাগাদির সংস্কার আর উদ্ভূত হইতে পারে না।

নির্বিকল্প-সমাধি আরম্ভ সময়ে সবিকল্প আনন্দের আস্বাদন অথবা বিক্ষেপ-নিবৃত্তিজনিত আনন্দানুভবই **রসাস্বাদন**-নামে খ্যাত। যোগীর ব্রহ্ম-স্বরূপতা লাভের পূর্বে ব্রহ্মানন্দের একটা অনুভব হয়। ইহার সঙ্গে বিক্ষেপরূপ দুঃখের নিবৃত্তিরও অনুভব হইয়া থাকে। দুঃখ-নিবৃত্তি হইতেও আনন্দানুভব হয়। এই আনন্দানুভবের উপর লক্ষ্য পতিত হইলে উহাই নির্বিকল্প সমাধির **রসাস্বাদ**-নামক বিঘ্ন বলিয়া কথিত হয়। সবিকল্প-সমাধির অবসানে এবং নির্বিকল্প-সমাধির প্রারম্ভে সবিকল্প-সমাধির সোপাধিক আনন্দকে সাধক ত্যাগ করিতে পারে না। উহাও রসাস্বাদরূপ বিঘ্ন। নির্বিকল্প-সমাধির যে নিরুপাধিক আনন্দ, তাহা জ্ঞাতা-জ্ঞান-জ্ঞেয়রূপ ত্রিপুটী সহায়ে অনুভূত হয় না। উহা আনন্দস্বরূপ বা অনুভূতি-স্বরূপ।

চতুর্বিধং হি মৈত্র্যাদি ভূতগ্রামশ্চতুর্বিধঃ।
চতুষ্টয়ং তথা ব্রহ্মবিদাদীনাং প্রকীর্তিতম্ ॥ ৩৬ ॥

মৈত্রী[১]-আদি, প্রাণিসমূহ[২] এবং ব্রহ্মবিদ্‌গণের[৩] চতুর্বিধ ভেদ কথিত হইয়া থাকে।

১. মৈত্রী-আদি চতুষ্টয়ঃ মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা। সুখীর প্রতি **মৈত্রী**-ভাবনা, দুঃখীর প্রতি **করুণা**, পুণ্যবান্‌দর্শনে **মুদিতা** অর্থাৎ প্রীতি এবং পাপাচারীদের প্রতি উপেক্ষা-ভাবনার দ্বারা চিত্তের প্রশান্তি লাভ হইয়া থাকে। (যোগসূত্র ১।৩৩ দ্রষ্টব্য)

২. চতুর্বিধ প্রাণীঃ **জরায়ুজ**—মনুষ্যাদি, **অণ্ডজ**—পক্ষী আদি, **স্বেদজ**—যূক, মশকাদি এবং **উদ্ভিজ্জ**—বৃক্ষগুল্মাদি।

৩. ব্রহ্মবিদ্-চতুষ্টয়ঃ ব্রহ্মবিৎ, ব্রহ্মবিদ্‌বর, ব্রহ্মবিদ্‌বরীয়ান্ এবং ব্রহ্মবিদ্‌বরিষ্ঠ।

হংসঃ পরমহংসশ্চ কুটীচকো বহূদকঃ।
ইতি চতুর্বিধাঃ প্রোক্তা ন্যাসিনস্তু বিবেকিভিঃ ॥ ৩৭ ॥

বিবেকীরা হংস, পরমহংস, কুটীচক ও বহূদক ভেদে চারিপ্রকার সন্ন্যাস[১] গণনা করিয়াছেন।

১. বৈরাগ্যের তারতম্যানুসারে শাস্ত্র এই চারিপ্রকার সন্ন্যাসের বিধান করিয়াছেন। যে তীব্র বৈরাগ্যবান্ পুরুষের শরীর তীর্থযাত্রাদি করিতে অসমর্থ, তাঁহার **কুটীচক**-সন্ন্যাসে অধিকার। আর যাঁহার সেরূপ সামর্থ্য আছে, তিনি **বহূদক**-সন্ন্যাসের অধিকারী। তীব্রতর বৈরাগ্যবান্ পুরুষ **হংস**-সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া থাকেন। প্রত্যগাত্মজ্ঞানলাভে তিনগুণের পরিণামরূপ ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সর্ববিষয়ে তৃষ্ণারাহিত্যরূপ পরবৈরাগ্যবান্ পুরুষই **পরমহংস**-সন্ন্যাসের অধিকারী। এই চতুর্বিধ সন্ন্যাসীর পক্ষেই দশটি সাধারণ ব্রত পালনীয়, যথা: অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য, অপরিগ্রহ, অক্রোধ, গুরুশুশ্রূষা, শৌচ, নিষিদ্ধ আহার ত্যাগ এবং কায়মনোবাক্য দ্বারা প্রমাদ-বর্জন।

বাগ্‌রোধো নির্মমত্বঞ্চাহংকারশূন্যতা তথা।
মহত্তত্ত্বস্য চাভাবশ্চতস্রো ভূমিকা মতাঃ ॥ ৩৮ ॥

বাঙ্‌নিরোধ, নির্মমত্ব, অহংকারশূন্যতা ও মহত্তত্ত্ব-রাহিত্য—অসংপ্রজ্ঞাত সমাধির এই চারিটি অবস্থা[১] বর্ণিত হইয়া থাকে।

১. বিদ্যারণ্য স্বামী প্রভৃতি কেহ কেহ বলেন, ক্লেশ বা দৃষ্টদুঃখ অর্থাৎ চিত্তবিক্ষেপের নিবৃত্তির জন্য তত্ত্ববিদেরও অসংপ্রজ্ঞাত সমাধি-অভ্যাসের প্রয়োজন আছে। এই সমাধি-অভ্যাস-বলে গবাশ্বাদির ন্যায় তাঁহার **বাঙ্‌নিরোধ** হইলে উহাকে প্রথম ভূমি বলে। বাল-মূকাদির ন্যায় **নির্মমত্ব** অবস্থাকে দ্বিতীয় ভূমি বলে। তন্দ্রার ন্যায় **অহঙ্কার-রাহিত্যই** তৃতীয় ভূমি এবং সুষুপ্তির ন্যায় **মহত্তত্ত্ব-রাহিত্যই** চতুর্থ ভূমি। এই অভিপ্রায়েই গীতাতে ভগবান 'শনৈঃ শনৈরুপরমেৎ' (৬।২৫) ইত্যাদি বলিয়াছেন। তৃতীয় ভূমিতে বিশেষ অহঙ্কার বা অহংবোধ থাকে না কিন্তু সামান্য অহঙ্কার সূক্ষ্মরূপে থাকে। ত্রিপুটী অজ্ঞাতরূপে থাকে। চতুর্থ ভূমিতে ঐ সামান্য অহঙ্কারও থাকে না অর্থাৎ অজ্ঞাত-ত্রিপুটীও থাকে না। সুতরাং এ অবস্থা হইতে আর ব্যুত্থান হয় না।

শীত উষ্ণো মৃদুশ্চৈব কাঠিন্যং চেতি ভেদতঃ।
স্পর্শশ্চতুর্বিধো জ্ঞেয়শ্চতস্রো যুক্তয়স্তথা ॥ ৩৯ ॥

শীত, উষ্ণ, মৃদু ও কঠিন ভেদে স্পর্শ চারি প্রকার এবং চিত্তনিরোধের যুক্তি[১]সকলও চারি প্রকার বিজ্ঞাতব্য।

১. অধ্যাত্মবিদ্যাধিগম অর্থাৎ পরমার্থ-বিষয়ক সগুণ বা নির্গুণ বিদ্যার অভ্যাস, সাধু-সঙ্গম বাসনা-পরিত্যাগ এবং প্রাণস্পন্দ-নিরোধ—ইহারাই চিত্তজয়ের চারিটি উপায়। পূর্ব পূর্ব উপায়ে চিত্তের দৃঢ় একাগ্রতা সম্পাদিত না হইলে উত্তরোত্তর সাধনে প্রবৃত্তি আবশ্যক, এইরূপ বোদ্ধব্য। চিত্তজয়ের এইরূপ স্বাভাবিক ও সরল উপায় বিদ্যমান থাকিতে জোরপূর্বক চিত্ত-নিয়মন করিবার প্রয়াস অকর্তব্য। অধ্যাত্মবিদ্যাধিগম অর্থাৎ **বিচার** দ্বারা দৃশ্য মিথ্যা ও দ্রষ্টা চিদ্‌বস্তুই সত্য—এইরূপ বোধ হইলে স্বগোচর দৃশ্যবস্তুতে প্রয়োজনাভাব-বশতঃ চিত্ত আর ধাবিত হয় না এবং স্বপ্রকাশ চিদাত্মতত্ত্বও চিত্তের গোচর বা বিষয় নহে—ইহা জানিয়া নিরিন্ধন অগ্নির ন্যায় চিত্ত স্বয়ংই উপশান্ত হইয়া যায়।

বোধিত হইয়াও অথবা বিস্মৃতি-বশতঃ যিনি সম্যক্ তত্ত্বাবধারণ করিতে অসমর্থ, তাঁহার জন্য **সাধুসঙ্গম** বিহিত। সাধুগণ পুনঃ পুনঃ তত্ত্ববোধন ও স্মরণ করাইয়া থাকেন। বিদ্যামদাদি দুর্বাসনাপীড়িত হইয়া সাধুদিগের উপদেশ-পালনে অসমর্থ হইলে বিবেকাদি-সহায়ে **বাসনা-পরিত্যাগ**-চেষ্টা কর্তব্য। অতিপ্রাবল্য-হেতু বাসনাও পরিত্যাগ করিতে না পারিলে তখন প্রাণস্পন্দনিরোধ অর্থাৎ প্রাণায়ামাদি দ্বারা চিত্তনিরোধ কর্তব্য।

(বিস্তৃত ব্যাখ্যা গীতা ৬।৩৫ মধুসূদনী টীকা দ্রষ্টব্য)

বৈরাগ্যমাদ্যং যতমানসংজ্ঞকং
কচিদ্ বিরাগো ব্যতিরেকসংজ্ঞকম্।
একেন্দ্রিয়াখ্যং হৃদিরাগমোক্ষ-
স্তস্যাপ্যভাবং তু বশীকৃতাখ্যম্॥ ৪০॥

যতমান[১], *ব্যতিরেক*[২], *আসক্তি-নিরোধের প্রযত্নরূপ একেন্দ্রিয়*[৩] ও *বিষয়েচ্ছার একান্ত* অভাবরূপ বশীকার[৪]—এইরূপ ভেদে বৈরাগ্য চতুর্বিধ।

১. সংসারে সার বস্তু কি ও অসার বস্তু কি?—ইহা গুরু ও শাস্ত্রসহায়ে জানিব, এইরূপ উদ্যোগের নাম **যতমান বৈরাগ্য**।

২. চিত্তগত রাগদ্বেষাদির এতগুলি নিবৃত্ত হইয়াছে এবং এতগুলি এখনও রহিয়াছে—চিকিৎসকের ন্যায় এইরূপ বিচারকে **ব্যতিরেক বৈরাগ্য** বলে।

৩. ঐহিক ও পারত্রিক বিষয়-প্রবৃত্তি দুঃখাত্মক বোধ-পূর্বক বহিরিন্দ্রিয় প্রবৃত্তিরহিত হইলেও ঔৎসুক্যবশতঃ বিষয়তৃষ্ণা চিত্তে বিদ্যমান থাকিলে উহা **একেন্দ্রিয় বৈরাগ্য** নামে অভিহিত হয়।

৪. ইহ ও পরলোকের যাবতীয় বিষয় নাশবান্ জানিয়া মনেও তৎতৃষ্ণা ত্যাগকরত প্রসন্নচিত্তবৃত্তিপরায়ণ হইবার প্রযত্ন **বশীকার বৈরাগ্য** নামে কথিত হইয়া থাকে। ইহা সবিকল্প-সমাধির অন্তরঙ্গ সাধন এবং নির্বিকল্প-সমাধির বহিরঙ্গ সাধন।

এই চারিপ্রকার বৈরাগ্যকে 'অপর বৈরাগ্য' বলে। বশীকার বৈরাগ্যও মন্দ, তীব্র ও তীব্রতর ভেদে ত্রিবিধ। মন্দ বৈরাগ্যবান্ পুরুষের সন্ন্যাসে অধিকার নাই। তীব্র বৈরাগ্যবান্ পুরুষের পক্ষেই কুটীচক এবং বহূদক সন্ন্যাস বিহিত। তীব্রতর বৈরাগ্যবান্ পুরুষ হংস সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া থাকেন। প্রথমোক্ত যতমানাদি ত্রিবিধ বৈরাগ্যবান্ পুরুষেরও সন্ন্যাসে অধিকার নাই।

এই সকল হইতে ভিন্ন পরবৈরাগ্যবান্ পুরুষই পরমহংস সন্ন্যাসের অধিকারী। প্রত্যগাত্ম-জ্ঞান সহায়ে তিনগুণের পরিণাম ঐহিক ও পারলৌকিক সর্ববিষয়ে তৃষ্ণারাহিত্যের নামই 'পরবৈরাগ্য' (পাতঞ্জল যোগসূত্র—১।১৬ দ্রষ্টব্য)। এই বৈরাগ্যই নির্বিকল্প-সমাধির অন্তরঙ্গ সাধন। (বৈরাগ্যের প্রকারভেদ-বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ গীতা ৬।৩৫ মধুঃ টীকার শেষাংশ দ্রষ্টব্য)।

মোক্ষদ্বারে দ্বারপালাশ্চত্বারঃ পরিকীর্তিতাঃ।
শমো বিচারঃ সন্তোষশ্চতুর্থঃ সাধুসঙ্গমঃ ॥ ৪১ ॥

মোক্ষপুরীর প্রবেশদ্বারে চারিটি দ্বারপাল কথিত হইয়াছে, যথা, শম[১], বিচার[২], সন্তোষ[৩] ও চতুর্থ সাধুসঙ্গ[৪]।

১. **শম** অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদি সংযম। মিথ্যাত্ব, বিনাশিত্বাদি দোষদর্শনপূর্বক বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়াদির নিবৃত্তি ও স্বলক্ষ্যে স্থাপন শম নামে কথিত হয়।

২. গুরুমুখে বেদান্তশ্রবণ অর্থাৎ একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্মাববোধনেই অখিল বেদান্তের তাৎপর্য—এইরূপ অবধারণ এবং সেই তাৎপর্য-নির্ণয়ানুকূল যুক্তিসহায়ে সত্যাসত্য বস্তুনির্ণয়ের নাম **বিচার**। 'বিচারাজ্জায়তে জ্ঞানং জ্ঞানান্মোক্ষোঽবাপ্যতে'—বিচার হইতে জ্ঞান জাত হয় এবং জ্ঞান দ্বারাই মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে। অর্থাৎ শ্রবণ-মননাদি দ্বারা সংশয়াদি প্রতিবন্ধ দূর হইলে বেদান্তোক্ত 'মহাবাক্য'-প্রভাবে অপরোক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং ঐ জ্ঞানদ্বারা অজ্ঞান-নিবৃত্তিপূর্বক মোক্ষলাভ হইয়া থাকে। জ্ঞানই মোক্ষপ্রাপ্তির একমাত্র মুখ্য সাধন। শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন অর্থাৎ বিচার—সংশয়-বিপর্যয়াদি নিবৃত্তি দ্বারা শোধক হয় মাত্র। মোক্ষলাভের পথে বেদান্তের নিজস্ব নিরপেক্ষ ও স্বতন্ত্র উপায়—বিচার। শমদমাদি-সাধন-চতুষ্টয়সম্পন্ন পুরুষই বেদান্তের অধিকারী, তিনিই বিচারের অর্থাৎ শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনের অধিকারী। 'অধিকারিণঃ প্রমিতিজনকো বেদঃ'—অধিকারী পুরুষের প্রতিই বেদ প্রমা বা যথার্থ জ্ঞানের জনক হইয়া থাকে। জ্ঞানপ্রতিবন্ধ নিবৃত্তির জন্য বিচার বেদান্তোক্ত মুখ্য সাধন। অতি-শুদ্ধান্তঃকরণ কৃতোপাসন অতি-উত্তম অধিকারীর গুরুমুখে বেদান্তোক্ত 'মহাবাক্য' শ্রবণমাত্রই জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। ব্যুৎপন্ন হইলেও চিত্তগত সংশয়াদিবশতঃ যাঁহাদের এইরূপ হয় না অর্থাৎ 'মহাবাক্য' শ্রবণমাত্র জ্ঞান উৎপন্ন হয় না, তাঁহাদের জন্যই বিচার বিহিত। বিচার-প্রভাবেই চিত্তদোষ নির্মূল হইয়া তাঁহাদের 'মহাবাক্য' দ্বারা জ্ঞানলাভ হয়। বিচারে অসমর্থ ও অব্যুৎপন্ন অধিকারীর জন্যই যোগ-অভ্যাস—ধ্যান, সমাধি-আদি অভ্যাস ও উপাসনাদি শ্রুতিতে বিহিত হইয়াছে। বর্তমান শ্লোকে কথিত অপর তিনটি সাধনই বিচারের সহায়ক বোদ্ধব্য।

'অপরোক্ষানুভূতিঃ'-নামক গ্রন্থে ভাষ্যকার ভগবান্ শ্রীশঙ্করাচার্য বলিয়াছেন :

এভিরঙ্গৈঃ সমাযুক্তো রাজযোগ উদাহৃতঃ।
কিঞ্চিৎপক্বকষায়াণাং হঠযোগেন সংযুতঃ ॥ ৪৩ ॥
পরিপক্বকষায়াণাং কেবলোঽয়ং চ সিদ্ধিদঃ ॥ ৪৪ ॥

—স্বাভিমত বিচারাত্মক রাজযোগ বর্ণনকরত আচার্য বলিতেছেন যে, কিঞ্চিৎপক্বকষায় অধিকারী হঠযোগ অর্থাৎ পাতঞ্জলোক্ত অষ্টাঙ্গ যোগসহ এই বিচার অভ্যাস করিলেই তদ্দ্বারা তাহার জ্ঞানলাভ হইবে। আর পরিপক্বকষায় উত্তম অধিকারীর পক্ষে কেবল এই বিচার-মার্গই জ্ঞানদ্বারা মোক্ষলাভের হেতু। তাঁহার জন্য যোগাভ্যাস অপেক্ষিত নহে।

প্রথমোক্ত কিঞ্চিৎপককষায় অধিকারীর জন্য ভাষ্যকার বিচার ও তৎসহ ধ্যান, সমাধি-আদি যোগাভ্যাসের বিধান করিলেন। এইরূপ অধিকারী শ্রবণ-মনন সহ ধ্যান, সমাধিরূপ নিদিধ্যাসন অভ্যাস করিয়া থাকেন।

'ভামতী'-টীকাকার শ্রীবাচস্পতি মিশ্রও বলিয়াছেন (ব্রঃ সূঃ ৩।৪।২৬), 'ব্রহ্মবিষয়ক প্রতিপত্তি বা জ্ঞান চারিপ্রকার। প্রথম—যে-জ্ঞান উপনিষদ্বাক্য শ্রবণ-দ্বারাই হইয়া থাকে, যাহাকে শ্রবণ বলে। ইহাদ্বারা প্রমাণগত-সংশয়-নিবৃত্তি হয়। দ্বিতীয়—মীমাংসা অর্থাৎ যুক্তিদ্বারা পূর্বশ্রুত উপনিষদ্বাক্য হইতেই যে-জ্ঞান উৎপন্ন হয়, যাহাকে মনন বলা হয়। ইহাদ্বারা প্রমেয়গত-সংশয়-নিবৃত্তি হইয়া থাকে। তৃতীয়—সন্ততময়ী চিন্তা, যাহাকে ধ্যান বা নিদিধ্যাসন বলে। দৃঢ় নিদিধ্যাসন দ্বারা প্রমাতৃগত-সংশয়াদির নিবৃত্তি হইলে তৎপশ্চাৎ চতুর্থ—বৃত্তিরূপা সাক্ষাৎকার—অখণ্ডাকারা চরমবৃত্তির উদয় হইয়া থাকে, যাহা হইতে মোক্ষের আর কোন ব্যবধান বা অন্তরায় থাকে না। বিদিতপদ-পদার্থ তথা বাক্যগতিবিষয়ক যুক্তিকুশল পুরুষেরই প্রথম দুইপ্রকার জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং ঐ দুইপ্রকার জ্ঞান হইতেই **চিন্তাময় অর্থাৎ ধ্যানরূপ তৃতীয় জ্ঞানের উদয় হয়**। ঐ ধ্যান বা নিদিধ্যাসন সাদরে নিরন্তর দীর্ঘকাল অভ্যাস করিলে **সাক্ষাৎকাররূপ দৃঢ় ও চতুর্থ জ্ঞানের বিকাশ হয়**। ঐ জ্ঞান স্বোৎপত্তিক্ষণেই অজ্ঞান বিনাশপূর্বক মোক্ষপ্রাপ্তি করাইয়া থাকে।'

অধিকাংশ অধিকারী এই প্রকারেই তত্ত্বসাক্ষাৎকারপূর্বক কৃতকৃত্য হইয়া থাকেন। বলাবাহুল্য যে 'ভামতী'-কারোক্ত প্রথম তিনটি জ্ঞানই পরোক্ষরূপ ও সাধনকোটির অন্তর্ভুক্ত। এই তিনটি সহায়ে মহাবাক্যোত্থ সাধ্যকোটির চতুর্থজ্ঞান, ফলীভূত বোধ বা অপরোক্ষ সাক্ষাৎকার উৎপন্ন হয়। চরমবৃত্তিতে অভিব্যক্ত চৈতন্যদ্বারা অবিদ্যা তৎক্ষণেই নাশ হয় এবং ঐ অভিব্যক্ত চৈতন্য ও অনভিব্যক্ত অধিষ্ঠান-চৈতন্যের একত্বও তৎকালেই সাধিত হয়। ইহাই অপরোক্ষ জ্ঞান। কিঞ্চিৎপককষায় অধিকারীর কথা বলা হইল।

পরিপককষায় উত্তম অধিকারীর জন্য ভগবান ভাষ্যকার যোগাভ্যাস-নিরপেক্ষ কেবল বিচারের বিধান দিয়াছেন। এই যোগনিরপেক্ষ বিচারের পথে সাধকের কর্তব্য-বিষয়ে প্রমাণাদি প্রদর্শিত হইতেছে।

গীতার (৬।২৯) টীকায় আচার্য মধুসূদন বলিয়াছেন, 'চিত্তবৃত্তি-নিরোধরূপ যোগ যে-প্রকার সাক্ষিসাক্ষাৎকারের হেতু, বিচারদ্বারা সর্বজড়বস্তু হইতে সর্বানুস্যূত চৈতন্যকে পৃথক্ করাও তদ্রূপ নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র (বেদান্তের নিজস্ব) সাধন।' ভগবান বশিষ্ঠ বলিয়াছেন, 'যোগ ও বিচার চিত্তনাশের এই দুইটি পরস্পর-নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র উপায়। অধিকারিভেদে ইহাদের যে-কোন একটি সুকর সুসাধ্য হইয়া থাকে' ইত্যাদি।

চিত্তনাশ অর্থ—সাক্ষী হইতে তদুপাধিভূত চিত্তকে পৃথক্ করা ও চিত্তের অদর্শন। ইহা করিবার একটি উপায় যোগ বা অসংপ্রজ্ঞাত সমাধির অভ্যাস। দ্বিতীয় উপায়—সাক্ষীতে কল্পিত সর্বদৃশ্য মিথ্যা বলিয়া বস্তুতঃ নাই, কেবল একমাত্র মৎস্বরূপভূত সাক্ষী চৈতন্যই পরমার্থ সত্য বস্তু বিদ্যমান—এইরূপ বিচার। প্রথম উপায়টি জগৎসত্যত্ববাদী যোগিগণ অবলম্বন

করিয়া থাকেন। তাহাদের পক্ষে পরমার্থতঃ সত্য চিত্তের অদর্শনপূর্বক সাক্ষী-দর্শনে চিত্তনিরোধ ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই।

আচার্য শ্রীশঙ্করপদানুগ, শ্রুত্যেকশরণ, জগৎমিথ্যাত্ববাদী বেদান্তিগণ কিন্তু দ্বিতীয় উপায়টি গ্রহণ করিয়া থাকেন। সর্বাধিষ্ঠান চৈতন্যের জ্ঞান দৃঢ় হইলে চৈতন্যে কল্পিত ও বাধিত চিত্ত এবং চিত্তদৃশ্যের অদর্শন তাঁহাদের অনায়াসেই হইয়া থাকে। অতএব ভগবান শঙ্করাচার্য কোথাও ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য যোগাভ্যাসাপেক্ষা প্রতিপাদন করেন নাই। এই কারণেই শ্রুত্যেকশরণ সাধক পরমহংস সন্ন্যাসিগণ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের নিমিত্ত গুরুমুখে বেদান্তোপদেশ শ্রবণানন্তর একমাত্র বেদান্তবাক্য-বিচারেই প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, যোগমার্গে নহে। চিত্তগত যদি কিছু সংশয়াদি দোষ এই অধিকারীর বিদ্যমান থাকে, তাহাও এই বিচারের প্রভাবেই বিনষ্ট হইয়া যায় (তজ্জন্য তাহার ধ্যানসমাধি-আদি অভ্যাসের প্রয়োজন হয় না) ইত্যাদি।

'জীবন্মুক্তিবিবেক'-গ্রন্থে মনোনাশ-প্রকরণে শ্রীবিদ্যারণ্য বলিয়াছেন : চিত্তনিরোধরূপ যোগের দ্বারা সাক্ষী অর্থাৎ শোধিত 'ত্বং' পদার্থের সাক্ষাৎকার হইলেও পুনঃ সেই সাক্ষীর ব্রহ্মত্ব বোধন করাইবার জন্য 'মহাবাক্য' সহায়ে ব্রহ্মজ্ঞান-নামক বৃত্ত্যন্তর উৎপন্ন হইয়া থাকে। শুদ্ধ 'ত্বং' পদার্থ সাক্ষাৎকারে নিরোধ-সমাধিই একমাত্র উপায় নহে, চিদ্-জড়-বিবেকদ্বারাও সাক্ষীকে পৃথক্ করা হইলে ঐ সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে।

আচার্য মধুসূদন তদ্‌রচিত গীতার টীকায় (৬।১৯) বলিয়াছেন, 'যোগের দ্বারা চিত্তের আত্মাকারতা সম্পাদিত হয় না। কিন্তু স্বতই আত্মাকার 'সৎ'-এর অনাত্মাকারতা নিবৃত্ত হইয়া থাকে মাত্র।'

জ্ঞানযোগ-প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন :

যে জ্ঞানী জ্ঞানযোগ ধরে আছে, সে 'নেতি' 'নেতি' এই বিচার করে—ব্রহ্ম এ নয়, ও নয়; জীব নয়, জগৎ নয়। বিচার করতে করতে যখন মন স্থির হয়, মনের লয় হয়, তখন ব্রহ্মজ্ঞান।

বিচারপথেও তাঁকে পাওয়া যায়, একেই জ্ঞানযোগ বলে। কিন্তু বিচারপথ বড় কঠিন। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা—এই বোধ ঠিক হ'লে মনের লয় হয়, সমাধি হয়।

বিচার করিতে করিতে মন আপনিই স্থির—একাগ্র হইয়া ব্রহ্মাকারা বৃত্তিতে স্থিত বা সমাহিত হইয়া পড়ে। ইহাই সমাধি। কিন্তু এই সমাধি যোগশাস্ত্রোক্ত প্রত্যাহার-ধারণাদি সহায়ে নিরোধরূপা নহে।

বিচারপথে সাধক পুনঃ পুনঃ শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনমাত্র করিয়া থাকেন। অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ বেদান্তশ্রবণ দ্বারা প্রমাণগত-সংশয়াদি নিবৃত্ত হইবার পর সাধক প্রমেয়গত-সংশয়াদি নিবৃত্তির জন্য পুনঃ পুনঃ মনন অভ্যাস করিয়া থাকেন। তদনন্তর প্রমেয়গত-সংশয় নিবৃত্ত হইলে প্রমাতৃগত-সংশয় দূর করিবার জন্য অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ না হওয়া পর্যন্ত পুনঃ পুনঃ নিদিধ্যাসন-মাত্র অভ্যাস করিয়া থাকেন। নিদিধ্যাসন অর্থ প্রসিদ্ধ ধ্যান নহে। উহা সম্যক্ জ্ঞান। ধ্যানরূপ নিদিধ্যাসন নিম্নাধিকারীর জন্য বিহিত। শ্রবণ ও মননের সতত অভ্যাসের অনন্তর যে সম্যক্ নিশ্চয় বা জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাই নিদিধ্যাসন। বার্তিককার এই কথাই

বলিয়াছেন যে, নিদিধ্যাসন অর্থজ্ঞান না হইলে শ্রুতি 'শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ' (বৃহঃ উপঃ ২।৪।৫) বলিয়াই তদনন্তর অনুবাদ-বাক্যে 'দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেন' এইরূপ বলিতেন না। যথা,

'নিদিধ্যাসন শব্দেন সম্যগ্ জ্ঞানং বিবক্ষিতম্ ।
উক্তানুবচনে তস্য বিজ্ঞানেনেতি নির্ণয়াৎ ॥'—বৃহঃ বার্তিক, ১।৪।৮৯৯

অর্থাৎ 'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ' (বৃঃ ২।৪।৫) এই শ্রুতিতে নিদিধ্যাসন শব্দ দ্বারা সম্যক্ জ্ঞান বিবক্ষিত, ধ্যান নহে, কারণ অনুবাদ বাক্যে ঐ শ্রুতিরই পরবর্তী অংশে—'মৈত্রেয্যাত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেন ইদং সর্বং বিদিতম্' (বৃঃ—২।৪।৫—এই স্থলে) পূর্বোক্ত নিদিধ্যাসন শব্দ বিজ্ঞানরূপে নির্ণীত হইয়াছে।

'ধ্যানাশঙ্কানিবৃত্ত্যর্থং বিজ্ঞানেনেতি ভণ্যতে ।
নিদিধ্যাসনশব্দেন ধ্যানমাশঙ্ক্যতে যতঃ ॥'—বৃহঃ বার্তিক, ২।৪।১৩৩

অর্থাৎ যেহেতু নিদিধ্যাসন শব্দের দ্বারা ধ্যান অর্থ শঙ্কিত হইতে পারে, অতএব তাহা নিবৃত্তির জন্য শ্রুতি অনুবাদ-বাক্যে 'বিজ্ঞানেন' এইরূপ বলিয়াছেন। পুনঃ—

'অপরায়ত্তবোধো হি নিদিধ্যাসনমুচ্যতে ।
পূর্বয়োরবধিত্বেন তদুপন্যাস ইষ্যতে ॥' বৃহঃ বাঃ ২।৪।২১৭

অর্থাৎ শমাদিজ্ঞানযুক্ত যে সাধক শ্রবণ ও মনন সহায়ে মহাবাক্যার্থজ্ঞানের অন্তরায়সমূহ দূর করিয়াছেন, তাঁহারই সেই মহাবাক্য হইতে উৎপন্ন মহাবাক্যার্থের অনুভব কোন প্রযত্ন বিনাই হইতে থাকিলে তাহাকেই নিদিধ্যাসন বলে। এই জন্যই শ্রবণ-মননের অবধিরূপে নিদিধ্যাসন কথিত হইয়াছে। অর্থাৎ শ্রবণান্তর মননের শেষ মুহূর্তে যে নিশ্চয়রূপ অনুভবের উদয় হয়, তাহাই নিদিধ্যাসন। বার্তিক-কথিত নিদিধ্যাসন-শব্দিত এই সম্যক্ জ্ঞান অর্থ সম্যক্ বস্তু অবগাহী পরোক্ষ জ্ঞান। সর্বজ্ঞাত্ম-মুনিও 'সংক্ষেপশারীরক' গ্রন্থে প্রথমে ৩।৩৪৫ শ্লোকে লোকপ্রসিদ্ধ প্রযত্নসাধ্য ধ্যান বা সমাধিরূপ নিদিধ্যাসন ব্যাখ্যান করিয়া পরবর্তী শ্লোকে জ্ঞানরূপ নিদিধ্যাসন বলিয়াছেন, যথা—

'শ্রবণমননবুদ্ধ্যোর্জাতয়োর্যৎ ফলং তৎ
নিপুণমতিভিরুচ্চৈরুচ্যতে দর্শনায় ।
অনুভবনবিহীনা যৈবমেবেতি বুদ্ধিঃ
শ্রুতমননসমাপ্তৌ তন্নিদিধ্যাসনং হি ॥' সং শাঃ ৩।৩৪৬

শ্রবণমননের সমাপ্তিকালে সম্যক্ অনুষ্ঠিত (অর্থাৎ নিরন্তর ও সাদর অনুষ্ঠিত) উক্ত শ্রবণমনন হইতেই উৎপন্ন যে ফল বা জ্ঞান, উহাই প্রাজ্ঞগণকর্তৃক অপরোক্ষ সাক্ষাৎকারের সাধন নিদিধ্যাসনরূপে কথিত হইয়াছে। ঐ নিদিধ্যাসনরূপ জ্ঞান সাক্ষাৎ মহাবাক্য-জন্য ও ব্রহ্মানুভবত্বরহিত অর্থাৎ অপরোক্ষত্বরহিত এবং 'এবমেব'—ইহা এই প্রকারই, এইরূপ পরোক্ষনিশ্চয়াত্মক। ৩।৩৪৫ শ্লোকোক্ত সমাধিরূপ নিদিধ্যাসন পৃথক্ অনুষ্ঠেয়। কিন্তু জ্ঞানরূপ এই নিদিধ্যাসন পৃথক্ অনুষ্ঠেয় নহে। শ্রবণমননের সম্যক্ অনুষ্ঠানের দ্বারাই মননের সমাপ্তিকালে অপ্রযত্নে যে পরোক্ষ জ্ঞান, 'অপরায়ত্তো বোধঃ' অপ্রযত্নলভ্য জ্ঞান—

'এবমেবেতি বুদ্ধিঃ'—ইহা এই প্রকারই, এইরূপ নিশ্চয় জ্ঞান (যজ্ঞ সম্পাদন করত যজ্ঞকারী পুরুষের যেমন স্বর্গ অবশ্যম্ভাবী—এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাসের উদয় হয়, তদ্রূপ) উৎপন্ন হয়—অপরোক্ষ-সাক্ষাৎকারত্বরহিতা পরোক্ষ-নিশ্চয়রূপা বুদ্ধি—উহাই নিদিধ্যাসন (—রামতীর্থের টীকা অনুসারে)। উত্তমাধিকারী বিচারসমর্থ পুরুষ-ধুরন্ধরের জন্য এরূপ নিদিধ্যাসনই শ্রুতিবিহিত। এই নিদিধ্যাসন-শব্দিত পরোক্ষ সম্যক্ জ্ঞানই পরিপক হইলে সংশয়াদি যাবতীয় প্রতিবন্ধ দূর হইয়া যায় এবং তখন অপ্রতিবন্ধ মহাবাক্য হইতে অপরোক্ষ ব্রহ্মাত্মৈকত্ব সাক্ষাৎকার উৎপন্ন হইয়া থাকে। (সংশাঃ ৩।৩৪৭) শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন অভ্যাস দ্বারা চিত্ত যদি এক ক্ষণের জন্যও অখণ্ড ব্রহ্মাকার হয়, তবে তৎক্ষণেই মূলাজ্ঞান নাশ হইয়া থাকে। চিত্ত পরমুহূর্তে বিষয়াকার হইতে পারে, কারণ উহা তাহার স্বভাব। যদি ব্রহ্মাকারা বৃত্তিতে স্থিত হইয়া কেহ ভূমিকারূঢ় হইতে চান, তবে সমাধি অভ্যাস প্রয়োজন হইবে। উহা না করিলেও তাঁহার কোন ক্ষতি নাই। কারণ ঐ জ্ঞানপ্রভাবে তিনি চিরমুক্ত। তাঁহাকে আর পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে না। তিনি জীবন্মুক্ত। প্রারব্ধ ভোগাবসানে দেহপাতের অনন্তর তিনি বিদেহকৈবল্য লাভ করিয়া থাকেন। •

৩. যদৃচ্ছালাভেই তৃপ্তি বা অধিক ভোগলাভার্থ আকাঙ্ক্ষার অভাবই **সন্তোষ**।

৪. তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের সঙ্গই **সাধুসঙ্গ**। তাঁহাদের সঙ্গে ও উপদেশে মুমুক্ষুর বিষয়-বাসনা ক্ষীণ হয় ও তত্ত্ববস্তু-লাভের জন্য উদ্যম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া পরম কল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে। (মোক্ষদ্বারে চারিটি দ্বারপাল—যোগবাশিষ্ঠঃ মুমুক্ষু প্রঃ ১৩-১৬ সর্গ দ্রষ্টব্য)।

[চতুর্বিধ সংজ্ঞা সমাপ্ত]

শ্রীমৎ তোতাপুরী মহারাজের গুরুর মঠ

স্বামী অলোকানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সন্ন্যাসী গুরু শ্রীমৎ তোতাপুরী মহারাজের গুরুর মঠের উল্লেখ দেখিতে পাই এবং উহা কুরুক্ষেত্রের নিকট লুধিয়ানা নামক স্থানে ছিল (গুরুভাব পূর্বার্ধ—৮ম অ.)। দক্ষিণেশ্বরকালীমন্দির হইতে চলিয়া যাইবার পর শ্রীমৎ তোতাপুরী মহারাজের আর কোন সংবাদই পাওয়া যায় না।

ঐ মঠ দর্শন করিবার জন্য বহু দিন হইতে মনে আকাঙ্ক্ষা ছিল, কিন্তু এতদিন তাদৃশ সুবিধা-সুযোগ ঘটে নাই। সম্প্রতি ৩১.৮.৬২ ঐ মঠ দর্শন করিয়া আসিলাম। ঐ স্থানটি দর্শন করিতে হইলে সর্বপ্রথম কয়থলে যাইতে হইবে। ওখান হইতে ঐ স্থান ৭।৮ মাইল দূরে অবস্থিত। কয়থল আম্বালা সিটি হইতে ৪৮ মাইল; বাসে যাইতে হয়। আম্বালা সিটির বাসের আড্ডা হইতে সামান্য দূরে কয়থল যাইবার বাসের আড্ডা। বাসে মাত্র আড়াই ঘণ্টা সময় লাগে। ভাড়া দু-টাকা দু-আনা। কয়থল-শহরের প্রবেশ-পথেই যাত্রীদিগকে নামাইয়া দেয়। ওখান হইতে রিক্সায় বা পায়ে হাঁটিয়া যাত্রীরা সাধারণতঃ শহরে যায়।

শহরে একটু প্রবেশ করিলেই রাস্তার দক্ষিণ দিকে লম্বা জলাশয় এবং তাহার তীরে বহু মন্দির-সমন্বিত দুইটি প্রাচীন মঠ। ঐ মঠের প্রবেশ-দ্বার শহরের পার্কের গা ধরিয়া যে রাস্তা গিয়াছে সেই দিকে। প্রথমটি বাবা শীতল-পুরীর এবং দ্বিতীয়টি বাবা রাজপুরীর মঠ নামে প্রসিদ্ধ। ওখানে যে-কোন সম্প্রদায়ের সাধু যত দিন ইচ্ছা থাকিতে পারেন। আশ্রমে তাঁহাদের 'ভিক্ষা'র ব্যবস্থা আছে।

কয়থল হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে বরাবর সোজা ৭।৮ মাইল দূরে লাধানা-নামক এক গ্রাম। রাস্তা চওড়া কিন্তু কাঁচা। সম্প্রতি উহা তৈয়ার হইয়াছে। রাস্তায় বর্ষাকালে মাঝে মাঝে জল-কাদা হয়। সেইজন্য গরুর গাড়ি পর্যন্ত চলাচলের অসুবিধা। কয়থল-শহরে যাহারা যাতায়াত করে তাহারা সাধারণতঃ সাইকেলে, পায়ে হাঁটিয়া অথবা ঘোড়ায় চড়িয়া। ইহা ব্যতীত আর অন্য কোন উপায় নাই। শীতকালে বা অন্য সময় যখন কাদা শুকাইয়া যায়, তখন মোটর-গাড়িতে যাওয়া যায়।

ঐ লাধানা-নামক গ্রাম হইতে বাম দিকে প্রায় আধ মাইল দূরে সম্পূর্ণ লোকালয়-বর্জিত স্থানে শ্রীমৎ তোতাপুরী মহারাজের গুরুজীর মঠ অবস্থিত। কয়থলে যে মঠ আছে, উহাও তাঁহারই; আর বাবা শীতলপুরীও ঐ মঠেরই সাধু ছিলেন। স্থানটির স্থানীয় নাম -- বাব্বেকা লাধানা অর্থাৎ সাধু মহারাজের লাধানা। মঠের নাম—'বাবা রাজপুরীকা মঠ' অর্থাৎ রাজপুরী মহারাজের মঠ।

বর্তমানে মঠের অতিশয় জীর্ণ অবস্থা! এক কালে ইহার যে অতিশয় গাম্ভীর্য ও সৌন্দর্য ছিল, ভগ্নাবশেষগুলি তাহারই সাক্ষ্য দিতেছে। প্রকাণ্ড বড় চক্‌মিলানো একতলা বাড়ি। ইহার মধ্যে বহুসংখ্যক প্রকোষ্ঠ আছে। বাড়ির ছাদ সব ধসিয়া পড়িয়া গিয়াছে। কেবলমাত্র দেওয়ালগুলি দাঁড়াইয়া আছে। যে ২।৩টি বাড়ির ছাদ আছে, তাহাও প্রায় পতনোন্মুখ।

আশ্রমের পশ্চিম দিকে একটি মাঝারি ধরনের পুকুর; বাঁধা ঘাট এবং স্ত্রী ও পুরুষদের জন্য পৃথক্ স্নানের ঘাট। জল পূর্বে হয়তো স্বচ্ছ ছিল, কিন্তু এখন উহা তত ভাল নয়। আশ্রমের মধ্যে দুইটি বড় কুয়া আছে। একটির জলই ব্যবহার করা হয়। জল সুপেয়।

আশ্রম-প্রাঙ্গণে মোট পাঁচটি মন্দির আছে। প্রথমটি ধুনির মন্দির। এটিই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও উচ্চ। এটির মধ্যে সর্বদাই ধুনি জ্বালানো থাকে। বোধ হয় নাগা সন্ন্যাসীর মঠ, সেইজন্য ধুনির এত সম্মান। দ্বিতীয়টি শিবের মন্দির। তৃতীয়টি মঠ-প্রতিষ্ঠাতা বাবা রাজপুরী মহারাজের সমাধি-মন্দির। চতুর্থটি রাজপুরীজী মহারাজের দুই শিষ্য—বাবা নেহালপুরী ও বাবা সিদ্ধপুরী এবং আরও চারিজন অজ্ঞাত-নামা মহাপুরুষের সমাধি-মন্দির। পঞ্চমটি— বাবা তোতাপুরী ও তাঁহার অজ্ঞাতনামা কোন এক শিষ্যের সমাধি-মন্দির। শ্রীমৎ তোতাপুরী মহারাজের গুরু কে ছিলেন, তাহা ইঁহারা বলিতে পারিলেন না। ইহা ছাড়া মন্দির-প্রাঙ্গণে ও উহার আশে পাশে আরও প্রায় ৩০।৩৫টি সমাধি আছে। সেগুলি নৈবেদ্যের মতো একটু উঁচু মাটির ঢিপি করিয়া তাহাতে চুণ লেপিয়া দিয়া সাদা রং করিয়া রাখিয়াছে।

ওখানকার বর্তমান মোহন্তের নাম শ্রীমৎ বদ্রীপুরী। ইঁহার গুরুর নাম শ্রীমৎ কেদারপুরী, আর কেদারপুরী মহারাজের গুরুর নাম শ্রীমৎ গোপালপুরী। তারপর আর কেহ বলিতে পারিলেন না। ইনি ওখানে প্রায় ২৭।২৮

বৎসর ধরিয়া আছেন। বয়স প্রায় ৭০ বৎসর। মোট তিনজন সাধু আছেন। তার মধ্যে যিনি হিসাবপত্র রাখেন, তাঁর আবার লাধানা-গ্রামে আশ্রম আছে। তিনি রাত্রে সেখানে গিয়া থাকেন। আর বাকি দুইজন এখানেই থাকেন। যিনি পূজা ও ভাণ্ডার দেখেন, তাঁর নাম বাবা শ্যামপুরী এবং যিনি হিসাবাদি রাখেন, তাঁর নাম বাবা ছোটেপুরী। ইঁহাদের পরিধানে কাহারও গেরুয়া-বস্ত্র দেখিলাম না। সব সাদা কাপড় পরিয়াই থাকেন। গলায় কেবল একটি রুদ্রাক্ষ সুতায় গাঁথিয়া মালার মতো ঝুলাইয়া রাখিয়াছেন।

আশ্রমের বহু ভূ-সম্পত্তি ছিল। সরকার সে-সমস্তের অধিকাংশই সংগ্রহ করিয়া লইয়াছেন। এখনও যাহা আছে, তাহাও নিতান্ত কম নয়। বহু প্রাচীনকাল হইতে প্রতি বৎসর দুর্গাপূজার সময় নবমীর দিন এখানে খুব বড় মেলা হয়। উহাতে বহু দূর হইতে দর্শনার্থী আসিয়া ঐ পুষ্করিণীতে স্নানাদি করিয়া বাবা রাজপুরী মহারাজের সমাধি-মন্দিরে পূজাদি দিয়া থাকে।

বাবা রাজপুরী মহারাজের সহিত তদানীন্তন কয়থলের নবাব নরশেবাজ পাঠানের বিশেষ সৌহার্দ্য ছিল। শুনিলাম, পুরীজী মহারাজের পাশাখেলার খুব সখ ছিল এবং তিনি উহাতে দক্ষও ছিলেন। সেইজন্য নবাব-সাহেব তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে নিজ আলয়ে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়া উভয়ে পাশা খেলিতেন। একদিন উভয়ে পাশা খেলিতেছেন, এমন সময় পুরীজী মহারাজ হঠাৎ হাসিতে লাগিলেন। তাহার একটু পরেই আবার কাঁদিতে লাগিলেন। নবাব সাহেব হঠাৎ তাঁহার এরূপ ভাবান্তরের কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন: দিল্লীর রাজদরবারে অতি সুন্দরী এক নর্তকী নৃত্য দেখাইতেছিল। ইহাতে দর্শকবৃন্দ অতিশয় আনন্দ উপভোগ করিতেছিল, সেইজন্য আমিও আনন্দিত হইয়া হাসিতেছিলাম। নৃত্য দেখাইতে দেখাইতে হঠাৎ ঐ নর্তকী মৃত্যুমুখে পতিত হইল। ইহাতে দর্শকবৃন্দ শোকে মুহ্যমান হইল, সেই জন্য আমিও কাঁদিতেছিলাম।

ইহার সত্যতা পরীক্ষার জন্য নবাবসাহেব তৎক্ষণাৎ দিল্লীতে লোক পাঠাইয়া খবর লইয়া জানিলেন যে, ঘটনা সম্পূর্ণ সত্য। ইহাতে পুরীজী মহারাজের উপর নবাব-সাহেবের শ্রদ্ধাভক্তি আরও বাড়িয়া গেল। তারপর তিনি নিজে আসিয়া ঐ লাধানা-গ্রামের নিকটে পুষ্করিণী-সমন্বিত ঐ বিরাট মঠ নির্মাণ করাইয়া দিলেন এবং উহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রচুর ভূসম্পত্তি দান করিলেন। এই মঠ নির্মাণ-বিষয়ে আরও একজন মহান্ ব্যক্তি অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম অমর সিংহ রাঠোর। তিনি রাজস্থানের কোন এক স্থানের রাজা ছিলেন।

বর্তমানে মঠের অবস্থা অতিশয় শোচনীয়, দেখিলে কষ্ট হয়, অথচ আয় নিতান্ত কম নয়। সকলেই একাহারী—রাত্রে খাবার কোন বালাই নাই। রাত্রি নয়টার সময় পূজারী মহারাজ কিছুক্ষণ তুলসী-রামায়ণ পাঠ করিলেন। তারপর সব শয়ন। আশ্রমের অবস্থা দেখিয়া মনে হইল, এখানে সাধু অতিথির আসাযাওয়া বোধ হয় একেবারেই নাই। যেখানে এককালে ব্রহ্মজ্ঞ গুরু বেদান্ত-মার্গে ব্রহ্মোপলব্ধি-বিষয়ে বহু শিষ্যকে শিক্ষা-দান করিতেন, আজ সেখানে এই দুরবস্থা দেখিয়া মনে বাস্তবিকই দুঃখ হইল। মনে মনে ভাবিলাম—কালের কি বিচিত্র প্রভাব!

কবীরের জীবন ও সাধনা

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

গুরু রামানন্দকে দর্শন করতে চলেছেন তাঁর ব্রাহ্মণ-শিষ্য, সাথে বালবিধবা কন্যা। আজন্ম-ব্রহ্মচারী রামানন্দ। যোষিৎ দর্শন করেন না তিনি। মেয়ে প্রণাম ক'রল রামানন্দ-চরণে। না দেখেই বাক্‌সিদ্ধ মহাপুরুষ আশীর্বাদ জানালেন, 'সুপুত্র লাভ কর'। সর্বনাশ! কেঁদে লুটিয়ে প'ড়ল মেয়ে—'প্রভু আমি যে বিধবা?' অভয় দান করলেন রামানন্দ। পুরুষ-সংসর্গ ব্যতীতই এই কন্যা পুত্রলাভ করবে, সেই পুত্র হবে এক মহাপুরুষ, জগতের ত্রাণকর্তা।

১৩৯৮ খৃষ্টাব্দ। সৌর-করদগ্ধ জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষ। বালবিধবা ব্রাহ্মণ-কন্যার কোলে এল ছেলে। লোকনিন্দার ভয়ে চুপি চুপি তাকে লহর-তালাও-এ পদ্মফুলের উপর রেখে আসা হ'ল। এই মাতৃস্নেহ-বঞ্চিত সন্তানই কবীর।

জোলা নীরু আর তার স্ত্রী নীমা। ছেলে-পুলে হয়নি তাদের। ঐদিন ঐ দীঘির ধার দিয়ে আসতে আসতে দেখতে পেল পদ্মফুলের উপর একটি শিশু। কোলে ক'রে ঘরে নিয়ে এল তারা। ভাবলো—ভগবানই পাঠিয়েছেন এ শিশু, এ তাদেরই।

নীমার আদরের দুলাল বাড়তে লাগলো। সময় এল নামকরণের। কাজী এলেন; কোরান খুললেন নামকরণের জন্য। কিন্তু কি আশ্চর্য, যতবারই কোরান খোলেন, চারটে নাম বেরিয়ে আসে—কবীর, আকবর, কিবরা, কিবরিয়া। সবগুলোই যে ভগবানের বিশেষণ, যার অর্থ—'মহৎ'। কাজী তো ভয় পেয়ে পালালেন। এই অলক্ষুনে ছেলের নামকরণে কাজ নেই, মন্তব্য করলেন তিনি। ছড়িয়ে প'ড়ল এ খবর চারদিকে। দলে দলে কাজীরা এল নীরুর বাড়ি; আর যাওয়ার সময় পরামর্শ দিল এ ছেলেকে হত্যা করতে। না হ'লে নীরুর ক্ষতি হবে। গোপনে সে-চেষ্টাও ক'রল নীরু। কি আশ্চর্য। এক ফোঁটা রক্ত বেরুল না। শিশুকণ্ঠে উচ্চারিত হ'ল অপূর্ব এক শ্লোক—'রক্তমাংসে গড়া নয় আমার দেহ, এ বিশুদ্ধ আলো।' আর দ্বিধা না ক'রে নীরু ছেলের নাম রাখলো 'কবীর'।

জোলা-পরিবারে মানুষ হ'তে থাকলেন কবীর। নাথপন্থী যোগীদের অনেকে একসময় বাধ্য হয়ে মুসলমান হয়ে যান। এঁরাই জোলা। এঁরা হিন্দু সংস্কার ও রীতিনীতি মেনে চলতেন। সকলেই খুব গরীব ছিলেন ব'লে লেখাপড়া শেখার সুযোগ মিলত না, কবীর এই আবেষ্টনীতে মানুষ হয়েছিলেন। লেখাপড়া করার ইচ্ছা বা সুযোগ ছিল না তাঁর। শিল্পজীবী পরিবারের সাধারণ ছেলের মতোই ছোটবেলাতেই জাত-ব্যবসায় শিখতে লাগলেন, এবং তাঁত বুনে জীবিকা অর্জন করবার কাজে লাগলেন।

এই সব স্তরের লোকেরা সাধারণতঃ, ভূতপ্রেতে বিশ্বাসী হয়। ফকির ও সন্ন্যাসীর প্রতি এদের অগাধ বিশ্বাস। তাঁদের অলৌকিক শক্তিতে মুগ্ধ হয়। জোলারা পূর্বে ছিল হঠযোগী সম্প্রদায়ের লোক। তাই সাধারণতঃ এই পথের পথিকদের উপর এদের টান থাকে।

এদের কাছে সহজে আশ্রয় ও আহার্য পাওয়া যাবে জেনে সাধু ফকিররাও এদের পাড়াতেই ঘোরাঘুরি করে। এ-সব বিচার করলে মনে হয়, কবীরও বোধ হয় শৈশবে এঁদের সান্নিধ্যে এসেছিলেন। এঁদের জীবনধারা শৈশবেই তাঁর মনে রেখাপাত করেছিল।

কবীরদাসের পরবর্তী জীবন-সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা যায় না। তাঁর মুসলমান শিষ্যেরা বলেন যে, তিনি বিয়ে ক'রে সংসারী হয়েছিলেন। পাদ্রী কী সাহেব ও আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন এই মত সমর্থন করেন। কিন্তু কবীরের হিন্দু শিষ্যেরা এ-কথা বিশ্বাস করেন না। মুসলমান কিংবদন্তী অনুসারে তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল লুই, ছেলের নাম কমাল ও মেয়ের নাম কমালী। কিন্তু হিন্দু শিষ্যেরা বলেন যে, তিনি বিয়ে করেননি। এমন কি অনেকে লুই-এর অস্তিত্বই অস্বীকার করেন। অনেকে বলেন লুই, কমাল ও কমালী ছিলেন কবীরের শিষ্য-শিষ্যা। কমাল ও কমালীকে পালিত পুত্র-কন্যা হিসাবে কেউ কেউ উল্লেখ করেন।

মনে হয় এঁরা যে কবীরের শিষ্য ছিলেন—এ-কথাই ঠিক। কারণ যিনি ভগবানকে স্বামী ও প্রিয় ব'লে ভাবে বিভোর হয়ে থাকতেন, তিনি অন্য কারও সাথে স্বামীর অভিনয় করবেন কেমন ক'রে? কবীর ছিলেন একাধারে প্রেমিক, ভক্ত ও জ্ঞানী। সদা ভাবে বিভোর থাকতেন তিনি। আবার তিনি ছিলেন পরম বৈষ্ণব। এইসব যুক্তি দিয়ে যাচাই করলে মনে হয়, তিনি ছিলেন ব্রহ্মচারী। একটি দোঁহায় এই অবস্থার কথা কবীর বর্ণনা করেছেন :

নই ধার্মিক, নই অধার্মিক,
নই গো যতি, কামী নই।
কই না কিছু, শুনি না কিছু,
নই গো সেবক, স্বামী নই।

'একমেবাদ্বিতীয়ম্' পুরুষকে তিনি জেনেছিলেন নির্বিকল্প সমাধি-অবস্থায়। সে-অবস্থা ও তার অনুভূতি সম্বন্ধে তাঁর একটি দোঁহা আছে :

দশ দুয়ারে লাগলে তালা
অলখপুরুষ দেখতে পায়।
করাল কাল ঘেঁষে না কাছে,
কাম-ক্রোধ-মদ-লোভ পালায়।

যে-অবস্থা লাভ করলে কাম-ক্রোধ-মদ-লোভ পালায়, তিনি সদা আসীন থাকতেন সেখানে। সেই প্রেমাবস্থা তো সমাধির পারে। যিনি ভগবানের বিরহে সদা দগ্ধ হচ্ছেন, এবং নিজেকে তাঁর 'প্রিয়া'রূপে কল্পনা করছেন, তিনিই আবার অন্য কাউকে প্রিয়া ভেবে পতির মতো ব্যবহার করবেন, এ ভাবা যায় না। কবীরের দোঁহাতেই পাওয়া যায় :

যেইখানে দেয় সিঁদুর-রেখা,
দেয় না কাজল সেথা।
রাম রয়েছেন যেই নয়নে,
সেথা কামের ঠাঁই কোথা ?

তাঁর এ-কথা থেকেই বোঝা যায়, তিনি অন্য কারও স্বামী ছিলেন না। তিনি রামেরই, তাঁর হৃদয়ে আর কারও ঠাঁই নেই।

ঐ সময় কাশীতে গুরু রামানন্দের খুব নাম। হিন্দু সন্ন্যাসীদের সাথে মিশে কবীর হিন্দুধর্মের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। তিনি রামানন্দের কাছে বৈষ্ণব-ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। রামানন্দ রামের উপাসক ছিলেন। এ রাম দশরথ-পুত্র রাম নন, ইনি নির্গুণ ব্রহ্ম, পরম বন্ধু, প্রিয় ও স্বামী। কবীরের দোঁহায় যে জ্ঞান ভক্তি ও প্রেমের ত্রিধারা প্রবাহিত, তার উৎস গুরু রামানন্দ।

পরম উদার ছিলেন রামানন্দ। তিনি কোন গোঁড়ামির প্রশ্রয় দিতেন না। তাঁর বহু শিষ্যই সমাজবিধি অনুসারে বর্জনীয়। এই

গুরুর কাছ থেকে শিক্ষা লাভ ক'রে কবীর সত্যদৃষ্টি লাভ করেছিলেন। তাই কোন কুসংস্কার তিনি পছন্দ করতেন না। তদানীন্তন সমাজের সকল কুসংস্কারকেই তিনি আঘাত করেছেন। অনেকেই বলেন, কবীরের আরও এক গুরু ছিল—তক্কী সাহেব। মনে হয়, কবীর সাধন-পথে অনেক সাধকের কাছ থেকেই নির্দেশ পেয়েছিলেন।

মুসলমান ঘরের ছেলে রাম ভজনা করে। দিনরাত সাধু-সন্ন্যাসীদের সাথে কাটায়। কাপড় বোনা ও সংসারের সব কাজ থেকেই মন উঠিয়ে নিয়েছে। কোন্ পিতা-মাতা এ-সব সহ্য করতে পারে? মা নীমা তাই কান্নাকাটি শুরু করলেন। নীরুর বয়স হয়েছে, তাই কবীরের রোজগারের উপর সংসার চলে। সেই কবীর কাজ ছেড়েছে। সংসারে এল অশান্তি। কিন্তু যতই অশান্তি বাড়ে, কবীর ততই ভগবৎ-চিন্তায় মগ্ন হয়ে যান। সকল অশান্তি জয় ক'রে এগিয়ে গেলেন কবীর সাধন-পথে, লাভ করলেন তিনি সেই পরমপুরুষকে। চারিদিকে এ-কথা প্রচারিত হ'তে লাগলো। দলে দলে লোক আসতে লাগলো তাঁর কাছে। শোনা যায়, যোগী গোরখনাথ এবং সর্বানন্দ-নামে সর্বজিৎ উপাধিধারী দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত তাঁর কাছে বিচার করতে আসেন।

সকল বাহ্যানুষ্ঠানের পারে ছিলেন কবীর। তাই রোজা, নামাজ, হজ, তীর্থযাত্রা আর সন্ধ্যা-আহ্নিক তাঁর কাছে ছিল নিরর্থক। এ-সবকেই যাঁরা ভগবানকে পাওয়ার উপায় ব'লে মনে করবেন, তাঁদের তিনি তীব্র ব্যঙ্গ করেছেন। তাই হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই ছিল তাঁর উপর অসন্তুষ্ট। তারা তাঁকে অপমানিত করার কৌশল খুঁজতে লাগলো।

এদিকে ক্রমাগত লোকের ভিড়ে ব্যতিব্যস্ত হচ্ছেন কবীর। সকলেই তাঁর কাছে আসত কামনা নিয়ে। কেউ চাইত পুত্র, কেউ চাইত ধন, কেউ রোগের ঔষধ ইত্যাদি। কবীর নিষ্কৃতি পাওয়ার পথ খোঁজেন। ভগবানের কাছে আবেদন জানান ভিড় সরিয়ে দেওয়ার জন্য। অযাচিতে এল সেই সুযোগ।

কবীর চলেছেন হাটে। কবীরকে যারা ঈর্ষা ক'রত, তারা এক পতিতা নারীর সঙ্গে চুক্তি ক'রল। বাজারের মাঝে এসে সে কবীরকে ধ'রল জড়িয়ে। বললে, সে নাকি কবীরের স্ত্রী, কবীর তাকে ফেলে পালিয়েছিল। লোকে ছি ছি করতে লাগলো। কবীর সব বুঝলেন। ভগবানের কি অসীম করুণা, চিন্তা করলেন তিনি। লোকের হাত হ'তে রক্ষা করার জন্য ভগবানই এই মেয়েকে পাঠিয়েছেন। ভগবানের দান মাথায় পেতে নিলেন তিনি। সেই নারীর হাত ধরে ফিরে এলেন ঘরে। প্রচারিত হয়ে গেল, কবীর ভণ্ড; লোকের আসা-যাওয়াও কমে গেল। শোনা যায়, এই নারী ভবিষ্যৎ জীবনে মহাসাধিকা হয়েছিলেন।

১৪৯৮ খৃষ্টাব্দ। জীর্ণ দেহ ছেড়ে দেওয়ার সঙ্কল্প করলেন কবীর, তাই চললেন মঘরে। কিংবদন্তী প্রচলিত ছিল যে, মঘরে মরলে গাধা হয়, আর কাশীতে মরলে স্বর্গে যায়। তাই কাশী ছেড়ে মঘরে যেতে শিষ্যেরা মানা করলেন। কুসংস্কারহীন কবীর মানলেন না সে-কথা। তাঁর মঘরে যাওয়ার কথা শুনে হাজার হাজার শিষ্য সমবেত হ'ল। কাঁদতে কাঁদতে তারা কবীরের সাথে সাথে মঘরে এল।

পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে অসী নদী; তীরে তার শূন্য ভজন-কুটীর। শেষ আসন পাতলেন কবীর এইখানে। কবীর দেহত্যাগ করবেন

এ-কথা শুনে সৈন্যসামন্ত নিয়ে রাজা বীরসিংহ ও বিজলী খাঁ মঘরে উপনীত হলেন। একজন হিন্দু, অপরজন মুসলমান। দু-জনেই স্ব-স্ব প্রথানুসারে গুরুদেবের দেহ সৎকার করতে চান। তার জন্য রক্তপাতের প্রয়োজন হলেও দ্বিধা করবেন না তাঁরা। কবীর এ সঙ্কট দেখতে পেলেন।

শিষ্যদের ডেকে দুটো সাদা চাদর ও কিছু সাদা পদ্মফুল আনতে বললেন তিনি। এল একরাশ পদ্মফুল আর চাদর। কবীর বললেন, 'আমি ঘুমুব, তোমরা দরজা ভেজিয়ে চলে যাও।' ঘুমিয়ে পড়লেন কবীরদাস। কিছুক্ষণ পরে ঘরের ভিতর হ'তে কেমন এক শব্দ শোনা গেল। কবীর নেই—এ-কথা বুঝলেন সকলে। দরজা খোলা হ'ল। কিন্তু গুরুদেব কই? পড়ে আছে দুটো চাদর আর তার উপর একরাশ পদ্মফুল! আসন্ন রক্তপাত-সম্ভাবনা দূরীভূত হ'ল। হিন্দু-মুসলমান শিষ্য মিলে এই স্থানে প্রতিষ্ঠা করলেন এক মঠ। বিদায় নেওয়ার পরম ক্ষণে মিলিয়ে দিয়ে গেলেন উদ্যত দুই ধর্মরোষকে। প্রমাণ ক'রে দিয়ে গেলেন—ধর্মে ধর্মে কোন অমিল নেই:

বেদ, কোরান মিথ্যা রে ভাই,
মনের সন্দ নাহি যায়।
ক্ষণেক হিয়া থির হোলে হয়
খুদা হাজির আঙ্গিনায়।
বান্দা খোঁজ রে আপন হিয়া,
করিসনে আর বৃথা শ্রম।
এই দুনিয়া সহর, মেলা—
হাতপাতা তোর ভীষণ ভ্রম।
মিথ্যাশাস্ত্র পড়ে খুশি
নিজের বেলা অসাবধান।
মূর্তিতে নয়, এই জগতে
ব্যাপ্ত স্রষ্টা ভগবান।
আকাশ মাঝে সাগর ভাসে,
কর না তাতেই অবগাহন।
চোখ মেলে তুই দেখ রে চেয়ে
সব ঠাঁয়ে সেই নিরঞ্জন।
পবিত্র তাঁর সব পবিত্র,
অন্য যা, তা শঙ্কা আনে।
যে করে কাজ দয়াময়ের,
কবীর কহে, সেই জানে।

শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দের পত্র

(স্বামী পরমানন্দকে লিখিত)

কল্যাণবরেষু,

তোমার প্রেরিত চিঠি ও টাকা পাইয়াছি। তুমি যেমন জানাইয়াছ—অবশিষ্ট টাকা শ্রীশ্রীপ্রভুর জন্মোৎসবে লাগিবে। তোমার শরীর দুর্বল শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। "শরীর-মাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্"। শরীরের দিকেও নজর দেওয়া দরকার। নতুবা ঠাকুরের কাজ হবে কি দিয়ে? তীব্র বৈরাগ্যবান্ পরম দীন ভক্ত নাগ মহাশয়কে শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছিলেন, যে বাক্সে ধনরত্ন থাকে, তাকে একটু সাবধানে রাখিতে হয়, যত্ন করতে হয়। তোমাদের দেহ ভোগের জন্য—নিজের সুখের জন্য নয় জানিবে। শ্রীশ্রীপ্রভুর ভাব মহাভাব ভক্তি প্রেম জ্ঞান—এই সব প্রচারের জন্য। বড় কঠিন—বড় কঠিন পরীক্ষা। খুব সাবধানে থাকবে। সর্বদা প্রভুর কাছে প্রার্থনা করিবে, ঠাকুর রক্ষা কর—রক্ষা কর।

মহাত্মা বীরভক্ত শশী মহারাজ—প্রথম বিলাত হ'তে ফিরিবার পর স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কি ক'রে ভাল প্রচারক হওয়া যায়? স্বামীজী নিজ হস্ত মাথায় দিয়া লিস পর্যন্ত আনিয়া কহিলেন, "এতদূর দরকার।" অর্থাৎ প্রথম খুব মেধাবী হওয়া চাই। তারপর মুখে হাত দিয়া কহিলেন, "শ্রী চাই—নইলে নেবে না।" পরে ঠোঁটে হাত দিয়া কহিলেন, "মিষ্ট-ভাষী হওয়া প্রয়োজন।" পরে বুকে হাত দিয়া বলিলেন, "চাই heart, heart না থাকলে, হৃদয় প্রশস্ত ও উদার না হ'লে কেউ শুনবে না তোমায়। আমার brain দিয়া যা না হয়েছে, heart দিয়া তার চেয়ে বেশী হয়েছে। প্রভুরও ছিল তাই।" "আর চাই সংযম, ঐটি প্রচারকের প্রধান সম্বল হওয়া প্রয়োজন।" সাধু সাবধান—খুব সাবধান। ঠাকুর রক্ষা করুন -বল দিন—এই প্রার্থনা।

নাগ মহাশয়ের জীবনী বেরিয়েছে। তোমায় শীঘ্র একখণ্ড পাঠানো হবে। পড়িবে, আদর্শ মহাপুরুষ।

Mrs. Leggott তার ঝি-জামাই প্রভৃতি এখানে ২।৩ দিন এসেছিল। তারা বেশ লোক। আমার বড় ভাল লেগেছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের পরিধেয় বস্ত্রের এক টুকরা তার জামাই কত ভক্তির সহিত চাহিয়া লইল। পয়সা থেকেও যে প্রভুকে ভক্তি কত্তে চায়, তারা বড় কম নয়। তাদের ঠিক ঠিক ভক্তি হয়।

মহারাজ, হরি মহারাজ ও তারক দাদা কাশীতে আছেন। তাঁদের শরীর মন্দ নয়। পূজনীয়া শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী গত রবিবার জয়রামবাটী যাত্রা করেছেন—ভাল আছেন। ঠাকুরের জন্মতিথিপূজা ১০ই মার্চ সোমবার দিন হবে। এ চিঠি তখন সমুদ্রে সমুদ্রে ভাসিবে। স্বামীজীর জন্মতিথি-উপলক্ষেও খুব দরিদ্রনারায়ণ-সেবা ও ভক্তভোজন হয়েছিল। তোমরা ওদেশে কি কর? এখানে বিবেকানন্দ Society-র উৎসবের দিন Frank সাহেব বেশ lecture দিয়াছিল। শরৎ মহারাজ হয়েছিলেন president।

সম্প্রতি ঐ Frank সাহেব স্বামীজীর life লিখেছে। সবাই বলছে, উত্তম হয়েছে। যদি না পেয়ে থাক, জানাবে। দেবমাতা কেমন আছে? তাহাকে আমার শুভাশীর্বাদ ও ভালবাসা জানাইবে। ওখানে যত ভক্ত আছে সকলকে আমার স্নেহসম্ভাষণ ও ভালবাসা জানাইও। এ যুগাবতারের কথা যে শুনিবে, যে ধারণা করিবে, সেই ধন্য হয়ে যাবে, কৃতার্থ হয়ে যাবে—নিশ্চয় জানিও। এখানে গোঁড়ামি নাই, সাম্প্রদায়িকতা নাই। উদার—পরম উদার ভাব। কেউ ফিরিবে না, কেউ উপবাসী যাবে না—জানিও।

অকাতরে স্বামীজীর ভাব ছড়িয়ে দাও। শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাব বিলাও। কিছু ফিরে চেয়োনা—কিছুতে লোভ করিও না। শ্রীশ্রীপ্রভুর কথা কহিতে কহিতে ভাবে বিভোর হয়ে যাও—মেতে যাও। ছেড়ে দাও আপনাকে ঠাকুরের হাতে। 'নাহং নাহং, তুঁহু তুঁহু'। আমি তোমার, ঠাকুর, আমি তোমার—এই ভাবে বিভোর হয়ে যাও। আনন্দ পাবে, শান্তি পাবে।

তুমি আমার ভালবাসা ও শুভাশীর্বাদ জানিবে।···কারো সহিত দ্বেষবুদ্ধি রেখো না। সবাই ঠাকুরের সন্তান জানিবে। গুরুজনজ্ঞানে ভক্তি করিবে। ইতি -

শুভাকাঙ্ক্ষী—প্রেমানন্দ

সমাজতন্ত্রবাদ ও স্বামী বিবেকানন্দ

(আশ্বিন-সংখ্যার পর)

অধ্যাপিকা শ্রীমতী সান্ত্বনা দাশগুপ্ত

(২) ফুয়ারবাক্-মার্ক্স-এর দৃষ্টিতে ধর্ম ও বিবেকানন্দের 'ধর্মবিজ্ঞান'

ফুয়ারবাক্ (Feuerbach)-কে অনুসরণ ক'রে ধর্ম-সম্বন্ধে ডক্টর দত্ত অভিমত প্রকাশ করেছেন: 'religious ideas are the inverted reflections of the mundane world of the time.' সে-সম্বন্ধে অধিক আলোচনার প্রয়োজন নেই। 'mundane world' 'time'-এর সঙ্গে যুগে যুগে বদলেছে, কিন্তু ভারতের আধ্যাত্মিক ধারণাসকল আজও একই প্রকার আছে। কৃষি-সমাজের পত্তন-কালে বেদে উচ্চারিত হয়েছিল 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম', তা পরবর্তীকালের সামন্ততান্ত্রিক ও বণিক্-সমাজেও সত্য ব'লে বিবেচিত হয়েছে, এবং আজকের যুগে শিল্পনির্ভর উন্নত নাগর সমাজেও রাধাকৃষ্ণন প্রভৃতি ধর্ম-বিজ্ঞানীরা তা সত্য বলেই মনে করেন। অতএব ধর্মকে কিরূপে 'reflections of the mundane world of the time' বলা যায়?

যাই হোক, এ মত ডক্টর দত্ত মার্ক্সবাদকে অনুসরণ করেই প্রকাশ করেছেন এবং প্রকাশ-কালে তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা স্বামী বিবেকানন্দের 'ধর্ম-বিজ্ঞান'-সম্বন্ধীয় যুক্তিগুলির কোনটিরই খণ্ডন না করেই করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর 'ধর্মবিজ্ঞান' (Science of Religion) শীর্ষক বক্তৃতায় ও প্রবন্ধগুলিতে ধর্মবিশ্বাসের উৎপত্তি, তার মূল ভিত্তি এবং তার বিভিন্ন দিক ও বিচিত্র প্রকৃতি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আলোচনা ক'রে দেখিয়েছেন যে, ধর্ম কোন কুসংস্কার নয়, তা সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি, মানব-মনে তার স্ফুরণ স্বভাববশতঃ হয়। সেইজন্য মানুষ আদিমযুগে মৃত্যুর সম্মুখীন হয়ে এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে অসহায়ভাবে নানা দেবদেবীর কল্পনা করেছে বটে, কিন্তু পরিশেষে সে রহস্যের সমাধান করেছে, জেনেছে আছেন এক পরম দেবতা—জীবন ও বল যথায় বিচ্ছুরিত, জীবন ও মৃত্যু যাঁর ছায়া, এ সৃষ্টি যাঁর নয়নসম্পাতে বিকশিত। জীবন ও মৃত্যুর রহস্য উদ্‌ঘাটনে মানুষের এই যে প্রয়াস, প্রকৃতির সীমাবদ্ধতা লঙ্ঘন করবার জন্য এই যে অকুতোভয় আয়াস, তাই মানুষের ধর্ম। ধর্ম হ'ল সত্যানুসন্ধান-প্রয়াস। এ-প্রয়াসের লক্ষ্য হ'ল অতীন্দ্রিয় সত্যবস্তু। বৈজ্ঞানিক উপায়ে অগ্রসর হলেই সেখানে পৌঁছানো যায়। ধর্মবিজ্ঞান সেই বৈজ্ঞানিক সূত্রগুলি নির্দেশ করেছে। মন, বুদ্ধি, চিত্তের ঊর্ধ্বে ধাপে ধাপে এগিয়ে 'বোধি'তে উপনীত হয়ে অতীন্দ্রিয় সত্য বস্তু প্রত্যক্ষ হয়। গবেষণাগারে বৈজ্ঞানিক যেমন সুনির্দিষ্ট পথ অনুসরণ ক'রে অনুমিত ফল নিশ্চয় প্রাপ্ত হন, তেমনি এই সকল সূত্র অনুসরণ ক'রে ধর্মপথিক আপন বাঞ্ছিত ফল অর্থাৎ সত্যবস্তু লাভ করেন। বিবেকানন্দ সর্বপ্রথম যে-কাজ করেছেন, তা হ'ল ধর্মের এই আধ্যাত্মিক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া।

ফুয়ারবাক্ খ্রীষ্টধর্মকে সমালোচনা করেছিলেন তার অবৈজ্ঞানিকত্বের দরুন। তিনি তাঁর 'The essence of Christianity' গ্রন্থে পরিশেষে এই অভিমত দেন, 'Christian God is only a fantastic reflexion, a

mirror-image of man.' ফুয়ারবাক্-এর এ-সিদ্ধান্ত কতটা যুক্তিপূর্ণ সে-সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে। কিন্তু এ-কথা ঠিক যে, পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ খ্রীষ্টধর্মকে বা অন্য কোন ধর্মমতকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেননি। এই অবৈজ্ঞানিকত্ব ফুয়ারবাক্-এর সিদ্ধান্তের মূল কারণ। আর ফুয়ারবাক্ হলেন ধর্ম-সম্বন্ধে মার্ক্স-এর গুরু। পৃথিবীর যাবতীয় ধর্মমতের বৈজ্ঞানিকত্ব বিবেকানন্দের পূর্বে কেউই প্রতিষ্ঠিত করেননি। তাঁর পূর্বে মর্গ্যান (Morgan) ও অন্যান্য পুরাতত্ত্ববিদেরা যা অনুসন্ধান করেছিলেন, তা মানুষের ধর্ম-বিশ্বাসকে আদিম-যুগের মানুষের মৃত্যুভয়ভীত মনের প্রকাশ মাত্র—এই সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। বিবেকানন্দ তাঁর 'Necessity of Religion' নিবন্ধে এই মতকে খণ্ডন করেছেন। কিন্তু বিবেকানন্দের সিদ্ধান্ত আজ পর্যন্ত কোন ঐতিহাসিক বস্তুবাদী (Historical Materialist) খণ্ডন করবার প্রয়াস করেননি। তাঁদের যুক্তির ভিত্তি আজও ফুয়ারবাক্ ও মর্গ্যানের আলোচনা।

বিবেকানন্দের মতে ধর্ম সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক বস্তু। মানব-মনের স্বাভাবিক অধ্যাত্ম-প্রবণতা হ'ল তার দেবসত্তাকে জানা। এই প্রবণতাই হ'ল ধর্ম। আচার-অনুষ্ঠান, রীতি-নীতি নয়। এগুলি ধর্মের আঙ্গিক মাত্র। সুতরাং বিবেকানন্দের ধর্মের মূলকথা: 'Religion is the manifestation of Divinity already in man'.—প্রকৃত ধর্ম হ'ল মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশ, আর কিছুই নয়। সেইজন্য এ ধর্ম একটা বিশ্বাসমাত্র নয়, 'dogma' নয়, 'theory' নয়; এ হ'ল 'being and becoming', 'Being divine' এবং 'becoming divine' হ'ল এর মূলকথা।

বিবেকানন্দ এই 'being' এবং 'becoming'-এর মূর্ত প্রতীক দেখেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণকে। তরুণ-বয়সে তিনি জীবনের মূলে নিহিত সত্যকে জানবার জন্য এক দুর্নিবার প্রেরণা অনুভব করেছিলেন। জীবন ও মৃত্যুর দ্বারা খণ্ডিত কিছুক্ষণের এই জীবনের চারপাশের দুর্ভেদ্য অজানার দেওয়াল তিনি কিছুতেই সহ্য করতে পারছিলেন না। এই অজানার দেওয়াল যেন তাঁকে বন্দী-দশার যন্ত্রণায় নিপীড়িত করছিল। তিনি পাশ্চাত্য দার্শনিক-দের গবেষণা, ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শনের মধ্যে তন্ন তন্ন ক'রে অনুসন্ধান করেছিলেন কি ক'রে জানা যায় এই অজানাকে। এ অজানা দুর্জ্ঞেয় —কাণ্ট (Kant)-এর এ-সিদ্ধান্ত তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি, হার্বার্ট স্পেন্সার (Herbert Spencer)-এর বৈজ্ঞানিক জড়বাদও তাঁকে উত্তর এনে দিতে পারেনি। এ-সকল মতে তিনি স্পষ্টই সমাধান এড়িয়ে যাবার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি ধর্মনেতাদের দ্বারস্থও হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁরাও তাঁর সন্তোষবিধান করতে অসমর্থ হন। একমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর দিতে পেরেছিলেন তাঁকে—'জানা যায়', 'প্রত্যক্ষ করা যায়'—এই স্পষ্টোক্তি তাঁকে চমকিত করেছিল। বস্তুতঃ 'জেনেছি, দেখেছি, যদি তুমি দেখতে চাও, তোমাকেও দেখাতে পারি'—শ্রীরামকৃষ্ণের এই সোজা স্পষ্ট উক্তিই তাঁকে সন্তুষ্ট করেছিল। অল্পবয়স-জনিত অজ্ঞতার কারণেই রামকৃষ্ণকে তিনি গ্রহণ করেননি। 'Being' এবং 'becoming'-কে প্রত্যক্ষ করেছিলেন ব'লে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন, রামকৃষ্ণের ধর্ম 'dogma' নয়, 'faith' মাত্র নয়, বাস্তব। শুনে মাত্র নয়, শ্রীরামকৃষ্ণকে 'চ্যালেঞ্জ' ক'রে, পরীক্ষা ক'রে এবং নিজে প্রত্যক্ষ ক'রে তবে তিনি তা

গ্রহণ করেছিলেন। কাজে-কাজেই ধর্ম-সম্বন্ধে চিরদিন বিবেকানন্দ সমান আস্থাশীল ছিলেন, এ 'মধ্যযুগীয় সংস্কারে'র হাত থেকে তিনি কোন দিন উদ্ধার পাননি। এবং মানুষ জন্ম-মৃত্যুর কঠিন নিগড় ভেঙে ফেলবেই, এই তার স্বভাব, এ বিশ্বাস তাঁর চিরদিন অটুট ছিল, কারণ এ তাঁর প্রত্যক্ষলব্ধ সত্য।

সুতরাং এই ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকেই তিনি ঘোষণা করেছেন : 'I am a socialist'. জীবন-মৃত্যুর রহস্যভেদের প্রয়াসের সঙ্গে সমাজতন্ত্রবাদী হওয়ার মধ্যে বাস্তবিক কোন বিপরীত সম্বন্ধ আছে কিনা, বিচার ক'রে দেখা প্রয়োজন। এ রহস্য ভেদ করতে যাঁরা অগ্রসর হন, এ জগৎ-সংসারের চির-প্রবহমান রূপটির তাঁরা ভাল ক'রে পরিচয় গ্রহণ করেন। এ জগৎ-সংসারে কিছুই স্থায়ী নয়, এক অনন্ত প্রবাহে ভেসে চলেছে সব, 'আছে' কিংবা 'নেই'—এ ঠিক ক'রে বলা দুরূহ।[১] এ রহস্যটিকেই তাঁরা 'মায়া' আখ্যা দিয়েছেন। এ 'মায়া' একটি 'statement of fact', অনস্বীকার্য তথ্য। একে অতিক্রম ক'রে সত্য-বস্তুর অবস্থান। অতএব এর পারে যেতে হবে। এই 'মায়া'কে অতিক্রম করবার প্রয়াসই হ'ল সন্ন্যাস। যাঁরা সন্ন্যাস অবলম্বন করেন, তাঁরা মায়ার জগতে সব সম্বন্ধকে অস্বীকার করেন। এঁদের একমাত্র প্রচেষ্টা দুর্নিরীক্ষ্য মায়াতীত সত্যকে নিরীক্ষণ করা। অতএব সত্যকে জানবার জন্য চিরদিনই সন্ন্যাস-ব্রতের প্রয়োজন আছে। প্রাচীন কালে কিংবা আধুনিক কালে তাতে কোন তারতম্য ঘটে না। সত্যানুসন্ধানী বিবেকানন্দও সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বন করেছেন, এই মায়াবাদকে সত্য জেনে প্রচার করেছেন পাশ্চাত্য দেশে। এবং এই মায়াবাদী সন্ন্যাসীই নিজেকে ঘোষণা করেছেন 'socialist' ব'লে। যখন তিনি এ-কথা বলেছেন, মায়াবাদের উপর দাঁড়িয়েই বলেছেন—মায়াবাদকে দূরে সরিয়ে রেখে নয়। অতএব মায়াবাদী সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের ধর্মবিশ্বাস ও সমাজতন্ত্রবাদে কোথাও একটি অবিচ্ছেদ্য সংযোগ নিশ্চয়ই আছে। সেই সংযোগের অনুসন্ধান-কার্যে এবার আমাদের এখানে ব্যাপৃত হ'তে হবে।

* * *

(৩) ধর্ম ও স্বামী বিবেকানন্দের সমাজতন্ত্রবাদ

রহস্যাবৃত যে সত্যের কথা ভারতের ধর্ম-দর্শন চিরদিন ব'লে আসছে, তার সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ বিশ্লেষণ পাওয়া যায় অদ্বৈত ব্রহ্মবাদে। অদ্বৈত ব্রহ্মবাদ ধর্ম-দর্শনের উত্তুঙ্গ চূড়া—শেষ কথা। এই বেদান্ত-দর্শনোক্ত সত্য একদিকে উপলব্ধির উপর, অপর দিকে যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। মানুষের বিশ্লেষণী শক্তির পরাকাষ্ঠা এতে প্রকাশিত। তর্কশাস্ত্রের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ-প্রণালীকেও এজন্য উন্নতির শেষ পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এই বৈজ্ঞানিক উপায়ে যে-সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেখানে, তা হ'ল এই যে, সত্য এক ও অভেদ এবং তার স্বরূপ সৎ চিৎ ও আনন্দময়। যতক্ষণ কোন ব্যক্তি নিজ-স্বরূপ জানতে না পারছে, ততক্ষণও তার স্বরূপ অন্য রকম হয়ে যাচ্ছে না। সে তখনও এই 'সৎ-চিৎ-আনন্দ'-স্বরূপই থেকে যাচ্ছে। সেই জন্যই স্বামীজী বলছেন, 'Each soul is potentially divine'. মানুষের স্বরূপবোধ সুপ্ত থাকতে পারে, বিকাশের অপেক্ষা রাখতে পারে, কিন্তু স্বরূপকে সব সময়ই অবিকৃত থাকতে হবে। যা এখন নেই, তা পরে হ'তে পারে না। অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব আসতে পারে না। যে এখন স্বরূপতঃ

১ Jnana-yoga.

সৎ-চিৎ-আনন্দ স্বরূপ নয়, সে পরে তা প্রাপ্ত হ'তে পারে না। অতএব মানুষে মানুষে স্বরূপের দিক থেকে কোন বৈষম্য নেই, যা আছে তা হ'ল বিকাশের। সব মানুষই তাদের স্বরূপের দিক থেকে এক ও অভিন্ন—শক্তিমান্ দুর্বল, ধনী দরিদ্র, অজ্ঞ জ্ঞানী, পাপী পুণ্যবান্।

অদ্বৈত ব্রহ্মবাদের তাৎপর্য এখানে। এ এক অপূর্ব সমদৃষ্টি ও সাম্য-উপলব্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত। এবং এইজন্য অদ্বৈত-ব্রহ্মবাদে বিশ্বাসীদের আচরণে এক বৈপরীত্য আসে। এ যেমন একদিকে মানুষকে মায়াতীত সত্য উপলব্ধির জন্য সমাজ-সংস্কারের সঙ্গে সব সম্বন্ধ ছিন্ন ক'রে অরণ্য-গিরি-গুহাবাসী হ'তে অনুপ্রাণিত করবে, আবার যে অদ্বৈত-তত্ত্ব উপলব্ধি করেছে, উপলব্ধ একত্ব সমাজে সংসারে প্রতিষ্ঠার জন্য তাকে উদ্বুদ্ধ করবে। অরণ্যের নির্জনতা—গুহার নিঃসঙ্গত্ব ত্যাগ ক'রে তখন সন্ন্যাসীকে এই মলিন সংসারের কোলাহলের মধ্যে দাঁড়াতে হয় সাম্য-প্রতিষ্ঠাকল্পে। ভারতের সকল ধর্মনেতা অবতার-আখ্যাপ্রাপ্ত পুরুষ তাই করেছেন। যুগে যুগে তাঁরা একদিকে যেমন আধ্যাত্মিকতা ও ধর্মের গ্লানি দূর করেছেন, অপরদিকে সমাজকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন সাম্যের উপর। ভাগবতে আমরা এই সাম্য-প্রচেষ্টার ইঙ্গিত পাই। বুদ্ধ-শঙ্কর প্রভৃতি সকলের কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে একই ইঙ্গিত পাই[২]।

এ আপাত-বৈপরীত্যের সমাধান স্বামীজী দিয়েছেন। জীবন ও ধর্ম পৃথক্ নয়। জীবনই ধর্ম। জীবনের সর্বক্ষেত্রে তার প্রতিষ্ঠা না হ'লে ধর্ম তো তত্ত্বের মধ্যে আবদ্ধ রইলো, তা সত্য হয়ে উঠল না। অতএব তার বাস্তব প্রয়োগ চাই।' যদি আমরা জেনে থাকি যে, সব মানুষ সব প্রাণী একই দেব-সত্তা-সম্পন্ন, দেবত্ব-সত্তায় সকলে এক ও অভেদ, তা হ'লে তার স্বতঃসিদ্ধ পরিণাম—জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে সকলের একই অধিকার-স্থাপন। এই কারণেই ধর্মনেতারা কাজ করেন সমাজে। তাঁদের প্রকৃত কর্মক্ষেত্র অরণ্য নয়। আরণ্যক বেদান্তের প্রয়োগ-ক্ষেত্র সমাজ। এমন কি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ, যিনি আধ্যাত্মিক সত্য-আস্বাদনে সমস্তক্ষণ মগ্ন থাকতেন, মুহুর্মুহুঃ যাঁর সমাধি হ'ত, তিনিও সমাজ-সংসারের কল্যাণের কথা চিন্তা করেছেন। এবং বিবেকানন্দের মধ্যে বৈপ্লবিক সমাজ-চিন্তার পত্তন তিনিই করেছিলেন 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা' এই উক্তির দ্বারা। যেদিন শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে এই কথা শুনেছিলেন, সেদিন বিবেকানন্দ (তখন নরেন্দ্রনাথ) বলেছিলেন, 'আজ এক নূতন আলোক দেখতে পেলুম।' তারপর যখন বিবেকানন্দ তাঁর কাছে সর্বক্ষণ নির্বিকল্প-সমাধিতে মগ্ন হয়ে থাকবার বাসনা ব্যক্ত করেছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে ধিক্কৃত ক'রে বলেছিলেন, 'ছিঃ! তোর এত ছোট ধারণা, কালে যে তোকে বটগাছের মতো অনেককে আশ্রয় দিতে হবে।' এই উক্তির মধ্যে সমাজ-সংস্কারের প্রতি আস্থাবান্ সন্ন্যাসীর মহান্ কর্তব্যের ইঙ্গিত রয়েছে। যে সত্য জেনেছে,

---

২ 'Do you read the history of India? Who was Ramanuja? Who was Shankara? Who was Nanaka? Who was Chaitanya, who was Kabir? Who was Dadu?...Did not Ramanuja feel for the lower classes? Did he not try all his life to admit even the Pariah to his community? Did he not try to admit even Mahommedans to his community? They all tried and their work is still going on. (My plan of Campaign—Swami Vivekananda)

৩ Practical Vedanta —Swami Vivekananda.

তাকে তার বাস্তব প্রয়োগ করতে হবে। এ হ'ল তার কর্ম-পরম্পরার সুসঙ্গত পরিণতি বা সন্ন্যাসাশ্রমের শেষ ন্যায়সঙ্গত পরিণাম। ভারতীয় সন্ন্যাসীরা এ-প্রচেষ্টা সকল যুগে করেছেন, এ আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। স্বামীজী সেইজন্য লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলককে লিখেছেন, 'India was saved by the begging bowl of the Sannyasin'। সন্ন্যাসীর ভিক্ষাপাত্র ভারতীয় সমাজকে যুগে যুগে বিচ্ছিন্নতা (disintegration) হ'তে রক্ষা করেছে।

বস্তুতঃ ভারতের ইতিহাসে যে-সব ব্যক্তি ভেদ-বিভেদের বিচ্ছেদের ও অসাম্যের মধ্যে প্রীতির ও সাম্যের যোগ-সেতু রচনা করতে পেরেছেন, তাঁরাই আমাদের মহাপুরুষ[৪]। শ্রীমদ্ভাগবতে আমরা রীতিমত সমাজ-বিপ্লবের ইঙ্গিত পাই, যার অবসান হয়েছে বিভিন্ন অস্পৃশ্য জাতির মধ্যে সাম্য-প্রতিষ্ঠায়। এমন কি সমাজে আর্থনীতিক সাম্যও সেখানে প্রতিষ্ঠার কথা পাওয়া যায়। সেখানে স্পষ্ট ক'রে বলা হয়েছে যে, সকলেই ক্ষুধার অন্ন পেতে পারে, তার বেশী ছলে বলে যে অধিকার করে সে চোর, সামাজিকভাবে সে দণ্ডার্হ[৫]। কিরাত, হূন, পুলিন্দ, পুক্কশ, আভীর, যবন, খস প্রভৃতি সকল জাতিই ভগবানের শরণে শুদ্ধ হন[৬]। বুদ্ধও জাতিভেদ মানেননি, তাঁকে স্ত্রী-শূদ্রের মুক্তিদাতারূপে স্তুতি করা হয়েছে বিশেষভাবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সর্বদা মহাভাবে বিভোর থাকলেও জাতিভেদের মূলে কুঠারাঘাত করেছেন। সেই একান্ত জাতি-সচেতনতার যুগে তাঁর নির্দেশে যবন হরিদাসের মৃত্যুর পর মৃতদেহের পাদোদক পান করেছিলেন উচ্চ-বর্ণের শিষ্যগণ। রামানুজ তাঁর ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে পারিয়া এবং মুসলমানগণকে স্থান দেবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন।

অতএব আমরা দেখতে পাচ্ছি, সন্ন্যাসী ও ধর্মপথের পথিকের পক্ষে সমাজে সাম্য-প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা অস্বাভাবিক নয়, বরঞ্চ তাই তাঁর জীবনধারার স্বাভাবিক পরিণতি। এবং ইতিহাসে তার প্রমাণ আমরা বারবার পেয়েছি। সুতরাং স্বামীজীও ভারতের সন্ন্যাসীদের চিরন্তন ধারা অনুসরণ ক'রে সমাজে সাম্য- ও সমন্বয়-প্রতিষ্ঠার প্রয়াস করেছেন। অতএব কর্ম ও বিশ্বাসের মধ্যে কোন অসঙ্গতি নেই। (ক্রমশঃ)

'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা'—রবীন্দ্রনাথ ৫ ভাগবত ৭।১১।১০ ৬ ঐ ২।৪।১৮

সমালোচনা

ভারতে শক্তিসাধনা—(প্রথম খণ্ড) শ্রীঅমূল্যনাথ চক্রবর্তী। প্রকাশক: শ্রীঅক্ষয়-কুমার চক্রবর্তী, ২৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা ১২। পরিবেশক: এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা ১২। পৃষ্ঠা ৩৮৯ + ১৮০; মূল্য ৭৲।

আলোচ্য গ্রন্থে শাস্ত্রের জটিল সমস্যার অবতারণা না করিয়া তাত্ত্বিক ও দার্শনিক দিক হইতে মহাশক্তির স্বরূপ ও মহিমা সাধারণ পাঠকের বোধগম্য ভাষায় আলোচিত। গ্রন্থকার দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, শক্তি ও কারণ-ব্রহ্ম একই বস্তু। শক্তিসাধকগণ মহাশক্তিকে ব্রহ্ম-জ্ঞানে এবং ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদজ্ঞানে উপাসনা করিয়া থাকেন। মহাশক্তি একদিকে পরমতত্ত্ব, অপরদিকে তত্ত্বাতীত। তিনি সর্বভূত সৃষ্টি করিয়া বায়ুর ন্যায় স্বচ্ছন্দে উহাদের অন্তরে বাহিরে অবস্থান করেন।

বিভিন্ন অধ্যায়ে শক্তির স্বরূপ, বৈদিক সাহিত্যে শক্তিসাধনা, পুরাণে শক্তিবাদ, তন্ত্রকথা, শাক্ত বৈষ্ণব শৈব গাণপত্য ও সৌর তন্ত্র, বৌদ্ধ ও জৈন তন্ত্র, বিভিন্ন মতবাদ আলোচিত। পুরাণ রামায়ণ ও মহাভারতের শক্তি-আলোচনা সুলিখিত।

প্রখ্যাত দুইজন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজ ও যোগেন্দ্রনাথ তর্ক-তীর্থ গ্রন্থটির যথাক্রমে প্রশংসাসূচক পরিচিতি ও দীর্ঘ সুচিন্তিত ভূমিকা লিখিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস সাধনায় অনুরাগী ধার্মিক জনসমাজে গ্রন্থখানি বিশেষ সমাদর লাভ করিবে। পরবর্তী খণ্ডগুলির আশু প্রকাশের আশায় রহিলাম।

মাতাজী গঙ্গাবাঈ: শ্রীঅজেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ, আদি মহাকালী পাঠশালা, ৩৫সি, কৈলাস বসু স্ট্রীট, কলিকাতা ৬। পৃষ্ঠা ৫৬, মূল্য ১৲।

আদি মহাকালী পাঠশালার প্রতিষ্ঠাত্রী তপস্বিনী মাতাজী গঙ্গাবাঈ-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ করিয়া আনন্দ লাভ করিলাম। পরাধীন ভারতে এই মহীয়সী মহিলা বিজাতীয় মোহান্ধ ভাবধারা হইতে সমাজের পবিত্রতা, শিক্ষা, রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠান রক্ষার জন্য বঙ্গদেশে আদর্শ স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন করেন। স্বামী বিবেকানন্দ মাতাজীর আমন্ত্রণে মহাকালী পাঠশালা পরিদর্শন করিয়া বিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতির প্রশংসা করেন। 'স্বামিশিষ্য-সংবাদ' গ্রন্থে এই বিষয় বর্ণিত আছে।

তীর্থরেণু—(দ্বিতীয় সংস্করণ) স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ। প্রকাশক: শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ৩৩৬; মূল্য ৬৲।

ধর্ম ও দর্শন বিষয়ে স্বামী অভেদানন্দের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ সম্বন্ধে পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি রাজযোগ এবং গীতা ও উপনিষদের যে-সব আলোচনা করিতেন, 'তীর্থরেণু' সেগুলিরই সারাংশ। তীর্থের ধূলির মতোই এগুলি পবিত্র।

রাজযোগের তিনটি পরিচ্ছেদে প্রাণশক্তির রহস্য, সংস্কারই সৃষ্টির বীজ, সৌরজগৎ, আলোকের গতি, সগুণব্রহ্মের রূপ, অব্যক্ত ঈশ্বর, ব্যক্ত ও অব্যক্তের মিলন, ষট্‌চক্রের ধ্যান, মনঃসংযম; গীতার দুইটি পরিচ্ছেদে

কার্য-কারণ-সূত্র, মনই সৃষ্টিকর্তা, প্রজ্ঞাই ঈশ্বর, 'আমি'ই অহং, কামনাই 'মহাশন', অঘটন-ঘটনপটীয়সী মায়া, বিচারের রূপ ; উপনিষদের দুইটি পরিচ্ছেদে বৈদিক যাগযজ্ঞ, সূর্য-উপাসনা, প্রতিমা ও পূজা, অবিদ্যা ও বিদ্যা, দুর্বলতাই ভ্রম প্রভৃতি সরল ভাষায় আলোচিত।

এতদ্ব্যতীত 'বিবিধ প্রসঙ্গে' মানুষের শক্তি অসীম, শরণাগতির দিক, সংগ্রামই জীবন এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-সম্বন্ধে বহু বিষয় আলোচিত। মূল আলোচনাগুলির প্রকাশভঙ্গী ভাব ও ভাষা যথাযথ রাখিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। প্রয়োজনীয় পাদটীকাগুলি দুর্বোধ্য শব্দ ও বিষয় বুঝিবার বিশেষ সহায়ক।

'হরিপাঠাচে অভঙ্গ'— বঙ্গানুবাদ : শ্রীগিরীশচন্দ্র সেন, ২১, লেক এভিনিউ, কলিকাতা ২৬। প্রাপ্তিস্থান : মহেশ লাইব্রেরি, ২।১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলেজ স্কয়ার, কলিকাতা ১২। পৃষ্ঠা ২৩, মূল্য ৭৫ ন.প.।

মারাঠী ভাষায় ভগবদ্গীতার অপূর্ব ভাষ্য 'জ্ঞানেশ্বরী'-গ্রন্থের প্রণেতা শ্রীজ্ঞানদেব 'হরিপাঠাচে অভঙ্গ'-নামক ২৮টি ভক্তিমূলক কবিতা রচনা করিয়াছেন। বাংলা ভাষায় ইতঃপূর্বে এইগুলি অনূদিত হয় নাই। সুধী লেখক মূল-সহ ইহাদের সরল বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়া বাংলা ধর্মসাহিত্যে একটি নূতন সংযোজন করিলেন।

বাংলা খেয়াল-গীতিকা (প্রথম খণ্ড) সুরসেবক। প্রকাশক : ইণ্ডিয়া লাইব্রেরি, করিমগঞ্জ, কাছাড়। প্রাপ্তিস্থান : আর. বি. দাস, ৮সি, লালবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা ১। পৃষ্ঠা ৩৮ ; মূল্য ২৲।

খেয়াল-গান সকলের জন্য নয়—বিশিষ্ট শিল্পীদের জন্য। খেয়াল-সঙ্গীত অধিকাংশই হিন্দীতে রচিত। হিন্দী গানের অনুকরণে বাংলা ভাষায় রচিত ভক্তিমূলক ২৫টি গান স্বরলিপি-সহ প্রকাশিত এই গ্রন্থে। ভূপালী, বেহাগ, দুর্গা, শিবরঞ্জনী, চন্দ্রকোষ, জৈনপুরী, মালকোস প্রভৃতি রাগের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। ভাষা বোধগম্য হইলেই গান হৃদয় স্পর্শ করে। বাংলায় খেয়াল-গান-রচনার প্রচেষ্টা তাই অভিনন্দনযোগ্য। গ্রন্থটির সপ্রশংস ভূমিকা লিখিয়াছেন প্রখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ।

সুরে কথামৃত (গান ও স্বরলিপি, ২য় খণ্ড)—ছন্দরূপ : অজাতশত্রু ; সুর ও স্বরলিপি : শ্রীরামকুমার চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক : কল্পতরু প্রকাশনী, ৮নং কে. কে. রায়চৌধুরী রোড, কলিকাতা ৮। পৃষ্ঠা ২৮ ; মূল্য ২৲।

বিভিন্ন স্থানে 'শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতে'র আলোচনা ও অনুধ্যান হয়। কথামৃতের ভাব ও গল্প অবলম্বনে সম্প্রতি অনেকে কবিতা ও গান রচনা করিতেছেন। আলোচ্য গ্রন্থখানি তাহারই একটি নিদর্শন। আশা করি প্রথম খণ্ডের মতো এই খণ্ডও সমাদৃত হইবে।

নচিকেতা (সচিত্র হিন্দী কাব্য) : শ্রীসুধাকর দীক্ষিত। প্রকাশক : কৃষ্ণ ত্রিবিক্রম বৈদ্য, চেতনা লিমিটেড, ৩৪, রেম্পার্ট রো, বোম্বাই ১। পৃষ্ঠা ৭৯ ; মূল্য টাকা ৩·৫০।

খ্যাতনামা হিন্দী কবি প্রণীত 'নচিকেতা' ভাষা ও ভাব উভয় দৃষ্টিকোণ হইতেই উৎকৃষ্ট কাব্য। প্রসিদ্ধ কঠোপনিষদের মুখ্য চরিত্র নচিকেতা। স্বামী বিবেকানন্দ নচিকেতার মতো নির্ভীক ও শ্রদ্ধাশীল হইতে উপদেশ দিয়াছেন। উপনিষদের কাহিনী অবলম্বনে রচিত হইলেও আলোচ্য গ্রন্থখানি অনুবাদ নয়। কবি কঠোপনিষদের আধ্যাত্মিক ভাব

ও ব্রহ্মবিদ্যা কোথাও সংক্ষেপে, কোথাও ব্যাখ্যাকারে ছন্দোবদ্ধ করিয়াছেন। প্রচ্ছদ-পট আকর্ষণীয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমা (তৃতীয় সংস্করণ) —স্বামী অপূর্বানন্দ। প্রকাশক: স্বামী মহেশ্বরানন্দ, অধ্যক্ষ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বাঁকুড়া। পৃষ্ঠা ২৫৬, মূল্য ৩৲।

একখানি গ্রন্থে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমায়ের দিব্য জীবন যুগ্মভাবে লিপিবদ্ধ। এই গ্রন্থ শ্রীশ্রীমায়ের শতবর্ষ-জয়ন্তী উপলক্ষে প্রথম প্রকাশিত হয়, ইহা পাঠকগণের বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে।

শিল্পপীঠ-পত্রিকা (রবীন্দ্র-প্রফুল্ল-শতবর্ষ-জয়ন্তী সংখ্যা—১৯৬২): রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পপীঠ, বেলঘরিয়া হইতে স্বামী সন্তোষানন্দ কর্তৃক প্রকাশিত ; পৃষ্ঠা ১২২।

সুনির্বাচিত কয়েকটি প্রবন্ধে ও কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ও প্রফুল্লচন্দ্রের উদ্দেশে তাঁদের জন্ম-শতবর্ষে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছে। জাতীয় অধ্যাপক বৈজ্ঞানিক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ভাষণের সংক্ষিপ্তসার 'নবযুগের পথিকৃৎ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র' এই সংখ্যার অলঙ্কার। 'Fractional Horse-Power Electric Motors', 'Development of underground Power Cables', 'কৃত্রিম চন্দ্র ও রকেট' প্রবন্ধগুলি বৈজ্ঞানিক অনুশীলনের এবং শিক্ষা- ও ভ্রমণ-সংক্রান্ত রচনাগুলি সাহিত্যিক প্রচেষ্টার পরিচায়ক। 'আমাদের কথা'য় সারা বৎসরের কর্মধারা বিবৃত।

বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী-প্রস্তুতি

মস্কো হইতে তাস (Tass)-এর সংবাদে প্রকাশ: সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞান-আকাদামির প্রেসিডিয়াম (The Presidium of the Academy of Sciences of the U. S. S. R) কর্তৃক ভারতীয় দার্শনিক ও চিন্তাশীল মনীষী স্বামী বিবেকানন্দের শতবার্ষিকী সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠানের জন্য একটি প্রস্তুতি-কমিটি গঠিত হইয়াছে।

স্বামীজীর শতবার্ষিক উৎসব ভারতে ও অন্যান্য দেশের বিজ্ঞান-জগতে ব্যাপকভাবে অনুষ্ঠিত হইবে। প্রখ্যাত সোভিয়েট দার্শনিক পায়তর ফেরোসিভ (Pyotr Feroseev) শতবার্ষিকী কমিটির সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছেন।

স্বামীজীর কয়েকটি গ্রন্থ রুশ ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। —Tass

বক্তৃতা-সফর

বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী কমিটির সাধারণ সম্পাদক স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ নিম্নলিখিত স্থানে শক্তিশালী শতবার্ষিকী কমিটি গঠন করেন। প্রত্যেক স্থানেই তাঁহার বক্তৃতায় বহু জন-সমাগম হয়। তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ছিল: স্বামীজীর শিক্ষা-আদর্শ এবং বর্তমান ভারতের প্রতি তাঁহার উপদেশ।

১. আজমীর— রামকৃষ্ণ আশ্রম, উইমেন্‌স্ কলেজ, মেয়ো প্রিন্সেস্ কলেজ, টাউন হল, বি.টি. কলেজ, অন্ধ বিদ্যালয়।

২. বেওয়ার—সনাতন ধর্ম কলেজ।

৩. পুষ্কর— বয়েজ্ এবং গার্লস্ স্কুল, গায়ত্রীদেবী গার্লস্ কলেজ।

৪. জয়পুর -রোটারী ক্লাব, স্টাডী সার্কল।

৫. বিকানীর—রামকৃষ্ণ আশ্রম।

৬. গোয়ালিয়র—সনাতন ধর্ম ইনস্টিট্যুট।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

কার্যবিবরণী

সিঙ্গাপুর ঃ কেন্দ্রটি ১৯২৮ খৃঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়া আধ্যাত্মিক ও সাধারণ শিক্ষা বিস্তার, সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ও সমাজসেবা করিয়া আসিতেছে। ১৯৫৯ ও '৬০ খৃঃ কার্যবিবরণীতে এই কেন্দ্রের উন্নতি পরিস্ফুট।

প্রতি সপ্তাহে ক্লাস ও বক্তৃতা এবং ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে ধর্মসম্বন্ধীয় শিক্ষা দেওয়া হয়।

'বিবেকানন্দ তামিল বিদ্যালয়' বালকদের জন্য এবং 'সারদাদেবী তামিল বিদ্যালয়' বালিকাদের জন্য—তামিল ভাষা শিক্ষা বিস্তার করিতেছে। উভয় বিদ্যালয়ে তিন শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়ন করে। প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য ইংরেজী ও তামিল শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

১৯৫৯ খৃঃ লাইব্রেরিতে বিভিন্ন বিষয়ের ইংরেজী, তামিল, মালয়ালম, হিন্দী ও বাংলা ভাষায় ৪,২৫২ বই ছিল; '৬০ খৃঃ ১০১ বই সংযোজিত হয়। পাঠাগারে ৬৬ সাময়িক ও ৬টি দৈনিক পত্রিকা রাখা হয়। গ্রন্থাগার ও পাঠাগার জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে।

আলোচ্য বর্ষদ্বয়ে ছাত্রাবাসে ৫০ ও ৫৭টি ছাত্র ছিল, ছাত্রদের সকলেই অনাথ বা অত্যন্ত দরিদ্র, বয়স ৬ হইতে ১৭ বৎসরের মধ্যে, তাহারা প্রাথমিক, মাধ্যমিক বা শিল্পবিদ্যালয়ের ছাত্র।

মাদ্রাজ ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ দাতব্য চিকিৎসালয়ের কার্যবিবরণী (এপ্রিল '৬১—মার্চ '৬২) প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯২৫ খৃঃ চিকিৎসালয়টির প্রতিষ্ঠা-বর্ষে ৯৭০ জন রোগী চিকিৎসা লাভ করে। আলোচ্য বর্ষে এলোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক উভয় বিভাগে মোট চিকিৎসিতের সংখ্যা ১,৬৬,৩৭১। এলোপ্যাথিক বিভাগে ১৪৬,৬৩০ (নূতন ৪৯,৬৬৬) রোগী এবং হোমিওপ্যাথিক বিভাগে ১৯,৭৪১ (নূতন ৫,৯৭১) রোগী চিকিৎসিত হয়। চক্ষু-বিভাগ, E. N. T.-বিভাগ ও দন্ত-বিভাগে চিকিৎসিতের সংখ্যা ৩,৩০২, ১৩,১৩৪ ও ৮,৭৪৭। এক্স-রে-বিভাগে ৫৪৭ জন পরীক্ষিত হয়; ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষিত নমুনার সংখ্যা ৯১৪। রুগ্ণ ও অপুষ্ট শিশুদের জন্য বিশেষ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে ৬,৯৮৭ শিশু চিকিৎসিত হয়। ১,৯৬,২২৯ জনকে দুধ দেওয়া হয়।

জনসাধারণের সহানুভূতি ও সহযোগিতা এই দাতব্য চিকিৎসালয়ের ক্রমোন্নতির মুখ্য কারণ।

মাঙ্গালোর ঃ ১৯৪৭ খৃঃ প্রতিষ্ঠিত মঠ-কেন্দ্রটি '৫১ খৃঃ মঙ্গলাদেবী রোডে অবস্থিত নিজস্ব ভবনে স্থানান্তরিত হয়। এখানে দৈনিক পূজা ভজন ও সাময়িক উৎসবাদি ছাড়া প্রতি সপ্তাহে আশ্রমে ও আশ্রমের বাহিরে ধর্মবিষয়ক বক্তৃতা ও আলোচনার ব্যবস্থা আছে। আশ্রম-পরিচালিত গ্রন্থাগারটির জনপ্রিয়তা বর্ধিত হইয়াছে, পাঠক-সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে।

মিশন-কেন্দ্র স্থাপিত হয় ১৯৫১ খৃঃ। দরিদ্র ছাত্রদের জন্য একটি ছাত্রাবাস ও সর্বসাধারণের জন্য একটি এলোপ্যাথিক দাতব্য

চিকিৎসালয় পরিচালিত হইতেছে। এপ্রিল '৬১—মার্চ '৬২ কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষের শেষে ছাত্রাবাসে ৪২ জন বিদ্যার্থী ছিল, তন্মধ্যে কলেজের ছাত্র ১১ জন; ৩৮ জন বিনা-খরচে থাকিবার সুযোগ লাভ করে। ছাত্রদিগকে ভগবদ্‌গীতা, বিষ্ণুসহস্রনাম ও ললিতসহস্রনাম আবৃত্তি করিতে শেখানো হয়।

১৯৫৫ খৃঃ প্রতিষ্ঠিত দাতব্য চিকিৎসালয়ে আলোচ্য বর্ষে ৩৭,৯৬৭ (নূতন ৮,০১৬) রোগী চিকিৎসিত হয়।

পাটনা ঃ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম ১৯২২ খৃঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই আশ্রমের বার্ষিক কার্যবিবরণী (এপ্রিল '৬১—মার্চ '৬২) পাইয়া আমরা আনন্দিত। আলোচ্য বর্ষে আশ্রমে ভাগবত, যোগবাশিষ্ঠ, অধ্যাত্মরামায়ণ, উপনিষৎ ও শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারা সম্বন্ধে ২৭২টি এবং আশ্রমের বাহিরে ৪৮টি আলোচনা হইয়াছিল। পূজা ও উৎসবাদিও যথারীতি সুসম্পন্ন হয়।

অদ্ভুতানন্দ অবৈতনিক উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২৬৩ ছাত্র অধ্যয়ন করে, ইহাদের অধিকাংশই দরিদ্র অনুন্নত শ্রেণীর। ছাত্রাবাসে বর্ষশেষে ২৬ জন বিদ্যার্থী ছিল, তন্মধ্যে ১৬ জনের সম্পূর্ণ খরচ আশ্রম হইতে বহন করা হয়। ২১ জন ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষা দেয়, ১৯ জন উত্তীর্ণ হয়।

তুরীয়ানন্দ-গ্রন্থাগারের ৬,৩৬০ পুস্তকের মধ্যে নূতন সংযোজন ৪৮৭। পাঠাগারে ৬টি দৈনিক ও ৭৫টি সাময়িক পত্রিকা নিয়মিত আসিয়াছে। পাঠক-সংখ্যা ও গৃহীত পুস্তক-সংখ্যা যথাক্রমে ২৩,৭৬০ ও ৯,৫০৯। গ্রন্থাগারটি জনসাধারণের বিশেষ করিয়া স্থানীয় ছাত্রগণের বিশেষ প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে।

গ্রন্থাগার-ভবনের দ্বিতলে প্রশস্ত হলে—বিশিষ্ট বক্তাদের দ্বারা সাধারণের উপযোগী ধর্ম-ও কৃষ্টিবিষয়ক বক্তৃতা ও আলোচনার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

আশ্রমের হোমিওপ্যাথিক ও এলোপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়ে যথাক্রমে ৫৯,৪২২ (নূতন ৭,২৫৮) ও ৫৪,৪৬৯ (নূতন ৮,৫৪৭) রোগী চিকিৎসিত হয়।

বিহারের মুঙ্গের জেলায় গত বন্যায় বন্যার্তদের সাহায্য (relief) করা হয়। ৪০টি গ্রামের ১,৩২৬ বন্যার্ত পরিবারে এই সেবাকার্যে নূতন ৯০০ কম্বল, ১,১৯২ ধুতি ও ১,০২০ শাড়ি বিতরণ করা হয়। ইহা ছাড়া জামার কাপড় এবং ছেলে-মেয়েদের প্যাণ্ট ও জামা দেওয়া হয়।

রাঁচি ঃ রামকৃষ্ণ মিশন যক্ষ্মা-আরোগ্য-ভবনের কার্যবিবরণী (জানুআরি '৬০—মার্চ '৬১) প্রকাশিত হইয়াছে। এই স্যানাটোরিয়ামটি রাঁচি হইতে ১০ মাইল দূরে রাঁচি-চাইবাসা রোডের পার্শ্বে অবস্থিত। স্বাস্থ্যকর প্রাকৃতিক পরিবেশে ২,১০০ ফুট উচ্চতায় প্রায় ২৮৯ একর-পরিমিত অরণ্যময় ভূখণ্ডের উপর আরোগ্য-ভবন গড়িয়া উঠিয়াছে। বৈদ্যুতিক আলো, টেলিফোন ও জলাধারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

এখানে দুরারোগ্য যক্ষ্মারোগের ফুসফুস-অস্ত্রোপচার-সহ প্রয়োজনীয় চিকিৎসা-ব্যবস্থাদি আছে। অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ বিভিন্ন বিভাগে নিযুক্ত আছেন। ১০ বৎসরের মধ্যে এই সেবাপ্রতিষ্ঠানটি একটি পূর্ণাঙ্গ আরোগ্য-ভবনে পরিণত হইয়াছে, ইহা ভারতের অন্যতম বিশিষ্ট যক্ষ্মা-কেন্দ্র।

১৯৫১ খৃঃ ৩২টি শয্যা লইয়া এই প্রতিষ্ঠানের সূচনা হয়। ১৩টি কেবিন ও

১৩টি কটেজ সহ বর্তমানে মোট শয্যা-সংখ্যা ২০৫, তন্মধ্যে ৩২টি ফ্রি। আলোচ্য বর্ষে আরোগ্য-ভবনে মোট ৫৩৮ জন রোগী ছিল; ৩৩৮ জন আরোগ্য লাভ করিয়া হাসপাতাল হইতে চলিয়া যায়। ৯৮ জন রোগী ফ্রি এবং ২৭ জন আংশিক ব্যয়ে চিকিৎসিত হয়।

যক্ষ্মারোগের কবল হইতে মুক্তিপ্রাপ্ত সুস্থ কয়েকজন আগ্রহশীল ব্যক্তিকে স্যানাটোরিয়ামেরই বিভিন্ন কর্মে নিযুক্ত করা হইয়াছে। আরও ফ্রি বেডের জন্য সরকার ও বদান্য ব্যক্তিগণের সাহায্য ও সহযোগিতা প্রয়োজন।

নিবেদিতা-স্মৃতিবার্ষিকী

গত ৩রা নভেম্বর, শনিবার বাগবাজার নিবেদিতা বিদ্যালয়ে ভারতগতপ্রাণা ভগিনী নিবেদিতার স্মৃতিবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়। ভগিনীর জন্মদিন ১৮৬৭ খৃঃ ২৮শে অক্টোবর; কিন্তু পূজার ছুটি উপলক্ষে বিদ্যালয় বন্ধ থাকায় ৩রা নভেম্বর ঐ উপলক্ষে বিদ্যালয়ের কর্মী ও ছাত্রীবৃন্দ তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে। মালা ও ফুল দিয়া ভগিনীর সুবৃহৎ প্রতিকৃতি সুসজ্জিত করা হয়। ধূপধুনা ও দীপালোকে সভায় একটি ভাবগম্ভীর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। বেদমন্ত্র-আবৃত্তি ও 'ভারত আমার, ভারত আমার যেখানে মানব মেলিল নেত্র' গানটি সভায় উদ্দীপনার সঞ্চার করে। ছাত্রীগণ কর্তৃক ভগিনীর উদ্দেশে রচিত কবিতা আবৃত্তি ও সঙ্গীতের পর ভগিনীর রচনা হইতে সুনির্বাচিত কয়েকটি সময়োপযোগী উদ্ধৃতি পঠিত হয়। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণা ভগিনীর অনুপম জীবন আলোচনা করেন। উদ্বোধন-সম্পাদক স্বামী নিরাময়ানন্দ সভায় পৌরোহিত্য করেন। সহজ সরল ভাষায় তিনি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারায় ভগিনীর অবদানের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেন। প্রায় ছয়শত ছাত্রী, বিদ্যালয়ের কর্মিগণ ও বহু মহিলা সভায় উপস্থিত ছিলেন।

আমেরিকায় বেদান্ত

স্যানফ্রান্সিস্কো (বেদান্ত-সোসাইটি): নূতন মন্দিরে প্রতি রবিবার বেলা ১১টার সময় কেন্দ্রাধ্যক্ষ স্বামী অশোকানন্দ এবং বুধবার রাত্রি ৮টায় পর্যায়ক্রমে সহকারী স্বামী শান্তস্বরূপানন্দ ও স্বামী শ্রদ্ধানন্দ বক্তৃতা দেন।

মার্চ: আমাদের অন্তঃকরণ ঈশ্বরের জন্য ক্ষুধার্ত; মন ও ইন্দ্রিয়গুলিকে শুদ্ধ করিবার উপায়; শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার শিষ্যগণকে কিভাবে শিক্ষা দিয়াছিলেন; বেদান্ত কিরূপে খৃষ্টধর্মকে সাহায্য করিতে পারে; অজ্ঞেয়কে জানা; মৃত্যুর পরে দেহ মন ও আত্মা; মনের উচ্চভাব উদ্দীপিত করা; আধ্যাত্মিকতার পরিণত অবস্থা।

এপ্রিল: 'আমাকে অনুসরণ কর, মৃতের সৎকার মৃতেরা করুক'; ঈশ্বর-সম্বন্ধে তোমার ধারণা কি? গুরু ও দীক্ষা; বাইবেলে বেদান্তের শিক্ষা; প্রকৃত সত্তাই পরমেশ্বর; মৃত্যুর গহ্বর অতিক্রম করা, ঈশ্বর সত্য শিব ও সুন্দর; শরীর-সচেতনতাই বড় বাধা।

মে: আধ্যাত্মিক উন্নতির লক্ষণ; পুনরুজ্জীবন, পুনরবতরণ ও আত্মপ্রকাশ; নকল অবতার হইতে সাবধান; মন শান্ত করা যায় কিরূপে? স্বামী বিবেকানন্দের ধর্ম—তিনি যেমন ইহা আচরণ করিয়াছিলেন ও শিক্ষা দিয়াছিলেন। নিদ্রা ও মৃত্যুর আধ্যাত্মিক অর্থ; যে রহস্য মানুষকে ঘিরিয়া রহিয়াছে; মনের স্বভাব এরূপ চঞ্চল কেন? বেদান্তের দৃষ্টিতে মূল পাপ।

পুরাতন মন্দিরে প্রতি রবিবার রাত্রি ৮টায় ধ্যান ও কঠোপনিষদের ক্লাস করেন স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। পূর্ব হইতে ব্যবস্থা করা থাকিলে স্বামী অশোকানন্দ ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করেন। নূতন মন্দিরে প্রতিদিন পূজা হয়; বেদীর সম্মুখের হলে কেহ ইচ্ছা করিলে ধ্যান-ধারণা করিতে পারেন।

বিবিধ সংবাদ

পরলোকে হরেরাম ঘোষ

আমরা দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, গত ২২শে অক্টোবর সোমবার রাত্রি ৪-২৫ মিঃ সময়ে ৭২ বৎসর বয়সে হরেরাম ঘোষ পরলোক গমন করিয়াছেন। কিছুকাল যাবৎ তিনি রক্তের চাপবৃদ্ধিতে ভুগিতেছিলেন। হুগলি জেলার আঁটপুর গ্রামের প্রসিদ্ধ ভক্ত তুলসীরাম ঘোষের তিনি ছিলেন একমাত্র পুত্র। শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য হরেরাম শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী সন্তানগণের বিশেষতঃ শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দের স্নেহলাভে কৃতার্থ হন।

তাঁহার দেহমুক্ত আত্মা শাশ্বত শান্তি লাভ করুক। ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

কার্যবিবরণী

গয়া: রামকৃষ্ণ আশ্রমের ১৯৫৯-৬১ খৃঃ কার্যবিবরণী আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এই আশ্রম কর্তৃক একটি হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়, একটি নৈশ বিদ্যালয় ও একটি গ্রন্থাগার পরিচালিত হইতেছে। আশ্রমে নিয়মিত পূজা ও সাময়িক উৎসবাদি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

দরিদ্র বান্ধব ভাণ্ডার: উত্তর কলিকাতার এই জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠানটির কর্মধারা সেবা, সাহায্য, গ্রন্থাগার- ও চিকিৎসালয়-পরিচালনার মাধ্যমে রূপায়িত। ৩৯তম বর্ষের (১৯৬১ খৃঃ) কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। দাতব্য চিকিৎসালয়ে ১,২২,৪৩৫ রোগী এবং চেস্ট-ক্লিনিকে ১৬,৮৭৯ রোগী চিকিৎসিত হয়। অন্যান্য বিভাগেও পূর্ব বৎসরের ন্যায় সেবাকার্য অনুষ্ঠিত হয়। গ্রন্থাগারের পুস্তকসংখ্যা ৫,৯৬৬।

ধোঁয়াহীন কয়লা

ধূমায়িত কলিকাতার বাতাস স্বাস্থ্যের পক্ষে বিপজ্জনক। শুধু কলিকাতা নয়, বড় বড় শহরে এবং শিল্পাঞ্চলে লক্ষ লক্ষ লোক আজকাল ধোঁয়া আর ধূলার জন্য স্বাস্থ্যপ্রদ সূর্যকিরণের শতকরা ৫০ ভাগও উপভোগ করিতে পারে না।

সম্প্রতি জার্মান রুর কয়লা শিল্প প্রতিষ্ঠান এমন একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছেন, যাহার সাহায্যে কয়লা জ্বালাইলে ধূম নির্গত হইবে না। এই নূতন পদ্ধতিকে তিন ভাগে করা চলে। প্রথমে কয়লাকে শুকাইয়া লওয়া হয়। তারপর তৈল মাখাইয়া ইহাকে জলরোধক করা হয়। অবশেষে কাগজ-কলের পরিত্যক্ত সালফাইট মিশ্রণের সহিত মাখিয়া ইঁটের আকৃতি দেওয়া হয়। জ্বালাইলে এই কয়লা হইতে ধোঁয়া বাহির হয় না। —সঙ্কলিত

ভারতে জনশিক্ষা

ভারতে সাধারণ শিক্ষার প্রসার মন্থর-গতিতে অগ্রসর হইতেছে। ১৯৬১ খৃঃ আদম-শুমারিতে প্রকাশ—ভারতে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন লোকের সংখ্যা বৎসরে গড়ে ০.৮ শতাংশ হারে বাড়িতেছে।

কেন্দ্রশাসিত দিল্লীতে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন লোকের সংখ্যা সর্বাপেক্ষা অধিক—প্রতি-হাজারে ৫২৭ জন। তাহার পরেই কেরলের স্থান, কিন্তু ১৯৫১ খৃঃ কেরলের স্থান ছিল প্রথম। ১৯৫১ খৃঃ পশ্চিমবঙ্গের স্থান ছিল

চতুর্থ, কিন্তু বর্তমানে হইয়াছে নবম। পশ্চিমবঙ্গে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন লোকের সংখ্যা হাজার-করা ২৯৩ জন। মণিপুরের স্থান ষোড়শ হইতে সপ্তমে উঠিয়াছে। আসামের স্থান নবম হইতে দশমে, বিহারের পঞ্চদশ হইতে সপ্তদশে এবং ওড়িষ্যার স্থান দশম হইতে চতুর্দশে নামিয়া গিয়াছে। —সঙ্কলিত

পশ্চিমবঙ্গে শহর ও গ্রাম

পশ্চিমবঙ্গে গত ১০ বৎসরে শহরের সংখ্যা বাড়িয়াছে ৬৪। ১৯৫১ খৃঃ এই রাজ্যে শহর ছিল ১২০টি, ইহাদের মোট লোকসংখ্যা ছিল ৬,২৮১,৬৪২। ১৯৬১ খৃঃ শহরের সংখ্যা হইয়াছে ১৮৪, ইহাদের মোট লোকসংখ্যা ৮,৫৪০, ৮৪২।

বর্তমানে একলক্ষের বেশী লোক-বসতির শহর পশ্চিমবঙ্গে ১২টি; '৫১ খৃঃ ছিল মাত্র ৭টি।

পশ্চিমবঙ্গে গ্রামের সংখ্যা ৩৮,৫৩০। গ্রামের মোট অধিবাসী ২৬,৩৮৫,৪৩৭; ইহার মধ্যে পুরুষ ১৩,৫৭৯,০৪৪ এবং মহিলা ১২,৮০৬,৩৯৩।

দশ হাজারের উপর বসতি এমন গ্রামের সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে ২৪, '৫১ খৃঃ ছিল ১৪। —সঙ্কলিত

নিবেদন

আগামী মাঘ মাসে 'উদ্বোধনে'র নূতন (৬৫ তম) বর্ষ আরম্ভ হইবে। গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ স্পষ্টাক্ষরে অনুগ্রহপূর্বক পুরা নাম ও ঠিকানা সহ বার্ষিক ৫।০ (সাড়ে পাঁচ টাকা) ১৫ই পৌষের মধ্যে উদ্বোধন-কার্যালয়ে পাঠাইয়া দিবেন। টাকা যথাসময়ে হস্তগত হইলে ভি. পি.-তে কাগজ পাঠাইবার অতিরিক্ত ডাকব্যয় বাঁচিয়া যায় ও অযথা বিলম্ব হয় না। কুপনে **গ্রাহক-সংখ্যা** অতি অবশ্যই উল্লেখ করিবেন।

অফিসে টাকা জমা দিবার সময়ঃ রবিবার বিকাল ৩টা হইতে ৫টা।

অন্যদিন সকাল ৭টা হইতে ১০-৩০ মিঃ এবং বিকালে ২-৩০ মিঃ হইতে ৫টা।

কার্যাধ্যক্ষ

১, উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা ৩

বিজ্ঞপ্তি

পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর ১১০ তম শুভ জন্মতিথি আগামী ২রা পৌষ, **১৮ই ডিসেম্বর, মঙ্গলবার কৃষ্ণা সপ্তমী তিথিতে বেলুড় মঠে ও অন্যত্র বিশেষ পূজানুষ্ঠান সহকারে উদ্‌যাপিত হইবে।**

আমারই আত্মাকে

স্বামী বিবেকানন্দ

ধরে থাকো আরো কিছু কাল, অটল হৃদয় !
ছিন্ন ক'রো নাকো এই আজন্ম বন্ধন,
যদিও অস্পষ্ট ক্ষীণ এই বর্তমান—ভবিষ্যৎ ঘনতমোময় !

কেটে গেছে যেন এক যুগ—তোমাতে আমাতে মিলে
যাত্রা শুরু করিলাম জীবনের উঁচু নিচু পথে,
অপূর্ব সমুদ্রে কভু ভেসে যাই শান্ত ধীর পালে ;
আমি মোর যত কাছে, তার চেয়ে তুমি আরো কাছে—মাঝে মাঝে,
মনের তরঙ্গগুলি উঠিবার আগে প্রকাশিত করেছ তুমিই।

অবিকল প্রতিভাস ! তোমার স্পন্দন—মেলানো আমার সাথে,
সূক্ষ্মতম চিন্তা, তবু পূর্ণরূপে ধ্বনিত তোমাতে !
হে সংস্কার, লিপিকার ! এখন কি আমাদের বিদায়ের পালা ?

তোমাতেই রহিয়াছে বন্ধুত্ব বিশ্বাস,
অশুভ বাসনা যবে ফেনাইয়া ওঠে, সতর্ক করেছ তুমি ;
সাবধান-বাণী তব হেলায় দিয়েছি ফেলে,
তবু তুমি সত্য শুভ শক্তি মোর—পূর্বের মতন !

'To my own Soul' কবিতার অনুবাদ ; রচনার স্থান কাল অজ্ঞাত।

কথাপ্রসঙ্গে

জাতীয় চরিত্র উন্নয়ন

বর্তমানে প্রতিবেশী রাষ্ট্র চীন কর্তৃক সহসা আক্রান্ত হওয়ায় ভারতীয় জনমানসে নূতন চিন্তা শুরু হইয়াছে, নূতনভাবে আত্মবিশ্লেষণ আরম্ভ হইয়াছে। একদিকে যেমন সকলে প্রাত্যহিক দ্বেষ-দ্বন্দ্ব বিস্মৃত হইয়া নবলব্ধ স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রাণ পণ করিয়াছে, তেমনি আবার চিন্তা করিতেছে: কেন এই প্রাথমিক বিপর্যয় ঘটিল? কোথায় আমাদের দোষ? কোথায় আমাদের দুর্বলতা? কি উপায়ে আমরা ভবিষ্যতে অনুরূপ বিপদ এড়াইতে পারিব? এই সকল প্রশ্ন আমাদিগকে জাতীয় চরিত্র সংগঠনের প্রয়োজনীয়তার দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করিতেছে। সর্বপ্রকার দোষ ও দুর্বলতা সম্বন্ধে সচেতন হইয়া ঐগুলি দূরীভূত করিতে হইবে। তবেই জাতীয় চরিত্র বজ্রের মতো দৃঢ় হইবে, জাতি অজেয় হইবে।

ব্যক্তিগত চরিত্র বলিতে একটা কিছু ধারণা হয়, কিন্তু জাতীয় চরিত্র বলিতে সঠিক কিছু ধারণা হয় কিনা সন্দেহ। ব্যক্তিগত চরিত্র বলিতে আমরা বুঝি—সত্য-পরায়ণ, কর্তব্যনিষ্ঠ, পরোপকারী, অমায়িক প্রকৃতির একটি মানুষ, পাঁচজনে যাঁহাকে শ্রদ্ধা করে, যাঁহার সুখ্যাতি করে, বিপদে আপদে যাঁহার কাছে আসে সহানুভূতি, সাহায্য বা পরামর্শের জন্য। তিনিও শুধু মুখে নয়, যথাসাধ্য কিছু করিয়া সঙ্কটকালে বিপন্নকে সাহায্য করেন।

কিন্তু জাতির ক্ষেত্রে আমরা চরিত্রের বিচার করিব কি করিয়া? জাতি তো একটি সামান্য ব্যক্তি নয়, বরং বহু ব্যক্তির সমষ্টি; এইখানেই আমরা জাতীয় চরিত্রের মূল সূত্র পাই! ব্যষ্টিকে উন্নত করিতে পারিলেই সমষ্টিও উন্নত হয়। ব্যক্তির চরিত্র উন্নত করাও সহজ নয়, এজন্যও জন্ম-জন্মান্তরের সাধনা প্রয়োজন।

মহৎ চরিত্রের লক্ষণ ও সাধন জানা থাকা সত্ত্বেও আমরা কয়জন সেগুলি জীবনে আয়ত্ত করিতে পারি? আমরা সকলেই জানি, সত্যপরায়ণতা চরিত্রের একটি প্রধান স্তম্ভ, সঙ্গে সঙ্গে ইহাও জানি, কার্যক্ষেত্রে সত্য পালন ও আচরণ করা কি কঠিন!

চরিত্রকে মহিমান্বিত করিবার আরও দুইটি প্রধান উপাদান—সেবা ও পরোপকার, এ-কথা জানা থাকা সত্ত্বেও প্রয়োজনকালে আমরা পিছাইয়া পড়ি। কেন?—এই প্রশ্নের উত্তর বিশ্লেষণ করিলে দেখি—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শরীর বা শরীর-চেতনাই আমাদের প্রতিবন্ধক, শরীর আমাদিগকে স্বার্থবিষয়ে সচেতন করে, এই ভাব বর্ধিত হইলে মানুষ স্বার্থান্ধ হয়—পশুরও অধম হইয়া যায়। ব্যক্তিগত চরিত্রের উন্নতি ও অবনতির কারণ সন্ধানে আমরা যে গভীর তত্ত্বে উপনীত হইলাম, তাহা হইতে কি জাতীয় চরিত্রের উন্নতির কোন সন্ধান পাওয়া যাইবে না?

ব্যক্তিগত চরিত্র গঠনের জন্য আমরা উপনীত হইয়াছি দেহচেতনার ঊর্ধ্বে আধ্যাত্মিক সাধনার দ্বারদেশে, কিন্তু এই সংসার-বিমুখ সাধনা দ্বারা কি আধুনিক কোন জাতির চরিত্র গঠন করা সম্ভব? প্রথমতঃ মনে হয়, 'না'। যদি আমরা গভীরভাবে চিন্তা করি, দেখিব, বুঝিব—স্বার্থকে বিসর্জন

না দিয়া শরীর-চেতনাকে অন্ততঃ কিছুটা অস্বীকার না করিয়া মানুষ পশুজীবনের স্তর হইতেও উঠিতে পারে না, যথার্থ মনুষ্য-জীবন যাপন করা তো দূরের কথা।

বহুর জন্য একের সুখ-সুবিধা ত্যাগ করিবার প্রবৃত্তি হইতেই গড়িয়া উঠিয়াছে—মানুষের সংসার, সমাজ, রাষ্ট্র, ইতিহাস ও কৃষ্টি। বহু মানব—হয়তো বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে—যখন সংহত হইল, তখন প্রত্যেককেই কিছু পরিমাণে ত্যাগ স্বীকার করিতে হইয়াছে।

এইভাবে এক ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে অবস্থিত একই দেশের অধিবাসিগণ একই প্রকার রীতিনীতি অনুসরণ করিয়া গোষ্ঠী হইতে ক্রমশঃ বড় হইয়া একটি জাতিতে পরিণত হয়। তাহারা একই কৃষ্টি—একই ইতিহাসের উত্তরাধিকারী হয়। একই ভাষায় কথা বলিয়া তাহারা নিজেদের বিশেষ প্রকার সাহিত্য সৃষ্টি করে। এইভাবে ব্যক্তির সমষ্টি জাতির মধ্যে কতকগুলি বৈশিষ্ট্যও দেখা দেয়, এইরূপে পৃথিবীর বিভিন্ন ভৌগোলিক পরিবেশে বিভিন্ন জাতি দেখা দেয়—তাহাদের এই বৈশিষ্ট্যগুলিই 'জাতীয় চরিত্র' নামে আখ্যাত হয়। জাতীয় চরিত্রের পূর্বোক্ত উপাদানগুলির কোনটিকেই আমরা অবহেলা করিতে পারি না।

বহুদিনের বহুজনের নীরব সাধনার ফলে একটি জাতীয় চরিত্র রূপ ধারণ করে, এবং পরবর্তী কালের মানুষেরা উহার উত্তরাধিকারী হইয়া ফলভোগ করে। যদি তাহারা সাধনা বজায় রাখিতে পারে, তবেই তাহাদের উন্নতি ও অগ্রগতি অব্যাহত থাকে, নতুবা পূর্ব পুরুষের সঞ্চিত ধন ফুরাইয়া গেলে ধনীর পুত্রগণের যেমন দীন অবস্থা হয়, ঐ জাতিরও সেইরূপ হইয়া থাকে।

জাতীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখার জন্য জাতিতত্ত্ববিদ্‌গণ ইতিহাসকে একটি বিজ্ঞানে পরিণত করিতে চান। অন্যান্য বিজ্ঞান সহায়ে যেমন আমরা শারীর জীবন সুখপূর্ণ এবং দুঃখশূন্য করিতে চেষ্টা করিতেছি, তেমনি দেশে দেশে মানুষের জীবনধারা কোথায় কিভাবে চলিয়াছে, আমাদেরই অতীত কিভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে, কোথায় তাহার শক্তি, কোথায় বা তাহার দুর্বলতা, সব জানা থাকিলে আমাদের ভবিষ্যৎ আমরাই অনেকটা নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিব। জাতীয় জীবনে সহসা কোন আকস্মিক দুর্ঘটনা দেখা দিবে না, দিলেও সময় থাকিতে আমরা তাহার প্রতীকার করিতে পারিব।

জাতীয় জীবন সাধারণতঃ প্রবাহিত হয় একটি সম-স্বার্থের খাতে। বহু ব্যক্তি যদি একই স্বার্থে একই প্রকার কাজ করে—তবে তাহারা সমধর্মী হইয়া যায়, স্বভাবতই তাহাদিগকে এক নিয়মে চলিতে হয়, তাহাদের উত্থান-পতন একসূত্রে গাঁথা হইয়া যায়—একই সঙ্গে সুখে ভাসিতে হয়, আবার একই সঙ্গে দুঃখের ঘূর্ণাবর্তে পড়িতে হয়। জাতিগত অবনতি ব্যক্তিকেও অবনত করে। জাতি যদি পতনের পথে গড়াইয়া চলে, তবে দু-একটি মহৎ চরিত্রের ব্যক্তি সে গতি রোধ করিতে পারেন না। পতনের গতি নিঃশেষিত হইলে উত্থানের মুখে প্রয়োজন অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন এক মহাপুরুষ। ইতিহাসের প্রয়োজনে যথাসময়ে এই মহামানব আবির্ভূত হন।

সে আলোচনার পূর্বে দেখা যাক—জাতির 'উত্থান পতন' বলিতে আমরা কি বুঝি! কি ভারতের 'মহাভারত', কি মধ্যপ্রাচ্যের 'বাইবেল', কি গ্রীসের পুরাণ—সর্বত্র প্রাচীন মানুষের এই উন্নতি-অবনতির কাহিনী ও

কারণ লিপিবদ্ধ আছে। পরবর্তী ঐতিহাসিক যুগের লেখাবলীর মধ্যেও মানুষের এই সংগ্রাম ও দুর্জয় সাধনার কথা কোথাও স্বর্ণাক্ষরে, কোথাও রক্তাক্ষরে লিখিত।

সেগুলি হইতে সারসংক্ষেপ সংগ্রহ করিয়া আমরা এইটুকু বুঝিয়াছি—জাতির উত্থান-পতন সাধারণভাবে নির্ভর করে তাহার সমষ্টিগত চরিত্রের উন্নতি বা অবনতির উপর। জনসাধারণের চরিত্রের উপরই একটি জাতির চরিত্র নির্ভর করে। দু-চারজন মহাপুরুষ বা মহামানব জাতির জীবনে আদর্শ স্থাপন করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া যতক্ষণ না দেশের অধিকাংশ লোক সেই ভাবে জীবন গঠন করিতেছে, ততক্ষণ আদর্শ বাস্তবে রূপায়িত হয় না, আদর্শ ধরাছোঁয়ার বাহিরেই থাকিয়া যায়।

* * *

কোন জাতি যে মহান্ আদর্শকে তাহার জাতীয় আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করে, সেই আদর্শের জন্য তাহাকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়, প্রয়োজন হইলে বহু জীবনও বিসর্জন দিতে হয়। অজ্ঞাতসারে পৃথিবীর ইতিহাসে অবিরত ইহাই ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে! ভারত আধ্যাত্মিকতাকেই তাহার জাতীয় আদর্শ বলিয়া করিয়াছে। দেশের শ্রেষ্ঠ মনীষীরা সেই দিকেই ধাবিত হইয়াছেন। সেই আদর্শের জন্য ভারতের ঐহিক উন্নতি অনেকাংশে ব্যাহত হইয়াছে। অনেকের মতে রাজনীতিক পরাধীনতার জন্যও দায়ী তাহার এই অত্যধিক অনৈহিকতা! এ বিষয়ে অবশ্য মতভেদ আছে।

প্রত্যেক দেশেরই বৈশিষ্ট্য আছে, প্রত্যেক জাতিরই উত্থান-পতনের ইতিহাস আছে, সেগুলি হইতেও আমরা যথেষ্ট শিক্ষা পাই, এবং সাবধান হইতে পারি। তবে এখানে আমরা বিশেষভাবে আলোচনা করিব—স্বামীজীর দৃষ্টিতে ভারতের উত্থান-পতনের ইতিহাস কিভাবে প্রতিভাত হইয়াছে। সহস্র যুগব্যাপী পতনের কি কি কারণ তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন, এবং আগামী উত্থানের কি উপায় তিনি নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

ভারতের চরম অধঃপতন প্রত্যক্ষ করিয়াও স্বামীজী কেন আশার বাণী ঘোষণা করিলেন, ইহাই আমাদের কাছে পরম বিস্ময়! স্বামীজীর যোগজ ভবিষ্যদ্দৃষ্টির সহিত সমন্বিত ছিল তাঁহার ইতিহাসের গভীর জ্ঞান ও প্রবল ঐতিহাসিক চেতনা। তিনি অতীতকে গভীরভাবে গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই বর্তমান সম্বন্ধে নিরাশ হন নাই, বরং ভবিষ্যতের উন্নতি প্রত্যক্ষ করিয়া তাহার পন্থা শুধু নির্দেশ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, সেই পথে জাতির জয়যাত্রা শুরু করিয়া দিয়া গিয়াছেন।

দেশকে, জাতিকে তিনি প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার গালাগালি আমাদের গায়ে লাগে না, অন্য ব্যক্তির সামান্য সমালোচনা আমরা সহ্য করি না। স্বামীজী তাঁহার পত্রাবলীতে এবং ভারতীয় বক্তৃতাবলীতে যে কঠোর সমালাচনা করিয়াছেন, তাহার মূল উৎস তাঁহার গভীর দেশপ্রেম। মাতা যেভাবে পুত্রের কল্যাণের জন্য সাশ্রুনয়নে তাহাকে ভর্ৎসনা করেন, সদ্‌ভাবে জীবনযাপন করিতে উদ্বুদ্ধ করেন, স্বামীজীর ভর্ৎসনার সহিত একমাত্র তাহারই তুলনা হইতে পারে।

আমাদের জাতির অধঃপতনের প্রধান কারণ স্বামীজী বলিয়াছেন শ্রদ্ধার অভাব! আমরা নিজেদের প্রতি শ্রদ্ধা হারাইয়াছি,

দেশের ইতিহাসের প্রতি শ্রদ্ধা হারাইয়াছি, স্বীয় কৃষ্টির প্রতি শ্রদ্ধা হারাইয়াছি। 'শ্রদ্ধা' বলিতে স্বামীজী বুঝিতেন আত্মবিশ্বাস। এই আত্মবিশ্বাসই জাতির মেরুদণ্ড। স্বামীজী তাঁহার জীবন দিয়া জাতির এই আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করিয়াছেন; জাতীয় জীবনে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। তিনি ভারতকে মৃত বা পতিত বলিতে অস্বীকার করিতেন, তাঁহার চক্ষে ভারত দীর্ঘদিন সুপ্ত ছিল, সুদীর্ঘ গৌরবময় জীবনযাপনের পর কিছুকাল ক্লান্ত অবসন্ন ছিল। কিন্তু এখন তাহার জাগিবার সময় হইয়াছে, মানব-জাতির প্রয়োজনের জন্য ভারতের জাগরণ যথাসময়েই হইয়াছে।

কিন্তু জাগ্রত জাতির একান্ত প্রয়োজনীয় গুণগুলি তাহাকে অর্জন করিতে হইবে, বিশেষতঃ তাহাকে আধুনিক যুগের উপযুক্ত হইতে হইবে। ভারতের জাতীয় জীবনে আর একটি অভিশাপ পরস্পর ঈর্ষা। আধ্যাত্মিক স্তরে উচ্চতম আদর্শ প্রচার করিলেও লৌকিক স্তরে সমাজ-জীবনে ভারতবাসী সেগুলি আচরণ করে নাই, যথা বেদান্তের অদ্বৈতবাদ বা সর্ববস্তুতে ব্রহ্ম আছেন—এ-কথা যে দেশে বজ্র-নির্ঘোষে প্রচারিত হয়, সে দেশে অস্পৃশ্যতা এমন কি 'অদৃশ্যতা' পর্যন্ত চালু থাকিতে দেখিয়া স্বামীজী বিস্মিত হইয়াছেন, বলিয়াছেন —ইহা 'পাগলা গারদ'! এই সব অসঙ্গতি দূর না হইলে জাতীয় সংহতি বা জাতীয় উন্নতি কিভাবে সম্ভব? তাই প্রথমেই উদার ভাব প্রচার দ্বারা সঙ্কীর্ণ ভাবগুলিকে নির্মূল করিতে হইবে, তবেই নবযুগের সৃজনশীল ভাবগুলি ফলপ্রসূ হইবে।

ভারতীয় জীবনে মহাজাতির ও মহত্ত্বের উপাদান রহিয়াছে। প্রয়োজন—শুধু হৃদয়বান্ সংগঠকের। আমরা স্বামীজীর মধ্যে এক অনুভূতিমান্ শিক্ষক বা আচার্য পাইয়াছি। যিনি ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনের গূঢ় রহস্য প্রত্যক্ষ করিয়া সেগুলি প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার রচিত বিশাল সাহিত্যে—তাঁহার কথায় ও বক্তৃতায় সেগুলি ছড়াইয়া রহিয়াছে, সেগুলি হইতে ধীরে ধীরে আমাদের জাতীয় জীবন গড়িয়া তুলিতে হইবে।

অভিজ্ঞ চিকিৎসকের মতো স্বামীজী রোগের নিদান ধরিয়াছেন, এবং প্রতিকারের ব্যবস্থাও করিয়া গিয়াছেন। স্বামীজীর মতে ঐহিক জীবনে ভারতের পতনের কারণ ক্ষাত্র শক্তির অবহেলা। ব্রাহ্মণ সমাজের মস্তিষ্ক, কিন্তু ক্ষত্রিয় তাহার বাহু। শুধু মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চালিত হওয়া রোগেরই লক্ষণ, সর্বাঙ্গে রক্ত-সঞ্চালন হইলে তবেই স্বাস্থ্য রক্ষিত হয়, শক্তি বর্ধিত হয়। কেন ঐরূপ হইয়াছিল—তাহার উত্তরও স্বামীজী পাইয়াছেন। ধর্মের ভ্রান্ত ব্যাখ্যা করিয়া আমরা রজোগুণকে অবহেলা করিয়াছি, শুদ্ধ সত্ত্ব গুণের চর্চা করিতে গিয়া আমরা তমোগুণে নিমজ্জিত হইতেছিলাম, এইখান হইতে স্বামীজী জাতিকে উদ্ধার করিয়াছেন। সেবা-ধর্মের মাধ্যমে প্রবল কর্মস্রোত প্রবাহিত করিয়া তিনি জাতীয় জীবনের দিকে দিকে বিদ্যুৎস্পর্শে তীব্র রজোগুণ সঞ্চার করিয়া গিয়াছেন। এই ভাবে তমোগুণের আলস্য ও জড়তা দূর করিয়া জাতি অবশ্যই রজোমিশ্রিত সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত হইবে—ইহাই স্বামীজীর স্বপ্ন ও ভবিষ্যদ্দৃষ্টি।

এত দিনের সুপ্ত এই বিরাট জাতিকে উন্নতির পথে আগাইয়া লইতে হইলে একদিকে তাহাকে দিতে হইবে আশা ও উৎসাহ, অপর দিকে চাই একটি আদর্শ জীবন, যাহা দেখিয়া জাতি দৃঢ় পদবিক্ষেপে অগ্রসর হইবে, যাহার

উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সে নির্ভয়ে ঠিক পথে চলিতে পারিবে। নেতার মনে যদি সংশয় থাকে, তবে সাধারণ জনগণ বিভ্রান্ত হইবেই। সেনাপতির মনে যদি জয়াশা না থাকে, সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া যাইবে। যথার্থ নেতা বা সেনাপতি নিজে কর্তব্য করিয়া সকলকে কর্তব্যে উদ্বুদ্ধ করিয়া যান, নিজের জীবন বিসর্জন দিয়া সকলের মধ্যে প্রাণসঞ্চার করিয়া যান, নিজে আদর্শ অনুযায়ী জীবন যাপন করিয়া ভবিষ্যতের জন্য আদর্শ স্থাপন করিয়া যান। তাঁহাকে কথা বলিতে হয় না, তাঁহার জীবনই কথা বলে। তিনি নিজে নীরবে অনলস ভাবে তাঁহার কর্তব্য পালন করিয়া যান। তাহাতেই যে শক্তি জাগ্রত হয়—তাহা দ্বারা সহস্র জীবন কর্তব্য করিতে অনুপ্রাণিত হয়।

আমাদের এই জাতিকে একটি শক্ত সবল আধুনিক জাতিতে পরিণত করিতে হইলে আমাদের নিজেদের যুগযুগাচরিত আদর্শের ভিত্তির উপর বর্তমান যুগের প্রয়োজনীয় আদর্শ-গুলি স্থাপন করিতে হইবে। তবেই আমরা আমাদের নিজেদের সমস্যার সমাধান তো করিতে পারিবই, তারপর যে-সকল সমস্যা বর্তমান পৃথিবীকে পীড়িত করিতেছে, সেগুলির সমাধানেও সাহায্য করিতে পারিব। সর্বাগ্রে প্রয়োজন আমাদের নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনের এবং জাতিগত চরিত্রের উন্নতি-সাধন।

* * *

শতবার্ষিকী সংখ্যা

আমাদের বহু-প্রতীক্ষিত বিবেকানন্দ-শতবর্ষ-জয়ন্তী সমাগত। এতদুপলক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে স্বামীজীর লেখা ও বক্তৃতাবলী বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে। 'উদ্বোধন' হইতেও 'স্বামীজীর বাণী ও রচনা' ১০ খণ্ডে বাহির হইতেছে।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন পত্রিকার পক্ষ হইতে আগামী বৎসর স্বামীজীর সম্বন্ধে বিশেষ সংখ্যা বাহির করিবার উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে স্বামীজীর শিক্ষা দীক্ষা কিভাবে নূতন করিয়া দেশকে উদ্বুদ্ধ করিবে, তাহাই আজ বিশেষভাবে চিন্তনীয়।

জাতীয় জীবনের মূল ধরিয়া তিনি নাড়া দিয়া গিয়াছেন—তাই তাঁহার কথা বলিতে বা লিখিতে গেলে জাতীয় জীবনের সব কথাই আসিয়া যায়।

উদ্বোধনের পক্ষ হইতে লেখক-লেখিকা ও পাঠক-পাঠিকাদের আমরা জানাইতেছি, স্বামীজীর জন্ম-শতবর্ষ-স্মরণে আগামী বর্ষের শেষের দিকে 'উদ্বোধনের' বিশেষ সংখ্যা বাহির হইবে। আগামী বৎসর প্রতি মাসেই স্বামীজীর জীবন ও বাণীর বিভিন্ন দিক লইয়া আলোচনা থাকিবে; তাছাড়া সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, শিক্ষা-বিষয়ক প্রবন্ধও সাদরে প্রকাশিত হইবে।

লেখক-লেখিকাদের নিকট অনুরোধ তাঁহারা যেন উদ্বোধনের বিশেষ সংখ্যা ও মাসিক সংখ্যার জন্য তাঁহাদের লেখা যথাশীঘ্র পাঠাইতে থাকেন। তাহা হইলে আমাদের কাজের সুবিধা হইবে। লেখা কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিবেন। শেষ পৃষ্ঠায় অনুগ্রহপূর্বক 'নাম ও ঠিকানা' স্পষ্টাক্ষরে লিখিবেন। বাংলা বানান যেন আধুনিক অভিধান অনুযায়ী হয়। উদ্ধৃতি (Quotation) থাকিলে মূল পুস্তকের নাম ও পৃষ্ঠা উল্লিখিত থাকা প্রয়োজন।

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃতি সম্বন্ধীয় দু-একটি তথ্য

স্বামী নির্বাণানন্দ

বেলুড়ে একদিন শ্রীরামকৃষ্ণের পার্ষদ স্বামী অখণ্ডানন্দ কথাচ্ছলে আমাদের বলিয়াছিলেন, 'ঠাকুরের যে ছবি পূজা হয়, তার সম্বন্ধে কিছু জানিস?' আমরা বিশেষ কিছু জানি না বলাতে তিনি বলিলেন :

বরাহনগরের ভক্ত ভবনাথ (স্বামীজীর বন্ধু) ঠাকুরের ফটো তুলতে চায়, একদিন অনেক অনুরোধ করে, পরদিন বরাহনগর থেকেই এক ফটোগ্রাফার সঙ্গে নিয়ে এসেছে —বিকেলের দিকে। ঠাকুরকে প্রথমে রাজী করাতে পারেনি। ঠাকুর রাধাকান্তের মন্দিরের দিকে চলে গেলেন।

ইত্যবসরে স্বামীজী এসে পড়েছেন, সব শুনে বললেন, 'দাঁড়া, আমি সব ঠিক করছি।' এই ব'লে রাধাকান্ত-মন্দিরের উত্তরদিকে রকের ওপর যেখানে ঠাকুর বসেছিলেন, সেখানে গেলেন ও তাঁর সঙ্গে ভগবৎপ্রসঙ্গ আরম্ভ করলেন। ঠাকুর সমাধিস্থ হয়ে গেছেন। স্বামীজী উঠে গিয়ে তাদের ডেকে নিয়ে এসে বললেন, 'তাড়াতাড়ি ক্যামেরা ফিট কর্'।

সমাধিতে ঠাকুরের শরীর একটু হেলে গিয়েছে, ক্যামেরা-ম্যান ঠাকুরের চিবুক ধরে সোজা ক'রে দিতে গেছে, চিবুক ধরা মাত্র ঠাকুরের শরীর হালকা কাগজের মতো হাতের সঙ্গে উঠে পড়েছে। তখন স্বামীজী বললেন, 'ও কি করছিস, শীগ্রি শীগ্রি ক্যামেরা ফিট কর্' ক্যামেরা-ম্যান যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি ফটো তুলে নিল। এই ঘটনা ঠাকুর কিছুই জানতেন না।

কয়েকদিন পরে ভবনাথ যখন প্রিন্ট-করা ছবি নিয়ে এল, ঠাকুর দেখে বললেন, 'এ মহাযোগের লক্ষণ, এই ছবি কালে ঘরে ঘরে পূজা হবে।'

* * *

শোনা যায়—ইতিপূর্বে এক সময় ঠাকুরের পরমভক্ত রামচন্দ্র দত্ত একবার ঠাকুরের একটি ফটো তুলিয়াছিলেন। সেই ফটো দেখিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন, 'আমি কি এত রাগী?' রামচন্দ্র কোন উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া রহিলেন এবং বুঝিয়াছিলেন, এ ছবি ঠাকুরের মনঃপূত হয় নাই। রামচন্দ্র সে ছবি লইয়া গেলেন এবং নেগেটিভ-সহ ছবিটি গঙ্গায় ফেলিয়া দেন।

* * *

আনুমানিক ১৯১৮ খৃঃ স্বামী সারদানন্দের অনুমতি লইয়া জনৈক ভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণের একটি প্রস্তর-মূর্তি নির্মাণ করিবার উদ্যোগ করেন, তদনুযায়ী জনৈক মারাঠী শিল্পী একটি মাটির মডেল তৈয়ার করেন। উহা অনুমোদন করিবার জন্য ভক্তটি স্বামী সারদানন্দকে অনুরোধ করেন।

তখন স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলরাম-মন্দিরে অবস্থান করিতেছিলেন, স্বামী সারদানন্দ তাঁহাকে ঐ মাটির মডেলটি অনুমোদন করিবার জন্য কলিকাতার ঝাউতলায় শিল্পীর স্টুডিওতে লইয়া যাইতে চান। তখন মহারাজ বলিলেন, 'ঠাকুরের কোন্ মূর্তি অনুমোদন ক'রব? তাঁকে একই দিনে বিভিন্ন রূপ ধারণ করতে দেখেছি। কখনও কৃশ ছোট শরীর—এলো-মেলো চুল, কখনও গভীর সমাধিমগ্ন দিব্য জ্যোতির্ময়, কখন বারন্দায় জোরে জোরে

পায়চারি করছেন—বিরাট শরীর—বড় বড় পা ফেলছেন! কোন্ রূপ অনুমোদন ক'রব?'

শরৎ মহারাজ বলিলেন, 'না মহারাজ, ঠাকুরের যে ছবি পূজা হয়, সেই ছবি সম্বন্ধে বলছি, তারই প্রতিমূর্তি তৈরী হচ্ছে, তোমাকে অনুমোদন করতে যেতে হবে।' তখন মহারাজ বলিলেন, 'চলো যাই।' এই বলিয়া সদলবলে চলিলেন—তাঁহার সঙ্গে ছিলেন স্বামী সারদানন্দ, শিবানন্দ, যোগেন-মা, গোলাপ-মা, ও কয়েকজন সাধু।

স্টুডিওতে গিয়া কিছুক্ষণ সেই মডেলটি নিরীক্ষণ করিয়া শিল্পীকে সম্বোধন করিয়া মহারাজ বলিয়া উঠিলেন, 'এঁকে কুঁজো করেছ কেন? ইনি কখনও শিরদাঁড়া বাঁকিয়ে বসতেন না।'

শিল্পী বলিল, 'Anatomical measurement (শরীর-বিজ্ঞানের মাপ) অনুসারে সাধারণ মানুষ যদি এইভাবে বসে, তবে একটু কুঁজো হয়ে যায়।' মহারাজ বলিলেন, 'ঠাকুর ছিলেন আজানুলম্বিত বাহু; সাধারণ লোকে তা নয়।'

ঐ মূর্তির কান সম্বন্ধে বলিলেন, 'সাধারণ লোকের কান ভ্রূরেখার সমান সমান আরম্ভ হয়, কিন্তু ঠাকুরের কান চোখের কোণের রেখা থেকে আরম্ভ, অর্থাৎ তাঁর কান সাধারণ লোকের থেকে নিম্নে।'

সব শুনিয়া সংশোধন করিয়া শিল্পী জানাইলে মহারাজ আর একদিন দেখিতে যান, সেদিন দেখিবামাত্র মূর্তি অনুমোদন করেন। দুঃখের বিষয় প্যারিস প্ল্যাস্টারে ঢালাই করার সময় ঐ ছাঁচ ঠিক ঠিক হয় নাই।

বিবেকানন্দ-সঙ্গীত

[হিন্দোল বাহার—ত্রিনেত্র তাল ১৬ মাত্রা]

স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ

পুরুষসিংহ বিবেকানন্দ যোগী, ত্যাগীশ্বর, তুমি যতিরাজ।
ল'য়ে বুদ্ধের হৃদয়, শঙ্করের মেধা—এলে শুকদেব ধরি নবসাজ॥
প্রেমে চৈতন্য, তেজে নানক, খৃষ্ট দীনতায় দেখাতে জগতে
এলে বেদান্তকেশরী জাগাতে ভারত—দেশ-দেশান্তর আজ॥
ধরমেতে ধীর, করমেতে বীর, (এলো) সাধিতে অসাধ্য সাধন সুধীর।
সন্ন্যাসিসম্রাট্, ওহে বাগ্মিবর, প্রচারি 'জীবে শিবজ্ঞানে' কাজ॥
আত্মমুক্তি—জগতের হিত, একাধারে সব করিয়ে বিহিত
প্রচারি যুগধর্ম সাধিলে শুভকর্ম ভারত ধন্য আজ॥

শ্রীশ্রীমায়ের একটি জন্মদিন

শ্রীপুষ্পকুমার পাল

শ্রীশ্রীমায়ের জন্মদিনে সকলের মতো আমিও 'উদ্বোধনে' দ্বিতলে মায়ের ঘরের সামনে বসে আছি। বিয়াল্লিশ বছর আগে মা লীলা সংবরণ করেছেন। তাঁর ঘরে সেই তক্তাপোশ ও আনুষঙ্গিক সামগ্রী—সব প্রায় তেমনি আছে, কেবল তিনি বা তাঁর একান্ত পার্শ্বচারিণীরা আর কেহ নরদেহে নেই। আছে কেবল তাঁদের আলেখ্য বা আলোক-চিত্র। আজ এই বিশেষ দিনে মায়ের সর্বজন-পরিচিত চিত্রখানিতে সুন্দর ক'রে একটি শাড়ি পরানো হয়েছে, আর সেটি সুগন্ধ পুষ্পমাল্যে সাজানো হয়েছে। সামনের একটি ছোট চৌকির উপর তাঁর পায়ের ছাপটি চন্দন-চর্চিত। তক্তাপোশে সংলগ্ন থাকায় মনে হচ্ছে, মা যেন পা ঝুলিয়ে বসে আছেন। পিছনের দেওয়ালে তাঁর একান্ত-সঙ্গিনী যোগেন-মা ও গোলাপ-মার ছবি টাঙানো। মনে হয় যেন অনেক আগে দেখা সেই স্নেহময়ী—সেই সরল ও করুণাময়ী মাতৃমূর্তি স্মিতহাস্যে প্রসন্ন-বদনে সকলের দিকে চেয়ে বসে আছেন এবং পশ্চাতে তাঁর দুই সঙ্গিনী যোগেন-মা ও গোলাপ-মা এই বিশেষ দিনে সন্তান-সন্ততির মধ্যে মায়ের পরিপূর্ণ ও পরিতৃপ্ত ভাব দেখে যেন মায়ের সুখে নিজেদের সুখী ভেবে দাঁড়িয়ে আছেন।

দর্শনের বিধি—মনে হয় প্রায় সেইরূপই আছে। সুসম্বদ্ধভাবে ভক্ত নরনারী ধীরে ধীরে নিচে থেকে উপরে অগ্রসর হচ্ছে। কারও হাতে পুষ্পমাল্য, কারও হাতে শুধু ফুল; কেউ বা ফল মূল ও মিষ্টান্ন নিয়ে, আবার অনেকে শুধু করজোড়ে দর্শনমানসে অপেক্ষমাণ। একে একে পুষ্পমাল্য ও অন্যান্য দ্রব্য নিবেদন ক'রে মায়ের আলেখ্যের প্রতি কাতর নয়নে তাঁরা মানস অনুভূতির সাহায্যে মাকে দর্শন করার জন্য ব্যাকুল। ভাগ্যবান্ ভক্ত হয়তো নিজ অনুভূতি ও বিশ্বাসে তাঁকে এমন দিনে জীবন্তরূপে দর্শন করতে সমর্থ হন। মানস চোখে দেখছি—একের পর এক শ্রীশ্রীমা সকলের প্রণাম গ্রহণ করছেন। সেই ক্ষমা, দয়া ও করুণার অপূর্ব মাতৃমূর্তি মৃদু হাস্যে সকলকে যেন কুশল বার্তা জিজ্ঞাসা করছেন।

প্রায় ৫০ বৎসর আগে এই স্থানে এমন একটি দিনের কথা পূজনীয় স্বামী ঈশানানন্দ সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। শ্রীশ্রীমা তখন পার্থিবদেহে এই বাড়িতে বিরাজমানা। স্বামী ঈশানানন্দ তখন ব্রহ্মচারী বরদা। সেদিন ছিল শ্রীশ্রীমায়ের এমনই একটি জন্মদিন। অন্যান্য প্রভাতের মতো সেই প্রভাতে সূর্যোদয়ের বহু পূর্বে শ্রীশ্রীমা গাত্রোত্থান করলেন। প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনের পর তিনি যথারীতি জপে বসলেন। শ্রীশ্রীমা নিয়মে চলার পক্ষপাতী ছিলেন। যখনকার যা কাজ, তা সময়ে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা তাঁর চরিত্রের আর একটি বিশেষত্ব। লোকশিক্ষার জন্য শ্রীশ্রীমায়ের নিজের চরিত্রে, নিজের দৈনন্দিন জীবনে এ ভাব আশ্চর্যজনক ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

জপের পর শ্রীশ্রীমা পরিজনবর্গের জন্য সাগু, বার্লি, দুধ ইত্যাদি জ্বাল দিলেন। একটু পরে স্নানের পর পূজায় বসলেন। ব্রহ্মচারী বরদা পাশে পাশে রয়েছেন। পূজার পর মা সন্তানদের দর্শন দেবার জন্য প্রস্তুত হলেন। ঐ তক্তাপোশে বসে মেজের উপর পা-দুটি

রেখে সেই অপরূপ মাতৃমূর্তি করুণার প্রতিমূর্তি হয়ে উপবেশন করলেন। সারাটি শরীর একটি চাদরে আবৃত। লজ্জা-পটাবৃতা হয়ে মা এবার সন্তানদের আহ্বান জানালেন।

সেদিনও এরূপ মায়ের সন্তানেরা শ্রেণীবদ্ধ-ভাবে একের পর এক মায়ের শ্রীচরণে ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করছিল। শ্রীশ্রীমা একের পর এক সকলের প্রণাম নিতে লাগলেন। কারও মস্তক স্পর্শ করলেন, কারও সহিত এক-আধটি কথা বললেন, কারও প্রতি আবার কেবলমাত্র সস্নেহ দৃষ্টিপাত করলেন। কেউ তাঁর চরণে পুষ্প-অর্ঘ্য নিবেদন ক'রল, কেউ ফল মূল বসন দিল, কেউ বা গিনিখণ্ড দিয়ে প্রণাম ক'রল, অন্যেরা কেবলমাত্র অতি সঙ্কোচে শুধু তাঁর চরণ স্পর্শ ক'রল। মায়ের কোন পক্ষপাতিত্ব নেই। ধনী দরিদ্র সকলে একইরূপ স্নেহ ও করুণা লাভ করেছে। সন্তানদের আগমনে ও তাঁদের সশ্রদ্ধ প্রণামে সেই অপরূপ মাতার স্নিগ্ধ চক্ষুদুটি করুণা কৃপা ও দয়ায় প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে। প্রতি সন্তানের শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রণাম তিনি গ্রহণ করছেন ও স্মিতহাস্য ও প্রসন্ন আননে তাঁদের দিকে চেয়ে আছেন।

শ্রীশ্রীমায়ের এই জগজ্জননীমূর্তি স্মরণ ক'রে স্বামীজীর দিব্যদৃষ্টিতে দেখা মায়ের রূপ যেন সকলের মানসপটে উদিত হয়। স্বামীজী বেলুড় মঠে এক ভক্তকে একদিন বলেন, 'তিনি (শ্রীশ্রীমা) জ্যান্ত দুর্গা, সরস্বতী মূর্তিতে আবির্ভূতা। উপরে মহা শান্তভাব, কিন্তু ভিতরে সংহারমূর্তি—জ্ঞানের ভাব।'

পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলতেন, 'মাকে চেনা বড় শক্ত। ঘোমটা দিয়ে যেন সাধারণ মেয়েদের মতন থাকেন, অথচ মা সাক্ষাৎ জগদম্বা। ঠাকুর না চিনিয়ে দিলে আমরাই কি মাকে চিনতে পারতুম?'

পূজনীয় স্বামী প্রেমানন্দ একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলেন, 'শ্রীশ্রীমা-ঠাকরুনে দেখছি ঠাকুরের চেয়েও বেশী শক্তি। তিনি শক্তিস্বরূপিণী কিনা, তাঁর ভাব চাপবার ক্ষমতা কত! ঠাকুর চেষ্টা করেও পারতেন না, বাইরে প্রকাশ হয়ে যেত। মা-ঠাকরুনের ভাবসমাধি হচ্ছে, কিন্তু কাউকে জানতে দেন? তাঁর ভাব গোপন করবার শক্তি কত! বৌটির মতো ঘোমটা দিয়ে থাকেন। মায়ের দেশের লোকেরা মনে করে, ভাইপো-ভাইঝির জন্যেই তিনি সব করছেন।'

পূজ্যপাদ স্বামী শিবানন্দ বলতেন, 'মাকে আমরা কতটুকু জেনেছি? তিনি সাধারণ মানবী নন, সাধিকা নন, সিদ্ধাও নন, তিনি নিত্যসিদ্ধা—সেই আদ্যাশক্তির প্রকাশ। সেই জগজ্জননী অহৈতুকী স্নেহপরবশ হয়ে যে ভক্তকে একবার স্পর্শ করেছেন, তার চৈতন্য হয়েছে বা হতেই হবে-এ আমার পূর্ণ বিশ্বাস।'

পূজনীয় গৌরী-মার কথা। তিনি এক ভক্ত নারীকে বলেন, 'শ্রীশ্রীমাকে তুমি কি মনে কর? মা যে কৈলাসেশ্বরী। তাঁকে মানুষ বলা চলে না। মা বিশ্বজননী।'

সকলের প্রণাম ও শ্রদ্ধানিবেদন সমাপ্ত হ'লে মা নিকটে দণ্ডায়মান সেবক রাসবিহারীকে বললেন, সকলে যেন প্রসাদ পেয়ে তবে যায়। সেবক বললেন, 'হ্যাঁ মা, সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক আছে।' প্রসাদের বিতরণ ত্বরান্বিত করার জন্য তিনি চলে গেলেন।

এবার শ্রীশ্রীমা অঙ্গের চাদর খুলে পার্শ্বে দণ্ডায়মান ব্রহ্মচারী বরদাকে বললেন, 'তুমি ফুল দিলে না?' শ্রীশ্রীমাকে তিনি তখন নিজের গর্ভধারিণী মায়ের মতো বা তাঁর চেয়েও স্নেহশীলা বলেই মনে করতেন,

এবং কেবলমাত্র এইটুকুই জানতেন, শ্রীশ্রীমা যা বলবেন, তা তাকে করতেই হবে। মায়ের আদেশে এক বালতি জল আনা ও তাঁর জন্মদিনে তাঁর শ্রীচরণে ফুল দেওয়া—তাঁর কাছে সমান। তিনি তখনই নিকটস্থ পাত্র থেকে ফুল নিয়ে শ্রীশ্রীমায়ের পায়ে রাখলেন ও প্রণাম করলেন। মা তখন তাঁর যে সন্তানেরা কোন কারণে উপস্থিত হ'তে পারেনি, তাদের নাম ক'রে তাঁর পায়ে ফুল দিতে বললেন। বরদা মহারাজ যথারীতি সে আদেশ পালন করলেন। করুণাময়ী মা তখন আবার বললেন, 'আজ বিশেষ দিন, শুভদিন, আর যে-সব জানা অথবা অজানা সন্তান আজ কাছে আসতে পারেনি, তাদের হয়ে এবং তাদের মনে ক'রে ফুল দাও।' বরদা মহারাজ ভক্তিভরে সে আদেশ পালন করলেন।

এইবার শ্রীশ্রীমা শ্রীশ্রীঠাকুরের আলেখ্যের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে উঠে দাঁড়ালেন। তিনি একান্ত অনুভূতি ও ভাবের সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরের দিকে চেয়ে আছেন। দৃষ্টিতে একান্ত ব্যাকুলতা, সমস্ত অবয়ব এক মহাভাবে ভাবান্বিত। সে তন্ময়তা, সে ব্যাকুলতা লক্ষ্য ক'রে সেবক অবাক্ বিস্ময়ে মায়ের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। শ্রীশ্রীমা যেন শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছেই দাঁড়িয়ে আছেন। মায়ের যুক্তপাণি ও অশ্রুসজল চক্ষু। শ্রীশ্রী-ঠাকুরের একান্ত সান্নিধ্যে তাঁর সেই ব্যাকুল চক্ষুযুগল থেকে মুক্তাসম বিন্দু বিন্দু অশ্রু ঝরতে লাগলো। গলবস্ত্র হয়ে করজোড়ে শ্রীশ্রীমা ঠাকুরকে বলছেন, 'ঠাকুর, আজ শুভদিন, পুণ্যদিন! আজ এই বিশেষ দিনে আমার ইচ্ছা ও কাতর প্রার্থনা—তুমি আমার জানা ও অজানা সমস্ত সন্তানকে দেখো, তাদের ইহকাল পরকাল দেখো, তাদের কৃপা করো। এ সংসারে বড় জ্বালা—বড় দুঃখকষ্ট।'

সন্তানের জন্য মায়ের ব্যাকুলতার এ এক অত্যাশ্চর্য নিদর্শন। তাঁর অগণিত সাধারণ বা অতি-সাধারণ সন্তানদের জন্য শ্রীশ্রীমায়ের কি ব্যাকুলতা, তাদের সুখ ও শান্তির জন্য তাঁর কত আকুলতা! শ্রীশ্রীমা কতবার কত সন্তানকে তাঁর মাতৃহৃদয়ের অপার করুণায় অভয় দিয়ে বলেছেন, 'তোমায় কিছুই করতে হবে না। তুমি আবার কি করবে? তোমার জন্য আমিই করেছি।'

সেদিন বরদা মহারাজ শ্রীশ্রীমায়ের যে রূপটি দেখেছিলেন, বহু বৎসর পূর্বে আর একদিন পূজনীয় মাষ্টার মশাই সেই অনুপম রূপ দেখেছিলেন—ভক্তদের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের এরূপ অহৈতুকী কৃপা ও ব্যাকুলতা। মাষ্টার মশাই লিখেছেন: ঠাকুর জগন্মাতার কাছে করুণ গদ্‌গদস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে প্রার্থনা করিতেছেন। কি আশ্চর্য! ভক্তদের জন্য মায়ের কাছে কাঁদিতেছেন, 'মা, যারা যারা তোমার কাছে আসছে, তাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করো। সব ত্যাগ করিও না মা। আচ্ছা শেষে যা হয় ক'রো।' আবার বলিতেছেন, 'মা, সংসারে যদি রাখো, তো এক একবার দেখা দিস্। তা না হ'লে কেমন ক'রে থাকবে? এক একবার দেখা না দিলে উৎসাহ হবে কেমন ক'রে মা? তারপর শেষে যা হয় ক'রো।'

আজ শ্রীশ্রীমায়ের জীবন-কথা স্মরণে এলে এই কথাই মনে হয়, তনু, মন ও প্রাণ এক ক'রে ইষ্টের ভাবে রঞ্জিত হওয়াতেই সাধনার সার্থকতা। শ্রীশ্রীমা তাঁর নিজের জীবনে একান্তভাবে এই ভাব প্রতিফলিত ক'রে লোকশিক্ষা দিয়েছেন। এ ভাব অতি কঠিন এবং ক্বচিৎ কেউ হয়তো নিজেকে ইষ্টের ভাবে ভাবান্বিত করতে পারেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি শ্রীশ্রীমায়ের এই ভাব উপলব্ধি করেই পূজ্যপাদ স্বামী অভেদানন্দ লিখেছেন:

রামকৃষ্ণগতপ্রাণাং তন্নামশ্রবণপ্রিয়াম্।
তদ্ভাবরঞ্জিতাকারাং প্রণমামি মুহুর্মুহুঃ॥

সারদামণি

শ্রীশশধর মুখোপাধ্যায়

কার ধ্যানে মগ্ন তুমি—নেত্র করি স্থির,
বদ্ধ করি করপদ্ম—হয়েছ গম্ভীর ?
মগ্নতায় ভরে গেছে সমুহ অন্তর—
প্রস্তর-প্রতিমা সম—আছ নিরন্তর।
এলায়িত কেশদাম সম্মুখে ফিরায়ে—
কার পদ-রেণু তুমি দেবে গো মুছায়ে ?
যাহারে বন্দিতে তুমি নোয়ায়েছ শির,
কেবা সেই বীর মাগো—কেবা সেই ধীর ?
অন্তর-জ্যোতিতে দীপ্ত, কোন্ সে মহান্ ?
জানি ওগো, তবু বলো, কাঁদুক পরাণ।
সুন্দর চন্দন-বিন্দু শোভে তব ভালে,
রক্তরাগে পদ-দুটি কখন রাঙালে ?

পাদমূলে কে দিয়েছে রাশি রাশি ফুল ?
সারি সারি পড়ে আছে চামেলী বকুল,
বনমালা শোভিতেছে চরণকমলে,
সযতনে গাঁথি মালা কে পরালো গলে ?
কারে দিয়ে জ্বালায়েছ সান্ধ্য ধুপ দীপ ?
রেখে গেছে গৃহকোণে জ্বলন্ত প্রদীপ ;
আলোকের শিখা ভাসে শুভ্র করতলে,
চরণ ধুয়েছ মাগো কার অশ্রুজলে ?

কে দেখেছে প্রতিমায়—অন্তরের রূপ,
কেমনে জানিল মাগো তোমার স্বরূপ ?
ওষ্ঠাধরে কে দেখেছে স্বরগের সুধা ?
মিটায়েছ বাসনার—সর্বনাশা ক্ষুধা।
অন্তর ভরেছে যার মানস-মূর্তিতে—
তারে দেখা দিও মাগো, জয়যাত্রা-পথে।

শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের কয়েকটি পত্র

(১)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

Ramakrishna Advaita Ashrama
Laksha, Banares City
31.1.28

শ্রীমান্—,

তোমার পত্র যথাসময়ে পাইয়া সকল সংবাদ অবগত হইয়াছি। জীব নিজ নিজ কর্মফল ভোগ করিতে ভগবানের বিধানে জগতে আসে এবং তাঁর দেওয়া প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইয়া পরস্পরের প্রতি প্রীতি ও ভালবাসাতে আবদ্ধ হয়। সে-বন্ধন বড়ই মধুর বলিয়া বোধ হয়—তাও তাঁর কৃপায় এবং তাঁরই ইচ্ছায় ঐ বন্ধন ছেদিত (ছিন্ন) হয় ভোগান্তে। কিন্তু যখন উহা হয়, তখন মানবের ও জীবের খুবই কষ্ট হয়—এবং উহা এতই কষ্টকর, যদি তিনি উহা সহ্য করিবার ক্ষমতা বা উপায় না করিয়া দিতেন, তাহা হইলে মানব উহা সহ্য করিতে পারিত কিনা সন্দেহ। এবং উপায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকারের; যদি একটু ধীর স্থির ভাবে দেখ, বুঝিতে পারিবে। তোমার ক্ষেত্রে দেখিতেছি, সকল বন্ধন হইতে মুক্তি দিবার পূর্বে তোমাদের হৃদয়ে ভগবৎপ্রেম দিয়াছেন। তাহা যদি না হইত, তোমার স্ত্রীর পক্ষে সন্তানের শোক সহ্য করা অসম্ভব হইত এবং তোমার পক্ষে তদুপরি স্ত্রীর শোক আরও অধিকতর হইত। বাবা, তিনিই একহাতে দিচ্ছেন, অপর হস্তে লইতেছেন—অলঙ্ঘ্য তাঁর নিয়ম। নাস্তিক আস্তিক যে যাহাই হও, সে নিয়ম সকলকেই মানিতে হইবে—উপায় নাই। বিদ্রোহে কোন ফল হয় না, সেখানে বিদ্রোহ টেকে না, আপত্তি চলে না। তিনি তাঁর মহান্ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সকলকে লইয়া যাইতেছেন; সকলেই তাঁর আশীর্বাদে একদিন না একদিন বুঝিবে এবং একদিন ভক্তি ও প্রেমে পূর্ণ হইয়া তাঁর মহিমায় মহিমান্বিত হইতে হইবে। অবতার-প্রথিত মহাপুরুষরাই তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। তাঁহারাও এই জগতের মানুষ, কিন্তু কি তফাৎ! কিসে তাঁরা মহৎ ও শ্রেষ্ঠ?—'তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি'। তাঁরই মহিমায় উজ্জ্বল। বাবা, তুমি তাঁর শরণাপন্ন হও, যাহাতে তিনি তোমার হৃদয়ে ধরা দেন—প্রার্থনা কর। শোকতাপ, সংসার, কাজ অকাজ—সব সমান বোধ হইবে, প্রভুর কৃপায়। কোন ভয় নাই, তাঁকে ডাক, তাঁর দোরে পড়ে থাক, তাঁকে ধরে থাক। যিনি তুমি—তাঁকে চেন। ব্যস্, আর কোন কিছুর দরকার হইবে না।

এইবার তোমার প্রশ্নের জবাব দিই—আশ্রমে ঠাকুরকে রাখিয়া ভালই করিয়াছ। যখন সময় ও ইচ্ছা হইবে, নেপাল[১]কে বলিয়া মাঝে মাঝে পূজা করিয়া আসিবে। মা এবং ঠাকুর কি আলাদা?—কোন দেবদেবীই (আলাদা) নয়, সবই তিনি—তাঁর যখন যে রূপ বা ভাব ভাল লাগিবে, যাহাতে মন বসিবে, তাহাই অবলম্বন করিবে—তাহাতেই মঙ্গল হইবে; যাহাই কর না কেন, মূলে ঠাকুরেরই ধ্যান হইবে, জানিবে।

---

১ কানপুর রামকৃষ্ণ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা ও তদানীন্তন অধ্যক্ষ।

মন্ত্রজপও তো বাবা, কর্ম ; লোকে যে চিন্তা করে, তাহাও কর্ম। আমরা কর্ম ও ধ্যান-জপকে আলাদা করি ব'লে ঐরূপ মনে হয়। কেউ কর্মের দ্বারা তাঁকে উপাসনা করে, কেউ জ্ঞানের দ্বারা করে, সবই উপাসনা। তবে শারীরিক কর্মের সহিত মানসিকও প্রয়োজন, তবে সামঞ্জস্য রক্ষা হয়। চিন্তা যত শুদ্ধ হইবে, বাহ্য কর্মও তত ভাল হইবে। মানুষ মনে যা ভাবে, হাতে তাই করে। যে ভগবৎ চিন্তা করিবে, তার দ্বারা শুভ কাজই হইবে, সেইজন্য সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর চিন্তা ত্যাগ করিবে না, মন তোমার যতই অসৎ প্ররোচনা দিক না।

তাঁকে ডাকতে ডাকতে তাঁর উপর নির্ভর করতে করতে তাঁর কৃপায় ধ্যান গভীর হইবে। এতদিন সংসার নিয়ে ছিলে কিনা তাই সংসারের বিষয়ে মনটা শীঘ্রই নিবিষ্ট হয়, তাই কষ্টও হয়, এখন মন যত তাঁতে লিপ্ত হবে, যত তাঁর স্মরণ-মনন বেশী হবে, তত তাঁর দিকে মন যাইবে ও চিন্তা সহজ হইয়া আসিবে। তখন আবার দেখিবে, তিনি ছাড়া অন্য বিষয় চিন্তা করিতে কষ্ট পাইবে। তিনিই সত্য—এই ধারণা যখন বদ্ধমূল হইবে, তখন ধ্যানাবস্থাই তোমার সহজ হইবে।

তিনি তোমাদের দিয়ে তো কাজ করিয়ে নিচ্ছেন, তুমি কি নিজের গোলামি করিতেছ? তাঁর গোলামি করিয়াছ এবং করিবেও। যদি নিজের হইত, স্ত্রী-পুত্রও কি তোমাকে ছেড়ে যেতে পারত? এতেও বুঝছ না—এ জগতের মালিক কে? আমরা কার দাস—ভৃত্য? প্রভুর গর্বে গরীয়ান্ হও; তাঁর মহিমায় মহীয়ান্ হও। তিনিই তোমার মালিক জেনে যখন যা করান, যে অবস্থায় রাখেন, সে কাজ ও তাঁর স্মরণ-মনন ক'রে যাও। তাঁর কৃপায় হৃদয়ে শান্তি ও আনন্দ পাইবে।

তাঁর কৃপায় শরীর ভালই আছে এক প্রকার। আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ ও শুভেচ্ছাদি জানিবে। ঠাকুরের কৃপায় তোমার ভক্তিবিশ্বাস উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হউক, তিনি তোমার কল্যাণ করুন—ইহাই প্রার্থনা। মধ্যে মধ্যে নিশ্চয়ই পত্র দিবে। ইতি—

সতত শুভানুধ্যায়ী
শিবানন্দ

(২)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

Sri Ramakrishna Math
P. O. Belur Math
12. 4. 28

শ্রীমান্—,

ঠাকুর তোমায় আকস্মিক বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছেন এবং তাঁর দয়ায় তুমি অনেকটা সুস্থবোধ করিতেছ জানিয়া আনন্দিত হইলাম। তুমি রোগশয্যায় শায়িত হইয়াও যে তাঁহাকে বিস্মরণ হও নাই—ইহা খুবই সুখের কথা। এইরূপ স্মরণ-মনন করিলেই যথেষ্ট হইবে—তিনি সব দেখিতেছেন। তুমি তজ্জন্য দুঃখিত হইও না। ঠাকুরের প্রতি তোমার ভক্তিবিশ্বাস অচল অটল হউক—তাঁকে আদর্শরূপে সম্মুখে রাখিয়া নিজ কর্তব্যপথে অগ্রসর হও—শান্তি এবং আনন্দ

নিশ্চয়ই পাইবে। আমার শরীর আজকাল একপ্রকার মন্দ নয়। তবে বৃদ্ধ শরীর, কিছু না কিছু লাগিয়াই আছে। কেমন থাক এবং সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিলে কিনা জানাইয়া সুখী করিবে। আমার স্নেহাশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা জানিবে। ঠাকুর তোমাদের কল্যাণ করুন। ইতি—

সতত শুভানুধ্যায়ী

শিবানন্দ

(৩)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

Sri Ramakrishna Math
P. O. Belur Math
24. 5. 30

শ্রীমান্—,

তোমার পত্র পাইয়া সকল সংবাদ অবগত হইলাম। ঠাকুরের আশীর্বাদে তুমি তাঁর আশ্রয়েই তো এসে পড়েছ --তাঁর নাম যখন ক'রছ, তখনই তো হইয়াছে। এবং তাঁর আশ্রমে রয়েছ, কাজকর্ম ধ্যান ভজন নিয়েই তো আছ। অফিসের কাজ যদি ছেড়ে দিতে ইচ্ছা হয়-- নেপালের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে দেখো। ঠাকুর তোমাকে দিয়ে নিঃস্বার্থ সেবা তো করিয়ে নিচ্ছেন। বৃদ্ধ বয়স—এখন আর সন্ন্যাসের প্রয়োজন নাই। এত দেখলে, এতেও কি তোমার ত্যাগ আসে না গা?—তা এসেছে। তোমার ঐ সবের কিছু প্রয়োজন হবে না। তুমি আশ্রমে থেকে—যেমন কাজকর্ম এবং তাঁর পূজাপাঠ নিয়ে আছ, এই ভাবেই থাক, আমার ইচ্ছা। বাবা, পুত্র পরিবার সব ভগবৎবিধানে নিজ নিজ কর্ম ক্ষয় করতে আসে - তাদের তিনি একটা অবলম্বন দেন ; তুমি ছিলে তাই, তাদের কাজ শেস হয়ে গেল - তারা চলে গেল। তুমি আছ, তোমার ভার ঠাকুর নিয়েছেন—দেখ-না কেমন আশ্রমে এনে ফেলেছেন। বাবা, এর অপেক্ষা আর কি সৌভাগ্য হবে? বাবা, তুমি পূর্বের কথা সব ভুলে গিয়ে ঠাকুরের উপর বিশ্বাস ভক্তি রেখে দিনকতক যা বাকী আছে, কাটিয়ে দাও। তাঁর দর্শন করেছ যখন, তখন আর কিছু বাকী নাই। মুক্তি, ভগবৎদর্শন সব হয়ে গেছে। তুমি মহাভাগ্যবান্, নররূপে ভগবানকে দেখা—এর চেয়ে আর কি ভাগ্য হ'তে পারে বলো! দেবতারাও এইরূপ ভাগ্যশালী নয়। ভগবানের সঙ্গে কথা কয়েছ, দেখেছ—আর কি চাও? সন্ন্যাসী হ'লে এর চেয়ে কি হবে? ঐ জন্যই তো সাধন-ভজন—তা তোমার তো হয়ে গেছে। তবে আর ভাবনা কি? তাঁর নাম নিয়ে শান্তিতে ও আনন্দে যেমন ভাবে তিনি রাখেন, থাকো।

আমার শরীর ভাল নয়। তবে তিনি একপ্রকার চালিয়ে নিচ্ছেন। তুমি আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা জানিবে এবং নেপাল প্রভৃতি আশ্রমের সকলকে জানাইয়া সুখী করিবে। ইতি—

সতত শুভানুধ্যায়ী

শিবানন্দ

(৪)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ
শরণম্

Sri Ramakrishna Math
Belur Math
26.6.30

শ্রীমান্—,

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। তোমার কোন চিন্তা নাই, ঠাকুরের কৃপায় তোমার কল্যাণ নিশ্চয়ই হইবে ; তাঁকে দেখেছ, তোমার আর কি কিছু বাকী আছে? যে কটা দিন জগতে রাখেন, তাঁর সেবা ও কাজ ক'রে কাটিয়ে দাও। আর তাঁর আশ্রয় ত্যাগ যেন না হয়। তুমি ওখানে থাকলে তোমার দ্বারা কাজ খুব হইবে। তাঁর কৃপায় তোমার ভক্তি-বিশ্বাস আছেই, আরও বৃদ্ধি পাইবে।

আমার শরীর ভাল নয়। জ্বরভাবের মতো কয়েকদিন হইল হইয়াছে। কমে যাবে, কোন চিন্তা নাই। আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা জানিবে এবং নেপাল প্রভৃতি আশ্রমের সকলকে ও সকল ভক্তদের জানাইয়া সুখী করিবে। ইতি—

সতত শুভানুধ্যায়ী
শিবানন্দ

(৫)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ
শরণম্

Belur Math P O.
District Howrah (Bengal)
30 5.31

শ্রীমান্—,

তোমার পত্র পাইয়া সকল সংবাদ অবগত হইলাম। তুমি ঠাকুর স্বামীজী—এঁদের স্থূল শরীরে দেখেছ, তোমার সাদা চোখ দিয়ে এর চেয়ে আর স্পষ্টভাবে ভগবানকে কি ক'রে দেখতে চাও—বলো! ভগবানকে—জ্যোতির্ময় শরীর—অনেকে দেখে বটে ; কিন্তু তাঁকে মনুষ্য-শরীরে দেখা— অতি বিরল লোকই ইহা দেখে, যারা দেখে ও সঙ্গ পায়, তারা অতি সৌভাগ্যবান্। তাই লিখি—তোমার ভগবানের দর্শন হয়ে গেছে। ধ্যান ধারণা ক'রে তাঁদের তোমাকে দেখতে হয় না। তাঁদের কৃপাতেই হয়েছিল যদি তোমার আর কিছু থাকে, তা তাঁদের কৃপাতেই হইবে। সেই যে দেখেছ, তার ফলেই আজ তোমার তাঁদের ভালবাসতে, তাঁদের কথা ও বিষয় স্মরণ-মনন করতে এত তোমার ইচ্ছা। এও জানবে তাঁর কৃপা। তোমাকে বাবা বেশী কিছু করতে হবে না। এই যে অফিস থেকে এসে রাত্রি ১২টা পর্যন্ত খাটো, কেন বলো তো? তাঁর প্রতি ভালবাসা ও ভক্তি আছে বলেই তো—ওতেই যে তোমার ধ্যান জপ তপস্যা হয়ে যাচ্ছে। চোখ বুজে বসলেই কি তাঁকে ভক্তি করা—ভালবাসা হইল? তোমাকে তিনি ঠিক নিয়ে যাচ্ছেন। তিনি যখন যে অবস্থায় রাখেন, তাতেই সন্তুষ্ট থেকে তাঁর নাম করতে হয়; তবেই তিনি যার যা দরকার, তার ব্যবস্থা ক'রে দেন। নচেৎ নিজ বুদ্ধি ও প্রবৃত্তি মতো চলতে গেলেই তিনি সরে দাঁড়ান। তুমি ভাবছ কেন? যদি তাঁর ইচ্ছা হয়, আশ্রমের এমন অবস্থা হবে যে, তোমাকে আর চাকরি করতে হবে না, আশ্রমে থেকেই তোমার কর্তব্য সব করবার সুযোগ হবে।

যেমন ভাবে কাজকর্ম ক'রছ ও তাঁর স্মরণ মনন যেমন ক'রছ, করবে—দেখবে এর মধ্য দিয়েই তোমার প্রেম ভালবাসা কত দিন দিন বৃদ্ধি পাইবে। তাঁর অভাববোধই তো তাঁর দিকে অগ্রসর হওয়ার লক্ষণ। প্রার্থনা করি, উহা তোমার খুব বৃদ্ধি লাভ করুক।

তুমি আমার খুব আন্তরিক আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা জানিবে। ইতি—

সতত শুভানুধ্যায়ী
শিবানন্দ

স্ত্রীশিক্ষা-প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

শ্রীতামসরঞ্জন রায়

পুরাতনের স্বকীয় উপকরণের ভিত্তিতে আর যুগ-লক্ষণের ইঙ্গিত লক্ষ্য ক'রে স্ত্রীশিক্ষার প্রশস্ত আয়তন গড়ে তোলবার জন্য দিগন্ত-ধ্বনিত এক মহা আহ্বান স্বামীজী এই কালে প্রেরণ করেছিলেন। সে-সকলের পাঠ ও অনুশীলন শুধু যে প্রয়োজনের তাগিদেই অবশ্য-কর্তব্য তাই নয়, তাদের প্রতিটি শব্দে যে ওজঃশক্তি অনুস্যূত, প্রতিটি বাক্যে যে বিচিত্র ব্যঞ্জনা পরিস্ফুট, যে অব্যর্থ সন্ধান নিহিত, আমাদের শত ঈর্ষা ও ক্ষুদ্রতর পাষাণ-ভার দূর করবার জন্যও তারা অপরিহার্য ও অমোঘ।

আমাদের সমাজ-জীবনে, বিশেষ ক'রে নারীর শিক্ষাক্ষেত্রে ও কর্মক্ষেত্রে, আজ শত জটিল সমস্যা দেখা দিয়েছে; অনস্বীকার্য সে-কথা। কিন্তু শিক্ষার সাহায্যে সমাধান হয় না বা হবে না—এমন কোন সমস্যা কি কোথাও আছে? না, তা নেই। অন্ততঃ স্বামী বিবেকানন্দ সে-কথা বিশ্বাস করতেন না। তিনি মনে করতেন, যে-শিক্ষা সহায়ে সদ্বুদ্ধি জাগ্রত হবে, অন্তরের সকল বৃত্তি সদ্বিষয়ে একাগ্র হবে, সে-শিক্ষার শক্তি অপরিমেয়। কি ব্যক্তিগত জীবনে, কি সমষ্টিগত জীবনে সর্বত্রই সর্বব্যাধির মহৌষধরূপে ক্রিয়াশীল হবে সেই শিক্ষা।

আর তারই ফলে মহীয়সী নারীদের অভ্যুদয় হবে ভারতবর্ষে, এবং তাঁরাই সক্ষম হবেন সঙ্ঘমিত্রা, লীলাবতী, অহল্যাবাঈ, মীরাবাঈ প্রমুখ মনস্বিনীগণের নির্ভীক পদাঙ্ক-অনুসরণে। তাঁরা পবিত্র হবেন, স্বার্থলেশহীন হবেন; ভগবানের পদারবিন্দ স্পর্শ করলে যে বীর্য লাভ হয়, যে দেবভাব সঞ্চারিত হয় জীবনে, তাঁরা তারই অধিকারিণী হবেন।

তবে তাঁদের সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থা ধর্মকে কেন্দ্র করেই গ্রথিত হবে। কারণ স্বামীজী বলতেন, 'I look upon religion as the innermost core of education.' অবশ্য সেই ধর্ম কোন ব্যক্তি-বিশেষের বা সম্প্রদায়-বিশেষের মতবাদ হবে না। তা হবে এক সার্বভৌম ধর্ম। মানুষের অবচেতন মনের অতি-গভীরে যে ব্রহ্ম-ভাব প্রসুপ্ত আছে, তাকে জাগ্রত করাই হবে সে-ধর্মের সাধনা, পরিপূর্ণ বিকাশে মানব-জীবন সার্থক করাই হবে তার লক্ষ্য।

শিক্ষাব্রতী যাঁরা, তাঁরা সে নিভৃত উৎস-মুখটিতে সুকৌশল অঙ্গুলি স্থাপন করবেন, আত্মবিশ্বাসের বীজমন্ত্র উচ্চারণ ক'রে প্রসুপ্তা কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগিয়ে দেবেন, তারপর শিক্ষার মহাপ্রয়াসের সূত্রপাত হবে।

সে-প্রয়াস কখনও অন্ধ অনুকরণের বিকৃত পথে অগ্রসর হবে না। শিক্ষা আছে, আর তার আদর্শ নেই, লক্ষ্য নেই—এমন ভয়াবহ পরিস্থিতি শিক্ষার প্রয়াসকে শূন্যতা বা ব্যর্থতার দিকে যাতে না নিয়ে যায়, সে-বিষয়ে সতর্ক হ'তে হবে। আর ভারতবর্ষে স্ত্রীশিক্ষার আদর্শরূপে সর্বকালের জন্য গৃহীত হবেন সীতা। তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে ভারতীয় নারী নিজ জীবন-পথ নিয়ন্ত্রিত করবে। মনে রাখতে হবে, ভারতীয় নারী-জীবনের অম্লান ও সর্বতোভদ্র

আদর্শ ঐ একটি চরিত্র থেকেই উন্মেষিত হয়েছে। ঐ চরিত্রটিই যুগ যুগ ধরে সমগ্র আর্যাবর্তের সম্মিলিত শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করেছে।

সেই মহামহীয়সী নারী—মূর্তিমতী পবিত্রতা থেকেও পবিত্রতরা, স্নেহ-মাধুর্যে অনন্যা। মাতা বসুমতীর মতো তিনি ধৈর্যশীলা। নারীরূপে তিনি অতুলনীয়া, জায়ারূপে 'পতিব্রতানাং ধুরি সংস্থিতা', স্বামীজীর ভাষায়—

'Sita has gone into the very vitals of our race. Any attempt to modernise our women, if it tries to take our women away from that ideal of Sita is immediately a failure.'

তাই চিরদিন এ-দেশের চিত্তলোকে সগৌরবে বিরাজ করবেন সীতা।

আমেরিকার মেয়েদের তিনি অজস্র অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন সে-কথা সত্যি, ইতিপূর্বে সংক্ষেপে আমরা তা বিবৃতও করেছি। কিন্তু সেই সঙ্গে এ-কথাও তিনি বলেছেন,

'In the west, the women did not very often seem to be women at all, they appeared to be quite the replicas of men! Driving vehicles, drudging in offices, attending schools, doing professional duties! In India alone the sight of feminine modesty and reserve soothes the eye.'

অতএব পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণে আমাদের নারীজাতিকে অতি-আধুনিক করতে গিয়ে যদি সীতার আদর্শ থেকে আমরা বিচ্যুত হই, তবে সমগ্র শিক্ষা-প্রয়াসই ব্যর্থ হবে। বিকৃত পরিণতিতে জাতীয় জীবনকে পঙ্গু ক'রে দেবে, নিষ্ফল ক'রে দেবে—এ-সম্বন্ধে তিনি নিঃসংশয় ছিলেন। কিন্তু এই অতি উচ্চ আদর্শ বাস্তবে রূপায়িত করতে হ'লে উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রীর যে একান্ত প্রয়োজন, সে-কথাও চিন্তা করতে হবে। এ-বিষয়ে স্বামীজীর অভিমত ছিল এই যে, যাঁরা স্ত্রীশিক্ষার দুরূহ ব্রত গ্রহণ করবেন, তাঁরা সুশিক্ষিতা হবেন, সুচরিত্রা হবেন; ব্রহ্মচারিণীর নিষ্ঠাপূত জীবন তাঁদের যাপন করতে হবে।

স্মরণাতীত কাল থেকে হিন্দুনারীর রক্তে যে সতীত্বের বীজ সংস্কারগতভাবে অনুপ্রবিষ্ট রয়েছে, তাঁদের চরিত্রেও সেই সতীত্বের ভাস্বর-প্রভা অতি উজ্জ্বলতায় দেদীপ্যমান হয়ে উঠবে, মূর্তি পরিগ্রহ করবে।

এমনি আদর্শ চরিত্রের শিক্ষয়িত্রীরাই স্ত্রী-শিক্ষার কর্ণধার হবেন, পরিচালিকা হবেন; তাঁরাই হবেন এ-যুগের সঙ্ঘমিত্রা। স্ত্রীশিক্ষার প্রচারিকারূপে ভারতবর্ষের দূরে দূরান্তরে তাঁরাই ছড়িয়ে পড়বেন—শিক্ষার দীপশিখাটি হাতে নিয়ে। কিন্তু এ-জাতীয় আদর্শ নারী যথেষ্ট সংখ্যায় গড়ে তোলা যে খুব সহজসাধ্য ব্যাপার নয়, সে-কথাও স্বামীজীর অবিদিত ছিল না। দগ্ধ মৃত্তিকায় কঠিন ঊষরতার মধ্যে সহসা সতেজ অঙ্কুর উদ্গত হবে, এমন আশাও তিনি পোষণ করতেন না। আর করতেন না বলেই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে পাশ্চাত্যের নারীজগতের উদ্যানবাটী থেকেই একটি আদর্শ মহিলাকর্মী ও যোগ্যা শিক্ষয়িত্রী সংগ্রহ করতে তিনি সচেষ্ট হয়েছিলেন, আর সেই প্রচেষ্টাতেই আহরণ করেছিলেন এক অনাঘ্রাত অম্লান কুসুম, শ্বেতপদ্মসম এক মনস্বিনী নারীকে—'ভগিনী নিবেদিতা' নামে যাঁর পরিচয় ভারতের আধুনিক কালের ইতিহাসে চিরদিনের মতো অক্ষয় হয়ে আছে।

স্বামী বিবেকানন্দের পরিকল্পনায় ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষে স্ত্রীশিক্ষার দুর্গম পথ-যাত্রায় যাঁরা যাত্রী হবেন, তাঁদের মধ্যে যে-নিষ্ঠা, যে-

তেজস্বিতা থাকবে, যে পূতচরিত-মহিমা ও ভক্তির কমনীয়তা থাকবে, যে সর্বত্যাগের ব্রত ও আদর্শ তাঁরা গ্রহণ করবেন—তারই পূর্ণ পরিণতি এবং সার্থক অভিব্যক্তিই যেন ছিলেন নিবেদিতা। অবিস্মরণীয় তাঁর অবদান, চির-অনুধ্যানযোগ্য তাঁর পুণ্যচরিত-মহিমা।

এই ভগিনী নিবেদিতাকে যন্ত্রস্বরূপ গ্রহণ করেই স্বামীজী তাঁর পরিকল্পিত স্ত্রীশিক্ষা-কেন্দ্রের উদ্বোধন করেছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর প্রান্তভাগে, উত্তর কলকাতার এক প্রাচীন পল্লীতে—বাগবাজারে। সে-কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি।

সেদিন চতুর্দিকে শত বিকৃত ও বদ্ধ কুসংস্কারের দুঃসহ বিরুদ্ধতার মধ্যেই ভাবীকালের মহাযজ্ঞের প্রথম সূত্রপাত হয়েছিল, অপরিসর যজ্ঞবেদীতে ক্ষীণ একটি হোমশিখা প্রজ্বলিত করা হয়েছিল।

সে যুগযজ্ঞের সর্বদায়িত্ব ভগিনী নিবেদিতার স্কন্ধে ন্যস্ত ক'রে নির্দেশ দিয়েছিলেন স্বামীজী :

You must live in strict seclusion. You have to set yourself to Hinduise your thoughts, your needs, your conceptions and your habits.

Your life, internal and external, has to become all that an orthodox Hindu Brahmin Brahmacharini's ought to be. The method will come to you, if only you desire it sufficiently. But you have to forget your own past and cause it to be forgotten. You have to lose even its memory.

—ভারতবর্ষের সেবাকার্যে আত্মনিয়োগ করতে হ'লে এ দেশটিকে তোমার একান্ত নিজস্ব বস্তুরূপে গ্রহণ করতে হবে, তার সব দোষগুণ মিশিয়ে সে যেমনটি, ঠিক তেমনি-ভাবেই তাকে নিতে হবে।

'You must help as she is. Those who have left her, can do nothing for her.'—এই ছিল তাঁর নিজস্ব ভাষা।

আবার বাস্তব কর্মক্ষেত্রে প্রেরণ করবার প্রাকালে অকুণ্ঠ আশীর্বাদে অভিসিঞ্চিত ক'রে নিবেদিতাকে বলেছিলেন :

জননীর কোমলতা ও বীরের কঠোর সঙ্কল্প তোমার মধ্যে সম্মিলিত হোক। দক্ষিণ দিগন্ত-পথে যে বায়ু প্রবাহিত হয়, তার মৃদুতা তোমার মধ্যে সঞ্চারিত হোক। আসুক হোমশিখার পূতদীপ্তি ও অক্ষয় উজ্জ্বলতা! আরও আসুক অনেক কিছু, যার স্বপ্নে ভারতাত্মা শতযুগ ধরে মগ্ন হয়ে আছে, বিভোর হয়ে আছে। হে কন্যা,……

'Be thou to India's future son
The mistress, servant, friend in one'.…

কত দিন, নিবেদিতাকে সম্মুখে রেখে স্ত্রী-শিক্ষার যে বিরাট স্বর্ণময় ভবিষ্যৎ ক্ষণে ক্ষণে তাঁর কল্পনা-মানসে প্রতিভাসিত হ'ত, তারই বর্ণবিশ্লেষণে তিনি নিমগ্ন হতেন।

শিক্ষার আদর্শের কথা বলতেন, সমন্বয়ের কথা বলতেন, পাঠ্যসূচীর বিশ্লেষণ করতেন। বাস্তবের এবং কল্পনার মোহময় সংমিশ্রণে সে-সব আলোচনা বিচিত্র হয়ে উঠত, ধর্মানুভূতির দিব্য আলোক-সম্পাতে সেগুলি প্রদীপ্ত হয়ে উঠত। জল ও বায়ুতে যেমন মানুষ মাত্রেরই জন্মগত অধিকার, শিক্ষার আলোক-ধারার উপরও তেমনি স্ত্রী ও পুরুষ নির্বিশেষে সকল মানুষেরই সমান অধিকার —এই মত অতি দৃঢ়তার সঙ্গেই স্বামীজী ব্যক্ত করতেন।

আধুনিক ভাবধারার সঙ্গে প্রাচীন দুর্লভ উপকরণগুলিকে কোন্ প্রণালীতে মিশ্রিত করা যেতে পারে, কি কৌশলে ধর্ম ও বিজ্ঞান স্ত্রী-

শিক্ষার নব-কর্ষিত ক্ষেত্রে এসে পরস্পরের সঙ্গে শোভন-সৌন্দর্যে সমন্বিত হ'তে পারে—সে-সকল চিন্তায়ও অনেক সময় গভীরভাবে তিনি ডুবে যেতেন।

এ-প্রসঙ্গে নিবেদিতা বলেছিলেন: He knew instinctively that the bonds by which the old society had been knit together, must receive a new sanction and a deeper sanctification, in the light of modern learning or that learning would prove only preliminary to the ruin of India.···How to nationalise the modern and modernise the old, so as to make them one, was a puzzle that occupied much of his time and thought.

আর সেই গভীর চিন্তামগ্নতা থেকেই সহসা একদিন এ-সমস্যা সমাধানের সূত্রটি তিনি আবিষ্কার করেছিলেন, অতীতে ও বর্তমানে যথার্থ সেতুবন্ধনের কৌশলটি উপলব্ধি করেছিলেন।

প্রাচীন ভারতবর্ষে—গার্হস্থ্যজীবনে ঋষি-ঋণ পিতৃ-ঋণ প্রমুখ পঞ্চ-ঋণের বিষয় কথিত হয়েছে। প্রতিদিন পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠানে সে-ঋণ পরিশোধের বিধানও রয়েছে শাস্ত্রে। সেই বিধানের বিশ্লেষণ-প্রসঙ্গেই নিবেদিতাকে বলেছিলেন স্বামীজী:

এই শাস্ত্রিক বিধান গভীর তাৎপর্যপূর্ণ, এরই মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা-সমস্যার সমাধান-মন্ত্র নিহিত আছে। সেটিকে এ-যুগের উপযোগী ক'রে বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ—

পিতৃযজ্ঞানুষ্ঠানের সূত্র ধরে বীরপূজার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলা যাবে।

দেবপূজায় দেবদেবীর নানা মূর্তি চিরদিনই ব্যবহৃত হয়েছে এদেশে। সে-সকল মূর্তির নানা ভঙ্গিমার সহায়তা নিয়ে চিত্রবিদ্যা, মৃৎশিল্প প্রভৃতি অতি সুষ্ঠু উপায়ে শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে।

হিন্দুর ধর্মসংস্কারের ঘনীভূত প্রকাশ থাকে দেবমন্দিরে। সেখানকার বেদীমূলের পূর্ণঘট, ঊর্ধ্বমুখী ঘৃত-প্রদীপ শিল্পশিক্ষার কি অপূর্ব উপাদান! বৈদিক যুগে যাগযজ্ঞের প্রচলন ছিল আর্যাবর্তে। যজ্ঞবেদীর আকৃতি ছিল শত বিচিত্র ধরনের, বিচিত্র আয়তনের। যজ্ঞ-বেদীতে অগ্নিসংযোগ করা হ'ত নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। সে-সবের সহায়তায় আধুনিক স্ত্রীশিক্ষা-ব্যবস্থাকে সমৃদ্ধ করা যেতে পারে, অতীতের ও বর্তমানের সামঞ্জস্যে সুগঠিত করা যেতে পারে।···

নিবেদিতাকে নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন, নানা গৃহপালিত পশুপক্ষীর পরিপালন ও পরিচর্যা যেন শিক্ষা-ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সেটি পশু-ঋণের অন্তর্ভুক্ত।

'Gather all sorts of animals about you. The cow makes a fine beginning. But you will also have dogs and cats and birds and others. Let the children have a time for going to feed and look after these.'

—পুরাতন স্বদেশী শিল্পগুলির পুনরুদ্ধার ক'রে রন্ধনবিদ্যা, সূচী-শিল্প প্রভৃতি শিক্ষা দাও। নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে, এমন কিছু কিছু শিক্ষাব্যবস্থা পাঠ্য-সূচীর অন্তর্ভুক্ত ক'রে নাও।

—কিন্তু সর্বোপরি স্মরণ রেখো মানুষের কথা, মনুষ্য-ঋণের কথা। 'সবার উপরে মানুষ সত্য'—এ-কথা ভারতবর্ষে চিরদিন বহুধা ঘোষিত হয়েছে। ঘোষিত হয়েছে কবির কণ্ঠে, পুঁথির পাতায়। কিন্তু প্রত্যক্ষ বাস্তবক্ষেত্রে তেমন ভাবে তার প্রয়োগ হয়নি।

—ভবিষ্যতের ভারতীয় নারীর হস্তে তার প্রয়োগ যেন ব্যাপক হয়, সার্থক হয়। দরিদ্র-সেবা, শিশুর সেবা ও মানব-সেবা—এ-সব যেন শিক্ষাবিধির মুখ্য বিষয়রূপে পরিগণিত হয়।

'Never forget humanity. Make poetry, make art out of it,···yes, a daily worship of the feet of beggars, after bathing and before the meal, would be a wonderful practical training of heart and hand together.

On some day, again, the worship might be of children, of your own pupils. Or you might borrow babies and nurse and feed them.'

আবার এ তত্ত্বেরই বিশদতর বিশ্লেষণে পাঠ্যসূচীর নানা খুঁটিনাটি সম্পর্কেও নিজ অভিমত তিনি ব্যক্ত করেছিলেন—অবশ্য নানাসূত্রে, নানাপ্রসঙ্গে।

বলেছিলেন, স্ত্রীশিক্ষার পাঠ্যসূচী—কতকাংশে হলেও পুরুষদের পাঠ্যসূচী থেকে স্বতন্ত্র হবে। তারা সাহিত্য, ইতিহাস, পুরাণ, গৃহবিজ্ঞান এবং সাধারণ বিজ্ঞানের মূলতত্ত্বগুলি শিক্ষা করবে। শিক্ষা করবে—সীবনশিক্ষা, সূচীশিল্প, বয়নশিল্প এবং সন্তান-পালন-বিষয়ক সাধারণ নিয়মাদি। আবার প্রাচীন ভারতের আধ্যাত্মিক জীবন-দর্শনের সঙ্গে নিগূঢ় পরিচয়ের মধ্য দিয়ে জপ ধ্যান ও পূজা-পদ্ধতিও তাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার মূল উপাদান-রূপে গৃহীত হওয়া চাই।

বর্তমানে আত্মরক্ষামূলক শারীরিক শিক্ষাও অবশ্য তাদের দিতে হবে।

দিনে দিনে বাস্তব অভিজ্ঞতার নিকষে যাচাই ক'রে, দ্রুত পরিবর্তনশীল কালধর্মের দিকে দৃষ্টি রেখে এ পাঠ্যসূচীর আবশ্যকীয় অদল-বদল অবশ্য করতে হবে। কিন্তু কোন অজু-হাতে, কোন মোহের আকর্ষণেই এ-দেশের মহান্ আদর্শ থেকে নারী-সমাজকে বিচ্ছিন্ন ক'রে তাকে 'অতি-আধুনিক' ক'রে গড়ে তোলবার মারাত্মক পথে আমার যেন অগ্রসর না হই।—এই ছিল স্বামীজীর অভ্রান্ত নির্দেশ।

আজ স্বামীজীর দেহত্যাগের কিঞ্চিদধিক অর্ধশতাব্দীকাল পরে সমগ্র ভারতে স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপক ও বহুবিস্তৃত ব্যবস্থাদি অবলম্বিত হচ্ছে। ঔদাসীন্যের কুজ্ঝটিকা অপসৃত হচ্ছে। অপ্রতি-রোধ্য কালপ্রবাহ সকল রাষ্ট্রিক ও সামাজিক বাধা-নিষেধ নিশ্চিহ্ন করেছে। জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে যুগলক্ষণ আজ পরিস্ফুট। নারী-শক্তি জাগছে, শূদ্রশক্তি জাগছে।

অনুকূল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে প্রগতির প্রশস্ত পথে আজ নারী দৃঢ় পদসঞ্চারে এগিয়ে চলেছে। অপ্রত্যাশিত এক শুভলগ্ন এসেছে ভারতের স্ত্রীশিক্ষা-ক্ষেত্রে। সেই লগ্নে স্বামীজীর শিক্ষাস্বপ্নের বর্ণময়ী চিত্রগুলি যদি আমরা স্মরণ রাখতে পারি, যদি তাঁর নির্দেশ অমান্য করবার দুর্বুদ্ধি আমাদের না হয়, তবে অবিকৃত আদর্শানুসরণের পথও আমরা খুঁজে পাব।

ভগিনী নিবেদিতার একটি সার্থক উক্তি দিয়েই এ-প্রসঙ্গ শেষ করি :

Indian educators have to extend and fulfil the vision of Vivekananda. When this is done, when to his reverence and love for the past, we can add his courage and hope for the future and his allegiance to the sacredness of all knowledge, the time will not be far distant, that is to see the Indian women take her rightful place amongst the womanhood of the world.

সে শুভদিন অবিলম্বিত হোক; দেবী ভারতী আমাদের সহায় হোন।

সমাজতন্ত্রবাদ ও স্বামী বিবেকানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

অধ্যাপিকা শ্রীমতী সান্ত্বনা দাশগুপ্ত

(৪) অদ্বৈত ব্রহ্মবাদ ও বিশেষ সুবিধা-তত্ত্ব

বিশ্লেষণ ক'রে দেখা গেল বিবেকানন্দের সমাজতন্ত্রে যে সাম্যবাদের কথা বলা হয়েছে, তা আধ্যাত্মিক সাম্যবাদ। তাঁর কথা হ'ল: The same power is in every man, the one manifesting more, the other less, the same potentiality is in every one.[১] সকলের মধ্যে একই শক্তি অন্তর্নিহিত আছে, সকলেরই মধ্যে একই সম্ভাবনা সুপ্ত আছে। 'Where is the claim to privilege ?' কোন বিশেষ সুবিধার দাবি তা হ'লে কেমন ক'রে দাঁড়ায়? 'All knowledge is in every soul, even in the ignorant ; he has not manifested it, perhaps he has not the opportunity' যে মানুষ অজ্ঞ, তারও মধ্যে অনন্ত জ্ঞান নিহিত আছে, কিন্তু সে তা বিকশিত করেনি, সম্ভবতঃ সুযোগ পায়নি। অতএব সকল প্রকার বিশেষ সুবিধার অবসান করতে হবে। সব মানুষকে তার সুপ্ত সম্ভাবনাকে বিকাশ করবার জন্য একই সুবিধা দিতে হবে।

অদ্বৈত ব্রহ্মবাদ হ'তে এই বিশেষ সুবিধা-তন্ত্রের অবসানের দাবি এসেছে। কিন্তু অদ্বৈতবাদ সম্পর্কে মার্ক্সবাদী সমাজতন্ত্রীদের সিদ্ধান্ত হ'ল এই যে, এ তত্ত্ব মানুষের 'দেবত্ব' প্রতিপন্ন ক'রে সব মানুষকে নিজ ভাগ্যে সন্তুষ্ট থাকতে প্রণোদিত করেছে। কেউ যদি দেব-স্বভাব হয়, অনন্ত শক্তি ও অনন্ত জ্ঞানের অধিকারী হয়, তা হ'লে তার আর কিসের অভাব? অতএব সে আর কোন অভিযোগ করবে না। তাতে রাজন্যবর্গ ও পুরোহিতদের শোষণ করবার সুবিধা হয়েছে।[২] শোষণের উদ্দেশ্যেই এ তত্ত্ব প্রচার করেছিল ক্ষত্রিয় ও পুরোহিতেরা মিলে। কিন্তু এ প্রকল্প সত্য নয়। কারণ অদ্বৈতবাদী এ-কথা বলেন না যে, দেব-স্বভাব মানুষের সে-স্বভাব বিকাশ করবার প্রয়োজন নেই, কিংবা তা বিকাশের জন্য সুযোগের প্রয়োজন নেই। উচ্চতম অধিকার সম্বন্ধে জনগণকে সচেতন করাই অদ্বৈতবাদের উদ্দেশ্য। বিবেকানন্দের যুক্তিধারা অনুসরণ করলে তা আমরা সম্যক্ প্রণিধান করতে সক্ষম হবো।

স্বামীজী বলছেন, ব্যাবহারিক জগতে মানুষে মানুষে প্রচুর ভেদ-বৈষম্য রয়েছে,[৩] যার ভিত্তিতে সমাজে নানা রকম বিশেষ সুবিধার প্রাকার গড়ে উঠেছে। এই ভেদ-বৈষম্য কত প্রকার, তা স্বামীজী সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করেছেন: 'There is first the brutal idea of privilege, that of strong over the weak. There is the privilege of wealth. If a man has more money more than another, he wants a little privilege over those who have less. There is still the subtler and more powerful privilege of intellect ; because

১ Vedanta and Privilege

২ 'From Volga to Ganga'—Rahul Sankrityana

৩ 'The idea of privilege is the bane of human life'—Vedanta and Privilege

one man knows more than others, he claims privilege. And the last of all and the worst, because the most tyrannical is the privilege of spirituality. If some persons think that they know more of spirituality, of God, they claim superior privilege over everyone.' ভেদবৈষম্য—শারীরিক শক্তি, আর্থিক সঙ্গতি, বিদ্যার গৌরব—এমন কি অধ্যাত্ম-জ্ঞান-সম্পদ্ এ সবের তারতম্য রয়েছে। এবং যেখানে এই-রূপ তারতম্য, সেখানেই তারতম্যের ভিত্তিতে বিশেষ সুবিধা দাবি করা হয়ে থাকে।

এই 'বিশেষ-সুবিধা' তত্ত্ব তাঁর সমাজতন্ত্র-বাদের অন্যতম মূলভিত্তি। বিশেষ সুবিধার নানা রূপ, একই সময়ে তা নানাভাবে প্রকট হয়। এই বিশেষ সুবিধাই হ'ল প্রকৃতপক্ষে সর্বপ্রকার শোষণের কারণ। এই বিশেষ সুবিধা আদায় ক'রে শক্তিমান্ দুর্বলকে, ধনী দরিদ্রকে, পণ্ডিত মূর্খকে আর ধার্মিক ব্যক্তি সাধারণ সংসারী ব্যক্তিকে শোষণ ক'রে থাকে। সাম্য-প্রতিষ্ঠা করতে হ'লে এই 'বিশেষ সুবিধা'র অবসান প্রয়োজন। কি ভাবে তা সম্ভব হ'তে পারে? একমাত্র ধন-বণ্টনের সাম্য আনলেই বিশেষ সুবিধা নির্মূল হবে না। কারণ মূর্খের ওপর শিক্ষিতের যে আধিপত্য, অধ্যাত্মবিদ্ যে-প্রভাব সাধারণ অজ্ঞানীর উপর বিস্তার করে, তা বড়ই সূক্ষ্ম এবং সেজন্য শুধু রাষ্ট্রিক প্রয়াসে তার অবসান ঘটানো খুবই শক্ত। কারণ যা স্থূল (concrete), তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্র ফতোয়া জারি করতে পারে, মূর্খের ওপর শিক্ষিতের প্রভাব ঠিক সে-জাতীয় বস্তু নয়।

শোষণের অবসানের উপায় স্বামীজী নির্দেশ করেছেন নিম্নলিখিত ভাবে। তিনি বলছেন: 'The work of Advaita philosophy is to break down all privileges.' এ-কথা যদি সম্যক্ উপলব্ধি করা যায় যে, সব মানুষের মধ্যে একই সুপ্ত সম্ভাবনা রয়েছে, সেখানে কোন পার্থক্য নেই, পার্থক্য যা কিছু পরিলক্ষিত হয় তা হ'ল বিকাশের, এবং সে-বিকাশের তারতম্যের কারণ সকলের সমান সুযোগের অভাব, তা হ'লে কোন প্রকার বিশেষ সুবিধার দাবি দাঁড়াতে পারে না। অদ্বৈত ব্রহ্মবাদই এ তত্ত্বের উদ্ঘাটন ক'রে সর্বপ্রকার বিশেষ সুবিধার মূলে করে কুঠারাঘাত। সকলকে সমান সুযোগ দিলে একই শক্তি প্রদর্শন করতে পারবে এই বিশ্বাস সকলের মনে অনুপ্রবিষ্ট হ'লে তখনই সমাজ-ব্যবস্থার পক্ষে বিশেষ সুবিধার অবসান করা সম্ভব, তার পূর্বে নয়।

বস্তুতঃ বাস্তব প্রয়োগের দিক থেকে সমগ্র বেদান্ত-দর্শনকে বিবেকানন্দ দুটি মূলসূত্রে পরিণত করেছেন:

(১) মানুষের দেবত্ব (Divinity of Man),

(২) জীবনের অপ্রতিরোধ্য আধ্যাত্মিক প্রবণতা (The essential spirituality of life)।

এই দুটি মূলসূত্র হ'তে অবশ্য প্রতিপাদিত হয় নিম্নলিখিত দুটি সিদ্ধান্ত:

(১) 'That every society, every state, every religion ought to be based on the recognition of this All-powerful Presence latent in man.'

(২) 'That in order to be fruitful, all human interests ought to be guided and controlled according to the ultimate idea of the spirituality of life' (Romain Rolland—Life of Vivekananda—p. 292)

মানুষের মধ্যে যে অনন্তশক্তিময় সত্তা সুপ্ত হয়ে আছে, তার স্বীকৃতির উপর সব

সমাজ, সব রাষ্ট্র ও সব ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এবং জীবনের অপ্রতিরোধ্য আধ্যাত্মিক প্রবণতা স্বীকার ক'রে নিয়ে মানুষের সব স্বার্থকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করতে হবে। তা না করতে পারলে ব্যর্থ হবে সমাজ-বিপ্লব ও রাষ্ট্রগঠন-প্রচেষ্টা। কারণ নিত্য নূতন বিশেষ সুবিধার সৃষ্টি হবে, পরিণামে বিচ্ছিন্নতা (disintegration) গ্রাস করবে সমাজ-জীবনকে। সব মানুষে স্বার্থ এক, তার একমাত্র উদ্দেশ্য—আধ্যাত্মিক বিকাশ-সাধন। সেই বিকাশ-সাধনে সকলের সমান অধিকার, কারণ সকলের মধ্যে একই সম্ভাবনা রয়েছে। সেইজন্য এই স্বার্থকে সমাজ-জীবনে মুখ্য স্থান দিলে সমান অধিকার রাষ্ট্রক্ষেত্রে ও অন্যান্য সামাজিক ক্ষেত্রে আপনা হ'তে স্বতঃসিদ্ধভাবেই এসে পড়ে।

(৫) সমাজ-জীবনে ধর্মের ভূমিকা : মার্ক্স ও বিবেকানন্দ

যে ব্যক্তি মনে করেছিলেন—মানুষের সব স্বার্থকে আধ্যাত্মিক বিকাশ-সাধনের প্রয়োজনে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে, তিনি আর যাই হোন কার্ল মার্ক্স-এর সমগোত্রীয় সমাজতন্ত্রী নন। এ-বিষয়ে ডক্টর দত্তের সিদ্ধান্ত যুক্তিসিদ্ধ নয়। বিবেকানন্দের সমাজতন্ত্রবাদের গোত্র ভিন্ন, তা স্বতন্ত্র এবং সম্পূর্ণ মৌলিক। তার ভিত্তি হ'ল আধ্যাত্মিক সাম্যবাদ, যা উদ্ভূত হয়েছে অদ্বৈত ব্রহ্মবাদ হ'তে।

সমাজ-জীবনে ধর্মের ভূমিকা সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে মার্ক্স-এর তুলনামূলক আলোচনা করলে বিবেকানন্দের মৌলিকত্ব আরও পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। ডক্টর দত্তের অভিমত আলোচনা করার প্রাক্কালে আমরা দেখেছি, মার্ক্স-এর মতের ভিত্তি কোথায়। ফুয়ারবাক্-এর কয়েকটি মন্তব্য হ'তে মার্ক্স ও এঙ্গেলস্ উভয়ে সিদ্ধান্ত করেছিলেন : 'Religious ideas are the inverted reflections of the mundane world of the time.' অবশ্য ফুয়ারবাক্ ঠিক এ-কথা বলতে চাননি। পূর্বেই বলা হয়েছে, তিনি খ্রীষ্টধর্মের অবৈজ্ঞানিকত্ব প্রতিপাদন করেছিলেন মাত্র। তা থেকেই এঁরা পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত গঠন করেছেন এবং ধরে নেন : 'exclusively natural-scientific materialism is indeed the foundation of the edifice of human knowledge.'

প্রকৃতপক্ষে ফুয়ারবাক্ ধর্মকে সুসংস্কৃত করতে চেয়েছিলেন মাত্র। এঙ্গেলস্ নিজেই তা স্বীকার ক'রে বলছেন :

'The real idealism of Feuerbach becomes evident as soon as we come to his philosophy of religion and ethics. He by no means wishes to abolish religion, he wants to perfect it.'

তা শুধু নয় এবং ফুয়ারবাক্-এর নিজস্ব কথা হ'ল, 'the periods of humanity are distinguished only by religious changes.' সে যাই হোক ফুয়ারবাক্-ই 'natural-scientific materialism' দিয়েছেন ব'লে মার্ক্স-এঙ্গেলস্-এর বিশ্বাস। এই 'natural-scientific materialism'কে তাঁরা 'foundation of the edifice of knowledge' মনে করেছেন, কিন্তু তাকে তাঁরা 'the edifice itself' মনে করেননি। তাঁদের মতে 'For we live not only in nature, but also in human society, and this also no less than nature has its history of development and its science. It was therefore

---

* Engels—'Feuerbach and the end of classical German Philosophy', p. 340—Selected works of Marx and Engels-Vol. II

« ঐ „ „ p.-342

a question of bringing the science of society, that is, the sum-total of the so-called historical and philosophical sciences, into harmony with the materialist foundation, and of reconstructing it thereupon'. এবং তাঁদের মতে 'But it did not fall to Feuerbach's lot to do this'. এ-কাজ তাঁরা নিজেরা করেছেন। ফুয়ারবাক্-এর 'idealistic' ধর্ম-সম্বন্ধে প্রকৃত অভিমত থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে তাঁর কয়েকটি খ্রীষ্ট ধর্মের সমালোচনা-সূচক মন্তব্য হ'তে তাঁরা 'natural-scientific materialism' আবিষ্কার ক'রে তার সঙ্গে হেগেল (Hegel)-এর 'dialectics'-কে জুড়ে, মর্গ্যান (Morgan)-এর পুরাতাত্ত্বিক গবেষণার* সঙ্গে সংযোজিত ক'রে তাঁরা 'Historical-Dialectical-Scientific Materialism' দিলেন। এবং তাতে তাঁরা ধর্ম-সম্বন্ধে যে অভিমতে পৌঁছলেন তা নিম্নোক্ত রূপ : 'Religion arose in very primitive times from erroneous primitive conceptions of men about their own nature and external nature surrounding them'[৭] এবং একই স্থানে বলেছেন : 'Religion once formed, always contains traditional material, just as in all ideological domains tradition from a great conservative force. But the transformations which this material undergoes, spring from class-relations of the people'[৮] —অর্থাৎ এঁদের মতে ধর্ম আদিমযুগের মানুষের অসম্পূর্ণ জ্ঞান-প্রসূত এবং যুগে যুগে যেটুকু বিবর্তন তার হয়েছে, তা আর্থনীতিক শ্রেণীসম্পর্কের বিবর্তনের ফল। এবং শেষ পর্যন্ত এঁরা আবিষ্কার করলেন যে, দেখা গেছে—ধর্ম শাসক-শ্রেণীর শোষণের যন্ত্র হয়েছে এবং 'opium of the people' (জনসাধারণের পক্ষে অহিফেন) হিসাবে কার্য করেছে। অতএব সমাজ-জীবনে ধর্মের ভূমিকা এই শোষণের যন্ত্ররূপে।

কিন্তু বিবেকানন্দ সমাজ-জীবনে ধর্মের ভূমিকাটিকে একটু অন্যরূপে দেখেছেন। তিনি বলেছেন : 'Priest-craft is in its nature cruel and heartless. That is why religion goes down, where priest-craft rises. Says Vedanta, we must give up the idea of privilege, then all religions will come. Before that there is no religion at all.'[৯] এখানে দেখা যাচ্ছে, স্বামীজী পুরোহিত-তন্ত্রকে হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতার জন্য নিন্দা করছেন। হৃদয়-হীন ও নিষ্ঠুর কেন না, শোষণ-কার্যে সহায়তা করেছে। 'বর্তমান ভারত' গ্রন্থে তার সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে : 'রাজ্য-রক্ষা, নিজের বিলাস, বন্ধুবর্গের পুষ্টি ও সর্বাপেক্ষা পুরোহিত-কুলের তুষ্টির নিমিত্ত রাজরবি প্রজাবর্গকে শোষণ করিতেন। **বৈশ্যেরা রাজার খাদ্য, তাঁহার দুগ্ধবতী গাভী।**' পুরোহিত-তন্ত্রকে যদি ধর্ম ব'লে মনে করা হয়, তা হ'লে অবশ্যই ধর্ম শোষণের যন্ত্র। কারণ যুগে যুগে যে পুরোহিত-তন্ত্র শোষণের যন্ত্ররূপে কাজ করেছে, তা স্বামীজী তাঁর 'বর্তমান ভারত' গ্রন্থে বিশদ আলোচনা ক'রে দেখিয়েছেন। তিনি তাতে দেখিয়েছেন যে, কখন রাজশক্তির সহিত সংগ্রাম ক'রে, কখন তার সঙ্গে হাত মিলিয়ে

* Engles-এর Origin of Family, Private property and State—Morgan-এর গবেষণার ভিত্তিতে রচিত।

৭ Engels-Feuerbach and classical German Philosophy, p 341

৮ ঐ ,, p. 342

৯ Vedanta and Privilege

পুরোহিতগণ এ-কার্য সাধন করেছে। কিন্তু এই পুরোহিত-তন্ত্রকে বিবেকানন্দ ধর্ম ব'লে স্বীকার করেননি। কারণ তাঁর মতে 'Religion goes down where priest-craft rises.' কারণ পুরোহিত-তন্ত্রের প্রাধান্য ঘটলেই বুঝতে হবে—ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হয়েছে। আমরা দেখেছি যে, ধর্ম তাঁর মতে বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিকতা—'manifestation of divinity in man.' তাঁর মতে যখনই মানুষের মধ্যে এই আধ্যাত্মিকতার অভাব হয়েছে, তখনই পুরোহিত-তন্ত্রের আবির্ভাব ঘটেছে। *প্রকৃত ধর্মের কাজ হ'ল—এই* পুরোহিত-তন্ত্রের অবসান ঘটানো। 'Says Vedanta—we must give up the idea of privilege, then will come religion; before that there is no religion at all.······And the work of Advaita philosophy is to break down privileges.' —অদ্বৈত বেদান্তের কাজ হ'ল এই বিশেষ সুবিধার অবসান ঘটানো, সামাজিক ক্ষেত্রে ধর্মের ভূমিকা-সম্বন্ধে এক নূতন তথ্য উদ্ঘাটন। মার্ক্স বলছেন, ধর্ম শোষণ-কার্য সম্পাদন করে। বিবেকানন্দ বলছেন, 'না, ধর্ম শোষণের অবসান ঘটায়।' যা শোষণ করে, তা পুরোহিত-তন্ত্র, ধর্মের নামে বিশেষ সুবিধা-তন্ত্র। কার্ল মার্ক্স এই পুরোহিত-তন্ত্রের ভূমিকাটিকে ঠিকই দেখেছেন, তিনি ধর্ম ও এই পুরোহিত-তন্ত্রকে এক ও অভিন্ন ব'লে মনে করেছেন। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ ক'রে ইতিহাস বিশ্লেষণ করলেও ইতিহাসের একটি ইঙ্গিতে প্রকৃত ধর্মের সঠিক ভূমিকা—তাঁর কাছে অজ্ঞাত রয়ে গেছে। বিবেকানন্দই সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ক'রে দেখেছিলেন যে, 'civilisation is the manifestation of spirituality'. যখনই আধ্যাত্মিকতার গ্লানি অপসারিত হয়েছে, তখনই সমাজ অগ্রসর হয়েছে, সভ্যতার প্রসার ঘটেছে। তার কারণ বিশেষ সুবিধার অবসান, সমাজের নিম্নস্তরে সাধারণ বর্ণের লোকেদের মধ্যে দেবভাব ও শক্তির স্ফুরণের জন্য রুদ্ধ সৃজনীশক্তি মুক্তি পেয়েছে। এ-প্রসঙ্গে আরও বিশদ আলোচনা পরে আমরা ক'রব। তার পূর্বে মার্ক্স-এর সিদ্ধান্তের আরও একটু বিশ্লেষণ এখানে প্রয়োজন।

মার্ক্স তাঁর সমাজতন্ত্রবাদের গোড়ায় হেগেল (Hegel)-এর 'Idealism' সমালোচনা ক'রে *আলোচনা শুরু করেন। হেগেল-এর প্রতিপাদ্য* বিষয় ছিল: 'Absolute Idea' হ'ল সত্য; ঘটনা যা ঘটতে দেখি, তা 'real' (সত্য) নয়। এই 'Absolute Idea' ইতিহাসের বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে আপনার পূর্ণত্ব-স্বরূপে (perfection) পৌঁছচ্ছেন। এর মধ্যে যুক্তির যে গলদ আছে, তার জন্য মার্ক্স এই মত গ্রহণ করতে পারেননি। 'Absolute Idea' পূর্ণত্বে পৌঁছচ্ছেন, অতএব ইতিহাসের বিবর্তনে ধর্মের যত বিকৃতি দেখা গেছে, সেগুলি সেই পূর্ণত্বের স্তর; এবং সেইজন্য সমর্থন করবার চেষ্টা করেছেন এই বিকৃতিকেও। এইজন্য মার্ক্স হেগেলের মতবাদকে 'ideological perversion' (আদর্শের বিকৃতি) বলেছেন। হেগেল বলেছেন, 'Dialectics is the self-development of the concept.' এই 'ideological perversion' থেকে হেগেলের (Hegelian) দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিকে মুক্ত ক'রে তাকে বাস্তব জগতের গতির সঙ্গে যুক্ত করেছেন মার্ক্স। ইতিহাসের বিবর্তন দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতেই হয়, 'thesis' এবং 'anti-thesis' স্থাপিত হয়, কিন্তু এই পদ্ধতিতে বস্তুর বিবর্তন ঘটছে, 'concept' বা 'Idea'র নয়। স্বামী বিবেকানন্দও তাঁর 'জ্ঞানযোগ' গ্রন্থের এক জায়গায়

হেগেল-এর মত খণ্ডন করেছেন। তাঁর মত মায়াবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত—অদ্বৈত-বেদান্ত-দর্শনের কথা। যা স্বরূপতঃ পূর্ণ, তা কোনরূপেই বিবর্তিত হ'তে পারে না। এবং যা অপূর্ণ, তাও যতই বিবর্তিত হোক না কেন, কখনও পূর্ণত্বরূপ-ধর্ম প্রাপ্ত হ'তে পারে না। যা পূর্ণ, তা সব সময়ই পূর্ণস্বভাব থাকবে; তার বিবর্তন অসম্ভব। ইতিহাসে যে-সকল অত্যাচার-অবিচার দেখা যায়, সেগুলি বিবর্তনের পথে পূর্ণত্বের স্তর, অতএব সেগুলি সমর্থনযোগ্য নয়। ওগুলি বিকৃতিই, কিন্তু বেদান্ত-মতে এ-সমস্তই পূর্ণের উপর আরোপিত। যতক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণত্বের উপলব্ধি নেই, ততক্ষণ সেগুলিকে অসত্য ব'লে উড়িয়ে দেবার উপায় নেই। বেদান্তের দিক থেকে তিনি এগুলিকে সমর্থন করবার চেষ্টা করেননি। হেগেলের এই যুক্তির থেকে ত্রুটিপূর্ণ মতবাদ থেকে যাত্রা শুরু করায় মার্ক্স ভ্রান্তপথে চলেছেন। বিকৃতিগুলিকে তিনি ধর্মের স্বভাব ব'লে গ্রহণ করেছেন। হেগেলের মত যে গ্রহণযোগ্য নয়, মাত্র যুক্তিসিদ্ধ, তাঁর এ-সিদ্ধান্ত ঠিক। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত কার্ল মার্ক্স প্রতিষ্ঠা করেছেন বস্তুবাদের উপর, আর স্বামী বিবেকানন্দ অধ্যাত্মবাদের উপর। মার্ক্স তারপর ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা দিয়েছেন, বিবেকানন্দ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। মার্ক্স-এর ব্যাখ্যা 'Materialistic Interpretation of History' (ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্যা) নামে খ্যাতি অর্জন করেছে, স্বামীজীর ব্যাখ্যাকে আমরা 'Spiritual Interpretation of History' (ইতিহাসের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা) আখ্যা দিতে পারি। (ক্রমশঃ)

দেবতার কথা

ডাঃ শ্রীশচীন সেনগুপ্ত

শিশুর ধরিয়া হাত
পূজারিনী মা তাহার
মন্দিরে চলে ধীর
চরণে।

দেবতার পূজা লাগি
সাজানো হয়েছে ডালি
ফুলে ফলে মালায়
চন্দনে।

শিশু কহে, 'শোনো মাগো
তোমার দেবতা কিগো
কথা কন মোদেরই
মতন ?'

মা শুনি কহেন হেসে,
'শোন্ তবে কোলে এসে
—নিশ্চয়ই কথা কন
তোদেরই মতন।'

সূর্য

[পূর্বানুবৃত্তি]

ডক্টর মতিলাল দাশ

মানুষ মনোময় জীব। সূর্যের বিদ্যুৎময় ঝলকের অন্তরালে সে এক দিব্য মাধুরীর সন্ধান করে। সে চায় উদয়ন—পতঙ্গের মোহ-আবরণ উন্মোচন ক'রে সে জাগবে মানবতার মহিমায়। কিন্তু সেই পরিণামেই সে নিবদ্ধ নয়, দেব-জন্মের আকূতি রয়েছে তার অন্তরে অন্তরে—সেই প্রেরণায় তার আকূতি দেবতাদের সখ্য-লাভ—দেবগণের সাথে একপ্রাণতা লাভের।

তার পার্থিব প্রকৃতির বুকে জলছে দিব্য জীবনের উৎশিখ অভীপ্সা। এই জগতেই এবং এই জীবনেই যে তার চাই উত্তরণ—উর্ধ্বাভিসার। ব্রাহ্মীসত্তার মধুর ও নিগূঢ় আনন্দেই যে তার পর্যবসান।

বিশ্বামিত্র ঋষির সূর্যবন্দনায় গায়ত্রীমন্ত্রে সেই দিব্যচেতনার প্রকাশ আমাদিগকে মুগ্ধ ও বিহ্বল করে।

তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি।
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ৩।৬২।১০

সবিতৃদেবের বরণীয় তেজ ধ্যান করি। তিনি আমাদের ধীশক্তি প্রেরণ করেন। সবিতৃদেব এখানে সূর্য। সায়ণ সেই কথাই বলেছেন—কিন্তু তিনি কেবল জড় জ্যোতিঃ-পিণ্ডকে উল্লেখ করেননি, তিনি সর্বদর্শী পরমপুরুষের কথাই বলেছেন।

মানুষের চাই চিন্ময় প্রমুক্তি। ঋত-চিতের জ্যোতির্লোকে যাত্রার জন্য ধ্যানই তার সম্বল। সেই ধ্যানের ফলে তার চেতনায় জাগে ছন্দোময় সত্যের লীলা, প্রকট হয় অখণ্ড ও অদ্বৈত ভাবনার ভাস্বর মহিমা।

আলোকোদ্ভাসিত আকাশে সূর্যের বিচরণ—সূর্যমণ্ডল তাঁর চক্ষু। তিনি হিরণ্যপাণি। দেব বিভাবসু আকাশের স্তম্ভ-স্বরূপ, কিন্তু কোন্ দৈব-বলে তাঁর ঊর্ধ্ব বিচরণ কে তা জানে? বামদেব ঋষি বলছেন:

অনায়তো অনিবদ্ধঃ কথায়ং
ন্যঙ্ঙুত্তানোঽব পদ্যতে ন।
কয়া যাতি স্বধয়া কো দদর্শ
দিবঃ স্কম্ভঃ সমৃতঃ পাতি নাকম্ ॥
ঋগ্বেদ ৪।১৩।৫

ঐ যে আকাশে প্রত্যক্ষ সূর্য—অদূরবর্তী তাঁকে কেউ বদ্ধ করতে পারে না—যখন তিনি অধোমুখে থাকেন, কেউ তাঁকে বাধা দিতে পারে না। ঊর্ধ্বমুখে তিনি কোন্ শক্তিতে আরোহণ করেন? কোন্ শক্তিতে তিনি স্তম্ভের মতো দ্যুলোককে ধারণ করেন—কে তা জানে? সে তত্ত্ব অনধিগম্য—কেউ তা জানে না।

বামদেবের দৃষ্টিতে দিবাকর মহৎ তেজে প্রদীপ্ত—তিনি আপন কিরণে দ্যাবাপৃথিবী ও অন্তরিক্ষকে পরিপূর্ণ করেন। সূর্য যখন দ্যুলোকে আরোহণ করেন, তখন বরুণ, মিত্র এবং অপরাপর দেবগণ আপনাপন ব্রতে নিযুক্ত হন, ভানু বিশ্বজগতের প্রকাশক।

বামদেব দিব্যসংবিতের বীর্যে অনুষিক্ত হয়ে স্তুতি করেছেন—সূর্যের বিপুল রহস্যময় গতিকে তিনি ভাবগভীরতায় উপলব্ধি করতে চেয়েছেন। তাই অনন্তের অনুভব তাঁর চিত্তে এক লোকোত্তর শক্তির উন্মেষ ঘটেছে।

শ্রীঅরবিন্দ তাঁর অনুপম ব্যাখ্যানে সূর্য সম্বন্ধে বলেছেন : But who, then, is Surya, the Sun from whom these rays proceed? He is the Master of Truth, Surya the illuminator, Savitar the creator, Pushan, the increaser. His rays in their own nature are supramental activities of revelation, inspiration, intuition luminous discernment and they constitute the action of that transcendent principle which the Vedanta calls Vijnana, the perfect knowledge, the Vedas Ritam, the Truth. But these rays descend also into the human mentality and form at its summit the world of luminous intelligence Swar, of which Indra is the lord.

The rays of Surya, as they labour to form our mental existence, create three successive worlds of mentality one superimposed on the other—the sensational, aesthetic and emotional mind, the pure intellect and the divine intelligence. The fullness and perfection of these triple worlds of mind exists only in the pure mental plane of being where they shine above the three heavens 'trisro divah', as their three luminosites—'trini rochanani'. But their light descends upon the physical consciousness and effects the corresponding formations in its realms, the Vedic 'pārthivāni rajānsi' earthly realms of light. They also are triple, 'tisro pṛthivih, the three earths. And of all these worlds Surya—Savitri is the creator.

সূর্য অন্তরাল আলোকিত করেন, তাই সূর্যকিরণ দিব্যজ্যোতির স্পন্দন, পরম সত্যের উন্মোচন এবং বোধির উন্মেষ। বেদান্ত যাকে বিজ্ঞান বলেন, বেদ তাকে ঋত বলেন, সূর্য তারই প্রতীক।

ভূর্ভুবঃস্বঃ—এই তিন লোক সূর্যকিরণের ক্রমোন্নত সোপান। সূর্য এই তিন লোকেরই স্রষ্টা।

শ্রীঅরবিন্দ শ্যাবাশ্ব আত্রেয়ের স্তুতি নিয়ে অনেক কথা বলেছেন। সূর্য বিপ্র, তিনি দিব্যচেতনায় ভাস্বর। ব্যক্তিত্বের সঙ্কীর্ণতা থেকে মানুষকে তিনি মুক্ত ক'রে মহৎ স্ফূর্তিতে জাগ্রত করেন—তাই তো তিনি বৃহৎ। কিন্তু এ তো ভ্রান্তির পথে নয়—এ যে আলোকের পথে উদয়ন। কারণ সূর্য যে বিপশ্চিৎ—তার চেতনশক্তি নির্মল এবং স্পষ্ট। এই ধারণা যেই জাগে, মানুষ সেই পরম সত্তার আলোকে আলোকিত হয়।

সূর্য দ্রষ্টা, প্রকাশক। জগতের যা কিছু সবই তিনি অভিব্যক্ত করেন। তিনি পার্থিব এবং অপার্থিব সমস্ত বস্তুকে প্রকাশিত করেন, তাদের যথার্থতা জ্ঞাপন করেন। পৃথিবীর কিছুই তুচ্ছ নয়, যখন বস্তুকে তার সততায় এবং যথার্থতায় জানি, তখন কিছুই অপচয় ব'লে মনে হয় না—সবই মঙ্গলময় ও শুভ মনে হয়।

সূর্যগ্রহণের কথা ঋগ্বেদে উল্লেখ আছে। পঞ্চম মণ্ডলের ৪০ সূক্তে পাই স্বর্ভানু-নামক রাক্ষস অন্ধকার দিয়ে সূর্যকে আচ্ছন্ন করেছিল, তখন ত্রিভুবনের লোক স্থান-নিরূপণে অসমর্থ ব্যক্তির ন্যায় হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল, ইন্দ্র রাক্ষসের সেই মায়া অপসারিত করেন, আর অত্রি-পুত্রগণ মন্ত্রবলে সূর্যকে অন্ধকারমুক্ত ক'রে প্রকাশ করেছিলেন। ঋগ্বেদে রাহুর নাম নেই—অথর্ববেদে রাহুর প্রথম উল্লেখ দেখা যায়।

প্রথম মণ্ডলের ১৬ সূক্তে সূর্যের অনেক কথা আছে। সূর্যের সাতটি রশ্মিই তাঁর সপ্ত অশ্ব। সূর্য সময়কৃৎ—মেষাদি দ্বাদশ রাশি দ্বাদশ অর,

তাঁর দ্বাদশ অর-বিশিষ্ট চক্রে সূর্য স্বর্গের চারিদিকে ভ্রমণ করেন। এই চক্রে সপ্তশত বিংশতি মিথুন—তারা হ'ল বৎসরে ৩৬০ দিন, ৩৬০ রাত্রি। বৎসরে দ্বাদশ মাস। এই সূক্তে সূর্যকে পঞ্চপাদ বলা হয়েছে—ছয় ঋতু ছয় পা, কিন্তু হেমন্ত ও শিশির একত্রে এক ঋতু ধরে পঞ্চ ঋতু বলা হয়েছে। সূর্যের উত্তরায়ণের এবং দক্ষিণায়নের ইঙ্গিতও ঋগ্বেদে আছে। ষষ্ঠ মণ্ডলের ৩২ সূক্তে বলা হয়েছে সূর্য দক্ষিণ থেকে বারিরাশি বিমুক্ত করেন। দক্ষিণায়নেই ভারতবর্ষে বৃষ্টি হয়, সায়ণ এখানে অর্থ করেছেন সূর্যের দক্ষিণায়নে বৃষ্টিরাশি পতিত হয়।

সূর্য ও চন্দ্রের বৈজ্ঞানিক সম্বন্ধও ঋগ্বেদে পরিচিত ছিল। নবম মণ্ডলের ৮৬ সূক্তের ৩২ ঋকে ঋষি গৃৎসমদ বলেছেন :

স সূর্যস্য রশ্মিভিঃ পরি ব্যত তন্তং তন্বানস্ত্রিবৃতং যথা বিদে। চন্দ্র—সূর্যের রশ্মিতে আলোকিত থাকেন। প্রাতঃকাল, মধ্যকাল এবং সান্ধ্যকাল এই তিন যজ্ঞে আপন অংশ গ্রহণ ক'রে তিনি যেন ত্রিবৃৎ সূত্রে আপন বস্ত্র বয়ন করেছেন। অমাবস্যার কারণও ঋষিরা জানতেন। প্রথম মণ্ডলের ৮৪ সূক্তের পঞ্চদশ ঋকে গৌতম ঋষি বলেছেন :

অত্রাহ গোরমন্বত নাম ত্বষ্টুরপীচ্যং। ইত্থা চন্দ্রমসো গৃহে ॥—তখন আদিত্য রশ্মি সকল এই চন্দ্রমার গৃহেই ত্বষ্টার আলোক দিয়েছিল। যাস্ক বলেছেন : তদেতেন উপেক্ষিতব্যং আদিত্যতঃ অস্যদীপ্তির্ভবতি।

উপরের শ্লোক থেকে আমরা অনুমান করতে পারি, আদিত্যের আলোকেই চন্দ্রের দীপ্তি ঘটে। অথর্ব বেদে এবং আরণ্যকে সূর্যের সপ্তাশ্ব এবং সপ্তরশ্মিকে সপ্ত সূর্য নামে অভিহিত করা হয়েছে।

সূর্য মানুষের হিতৈষী—তিনি আলোক ও তাপ দিয়ে মানুষকে সমৃদ্ধ করেন। বিভ্রাট্ ঋষি তাকে বলেছেন 'বিশ্বকর্মা'। তিনি মনুষ্যলোককে কর্মে প্রবর্তিত এবং জাগ্রত করেন স্থাবর ও জঙ্গম সমস্ত পদার্থেরই তিনি প্রাণস্বরূপ—সমস্ত প্রাণীই তাঁর অধীন। তিনিই বিশ্বস্রষ্টা।

ঋগ্বেদে সূর্য গ্রহরূপে পূজা পাননি। পরবর্তী যুগেই তিনি নবগ্রহের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন :

শ্রীকামঃ শান্তিকামো বা গ্রহযজ্ঞং সমাচরেৎ।
বৃষ্ট্যায়ুঃপুষ্টিকামো বা তথৈবাভিচরন্নরীন্ ॥
সূর্যঃ সোমো মহীপুত্রঃ সোমপুত্রো বৃহস্পতিঃ।
শুক্রঃ শনৈশ্চরো রাহুঃ কেতুশ্চেতি গ্রহা স্মৃতাঃ ॥

—সূর্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতু এই নবগ্রহ। যিনি শ্রী, শান্তি, বৃষ্টি, আয়ু, পুষ্টি কামনা করেন কিংবা শত্রুর অমঙ্গল প্রার্থনা করেন, তিনিই গ্রহযজ্ঞ করবেন। এই গ্রহপূজা এক সময়ে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেছিল, মন্দিরে মন্দিরে নবগ্রহের মূর্তি স্থাপিত হয়েছিল—সেই গ্রহ-স্বস্ত্যয়ন আজও আমাদের মধ্যে প্রচলিত।

অতি প্রাচীন যুগ থেকে সূর্যোপাসনা আমাদের ধর্মজীবনে উচ্চ স্থান অধিকার ক'রে আছে। 'অসাবাদিত্য ব্রহ্ম' এই শ্রুতি-বচন জলদগম্ভীর স্বরে সূর্যের মহিমা প্রকাশ করেছে। কৌষীতকী ঋষি পাপ-বিমোচন জন্য ত্রিসবন সূর্যোপাসনার বিধান দিয়াছেন। প্রাতঃ সবনে উদীয়মান ভাস্করের প্রতি সুগম্ভীর মন্ত্র বলতে হবে—'বর্গোঽসি পাপ্মানং মে বৃঙ্‌ধি।'—হে পাপ-বিনাশক, তুমি আমার পাপ বিনাশ কর। দ্বিপ্রহরে—যখন মরীচিমালীর কিরণজালে দিঙ্‌মণ্ডল প্রোজ্জ্বল, তখন মন্ত্র বলতে হবে—'উদ্বর্গোঽসি পাপ্মানং মে উদ্‌বৃঙ্‌ধি'—হে পাপের

মহৎ বিনাশক, তুমি উৎকৃষ্ট রূপে আমায় পাপ-রহিত কর। আর অস্তগমনশীল সূর্যের কিরণ-চ্ছটায় যখন পশ্চিমাকাশ রঞ্জিত, তখন ভক্তি-বিনম্র কণ্ঠে বলতে হবে—'সংবর্গোঽসি পাপ্মানং মে সংবৃঙ্ধি'—হে জ্যোতির্ময় দেব, তুমি পাপকে সমূলে বিনাশ কর। আমার পাপকে তুমি সম্যক্‌রূপে বিনাশ কর।

ঋষি বিশ্বামিত্র লোকোত্তরকে লোকজীবনে প্রতিষ্ঠা করতে যে চিন্ময়ী গায়ত্রীর অবতারণা করছিলেন—এই মানুষের কাছে দুর্মূল্য মণির মতো প্রভাসম্পন্ন হয়ে দেখা দিল—কণ্ঠে কণ্ঠে নিত্য গীত হয়ে সে মন্ত্র শূন্যতার বুকে পূর্ণতার ঐশ্বর্য নিয়ে এল। আধ্যাত্মিকতার প্রবল ব্যাপ্তিতে মানুষের চিত্তে আলোর নির্ঝর ঝরে প'ড়ল। গায়ত্রীর এই অন্তর্গূঢ় ব্যঞ্জনাকে নব নব গায়ত্রীতে পরিস্ফুট করবার চেষ্টা আমাদের দেশে হয়েছিল। বিশ্বামিত্রের গায়ত্রী সবিতার বন্দনা, সূর্যের বন্দনা নয়। সৌরোপাসক তাই সূর্য-গায়ত্রীর উদ্ভাবন করলেন।

তৈত্তিরীয় আরণ্যকে দেখা দিল আদিত্য-গায়ত্রী—'ভাস্করায় বিদ্মহে মহাদ্যুতিকরায় ধীমহি তন্নো আদিত্য প্রচোদয়াৎ'—আমি ভাস্করকে জানব—তাঁর মহাদ্যুতিকর তেজ ধ্যান করি, সেই আদিত্য আমাকে সত্যে, কল্যাণে এবং ধর্মে প্রবৃত্ত করুন। মৈত্রায়ণী সংহিতায় এল সূর্য-গায়ত্রী—'ভাস্করায় বিদ্মহে প্রভাকরায় ধীমহি তন্নো ভানু প্রচোদয়াৎ।'—সেই ভাস্করকে প্রণিধান করি, সেই প্রভাকরের ধ্যান করি—সেই সূর্য আমাদের ধীশক্তিকে প্রযোজিত করুন। তন্ত্রসারে বহুপরে এই গায়ত্রী নূতন রূপ নিয়েছে—পূর্বোক্ত দুটি মন্ত্রের মিলন সাধন করেছে।

'ওঁ আদিত্যায় বিদ্মহে, মার্তণ্ডায় ধীমহি তন্নঃ সূর্যঃ প্রচোদয়াৎ।' আমি আদিত্যকে অনুধাবন ক'রব, মার্তণ্ডের ধ্যান ক'রব, সেই সূর্য আমাদিগকে কর্তব্যে অটল করুন, ধীশক্তিতে স্বরাট্ করুন, অমৃতে উদ্বেল করুন।

এই সূর্যোপাসনা কেবল ঐহিক বা পারলৌকিক সুখলাভের জন্য নয়। ইহা আদিত্যমণ্ডলের অধিষ্ঠাতা পরমপুরুষের সেবা—তিনি দীপ্তিমান্ সূর্য আদিত্য। তন্ত্রসারের সূর্য-মন্ত্রে যাঁকে বলা হয়েছে—'ওঁ ঘৃণিঃ সূর্য আদিত্যঃ।' যাঁর সম্বন্ধে বলা হয়েছে—'মধু ক্ষরন্তি তদ্রসং সত্যং বৈ তদ্‌বলম্ আপো জ্যোতী রসোঽমৃতং ব্রহ্ম।' সেই পরমপুরুষের প্রেম-রস অনির্বচনীয় আনন্দ বহন করে, তার থেকে অজস্র ধারায় মধু ক্ষরিত হয়। সে রস সত্যের দ্যোতক, সত্যই সে রস, জল তার জ্যোতি, সে রস অমৃত ব্রহ্মস্বরূপ। এই উপাসনার ফলে মানুষ মর্ত্যলোকেই অমৃত হয়ে ওঠে।

রামায়ণ এবং মহাভারতের অন্তর্গত সূর্যস্তবের মধ্যেও আমরা সর্বাত্মক বিরাট্ রূপের সন্ধান পাই। পরবর্তীকালে ইরানে প্রচলিত সূর্যোপাসনা মগব্রাহ্মণগণ কর্তৃক ভারতে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হ'ত। এই সময়ে ভারতে যে-সব সূর্যমূর্তি তৈরি হয়েছিল, তাদের পায়ে বুট-জুতার মতো উচ্চ পদাবরণ ছিল - সে ইতিহাস অতিশয় কৌতূহলপ্রদ, কিন্তু এখানে সে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

দুর্ভাগ্যক্রমে সূর্যোপাসনা আজ আর প্রচলিত নেই। আজ আর কেহ ভাব-গদ্গদ ভক্তিতে উচ্চারণ করে না :

নমঃ সবিত্রে জগদেকচক্ষুষে
জগৎপ্রসূতিস্থিতিনাশহেতবে।
ত্রয়ীময়ায়াথ ত্রিগুণাত্মধারিণে
বিরিঞ্চিনারায়ণশঙ্করাত্মনে॥

সবিতাকে নমস্কার করি। যিনি জগতের একমাত্র চক্ষু, সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়হেতু, সত্ত্ব রজঃ ও

তমোগুণের ধারক, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবাত্মক ত্রয়ীময় সেই সূর্যদেবতাকে নমস্কার করি।

কালের গতি দুর্বার। পৃথিবীর ইতিহাসে সূর্যদেবতার প্রভাব ও প্রতিপত্তির পুরাণ-কথা পূর্ণভাবে লিখিত হ'লে এবং জ্ঞাত হ'লে আমরা এক অত্যাশ্চর্য ইতিহাস জানতে পারব। সেই বিলুপ্ত জটিল ইতিবৃত্তের দ্বারোদ্ঘাটন আমাদের সাধ্যের বাইরে—আমরা শুধু সূর্যপূজার গোপনতম দার্শনিক রহস্যটির বার্তা উল্লেখ করেই আমাদের বক্তব্য শেষ ক'রব।

সূর্য পুষ্টিত্তর—তাঁর এই পোষকরূপ পূষা দেবতায় বন্দিত হয়েছে। তিনি প্রদীপ্ত, মনোহর, প্রজ্ঞাসম্পন্ন ও সাধুগণের রক্ষক। তিনি অভয়তম পথে আমাদিগকে পরিচালিত করেন।

পূষেমা আশা অনু বেদ সর্বাঃ
সো অস্মাঁ অভয়তমেন নেষৎ।
স্বস্তিদা আঘৃণিঃ সর্ববীরো-
ঽপ্রযুচ্ছৎ পুর এতু প্রজানন্॥
—ঋগ্বেদ, ১০।১৭।৫

পরিপোষক সূর্য প্রাচ্যাদি সমস্ত দিককে পরিপূর্ণ ভাবে জানেন, কোন্ পথ সুগম, কোন্ পথ দুর্গম সবই তাঁর জানা, অতএব তিনি অভয়তম মার্গে আমাদিগকে পরিচালনা করুন, তিনি সর্বমঙ্গলদাতা, সর্বদীপ্তি-সমারোহে প্রোজ্জ্বল, অপ্রমত্ত, কর্মকুশল বীরপরিবৃত। তিনি আমাদের সম্মুখে উত্থান করুন, যাতে আমরা ভয়হীন হয়ে সত্য, শিব ও সুন্দরকে অবলম্বন করতে পারি। সূর্য মানুষের অন্তরে নবীন সম্ভাবনা জাগ্রত করেন। আমরা দ্বিজ হয়ে বিশ্বায়ু বিশ্বস্রষ্টা আদিত্যের আলোকে আলোকিত হয়ে উঠি। তিনি আমাদের মানবীয় চেতনায় আমাদের পরমলক্ষ্যকে প্রকটিত করেন—মানব-চেতনার স্তরে আমরা দিব্য চেতনায় বীর্যে বীর্যবান্ হয়ে অবিদ্যার ঘনান্ধকার নিশীথ রাত্রি থেকে মুক্তিলাভ করি। আমরাও সূর্যের মতো জ্যোতির্ময়ী উষসীর পশ্চাৎ ধাবন করি। আমাদের চৈতন্যের মানস-স্তরে দিব্য অতিমানসের উত্তরণের পূর্বে চাই প্রজ্ঞার জাগরণ, বিদ্যার উন্মীলন।

অন্য দেবতারা সূর্যের অনুগমন করেন। তাঁরই দিব্য আলোকে তাঁরই দিব্যক্রতু লাভ করেন। এ কথার অর্থ হ'ল এই যে, কল্যাণকর সত্য এবং ঋতের বিস্তারের সাথে সাথে মানুষের অন্যবিধ কল্যাণগুণের স্ফুরণ হয়। তখন এই অতিমানসের পরাশক্তিতে মানুষের জাগে অসীম প্রাচুর্য, অবাধ চিন্তায় অনন্ত প্রসার, যার ফলে সত্য সম্ভূতি, সত্য কর্ম এবং সত্য জ্ঞান তার কাছে সহজ হয়ে যায়। সম্ভূতি এবং সংবিৎ মানুষকে দেয় সত্য কর্মের ঠিকানা —মানুষ তখনই আপ্তকাম আত্মারাম হয়ে নিটোল আনন্দে উচ্ছল হয়ে ওঠে।

সূর্য তার পরম জ্যোতিতে আমাদের পার্থিব চেতনাকেই কেবল দিব্য চেতনার ভূমি করে না—আমাদের সম্যক্ সম্বুদ্ধ মনকে—'ত্রীণি রোচনানি' নামক দীপ্ত ত্রিলোকে সঞ্চরণ করায়।

তখনই মানুষের অন্তরে সচ্চিদানন্দ অমৃত-লোকের আবির্ভাব ঘটান। অতিমানসের অধিচেতনায় নিম্ন এবং উচ্চস্তরের সমস্ত দ্বন্দ্ব এবং সংঘর্ষের সমাধান হয়।

উত যাসি সবিতস্ত্রীণি রোচনোত সূর্যস্য রশ্মিভিঃ সমুচ্যসি।
উত রাত্রীমুভয়ত পরীয়স উত মিত্রো ভবসি দেব ধর্মভিঃ॥
উতেশিষে প্রসবস্য ত্বমেক ইদুত পূষা ভবসি দেব যামভিঃ।
উতেদং বিশ্বং ভুবনং বিরাজসি শ্যাবাশ্বস্তে সবিতঃ স্তোমমানসে॥
—৫।৮১।৪-৫

হে সবিতা, তুমি 'ত্রীণি রোচনানি'—তিন দীপ্ত ভুবন—ভূলোক, ভুবর্লোক এবং স্বর্গলোক পরিভ্রমণ কর। অথবা সূর্যের রশ্মির সাথে সম্মিলিত সত্য তিনটি রোচমান দ্যুতির মাঝে

তোমার প্রগতি—সূর্যকিরণ তোমাকে প্রকৃত ভাবে প্রকাশ করে। তুমি রাত্রিকে উভয়তঃ পরিবৃত কর, রাত্রি তোমার উভয় পার্শ্বে থাকে —তুমি মধ্যপথে সঞ্চরণ কর। সে রাত্রি অবিদ্যার তামসী রজনী এবং হে দেব, তুমি তোমার পুণ্যকর্মের ধর্মে আমাদের পরম মিত্র হও। মিত্র প্রেম ও আলোকের দেবতা—যখন তিনি তাঁর পরম ঐশ্বর্যে প্রকাশিত হন, তিনি আনন্দময় হয়ে আবির্ভূত হন। মিত্র যে আমাদের একান্ত সখা—সুখ, তৃপ্তি এবং আনন্দের দেবতা।

হে দেবতা, তুমি একাই সৃষ্টিশক্তি ধারণ কর, তুমি একাই শাশ্বত গোপ্তা, তোমার চলার পথে পথে সৃষ্টি ও স্বস্তি, শ্যাবাশ্ব তোমার জন্য স্তোত্র পাঠ করেন, কারণ তুমি এই ত্রিভুবন বিদ্যুৎ-ঝলকে চমকিত কর।

সূর্য আত্মশক্তি-উন্মেষের সহায়। তাঁরই প্রকাশের দ্যুতিতে আমরা আত্মার অমরত্বকে অন্তরে প্রত্যক্ষ করতে পারি। জড়ের জগৎই বিশ্বসত্তার সবখানি নয়, মানসোত্তর চেতনা-ভূমিতে যখন আমরা আরোহণ করি, তখনই উপলব্ধি করি—জড়ের মাঝে অনুস্যূত হয়ে এবং একে ছাপিয়ে অতীন্দ্রিয় আরও বহুলোক আছে।

সূর্যদেবের করুণায় আমরা এই তিন লোকে প্রবেশ করতে পারি। জন্মজন্মান্তরের মাধ্যমে জীবচেতনা অগ্রসর হয়ে চলেছে—এক চিন্ময় পরিণামের অভিমুখে। লোকোত্তর মহামানবের মাঝে আমরা স্পষ্ট অনুভব করি যে, মানসোত্তর অতিমানস শক্তি বার বার এই পৃথিবীর মাটির আধারে নেমে আসতে চাইছে।

এ আগমন কল্পনা নয়, স্বপ্ন নয়, মিথ্যা নয়। মানুষকে বৃহৎ হ'তে হবে। এ আকুতি তার প্রাণের মূলে। মনোময় মানুষের জগৎকে অতিক্রম ক'রে চিন্ময় মানুষের আবির্ভাব তাই মানুষের কামনার লক্ষ্য।

এই আবির্ভাবের সার্থকতা আসে অদ্বৈত-ভাবের পরিপূর্ণতায়। যজুর্বেদ বলেন :

যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি।

সূর্য একর্ষি, তিনিই দেখেন যে বহুর বিচিত্রতার অন্তরালে রয়েছে এক পরম ঐক্য। সূর্যের কাছে তাই প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদিগকে সেই কল্যাণতম রূপ দেখবার শক্তি দেন, আমরা যেন সেই অদ্বৈতবোধের আলোকে আনন্দিত হয়ে উঠি।

এইবার সূর্যসাধনার মর্ম কথাটি বলি—চেতনাকে অবিদ্যার সঙ্কোচ থেকে বিদ্যার বিপুলতায় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সাধককে প্রতি মুহূর্ত জপ করতে হবে—'আমি দেব, আমি চিন্ময়, আমি ব্রহ্ম, আমি নিত্যমুক্ত।' এই তপস্যার ফলে চেতনা বিশ্বময় ব্যাপ্ত হবে, বিশ্বকে অতিক্রম করবে এবং ব্যাবহারিক জীবনকে অসীমতার সুরে বাজিয়ে তুলবে।

এইভাবে নিজেকে ফুটিয়ে ব্যক্তির সঙ্গে বিশ্বের পরিপূর্ণ যোগাযোগ করতে হবে। তাকে সর্বাত্মভাবে সিদ্ধ করতে হবে। সমস্ত ভূতকে আপনার মধ্যে এবং সর্বভূতের মধ্যে আপনাকে দেখতে হবে।

তারপর চাই দিব্য রূপান্তর। চরিত্রের অকলঙ্ক সুচিন্তা এবং অখণ্ড আত্মসংযমে এক সমত্ব প্রকাশিত, সেই সমত্ববোধ দীপ্ত হলেই মানুষের হবে পরিপূর্ণ উপচয়।

তখন ভোগের প্রমত্ততাও নয়, দারিদ্র্যের দীনতাও নয় ; তখন জ্ঞানে ও প্রেমে রসোচ্ছল হয়ে আমরা পরম পরিপূর্ণতায় সার্থক ও সুন্দর হয়ে উঠব।

বিশ্বানি দেব সবিতঃ দুরিতানি পরাসুব
যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব।

—হে দেব সবিতা, তুমি সেই পুঞ্জীভূত পথের জঞ্জাল অপসারিত কর, যা কল্যাণ, যা সুন্দর, যা ভদ্র, তাই যেন আমরা পাই।

স্বামীজীর স্মৃতিকথা

ভক্ত ৺মন্মথনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

স্বামীজী দেখতে কেমন ছিলেন?

স্বামীজীর বহু ছবি আছে, এবং তা থেকে মোটামুটি একটা ধারণা হয়। কিন্তু মানুষকে দেখা এক, আর ছবিতে দেখা আর এক রকম। এক কথায় বলতে গেলে এ রকম মানুষ বড় দেখা যায় না। দেখলে মনে হ'ত, শুধু দেখতেই থাকি। তাঁর চলন-বলন সবই সুন্দর। জীবনে অনেক ভাল ভাল সাধু-সন্ন্যাসী দেখেছি। কারও কারও অলৌকিক ক্ষমতাও ছিল। কাশীর ত্রৈলঙ্গ স্বামী, এলাহাবাদের 'শাহ্‌জী' এবং কানপুরের নাগা বাবা—এই তিনজন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু স্বামীজীর মতো এমন আকর্ষণ কোথাও বোধ করিনি। আর এমন দুটি চোখও আর দেখলুম না!

স্বামীজীর রঙ তখন খুবই ফরসা ছিল। পায়ের দিক আবার বিশেষ ভাবে ফরসা। হাতের তেলো, পায়ের চেটো রক্তিমাভ ছিল। বাবুরাম মহারাজ খুব ফরসা ছিলেন, মহাপুরুষ মহারাজের রঙ স্বামীজীর চেয়েও ফরসা; কিন্তু স্বামীজীর বর্ণের মধ্যে এমন একটা ঔজ্জ্বল্য ছিল যে, তিনি যত না ফরসা ও সুন্দর ছিলেন, তার চেয়ে বেশী মনে হ'ত। সহোদর ভাইদের মধ্যেও স্বামীজীর রঙ সব চেয়ে বেশী উজ্জ্বল ছিল।

যাঁরা স্বামীজীর মাতাঠাকুরানীকে দেখেছেন, তাঁরা জানেন—স্বামীজীর সব ভ্রাতাই কতকটা মায়ের মুখাকৃতি পেয়েছিলেন। স্বামীজী যে গঠনকে (নিজ মুখের) মঙ্গোল-দেশীয় বলে নির্দেশ করতেন, তা সকল ভ্রাতার মধ্যেই পরিস্ফুট; তবে স্বামীজীর মুখের চোয়াল ও চিবুক কিছু অধিক পরিমাণে দৃঢ়তাব্যঞ্জক ছিল। চোখদুটি মায়েরই অনুরূপ; তবে স্বামীজীর চোখে যে কি ছিল, তা মুখে বলা যায় না। তাঁর চোখে নানা ভাব প্রকাশ পেত। কখনও স্থির, কখনও গম্ভীর, কখন চঞ্চল—এইরূপ নানা ভাব চোখে ফুটে উঠত। শুধু চোখে নয়, তাঁর সারা মুখে এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে মনের এই ভাবগুলি প্রকাশ পেত।

যখনই যে-কথা এবং যে-ভাব প্রকাশ করতেন, মনে হ'ত সেই ভাব ছাড়া আর সব ভাব তাঁর মন থেকে মুছে গেছে। এইজন্য তাঁর কথা উদ্ধৃত ক'রে আপাত-বিরোধী ভাব দেখানো যেতে পারে। যে-ক্ষেত্রে যাকে যে-কথা বলছেন, সেটুকু না বুঝলে শুধু তাঁর কথাগুলি তুলে দিলে ঠিক অর্থ হৃদয়ঙ্গম হয় না। 'নেড়া-নেড়ি' ব'লে কখনও কখনও তিনি বৈষ্ণবদের নিন্দা করেছেন বলা হয়, কিন্তু বৈষ্ণব ভাবকে তিনি নিজেই গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতেন। কিছু লোকের ব্যভিচারকেই নিন্দা করতেন। তন্ত্রের বামাচারকেও যথেষ্ট নিন্দা করেছেন। আবার কেউ তন্ত্রের নিন্দা করলে বামমার্গও যে উচ্চতম সিদ্ধির সোপান, তাও প্রমাণ ক'রে ছাড়তেন। এইজন্য তাঁর কথার ভাব বুঝতে হ'লে তাঁর নিজের অন্তরের গভীর অনুভূতির রাজ্যকে বাদ দিলে কিছু বোঝা যাবে না।

যখন যে-কথা বলতেন, সে ভাবগুলি যেন তাঁর ভাঙা শরীরেও চনমন ক'রে বেড়াত।

আমরা শুনেছি—তাঁর ভাবের আধিক্যই অকালে শরীর চলে যাবার অন্যতম কারণ। তবে প্রধান কারণ ছিল তাঁর অপূর্ব বক্তৃতা। শোনা যায়, বক্তৃতা দেবার সময় শ্রোতৃমণ্ডলীর মনকে সমষ্টিভাবে আকর্ষণ ক'রে নিজের বিরাট সত্তার মধ্যে গ্রহণ করতেন। যেমন যেমন তাঁর মন উর্ধ্ব থেকে উর্ধ্বতর ভাবরাজ্যে উঠতে থাকত, শ্রোতাদের মনও সেই ভাব অনুভব করতে থাকত। স্বামীজী বলতেন, তাতে তাঁর ভয়ানক রকম প্রাণ-শক্তির ব্যয় হ'ত। এই করেই তাঁর শরীর ভেঙেছিল।

তাঁর উচ্চতা ছিল প্রায় পাঁচ ফুট নয় ইঞ্চি। শরীরের গঠন বলিষ্ঠ ও ছাতি চওড়া ছিল, কিন্তু হাত-পা তাঁর খুব নরম ছিল। হাতের চেটোর উন্নত স্থানগুলি (*mounts*) বেশ পুষ্ট ছিল এবং রেখাগুলি ছিল গভীর ও রক্তিম। বৃহস্পতি, শনি প্রভৃতির মতো শুক্র ও চন্দ্রের ক্ষেত্রও ছিল উচ্চ। শুক্র-বন্ধনী (Girdle of Venus) সুস্পষ্ট ছিল। তাঁর হাড় চওড়া চওড়া ছিল—হাতের কব্জি এতখানি—বুকও এতখানি! অস্থি-সংযোগগুলি নিগূঢ় ছিল। এককালে কুস্তি করতেন—চেহারায় একটা বলিষ্ঠ দৃঢ়ভাবের ছাপ ছিল। কিন্তু পালোয়ানি চেহারা বলতে যেমন বুঝায়, তেমন ছিল না। বরং বাজু, আঙুলগুলি শুণ্ডাকৃতি (tapering) ও মসৃণ ছিল। পায়ের থেকে কোমরের ভাগ দীর্ঘ ছিল—হাতদুটি আজানু অর্থাৎ লম্বা ছিল। তাঁর নখগুলি রক্তিমাভ এবং অগ্রভাগ চতুষ্কোণাকৃতি ছিল।

স্বামীজীর সহানুভূতির দৃষ্টান্ত

একবার ট্রেনে যাচ্ছেন। একটি স্টেশনে গাড়ি থেমেছে। কানাই মহারাজ (পরে স্বামী নির্ভয়ানন্দ) এসে খোঁজ খবর নিচ্ছেন। একটি মুসলমান ফেরিওয়ালা চানাসিদ্ধ বিক্রয় করছে। স্বামীজী যে কম্পার্টমেন্টে ছিলেন, তার সামনে কয়েকবার আনাগোনা করছে। অমনি স্বামীজী ব্রহ্মচারীকে ডেকে বললেন, 'ছোলাসেদ্ধ খেলে বেশ হয়! বেশ স্বাস্থ্যকর জিনিস!' স্বামীজীর মনোভাব বুঝে ব্রহ্মচারী তাকে ডেকে একটি দোনা নিলেন। জিনিসটির দাম হয়তো এক পয়সা; কিন্তু স্বামীজী তাকে কিছু সাহায্য দিতে চান বুঝে ব্রহ্মচারী তাকে দিলেন একটি সিকি। স্বামীজী তাকে ডেকে জিগ্যেস করলেন, 'কিরে! কত দিলি?' ব্রহ্মচারী বললেন, 'চার আনা।' তিনি ব'লে উঠলেন, 'ওরে, ওতে ওর কি হবে? দে, একটা টাকা দিয়ে দে। ঘরে ওর বউ আছে, ছেলেপিলে আছে।' একটু পরে আবার বলছেন, 'আহা! আজ বোধ হয় বেশী কিছু হয়নি! তাই দেখছিস না, ফার্স্ট সেকেণ্ড ক্লাসের সামনে ফেরি করছে!' ছোলা অবশ্য কেনাই হ'ল, ওই পর্যন্ত! দাঁতেও কাটলেন না!

ওইটুকু ছিল তাঁর বিশেষত্ব। যখন যা ভাবতেন, তার অনেক গভীর পর্যন্ত ভাবতেন। আমরা দেখি: জিনিসটার কত দাম হওয়া উচিত। এক পয়সা কি দুই পয়সা! আচ্ছা, এক আনা দিয়ে দাও! তার জায়গায় চার আনা দিলে যথেষ্ট হ'ল মনে করি। কিন্তু স্বামীজী ভাবছেন: আ—হা! তার কত অভাব, কত পোষ্য! অন্ততঃ একটি দিনের জন্য তারা সকলে খেতে পাক।

দীন-দুঃখীকে দয়া করার ভাব এক-রকম। এ তা নয়। সামনে যাকে দেখতেন, নাড়ী-নক্ষত্র সব কথাই যে তাঁর মনে উঠত! এটা ছিল তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ক্ষমতা। এদিকে তাঁর মনটা ছিল কোমল—অতি স্নেহপরায়ণ! তাই

লোকের দুঃখে দুঃখী, ব্যথায় ব্যথী হয়ে পড়তেন। তাঁর প্রাণের এই 'আহা!' তাঁকে যে কতদূর ব্যথিত পীড়িত ক'রে তুলত, তা তাঁর সেবকরাই শুধু জানতেন।

কেউ রোগে ওষুধ পাচ্ছে না, এতটুকু সেবা কি যত্নের অভাবে কষ্ট পাচ্ছে—তার জন্য যাদের প্রাণ কাঁদত, তাদের তাই তিনি প্রাণ-ঢালা আশীর্বাদ করেছেন। এই ভাবটি যে শুধু তাঁরই ছিল তা নয়, তাঁর মধ্যে প্রকাশটা খুব বেশী বোঝা যেত। স্বামী অখণ্ডানন্দের মধ্যে এই দরিদ্রনারায়ণের সেবার ভাবটি খুবই ছিল। স্বামী বিজ্ঞানানন্দের মধ্যেও এই ভাব পরিস্ফুট ছিল, তবে তিনি ভাবগুলি খুব চেপে রাখতেন। তাঁকে দেখে হঠাৎ বোঝা যেত না—কি স্নেহ ও মাধুর্যপূর্ণ ছিল তাঁর অন্তঃকরণ। বাহির থেকে অনেক সময় কঠোর ব'লে মনে হ'ত। শেষের দিকে এই স্নেহ-ভালবাসার ভাবটি তাঁর খুবই দেখা গেছে। অযাচিত করুণার ধারায় সকলকে অভিষিক্ত ক'রে গেছেন।

একবার স্বামীজী স্টীমারে গোয়ালন্দ যাচ্ছেন; একটা নৌকোয় জেলেরা ইলিশ মাছ জালে তুলেছে। হঠাৎ বললেন, 'বেশ ভাজা ইলিশ খেতে ইচ্ছে হচ্ছে।' কানাই মহারাজ তাঁর কথার মানে বুঝতেন। খেতে ইচ্ছে তাঁর নিজের জন্য তো নয়, স্টীমারের সব খালাসীদের খাওয়াবার ইচ্ছে! সারেঙ দর ক'রে জানালো, এক আনায় একটি ইলিশ মাছ—তিনটি চারটিই যথেষ্ট! স্বামীজী অমনি বললেন, 'তবে! এক টাকার কেন্।' অঢেল মাছ হয়ে গেল। বড় বড় ইলিশ ষোলটি, তার উপর দু-চারটি ফাউ! স্টীমার এক জায়গায় থামানো হ'ল। স্বামীজী অমনি বললেন, 'পুঁইশাক হ'লে বেশ হ'ত, আর গরম ভাত!'

কাছেই গ্রাম। সেইদিকে কানাই মহারাজ গেলেন শাক সংগ্রহ করতে। একটি দোকানে চাল পাওয়া গেল। কিন্তু সেখানে কোন বাজার বসে না। এমন সময় একটি ভদ্রলোক বললেন, 'চলুন, পুঁইশাক আমার বাড়ির বাগানে আছে অনেক! তবে একটি শর্ত! স্বামীজীকে একটিবার দর্শন করাতে হবে।' এক ঝুড়ি পুঁই নিয়ে চললেন নিজেই মাথায় ক'রে। পরে (ফিরবার পথে) স্বামীজী তাঁকে কৃপা ক'রে দীক্ষা দিয়েছিলেন তাঁর অসীম ভক্তি ও অনুরাগ দেখে। ভক্তটি বলতেন, 'আমাকে কৃপা করবেন বলেই স্বামীজীর মাছ ও পুঁইশাক খাবার কথা মনে উঠেছিল। তা না হ'লে এ হেন সৌভাগ্য থেকে আজীবন বঞ্চিত থেকে যেতাম।'

আপাততঃ ছোট ছোট কথায় বা কাজে তাঁর সর্ব জীবের প্রতি যে গভীর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা, তা সর্বদা টের পাওয়া যেত না, কিন্তু এক এক সময় এইরূপ ঘটনায় তা ব্যক্ত হয়ে প'ড়ত।

স্বামীজী দীক্ষা দিতেন খুব কম

রাখাল মহারাজ ছিলেন মঠের অধ্যক্ষ। দীক্ষাপ্রার্থীদের তিনি মা-ঠাকরুনের কাছেই পাঠাতেন। স্বামীজীও নিজে প্রায় কাউকে দীক্ষা দিতেন না বললেই চলে। তাঁর কাছে দীক্ষা পেয়েছেন, এমন লোক আঙুলে গোনা যায়। এলাহাবাদে আমার বন্ধুদের মধ্যে এক ভক্তরাজ কাশীতে দীক্ষা পেয়েছিলেন আর হরেনবাবু মঠে গিয়ে দীক্ষা নিয়েছিলেন। ভক্তরাজ দীর্ঘকাল বিজ্ঞান মহারাজের কাছে ছিলেন। পরে ১৯২০ খৃঃ রাখাল মহারাজ কাশীতে তাঁকে চারুবাবু, কেদারবাবু প্রভৃতির সঙ্গে সন্ন্যাস দিয়েছিলেন। হরেনবাবু সন্ন্যাস নেননি, শেষ অবধি সাদা কাপড়েই থাকতেন, তবে তিনি সাধুভাবেই ছিলেন—বলতেন,

'স্বামীজী তো আমায় গেরুয়া দিয়ে যাননি, সাদা কাপড়েই থাকতে বলেছেন।' তিনি আজীবন ব্রহ্মচারী-ভাবেই কাটিয়ে দিলেন। জ্ঞান ব্রহ্মচারী বয়সে সব থেকে কনিষ্ঠ ছিলেন এবং একমাত্র তিনিই স্বামীজীর ত্যাগী শিষ্যদের মধ্যে এখন বর্তমান আছেন।

আমারই নামে আর এক 'মন্মথ' স্বামীজীর শিষ্য ছিলেন; তিনিও গৃহস্থ। শ্রীমন্মথ মুখোপাধ্যায়—কলকাতার লোক। এ ছাড়া আর যাঁরা গৃহস্থ শিষ্য ছিলেন, তাঁদের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়নি। শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী—যাঁকে স্বামীজী রহস্য করে 'বাঙাল' বলতেন, তাঁর দীক্ষার সময় আমি মঠেই ছিলাম। তিনি খুব বিদ্বান্ ও পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর বেশ একটা সহজ সখ্যভাব ছিল। আমরা সমীহ ক'রে দূরে দূরে থাকতাম। শরৎবাবুর সঙ্গে স্বামীজীও রঙতামাসা করতে ভালবাসতেন। তাঁর প্রতি স্বামীজীরও খুব স্নেহের ভাব ছিল। শরৎবাবু মাঝে মাঝে তর্ক করতে ভালবাসতেন, শাস্ত্রাদির জ্ঞানও তাঁর বেশ গভীর ছিল—স্বামীজীও তাঁকে খেপিয়ে দিয়ে বেশ মজা করতেন। তাঁর সঙ্গে অন্য গুরুভাইরাও মাঝে মাঝে যোগ দিতেন। শরৎবাবু সবদিন যেমন সহজভাবে গল্পগাছা করতেন, দীক্ষার দিন—দীক্ষা হয়ে যাবার পর যেন চুপচাপ হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি ভাবুক প্রকৃতির ছিলেন এবং তাঁর ভক্তি ভালবাসার জন্য মঠের সব মহারাজই তাঁকে স্নেহ ও প্রীতির চোখে দেখতেন।

উদ্যোগপর্বে কৃষ্ণকুন্তী-সংবাদ*

[বিদুলার উপাখ্যান]

অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরারি চক্রবর্তী

মহাভারতের উদ্যোগপর্বে হস্তিনাপুরে বিদুরের গৃহে আজ আমরা কৃষ্ণকুন্তী-সংবাদে দ্বিতীয় পর্যায় আলোচনা করছি। আমরা দেখেছি যে, শ্রীকৃষ্ণ ব্যর্থ-মনোরথ হয়ে কুরু-সভা ত্যাগ করলেন। উপপ্লব্যের পথে তিনি বিদুরের গৃহে তাঁর পিতৃস্বসা কুন্তীর সঙ্গে দেখা করতে এলেন, কুরুসভায় যাবার পূর্বেও একবার কুন্তীর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। কুন্তীর কি ব্যক্তব্য ছিল, তা শুনেছিলেন। আজ আবার প্রত্যাবর্তনের পূর্বে কুন্তীকে সব কথা ব'লে যাচ্ছেন।

কুন্তী সেদিন শ্রীকৃষ্ণকে ধর্মরক্ষা সম্বন্ধে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম কি, সে-সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছিলেন। কুন্তীর বাক্যে আমরা দেখি, সেদিন রুদ্রবীণা বেজে উঠেছিল, প্রত্যেকটি শব্দে কুন্তীর এই রুদ্রবীণা বারবার ঝঙ্কৃত হচ্ছে। শ্রীকৃষ্ণ অবশ্য এসে বললেন,

'উক্তং বহুবিধং বাক্যং গ্রহণীয়ং সহেতুকম্।
ঋষিভিশ্চ ময়া চৈব ন চাসৌ তদ্‌গৃহীতবান্॥'

—পিসিমা, অনেক ভাল কথা বলেছি, কেবল আমি বলিনি, ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ঋষিগণও সেই কথা বলেছেন। 'উক্তং বহুবিধং বাক্যং গ্রহণীয়ং সহেতুকম্'—হেতুযুক্ত বাক্য, গ্রহণযোগ্য বাক্য আমি বলেছি, ভারতবর্ষের ঋষিগণও বলেছেন, কিন্তু দুর্যোধন কিছুই গ্রহণ ক'রল না। এবার বলো তুমি, আমাদের কি কর্তব্য?

* রামকৃষ্ণ মিশন সংস্কৃতি-ভবনে (Institute of Culture) প্রদত্ত বক্তৃতার Tape-recording হইতে।

কুন্তী বলেছিলেন: কৃষ্ণ! আমার সেই ধর্মাত্মা পুত্র যুধিষ্ঠিরকে বোলো, 'ভূয়াংস্তে হীয়তে ধর্মো, মা পুত্রক বৃথা কৃথাঃ।' যুধিষ্ঠিরকে বোলো যে তার ধর্ম রক্ষিত হচ্ছে না, বোলো এই ক্লীববৎ আচরণের দ্বারা 'ভূয়াংস্তে হীয়তে ধর্মঃ' যুধিষ্ঠির তোমার ধর্ম লোপ পাচ্ছে। কেন? তাও বলেছিলেন কুন্তী।

'শ্রোত্রিয়ঃ সেবতে রাজন্ মন্দকস্তাবিপশ্চিতঃ
অনুবাকহতাবুদ্ধিঃ ধর্মং এবৈকমীক্ষতে।'

তুমি সাধারণ ব্রাহ্মণের মতো, সাধারণ পণ্ডিতের মতো শাস্ত্রবাক্য মুখস্থ ক'রে বুঝতে পারছ না, কর্তব্য কি। 'অনুবাকহতাবুদ্ধিঃ' বারবার আবৃত্তির দ্বারা তোমার বুদ্ধি বিফল হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং শাস্ত্রপাঠ বন্ধ ক'রে ক্ষত্রিয়ের যা ধর্ম, ক্ষত্রিয়ের যা আচরণ, সেই আচরণ অবলম্বন করো।

সেদিন কুন্তী তাঁর পুত্রগণকে উৎসাহিত করবার জন্য একটি প্রাচীন উপাখ্যান শ্রীকৃষ্ণের কাছে কীর্তন করেছিলেন। ভারতবর্ষের একটি অবিস্মরণীয় উপাখ্যান এই 'বিদুরার বা বিদুলার অনুশাসন'।

সিন্ধুদেশের রমণী বিদুরা বা বিদুলা। 'জগর্হে পুত্রমৌরসং বিদুরা নাম নারী তু সাধ্বী পতিব্রতা শুভা।' আবার আছে 'সাধ্বী'র পরিবর্তে 'সত্যা' কথাটি। 'সত্যা বিদুলা জগর্হে পুত্রমৌরসম্'—নিজের ঔরসজাতপুত্র সঞ্জয়কে তিরস্কার করেছিলেন, সঞ্জয়ের আচরণের নিন্দা করেছিলেন। সঞ্জয় সিন্ধুরাজের কাছে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে গৃহে এসে শয্যা গ্রহণ করেছে। 'নির্জিতং সিন্ধুরাজেন শয়ানং দীনচেতসম্' ঔরসং পুত্রং জগর্হে।

বিদুরা দেখলেন, বাড়িতে এসে পুত্র শয্যা গ্রহণ করেছে। বিদুরা সেদিন সেই পুত্রকে বলেছিলেন, 'উত্তিষ্ঠ হে কাপুরুষ, মা শেষ্বৈবং পরাজিতঃ'—হে কাপুরুষ, ওঠ! প্রথম কথাই 'উত্তিষ্ঠ হে কাপুরুষ মা শেষ্বৈবং পরাজিতঃ' আরও বলেছিলেন—

'অলাতং তিন্দুকস্যেব মুহূর্তমপি হি জ্বল।
মা তুষাগ্নিরিবানার্চির্ধূমায়স্ব জিজীবিষুঃ॥'

বলেছিলেন—'মুহূর্তং জ্বলিতং শ্রেয়ো ন তু ধূমায়িতং চিরম্।'

বিদুরা আরও বলেছিলেন—একটি শ্লোক, ভারি সুন্দর সে-শ্লোকটি—যে-পুত্র বংশের গৌরব রক্ষা করে না, কুলধর্মকে রক্ষা করে না, সে পুত্র তো পুত্র নয়, সে হচ্ছে 'সংখ্যাবর্ধনমাত্রং তু', 'রাশিবর্ধনমাত্রং তু'। সে কেবল সংখ্যা বাড়ায়, সেন্সাসে (census) তার নাম থাকতে পারে। 'রাশিবর্ধনমাত্রস্তু নৈব স্ত্রী ন পুনঃ পুমান্'—সে না স্ত্রী, না পুরুষ সে কেবল সংখ্যাবর্ধক।

একটি মায়ের পাঁচটি ছেলে। কোন ছেলেই যদি বংশের গৌরব রক্ষা না ক'রল, কোন ছেলেই যদি দেশের গৌরব রক্ষা না ক'রল, সে ছেলেতে কি প্রয়োজন? যে-কথা আমরা পঞ্চতন্ত্রে পড়েছিলাম—'কোঽর্থ পুত্রেণ জাতেন যো ন বিদ্বান্ ন ভক্তিমান্'—বিদুরাও সেই কথা বলছেন, এমন ছেলে দিয়ে কি হবে? সে কেবল সংখ্যাই বাড়ায়। আমার এতটি ছেলে হয়েছে বা এত ছেলে হয়েছিল—এ-কথা বলতে পারি, তেমন ছেলে আমি চাই না।

'যস্য বৃত্তং ন জল্পন্তি মনো বা মহদদ্ভূতম্।
রাশিবর্ধনমাত্রং তু নৈব স্ত্রী ন পুনঃ পুমান্॥
দানে তপসি শৌর্যে চ যস্য ন প্রথিতং যশঃ।
বিদ্যালাভেঽর্থলাভে বা মাতুরুচ্চার এব সঃ॥'

—যে-ছেলে দান করতে জানে না, যে ছেলের শৌর্য নেই, পরাক্রম নেই, যে ছেলের বিদ্যা নেই, সে ছেলে তো মাতৃগর্ভের রত্ন নয়—বিদুরা বলছেন, 'মাতুরুচ্চার এব সঃ।' নীলকণ্ঠ

টীকায় বলেছেন, 'উচ্চার' শব্দের অর্থ 'বিষ্ঠা'। কত বড় গাল! সে তো মাতৃগর্ভের রত্ন নয়, সে ছেলে মায়ের উদরের বিষ্ঠা!

আজকের দিনে দেশের সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে কুন্তীর এই কথা এবং বিদুরার এই বাক্য বিশেষরূপে প্রণিধানযোগ্য। আরও বলেছিলেন বিদুরা—আমি গর্দভী নই, আমার চরিত্রে 'খরী-বাৎসল্য' নেই। গর্দভী তার অযোগ্য সন্তানকে যে ভালবাসে, যে স্নেহ করে, তাকে বলে 'খরী-বাৎসল্য'। তাই বিদুরা বলেছিলেন, 'খরীবাৎসল্যমাহুস্তন্নিঃসামর্থ্যম-হেতুকম্'—অহেতুক খরী-বাৎসল্য গর্দভীর থাকে। সে বাৎসল্যের কোন হেতু নেই, অক্ষমা গর্দভী না বুঝে, না জেনেই নিজের সন্তানকে ভালবাসে। তাই বিদুরা বলেছিলেন, আমার চরিত্রে 'খরী-বাৎসল্য' নেই, তুমি যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে প্রাণত্যাগ কর, বংশের মর্যাদা রক্ষার জন্য দেশের গৌরব রক্ষা করবার জন্য তুমি যুদ্ধ কর। 'উত্তিষ্ঠ হে কাপুরুষ, মা শেষ্বৈবং পরাজিতঃ'—এই ছিল বিদুরার অনুশাসন।

মহাভারতে উদ্যোগপর্বে এই উপাখ্যানকে বলা হয়—'বিদুরাপুত্রানুশাসনম্'—পুত্রের প্রতি বিদুরার অনুশাসন—একমাত্র পুত্র সঞ্জয়। বার বার বলেছিলেন সেই কথা বিদুরা, 'অন্বর্থনামা ভব মে পুত্র মা ব্যর্থনামকঃ'—পুত্র, তোমার নামের মর্যাদা রক্ষা কর, অনেক আশা ক'রে তোমার নাম রেখেছিলাম 'সঞ্জয়', তুমি জীবনের সর্বক্ষেত্রে সম্যক্‌রূপে জয়ী হবে। ব্যর্থ ক'রো না নিজের নাম।

তাই কুন্তী কৃষ্ণকে বলছেন,

'নিয়ন্তারমসাধূনাং গোপ্তারং ধর্মচারিণাম্।
তদর্থং ক্ষত্রিয়া সূতে বীরং সত্যপরাক্রমম্॥'

ক্ষত্রিয়-নারী কি জন্য সন্তান প্রসব করে? ক্ষত্রিয়া নারী এমন সন্তান কামনা করে, যে সন্তান অসাধুগণকে দমন করবে। 'নিয়ন্তার-মসাধূনাম্, গোপ্তারং ধর্মচারিণাম্'—যারা ধর্মচারী তাদের রক্ষা করবে, তারা সত্যনিষ্ঠ হবে, এইজন্য ক্ষত্রিয়া নারী সন্তান কামনা করেন। কৃষ্ণ, তুমি আমার পুত্র যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বোলো।

তারপর আবার কুন্তী বলছেন, আমার পুত্র অর্জুনকে বোলো, অর্জুন যখন জন্মগ্রহণ করে, হিমালয়ের উত্তরে পারিপাত্রে তখন আকাশবাণী হয়েছিল, আমি সেই আকাশবাণী শুনেছিলাম:

'অথান্তরীক্ষে বাকাশে দিব্যরূপা মনোরমা'
কি সেই কথা—কি সেই আকাশবাণী—
'সহস্রাক্ষসমঃ কুন্তি ভবিষ্যত্যেষ তে সুতঃ।
এষ জেষ্যতি সংগ্রামে কুরূন্ সর্বান্ সমাগতান্।'

কুন্তি! তোমার এই পুত্র অর্জুন ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমী, 'সহস্রাক্ষসমঃ', আর এই পুত্র সমস্ত কুরুবাহিনী একা জয় করবে। 'পুত্রস্তে পৃথিবীং জেতা যশশ্চাস্য দিবং স্পৃশেৎ।' তোমার এই পুত্র অর্জুন সমগ্র পৃথিবী জয় করবে, এর যশ আকাশস্পর্শী হবে—স্বর্গস্পর্শী হবে।

'পুত্রস্তে পৃথিবীং জেতা যশশ্চাস্য দিবং স্পৃশেৎ।
হত্বা কুরূন্ গ্রামজন্যে বাসুদেবসহায়বান্।
ভ্রাতৃভিঃ সহিতঃ শ্রীমাংস্ত্রীন্ মেধানাহরিষ্যতি॥'

বাসুদেবসহায়বান্ অয়ম্ অর্জুনঃ—এই অর্জুন বাসুদেবের সাহায্যে সমস্ত কুরুবাহিনীকে পরাজিত করবে এবং তিনটি বৃহৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করবে। কৃষ্ণ! সে আকাশবাণীর মর্যাদা কোথায় রক্ষিত হচ্ছে?

পরম আর্তির সঙ্গে, বেদনার সঙ্গে কুন্তী এই প্রশ্ন করছেন কৃষ্ণকে—বলছেন, ধর্ম কি আছে কৃষ্ণ? যদি ধর্ম থাকে, নিশ্চয়ই আকাশবাণী সফল হবে। 'ধর্মশ্চেদস্তি বার্ষ্ণেয় তথা সত্যং ভবিষ্যতি।' আমি এবার পরীক্ষা

ক'রব, ধর্ম আছে কিনা। যদি ধর্ম থাকে তা হ'লে এ আকাশবাণী নিশ্চয়ই সত্য হবে। এ-কথা আমি বিশ্বাস করি, 'নমো ধর্মায় মহতে ধর্মো ধারয়তি প্রজাঃ'—আমার এখনও বিশ্বাস আছে, ধর্ম হচ্ছে এই পৃথিবীতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সর্বাপেক্ষা মহৎ বস্তু এবং এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ধর্মে বিধৃত হয়ে আছে।—এটা মহাভারতের খুব বড় কথা।

অর্জুনও একদিন এই কথাই বলেছিলেন যে, আমরা এত কষ্ট পেলাম, আমরা এত সহ্য করেছি, আমরা সত্যের জন্য এত তপস্যা করলাম, এর পরে যদি হেরে যাই, তা হ'লে মনে ক'রব, 'ধর্মাদধর্মশ্চরিতো গরীয়ান্'। তা হ'লে মনে ক'রব, ধর্ম ব'লে কিছু নেই। ধর্ম অপেক্ষা অধর্মই বড়, 'ধর্মাদধর্মশ্চরিতো গরীয়ান্ ততো ধ্রুবং নাস্তি কৃতং ন সাধু' মনে ক'রব এ পৃথিবীতে ধ্রুব ব'লে কোন বস্তু নেই এবং সাধু কর্মের কোন পুরস্কার নেই।

কুন্তীও সেই কথা বলেছেন, 'ধর্মশ্চেদস্তি বার্ষ্ণেয় তথা সত্যং ভবিষ্যতি।' আর উপপ্লব্যে গিয়ে আমার দুই ছেলে ভীম এবং অর্জুনকে একসঙ্গে ডেকে আমার এই শেষ কথা বোলো—'যদর্থং ক্ষত্রিয়া সূতে তস্য কালোঽয়মাগতঃ' ক্ষত্রিয়-নারী যেজন্য সন্তান প্রসব করে, তা সপ্রমাণ করার কাল আজ সমুপস্থিত।

এ-রকম উদ্দীপনাময়ী বাণী আমরা সচরাচর শুনি না। কুন্তীর রুদ্রবীণা—'যদর্থং ক্ষত্রিয়া সূতে তস্য কালোঽয়মাগতঃ।' আজ সেই সময় উপস্থিত, সপ্রমাণ করো ভীম অর্জুন, যে আমি বীর সন্তান প্রসব করেছি কি না।

মাদ্রীপুত্র নকুল ও সহদেব, তাদের বোলো যে, ক্ষত্রিয় কখনও পরের মুখাপেক্ষী হয় না, ক্ষত্রিয় তার বীর্যের দ্বারা, তার শৌর্যের দ্বারা পরাক্রমের দ্বারা সমস্ত বস্তু অর্জন ক'রে ভোগ করে। বোলো সে-কথা 'বিক্রমেণার্জিতান্ ভোগান্ বৃণীতং জীবিতাদপি।'—বিক্রম প্রকাশ ক'রে জীবনের যা ভোগ্যবস্তু তাকে আহরণ কর।

আবার বলেছেন এক দুঃখের কথা, কুন্তী সে কথা কিছুতেই ভুলতে পারেন না; দ্রৌপদীর লাঞ্ছনার কথা কুরুসভায়। প্রথম যখন কৃষ্ণ গিয়েছিলেন, তখনও বলেছিলেন যে, আমার সমস্ত পুত্র অপেক্ষা প্রিয়তরা দ্রৌপদী, আমার স্নুষা—আমার পুত্রবধূ দ্রৌপদী, সেই দ্রৌপদী

'যৎ স্নুষা বৃহতী শ্যামা সভায়াং রুদতী তদা।
অশ্রৌষীৎ পরুষা বাচস্তন্মে দুঃখতরং মহৎ ॥'

সেই কুরুসভায় ক্রন্দন করছে দ্রৌপদী, আর দ্রৌপদী লাঞ্ছিতা হচ্ছে দুঃশাসনের হস্তে, তাকে কটুবাক্য বলছে দুঃশাসন—কর্ণ। এর চেয়ে আর দুঃখের কি থাকতে পারে?

'স্ত্রীধর্মিণী বরারোহা ক্ষত্রধর্মরতা সদা।
নাধ্যগচ্ছৎ তদা নাথং কৃষ্ণা নাথবতী সতী ॥'

সতী সাধ্বী কৃষ্ণা—কুরুসভায় কোন সাহায্য সে পেল না, অনাথার মতো সে রোদন করতে লাগল। কোন বীরপুরুষ তাকে সাহায্য করবার জন্য এগিয়ে এল না কুরুসভায়!

ঐ অর্জুনকে বোলো 'দ্রৌপদ্যাঃ পদবীং চর' এই একটি কথা অবিস্মরণীয়, আর কোন বিচার ক'রো না, আর কোন কথা ভেবো না, দ্বিধা ক'রো না 'দ্রৌপদ্যাঃ পদবীং চর'—দ্রৌপদী যা বলেছেন, সেই কথা শোন। দ্রৌপদীর যা মত, সেই মতের অনুসরণ কর।

কুন্তী শেষে বলেছিলেন, 'অরিষ্টং গচ্ছ পন্থানং পুত্রান্ মে পরিপালয়'—তোমার যাত্রা বিঘ্নরহিত হোক, তুমি কুশলে উপপ্লব্যে পৌঁছাও, আমার পুত্রগণকে রক্ষা কর, সদুপদেশ দাও।

'অভিবাদ্যাথ তাং কৃষ্ণঃ কৃত্বা চাভিপ্রদক্ষিণম্।
নিশ্চক্রাম মহাবাহুঃ সিংহখেলগতিস্ততঃ ॥'

এর পর সিংহখেলগতি কৃষ্ণ পৃথাকে—কুন্তীকে প্রণাম ক'রে তাঁকে প্রদক্ষিণ ক'রে বিদুরের গৃহ থেকে বহির্গত হলেন।

'বিচার-সাগর'-পরিচয়

শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায়

'বিচার-সাগর' হিন্দী ভাষায় রচিত বেদান্ত-শাস্ত্রের একখানি সংগ্রহ-গ্রন্থ। ভারতবর্ষের হিন্দী ভাষাভাষী অঞ্চলে এই গ্রন্থের বিশেষ সমাদর। এর বিচার-প্রণালা অতীব সুন্দর ও দার্শনিক তত্ত্বে পরিপূর্ণ। গ্রন্থকার মহাত্মা নিশ্চল দাস বেদান্ত-শাস্ত্র ও তার পূর্ববর্তী কাল পর্যন্ত বেদান্ত সম্বন্ধে রচিত যাবতীয় প্রকরণ-গ্রন্থ পাঠ ক'রে এবং স্বীয় সাধনলব্ধ জ্ঞান দ্বারা পঠিত বিদ্যাকে আয়ত্ত ক'রে অল্পসংস্কৃত-জানা ব্যক্তিদিগের জন্য এই অপূর্ব 'বিচার-সাগর' গ্রন্থ হিন্দী ভাষায় রচনা করেছেন। অদ্বৈত বেদান্তের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করবার জন্য লেখককে প্রসঙ্গক্রমে সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, মীমাংসা, বৌদ্ধ, জৈন ইত্যাদি সর্বপ্রকার দার্শনিক মত আলোচনা করতে হয়েছে।

১৭৯২ খৃঃ পঞ্জাব প্রদেশে মহাত্মা নিশ্চল দাস জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ৺কাশীধামে শ্রীকাকারাম শাস্ত্রী নামক জনৈক মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিতের নিকট বেদান্তের যাবতীয় গ্রন্থই পাঠ করেন। নিশ্চল দাসের অতুলনীয় প্রতিভা ও শাস্ত্রী মহাশয়ের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও শিক্ষাদান-প্রণালী মিলিত হয়ে নিশ্চল দাসকে এই গ্রন্থ-প্রণয়নে এমনই যোগ্যতা দান করেছিল যে, তার ফলে 'বিচার-সাগর' সর্ববাদি-সম্মত শ্রেষ্ঠ বেদান্ত-বিচার-গ্রন্থরূপে গণ্য হয়েছিল। আজও এই গ্রন্থখানির খ্যাতি চতুর্দিকে বিঘোষিত হচ্ছে।

বেদান্তজ্ঞানের মূর্ত বিগ্রহস্বরূপ স্বামী বিবেকানন্দ এই গ্রন্থ সম্বন্ধে যা বলেছেন, তা এর শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে বিশেষ প্রমাণ। তিনি বলেছেন: 'Vichar Sagar'—the book has more influence in India than any that has been written in any language within the last three centuries.'—Reply to the Madras Address. অর্থাৎ ভারতে তিন শতাব্দী ধরে যত ভাষায় যত গ্রন্থ লিখিত হয়েছে, সকলের অপেক্ষা এই 'বিচার-সাগর' গ্রন্থের প্রভাব ভারতীয় জনসমাজে সর্বাধিক।

খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীতে জ্ঞানী গুরু আচার্য শঙ্করের বেদান্ত-প্রচারের পর বেদান্ত-আলোচনায় এক যুগান্তর এসে উপস্থিত হয়। তাঁর প্রচারিত মহান্ অদ্বৈতবাদের প্রকৃত মর্ম অবধারণে অসমর্থ অপরাপর সম্প্রদায়-ভুক্ত পণ্ডিতগণ অদ্বৈতবাদ-খণ্ডনকল্পে এক একবার গ্রন্থ-রচনায় মনোযোগী হন, আবার তাঁদের মতবাদ খণ্ডনের জন্য অদ্বৈতবাদী আচার্যগণ তাঁদের ক্ষুরধার বুদ্ধি ও অকাট্য যুক্তি-সহায়ে বহু গ্রন্থ রচনা করেন, সেই গ্রন্থগুলি ভারতবর্ষের অমূল্য সম্পদ্। ইতিহাস পর্যালোচনা ক'রে আমরা দেখি যে, ৮ম ও ৯ম শতাব্দীতে আচার্য শঙ্করের শিষ্য পদ্মপাদাচার্য ও সুরেশ্বরাচার্য তাঁদের সুবিখ্যাত গ্রন্থাদির দ্বারা আচার্যের মতকে সাধারণের সহজবোধ্য করার জন্য লেখনী ধারণ করেছেন।

নিশ্চল দাস তাঁর সময় পর্যন্ত রচিত যাবতীয় পুস্তক আলোচনা করেছিলেন ও স্বয়ং সাধন-সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন ব'লে তাঁর 'বিচার-সাগর' গ্রন্থ এত সারবান্ ও এত বিখ্যাত।*

---

* 'বিচার-সাগরে' নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির উল্লেখ আছে: উপনিষৎ ও গীতার শাঙ্কর ভাষ্য, সংক্ষেপ-শারীরক, যোগ-বাশিষ্ঠ, সর্বসিদ্ধান্ত-সংগ্রহ, উপদেশ-সাহস্রী, অপরোক্ষানুভূতি, বোধসার, নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি, স্বারাজ্যসিদ্ধি, ভামতী, বৃত্তিপ্রভাকর, বিদ্যার্ণবতন্ত্র, খণ্ডনখণ্ডখাদ্য, পঞ্চদশী, পঞ্চীকরণ, সিদ্ধান্তলেশ, চিৎসুখী, বেদান্তসার, সর্বদর্শন-সংগ্রহ, মুক্তাবলী, অদ্বৈত-দীপিকা, সিদ্ধান্তবিন্দু, বেদান্তকল্পলতিকা, অদ্বৈতসিদ্ধি, বিবরণ, বেদান্তপরিভাষা ইত্যাদি।

শিষ্য ও গুরুর প্রশ্নোত্তরচ্ছলে বেদান্তোক্ত বিষয়গুলি এই গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। গ্রন্থখানি সাতটি 'তরঙ্গে' বা অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম ও দ্বিতীয় তরঙ্গে গ্রন্থের উদ্দেশ্য ও শ্রেষ্ঠত্বের হেতু, অন্তর্মল দূরীকরণের উপায়, সাধনপ্রসঙ্গ ও অধিকারী, বিষয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজন আলোচিত হয়েছে।

তৃতীয় তরঙ্গে গুরু ও গুরুভক্তি, ব্রহ্মজ্ঞের বাণী, গুরুসেবা ও তার ফল এবং শিষ্যের কর্তব্য প্রভৃতি আলোচিত। চতুর্থ তরঙ্গে জীবের স্বরূপ, আনন্দ কোথায়, অনির্বচনীয়-খ্যাতি, অধ্যাসবাদ, বিবর্তবাদ, জগতের আধার ও দ্রষ্টা, জগতের নিবৃত্তি ও মোক্ষের সাধন, ভেদবাদ ও চার প্রকার আকাশের দৃষ্টান্তে সমস্যা সমাধান প্রভৃতি বর্ণিত। পঞ্চম তরঙ্গে মহর্ষি বাল্মীকি- ও ব্যাস-সম্মত মত, অজ্ঞান-পরিহারের উপায়, মিথ্যা জগতের উৎপত্তিক্রম, মায়া ও ঈশ্বর, জীব, সৃষ্টির অনাদিত্ব ও প্রলয়, ওঁকার-তত্ত্ব, সগুণ উপাসনা ও নিষ্কাম কর্ম প্রভৃতি আলোচিত। ষষ্ঠ তরঙ্গে স্বপ্নের দৃষ্টান্ত, চৈতন্য ও জ্ঞান, আত্মা ও আনন্দ, বৈরাগ্য, লক্ষণা, আভাসবাদ প্রভৃতি আলোচিত।

সপ্তম ও শেষ তরঙ্গে তত্ত্বজ্ঞের ব্যবহার, সমাধি, জীবন্মুক্তি, প্রারব্ধ, সাকার উপাসনা, ব্রহ্মলোক ও বিদেহ-মুক্তি, নামরূপের নানাত্ব, সাম্প্রদায়িক বিরোধ-পরিহার, পুরাণের তাৎপর্য ও বেদের প্রমাণ প্রভৃতি আলোচিত।

বিষয়-পরিচয়

গ্রন্থকর্তা বলেন, যাঁরা সংস্কৃত জানেন না, তাঁদের শাস্ত্রজ্ঞানতৃষ্ণা মেটানোর জন্যই এই গ্রন্থ রচিত। হিন্দীতে গ্রন্থখানি লিখিত হওয়ার উদ্দেশ্যই এই। এই গ্রন্থে আত্মজ্ঞানলাভের জন্য প্রয়োজনায় যাবতীয় বিচার লিপিবদ্ধ হয়েছে ও বেদান্ত-সিদ্ধান্তের কোন বিরুদ্ধ-কথা এতে নেই। এইজন্য এটি সমুদয় ভাষাগ্রন্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং এই জন্যই এর 'বিচার-সাগর' নামকরণ হয়েছে।

অন্তঃকরণের মল তিন প্রকার: (১) প্রথম—ভোগবাসনা, দূর করার সাধন নিষ্কাম কর্ম। (২) দ্বিতীয়—চিত্তচাঞ্চল্য, দূরীভূত হয় উপাসনা দ্বারা এবং (৩) তৃতীয়- অজ্ঞান, দূর করার উপায় জ্ঞানার্জন।

জ্ঞানলাভার্থ সাধন চার প্রকার: (১) বিবেক অর্থাৎ আত্মা অবিনাশী ও অচল এবং জগৎ বিনাশশীল ও চঞ্চলস্বভাব—এই ধারণা। এই বিবেক বা নিত্যানিত্য-বস্তুবিবেক সকল প্রকার সাধনের মূল। (২) বৈরাগ্য অর্থাৎ জাগতিক ও স্বর্গীয় ভোগ্য বস্তুতে বিরাগই দ্বিতীয় সাধন। (৩) তৃতীয় সাধন—ষট্‌সম্পত্তি: শম বা মন-নিরোধ; দম বা বাহ্যেন্দ্রিয়-নিরোধ; শ্রদ্ধা অর্থাৎ গুরু ও বেদান্ত-বাক্যে বিশ্বাস; সমাধান বা মনের বিক্ষেপ-নাশ; উপরতি বা বিষয়-বিমুখতা; তিতিক্ষা অর্থাৎ সহনশীলতা। (৪) চতুর্থ সাধন—মুমুক্ষুতা। এই চার প্রকার সাধন-সম্পন্ন সাধক শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন এবং 'তৎ' ও 'ত্বং' পদার্থের বিচারদ্বারা মহাবাক্যের অর্থবোধ ক'রে যথার্থ জ্ঞান লাভ করেন। এইগুলি জ্ঞানের অন্তরঙ্গ সাধন এবং যাগযজ্ঞাদি বহিরঙ্গ সাধন-মাত্র।

জীব ও ব্রহ্মের একতা এই গ্রন্থের 'বিষয়'। 'ব্রহ্ম আছেন' বা 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' এইরূপ বাক্যগুলি থেকে পরোক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হয়। 'অহং ব্রহ্মাস্মি' বা 'তত্ত্বমসি'—এইরূপ বাক্যগুলিকে 'মহাবাক্য' বলে এবং এগুলি থেকে অপরোক্ষ জ্ঞান হয়। প্রতিপাদ্য ও প্রতিপাদকের মধ্যে যে সম্বন্ধ, তা এই গ্রন্থ ও ব্রহ্মের মধ্যে 'সম্বন্ধ'। অনর্থ নিবৃত্তি ও পরমানন্দ-প্রাপ্তি বা মোক্ষ এই গ্রন্থের 'প্রয়োজন'। ব্রহ্ম নিত্যসুখস্বরূপ এবং ব্রহ্ম-ভিন্ন বস্তু-মাত্রই দুঃখের

সাধন। নিজ স্বরূপ-সম্বন্ধে অজ্ঞতাই দুঃখের হেতু। স্বরূপের অজ্ঞান স্বরূপের জ্ঞান ব্যতীত দূরীভূত হয় না। জ্ঞান-লাভের পরম সহায়ক ব'লে জিজ্ঞাসু ব্যক্তিমাত্রেরই এই গ্রন্থপাঠে প্রবৃত্তি হবে, তবে বিষয়সুখে মগ্ন ব্যক্তির হবে না। গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় তরঙ্গে আলোচ্য বিষয়ের সার কথা এই।

এইবার **তৃতীয়** তরঙ্গের সারকথা আলোচনা করা যাক। যে মহাপুরুষ জীব ও ব্রহ্মের অভেদজ্ঞান লাভ করেছেন, তিনিই গুরু। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ ভিন্ন অপর কেহই গুরুপদ-বাচ্য নন। ব্রহ্মবিদ্‌ই গুরু। যিনি ব্রহ্মবিৎ, তিনি ব্রহ্মস্বরূপ এবং তাঁর বাণীই বেদ। সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ না হ'লে যে তা বেদতুল্য হয় না, এরূপ নয়; যেহেতু ব্রহ্মবিৎ গুরুর সংস্কৃত ভিন্ন প্রাকৃত ভাষার দ্বারাও মুমুক্ষু শিষ্যের জগদ্ভ্রম দূর হয়। এই কারণে তাঁর শ্রীমুখ-নিঃসৃত ভাষাই সংস্কৃতে লিপিবদ্ধ বেদবাক্যতুল্য মর্যাদা-সম্পন্ন। শাঙ্কর সম্প্রদায়ের সঙ্গে বেদান্তদর্শন-প্রণেতা ব্যাসদেবের গুরু-পরম্পরা সম্বন্ধ আছে। এই সম্প্রদায়ের আদি-ঋষির নাম মহর্ষি বশিষ্ঠ। গুরুভক্তি ভিন্ন কোন প্রবীণ ব্যক্তিও ঈশ্বর লাভ বা আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারেন না। গুরুর উপর একান্ত-নির্ভর না হ'লে জ্ঞান হয় না। ঈশ্বর-সেবা অদৃষ্ট ফলের জনক এবং গুরুসেবা দৃষ্ট ও অদৃষ্ট উভয়বিধ ফলের জনক। এই কারণে ঈশ্বর-সেবার পূর্বে গুরুসেবা। বস্তুতঃ গুরু ও ইষ্টে অভেদ-জ্ঞান করাই আবশ্যক। স্বয়ং ঈশ্বরই গুরুরূপে আবির্ভূত হন। ঈশ্বরেরই এক রূপ গুরুমূর্তি। গুরুর শ্রীমূর্তি হৃদয়ে ধ্যান করতে হয়। ভগবানের উপর যেরূপ প্রেম, গুরুর উপরও সেইরূপ প্রেম-সম্পন্ন হ'তে হয়। গুরুসেবায় দুটি ফল: (১) শ্রীগুরুর প্রসন্নতা (২) অন্তঃকরণ-শুদ্ধি। ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তিই গুরু হ'তে পারেন। যাজ্ঞবল্ক্য, উদ্দালক প্রভৃতি অনেক গৃহস্থও ব্রহ্মবিদ্‌ ব'লেই আচার্য হয়েছিলেন।

প্রশ্নোত্তর

চতুর্থ তরঙ্গ হ'তে প্রশ্নোত্তরে তত্ত্বকথার আলোচনা আরম্ভ হয়েছে। এই তরঙ্গের প্রথম প্রশ্ন: পরমানন্দ-লাভের উপায় কি?

উত্তর: জীব স্বয়ং পরমানন্দ-স্বরূপ। তিনি নিত্য, অবিনশ্বর, চিৎ, ব্রহ্মস্বরূপ। এখানে বিবেচ্য, এই উত্তর সর্বোচ্চ অধিকারীর জন্য। সাধারণ মানুষ এই উত্তরের মর্ম অবধারণ করতে কখন সক্ষম নয়।

দ্বিতীয় প্রশ্ন: বিষয়ের সম্বন্ধ-জন্য কি আত্মাতে আনন্দ বোধ হয়?

উত্তর: বিষয়ে আনন্দ নেই। অভিলষিত বস্তু লাভ করলে বুদ্ধি কিছুক্ষণের জন্য বিক্ষেপ-শূন্য হয় ও বুদ্ধির ঐ শান্ত অবস্থায় চিত্তে আত্মার স্বরূপভূত আনন্দের প্রতিবিম্ব পড়ে। কিন্তু ক্ষণকাল পরে আনন্দের প্রতিবিম্বে ভ্রমোৎপাদিকা বুদ্ধি হয়, অর্থাৎ তখন বিষয়কে আনন্দ ব'লে ভ্রম হয়, মনে হয় বিষয় হতেই আনন্দ-লাভ হয়েছে। বিষয়ে যে আনন্দ নেই, সে বিষয়ে কয়েকটি যুক্তি:

(১) যখন একটি বিষয় লাভ ক'রে এক ব্যক্তির আনন্দ হয়, তখন দ্বিতীয় বিষয় লাভের পর তাঁর ঐ প্রথম বিষয়ে আর কেন পূর্বের ন্যায় আনন্দ হয় না?

(২) বহুকাল পরে প্রিয় ব্যক্তিকে প্রথম দর্শনে যে আনন্দ হয়, পরে তাকে দেখলে সেরূপ কেন হয় না?

(৩) বিষয় যদি সুখের হেতু হয়, তা হ'লে সমাধিকালে বিষয় না থাকায় তখন যোগানন্দ উপলব্ধ হওয়ার সম্ভাবনা না থাকাই উচিত।

(৪) সুষুপ্তিকালে যে আনন্দের অনুভূতি হয়, তাও উক্ত কারণে হওয়া সঙ্গত হয় না।

(৫) আনন্দ যদি বিষয়েই থাকে তো একই বিষয় সকলেরই আনন্দের কারণ হওয়া উচিত। কিন্তু দেখা যায়, একই বিষয় হ'তে একের সুখ ও অপরের দুঃখ হয়ে থাকে। ব্যাঘ্রী তার শাবকদের কাছে সুখের বিষয় বটে, কিন্তু মানুষের নিকট সে পরম দুঃখের হেতু।

(৬) আত্মার স্বরূপ যে আনন্দ, তার দ্বারাই সকল বস্তু আনন্দযুক্ত অর্থাৎ প্রিয় হয়। আনন্দের সঙ্গে সত্তা ও বোধ অভিন্ন ভাবে মিলিত না থাকলে আনন্দকে আনন্দই বলা যায় না। বিষয় আনন্দস্বরূপ হ'লে বিষয়ই সৎ ও চিৎ-স্বরূপ হয়ে যায়। অর্থাৎ 'সৎ-চিৎ-আনন্দ' জড়বস্তু হয়ে যায়।

এই সব যুক্তি হ'তে প্রতিপন্ন হয়, আনন্দ কখন বিষয়ে থাকতে পারে না।

তৃতীয় প্রশ্ন : বিষয়-সম্বন্ধ-বশতঃ অজ্ঞান ব্যক্তির যেরূপ সুখ হয়, জ্ঞানী ব্যক্তির সেরূপ হয় কিনা ?

উত্তর : জ্ঞানী ব্যক্তি কখন কখন ব্যবহার-কালে আত্মবিস্মৃত হন। তবে বিষয়-সম্বন্ধ-বশতঃ যে আনন্দের ভান হয়, তা যে তাঁর স্বরূপ-ব্যতিরিক্ত কিছু নয়, এই বোধ জ্ঞানীর নিয়ত থাকে, কিন্তু অজ্ঞানীর এই বোধ থাকে না।

চতুর্থ প্রশ্ন : এই সংসাররূপ দুঃখ কার হয় ?

উত্তর : জগৎ-সংসার প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টই হয়নি। এর অত্যন্ত নিবৃত্তি সর্বদাই বর্তমান। এ উত্তর অবশ্য উত্তম অধিকারী পূর্ণপ্রজ্ঞ বা অজাতবাদীর জন্য।

পঞ্চম প্রশ্ন : সংসার প্রকৃতপক্ষে না থাকলেও এর প্রত্যক্ষ প্রতীতি কিরূপে হয় ?

উত্তর : সংসার পরমার্থতঃ না থাকলেও অজ্ঞান হ'তে এর প্রতীতি হয়। যেমন আকাশে নীলিমার, স্বপ্নে বস্তুসমূহের বা রজ্জুতে সর্প প্রভৃতির প্রতীতি হয়।

ষষ্ঠ প্রশ্ন : রজ্জুতে কিরূপে সর্পভ্রান্তি হয়ে থাকে ?

উত্তর : রজ্জুতে সর্পভ্রম কালে অন্তঃকরণ-বৃত্তি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়-পথ দিয়ে বাহির হ'য়ে রজ্জুর সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করে। কিন্তু চক্ষুতে তিমিরাদি দোষ থাকায় অন্তঃকরণবৃত্তি রজ্জুর সমান আকার ধারণ করে না; তখন রজ্জুতে অবস্থিত অবিদ্যাতে চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, এবং ঐ অবিদ্যা সর্পাকারে পরিণাম প্রাপ্ত হয়। এজন্য ঐ সর্প সত্য নয়। আবার ঐ সর্প বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় অপ্রতীতির বিষয়ও নয়, মিথ্যারূপে প্রতীত হওয়ায় একেবারে অসৎও নয়। এজন্য রজ্জুসর্প সৎ- ও অসৎ-বিলক্ষণ মিথ্যা বা অনির্বচনীয় বস্তু। এই অনির্বচনীয় বস্তুর খ্যাতি বা কথনকেই 'অনির্বচনীয় খ্যাতি' বলে। রজ্জুতে অনির্বচনীয় সর্প ও তার জ্ঞান—এই উভয়কেই 'ভ্রম' বা 'অধ্যাস' বলা হয়। এই ভ্রম অবিদ্যার পরিণাম এবং চেতনের বিবর্ত স্বরূপ। অধিষ্ঠানের বিপরীত স্বভাব-সম্পন্ন যে অন্যথা-স্বরূপ, তাকে 'বিবর্ত' বলে।

সপ্তম প্রশ্ন : মিথ্যা জগতের আধার কি ?

উত্তর : নিজ স্বরূপের অজ্ঞানবশতঃ মিথ্যা জগতের প্রতীতি হয়। যাঁর প্রতীতি হয়, তিনিই এর আধার ও অধিষ্ঠান।

অষ্টম : মিথ্যা জগতের দ্রষ্টা কে ?

উত্তর : এ প্রশ্ন সম্ভব নয়, কারণ যখন জগৎই নেই, তখন তার আবার দ্রষ্টা কে, তার আবার নিবৃত্তিই বা কি ? বাজিকর যেমন মন্ত্রবলে কোন ব্যক্তিকে মিথ্যা শত্রু দেখালে সে ঐ মিথ্যা শত্রুকে মারবার জন্য উদ্যোগ করে না,

সেইরূপ মিথ্যা সংসার-নিবৃত্তির কোন আকাঙ্ক্ষা হওয়াও সম্ভব নয়।

নবম প্রশ্ন : জগৎ মিথ্যা হলেও এর নিবৃত্তির উপায় কি ?

উত্তর : জগৎ আমাতে নেই, 'ব্রহ্মই আমি, আমিই ব্রহ্ম' নিজ হৃদয়ে এই ভাব দৃঢ় করতে পারলে জগৎ ও জগজ্জনিত দুঃখ আর থাকে না—এই উপায়। অজ্ঞান জগতের উপাদান-কারণ এবং কার্য। সেই অজ্ঞান নষ্ট হ'লে জগৎ আপনা হতেই নষ্ট হয়ে যায় ; যেমন সুতা নষ্ট হ'লে বস্ত্র থাকতে পারে না। অবশ্য চিত্ত শুদ্ধ না হ'লে এ-কথার মর্ম ধারণা করা যায় না।

দশম প্রশ্ন : দেখা যায়, জীব পাপপুণ্যের কর্তা এবং ব্রহ্ম তদ্‌বিপরীত। অতএব জীব ও ব্রহ্মে ভেদই তো সঙ্গত ব'লে মনে হয়।

উত্তর : যেমন একই আকাশে ঘটাকাশ, জলাকাশ, মেঘাকাশ ও মহাকাশরূপ চার প্রকার ভেদ হয়ে থাকে, সেইরূপ একই চৈতন্যের চার প্রকার ভেদ হয়। যথা : কূটস্থ, জীব, ঈশ্বর ও ব্রহ্ম। বুদ্ধিরূপ অন্তঃকরণ-উপাধিযুক্ত বা ব্যষ্টিজ্ঞানের অধিষ্ঠানরূপ চৈতন্যকে 'কূটস্থ' বলা হয়। এ ঘটাকাশ তুল্য। কূটস্থ ব্রহ্মস্বরূপই, যেমন ঘটাকাশ মহাকাশ-স্বরূপই। এই কূটস্থকে 'জীবসাক্ষী' বা 'সাক্ষিচৈতন্য' বলা হয়। কামনা- ও কর্মযুক্ত বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যকে 'জীব' বলা হয়। অন্তঃকরণ এই জীবচৈতন্যের বিশেষণ। একই ব্রহ্ম-চৈতন্য অন্তঃকরণ-উপহিত বা উপাধিযুক্ত হ'লে তাঁকে 'সাক্ষী' ও অন্তঃকরণ-বিশিষ্ট বা বিশেষণযুক্ত হ'লে তাঁকে 'জীব' বলা হয়। এই জীব প্রতিবিম্ব-সহিত জলাকাশতুল্য। জীব 'ত্বং' পদের বাচ্য ও কেবল কূটস্থ 'ত্বং' পদের লক্ষ্য। বুদ্ধিগত আভাসই পুণ্যপাপাদির ফল ভোগ করে এবং জন্মমৃত্যুর অধীন হয়।

মায়াতে চৈতন্যের যে আভাস বা প্রতিবিম্ব এবং ঐ মায়ার অধিষ্ঠান যে চৈতন্য এই দুটি মিলিতভাবে 'ঈশ্বর' হন। ইনি মেঘাকাশতুল্য ! ঈশ্বর নিত্যমুক্ত ও সর্বজ্ঞ। ঈশ্বর 'তৎ'-পদের বাচ্য ও কেবল অধিষ্ঠানচৈতন্যকে 'তৎ'-পদের লক্ষ্যার্থ বলা হয়। ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে বাহিরে যিনি মহাকাশের ন্যায় পরিপূর্ণ চৈতন্য, তিনিই 'ব্রহ্ম'। মায়াশূন্য শুদ্ধ ব্রহ্ম জগৎকারণ হ'তে পারেন না, মায়াবিশিষ্ট ব্রহ্ম অর্থাৎ সগুণব্রহ্ম বা ঈশ্বরই জগৎকারণ এবং তিনিই কর্মফল-দাতা।

উপনিষদে যে 'দ্বা সুপর্ণা' ইত্যাদি মন্ত্র আছে, তাতে যে দুটি পক্ষীর কথা বলা হয়, তার দ্বারা কূটস্থ ও আভাসকেই বুঝানো হ'য়ে থাকে। জীব ও ঈশ্বরের চৈতন্যাংশে অভেদ, কিন্তু আভাসাংশে ভেদ ; এজন্য ভেদ ও অভেদ-বোধক উভয়প্রকার বাক্যগুলির মধ্যে কোন অসঙ্গতি নেই। এই পর্যন্ত বিচার—শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা জীবের ভেদভ্রম দূর হ'তে পারে ; তবে তাকে উত্তম অধিকারী হ'তে হবে।

মধ্যম অধিকারীর জন্য

বিচার-সাগরের **পঞ্চম** তরঙ্গে মধ্যম অধিকারীর উপযোগী বিচার প্রদত্ত হয়েছে। প্রথম প্রশ্নোত্তরে পাওয়া যায় যে, ভেদবাদ অপ্রমাণ। ভেদজ্ঞান অভেদজ্ঞান-সাপেক্ষ। এ স্বরূপনিষ্ঠ নয়, ব্যবহারসাধক মাত্র। এই কারণ এ কল্পিত বা মিথ্যা। অদ্বৈতমতই পরম-প্রমাণ। এই বাদ যোগবাশিষ্ঠে বশিষ্ঠদেব কর্তৃক উপদিষ্ট হয়েছে। এ বাল্মীকি- ও ব্যাসদেব-সম্মত সিদ্ধান্ত। গৌড়পাদাচার্য থেকে শিষ্যপরম্পরায় শঙ্করাচার্য ও তাঁর শিষ্যসম্প্রদায় সকলেই অদ্বৈতবাদী। শাঙ্কর মতে শ্রুতি-প্রমাণের প্রাধান্য, যুক্তির নির্মলতা, ও অনুভবের স্পষ্টতা থাকায় এর প্রামাণ্যে কোন সন্দেহ নেই। এক অদ্বৈততত্ত্বস্বরূপ ব্রহ্ম হ'তে যাবদ্ দৃশ্য বস্তুর

আবির্ভাব, সুতরাং সকলের মূলে অভেদ। সেই অদ্বিতীয় অভিন্ন বস্তুই বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হচ্ছেন মাত্র। একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা এই ভেদ জন্মমরণাদিময় সংসাররূপ যে দুঃখ, তা বিনষ্ট হ'তে পারে।

এই তরঙ্গের তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে ব্রহ্মের অজ্ঞানবশতঃ যে সংসার উৎপন্ন হয়, তার উৎপত্তিক্রম বর্ণিত হয়েছে। সৃষ্টির নিষেধ বা চৈতন্য-ভিন্ন বস্তুর অসারতা প্রদর্শন বেদের অভিপ্রায়, এই কারণে বিভিন্ন উপনিষদে জগৎ-সৃষ্টির কথা বহু প্রকারে উক্ত হয়েছে। ভাষ্যকার ও সূত্রকার সৃষ্টি-বিষয়ে তৈত্তিরীয় শ্রুতি অনুসরণ করেছেন। শুদ্ধ ব্রহ্ম হ'তে জগদুৎপত্তি হ'তে পারে না, মায়াবিশিষ্ট ঈশ্বর জগৎকারণ, নিষ্ক্রিয় ও অদ্বৈতব্রহ্মই মায়াযোগে ঈশ্বর হন। ঈশ্বরের মায়া জগতের উপাদান-কারণ ও চেতনাংশ নিমিত্ত-কারণ। এ-বিষয়ে দৃষ্টান্ত হচ্ছে মাকড়সা। সংসার অনাদি, উত্তরোত্তর সৃষ্টির প্রতি পূর্ব পূর্ব সৃষ্টির কর্মই কারণ হয়। কোন সৃষ্টি সর্বপ্রথম হয়েছে, এরূপ বলা যায় না। মায়া অনাদি ব'লে মায়াকল্পিত জীব, ঈশ্বর ও সৃষ্টি সবই অনাদি। যখন জীবের কর্মফল-প্রদানে জীবকর্মানুরোধেই ঈশ্বর উদাসীন থাকেন, তখন প্রলয় উপস্থিত হয়। প্রলয়ে সকল কার্যদ্রব্য নিজ নিজ কারণে লয় পায়।

কল্পারম্ভে মায়া হ'তে অপঞ্চীকৃত সূক্ষ্ম পঞ্চভূতের সৃষ্টি হয়। পঞ্চভূতের মিলিত সত্ত্ব-গুণাংশ হ'তে অন্তঃকরণ উৎপন্ন হয়। পঞ্চভূতের মিলিত রজোগুণাংশ হ'তে প্রাণাদি পঞ্চবায়ুর উৎপত্তি হয়। আকাশাদি পঞ্চভূতের পৃথক্ পৃথক্ সত্ত্বগুণ হ'তে যথাক্রমে কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, রসনা, নাসিকা এবং পঞ্চভূতের পৃথক্ পৃথক্ রজোগুণ হ'তে যথাক্রমে বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ উৎপন্ন হয়। পঞ্চভূতের তামসাংশ পঞ্চীকৃত হয়ে পঞ্চস্থূলভূত উৎপন্ন হয়। শুদ্ধ সত্ত্বগুণময়ী মায়া ঈশ্বরের কারণ-শরীর। মলিন সত্ত্বগুণযুক্ত অবিদ্যাংশ জীবের কারণ-শরীর। ইহারই নাম আনন্দময়কোষ। সূক্ষ্ম জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় ও বায়ু সমুদয় এবং বুদ্ধি ও মন মিলিত হ'য়ে সূক্ষ্মশরীর সৃষ্ট হয়। জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বুদ্ধির মিলনকে বিজ্ঞানময়কোষ এবং জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মনের সমষ্টিকে মনোময়কোষ বলে। পঞ্চপ্রাণ ও পঞ্চসূক্ষ্ম কর্মেন্দ্রিয়কে প্রাণময়কোষ বলে। এই তিন কোষের সমষ্টিই সূক্ষ্মশরীর। স্থূল-দেহের নাম অন্নময়কোষ।

জাগ্রৎ অবস্থায় স্বপ্ন ও সুষুপ্তি থাকে না, সেইরূপ স্বপ্নে জাগ্রৎ ও সুষুপ্তির অভাব, আবার সুষুপ্তিতে জাগ্রৎ ও স্বপ্ন থাকে না। আত্মা সকল অবস্থায় সমভাবে ভাসমান, তাই ব্যাপক। এই প্রকার বিবেক দ্বারা আত্মা যে ত্রিবিধ শরীর হ'তে পৃথক্, তা জানা যায়। অপর এক প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে যে, জীবন্মুক্ত ব্যক্তির দৃষ্টিতে অজ্ঞান বা তার কার্যক্রম সমস্তই অলীক। ধ্যানের কথায় বলা হয়েছে যে, 'আমি ব্রহ্ম' এরূপ ধ্যানকে 'অহংগ্রহ ধ্যান' বলে। পরব্রহ্মরূপে প্রণবের ধ্যান করলেও মোক্ষলাভ হয়। সগুণব্রহ্মের চিন্তা দ্বারা ব্রহ্ম-লোক-প্রাপ্তি হয়। সেখানকার ভোগ শেষ হ'লে জ্ঞানোদয়ে মোক্ষলাভ হয়।

ওঁকার ব্রহ্মস্বরূপ। ওঁকার ব্রহ্মের বাচক এবং ব্রহ্ম বাচ্য। সমষ্টি-স্থূলপ্রপঞ্চসহ চৈতন্যকে 'বিরাট' বলে। ব্যষ্টিস্থূলদেহ-অভিমানী চৈতন্যকে 'বিশ্ব' বলে। এটি ওঁকারের প্রথম মাত্রা 'অ'-কার॥ ব্যষ্টি সূক্ষ্ম বা লিঙ্গশরীর-অভিমানী চৈতন্যের নাম 'তৈজস' ও সমষ্টিসূক্ষ্মদেহ উপহিত চৈতন্যের নাম 'প্রাণ', 'সূত্রাত্মা' বা 'হিরণ্যগর্ভ'। এটি ওঁকারের দ্বিতীয় মাত্রা 'উ'-কার॥ সমষ্টি-কারণ-দেহ উপহিত চৈতন্যকে

'প্রাজ্ঞ' বলে। এটি ওঁকারের তৃতীয় মাত্রা 'ম'-কার॥ এই তিনটি উপাধিরই অধিষ্ঠান হচ্ছেন 'তুরীয়' (অর্থাৎ চতুর্থ) চৈতন্য। এই 'তুরীয় চৈতন্য' পরমাত্মার চতুর্থ পাদ। ইনি ঈশ্বর, সাক্ষী বা ব্রহ্মস্বরূপ। এই পর্যন্ত বিচারেই ও উপাসনার ফলে মধ্যম অধিকারী জ্ঞান দ্বারা পরমপুরুষার্থরূপ মোক্ষলাভ করেন।

নিম্ন অধিকারীর জন্য

নিম্নতম অধিকারীর জন্য যুক্তিপ্রধান **ষষ্ঠ** তরঙ্গ। তীক্ষ্ণবুদ্ধি সত্ত্বেও যাঁর মনে বহু শঙ্কা-সন্দেহের উদয় হয়, তিনিই কনিষ্ঠ বা মন্দ অধিকারী। প্রথমে স্বপ্নের মিথ্যাত্ব বলা হয়েছে। স্বপ্নে দৃষ্ট পদার্থের ব্যাবহারিক সত্তা নেই; এর সত্তা প্রাতিভাসিক মাত্র। এ ব্যাবহারিক কারণ-নিরপেক্ষ এবং অবিদ্যাদোষ-দুষ্ট, এজন্য মিথ্যা। সত্তা মুখ্যতঃ দুই প্রকার: চৈতন্যের পারমার্থিক সত্তা এবং তদ্ভিন্ন সমস্ত অনাত্ম বস্তুরই প্রাতিভাসিক সত্তা। জাগ্রৎ-কালে যেমন স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু থাকে না, তেমনি স্বপ্নকালেও জাগ্রৎকালের দৃষ্ট বস্তু থাকে না, এই কারণে জাগ্রৎও স্বপ্নবৎ মিথ্যা। বেদান্ত-মতে চৈতন্য ও জ্ঞান অভিন্ন বস্তু, এ জ্ঞানের উৎপত্তি হ'তে পারে না, যে-জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তা বৃত্তিজ্ঞান। স্বপ্নদর্শনকালে স্বপ্নটি জাগ্রৎ বলেই বোধ হয়, অতএব উভয়ই কল্পিত। একটি স্থির ব'লে কল্পিত, অপরটি অস্থির ব'লে কল্পিত। জগৎ—দেখছি, তাই আছে; আছে ব'লে দেখছি না। এইরূপ দৃষ্টিসৃষ্টিবাদই সিদ্ধান্ত।

এই তরঙ্গে বহুবিধ প্রশ্নের উত্তরদান-প্রসঙ্গে সাংখ্য, ন্যায়, রামানুজ মধ্বাচার্যাদি মতে আত্মার অণুত্ব প্রভৃতি খণ্ডন করা হয়েছে। আত্মা যে সৎস্বরূপ, তা নিষ্পন্ন করা হয়েছে। আত্মার নিবৃত্তি কেউই অনুভব করতে পারে না। অনুভবের কর্তাই আত্মা। আত্মা চৈতন্যস্বরূপ, প্রকাশস্বরূপ জ্ঞানকেই 'চিৎ' বা 'চৈতন্য' বলে। অন্তঃকরণ বা ইন্দ্রিয় দ্বারা কোন বস্তুর প্রকাশ হ'তে পারে না। জ্ঞানকে আত্মার গুণ বলা যায় না। যদি আত্মার গুণ অনিত্য হয়, তবে তা জড়বস্তু হ'য়ে পড়ে। অনিত্য বস্তুমাত্রই জড়। সুতরাং জ্ঞান নিত্য ও ঐ নিত্যজ্ঞান আত্মস্বরূপই। যেমন উষ্ণতা পরিত্যাগ ক'রে অগ্নি কদাপি থাকে না, উষ্ণতা অগ্নির স্বরূপ। সেইরূপ জ্ঞান আত্মার স্বরূপ। আবার আত্মা আনন্দস্বরূপ। যদি আত্মা আনন্দস্বরূপ না হতেন, তা হ'লে বিষয়-সম্বন্ধবশতঃ যা ভান হয়, তা না হওয়াই উচিত। কারণ বিষয়ে তো আর আনন্দ নেই। এই সৎ চিৎ ও আনন্দ পরস্পর ভিন্ন নয়, একই বস্তু। আত্মা ব্রহ্মস্বরূপই এবং ব্রহ্মই সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ। আত্মা 'অস্তি, জায়তে' প্রভৃতি ষড়্‌বিকার-রহিত, আত্মা অসঙ্গ এবং স্বগত সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদশূন্য, দেশকালবস্তু-রূপ ত্রিবিধ পরিচ্ছেদশূন্য। জীব এই আত্মস্বরূপ।

অ-জ্ঞানীর চিহ্ন রাগ ও জ্ঞানীর চিহ্ন বিরাগ। বিষয়ে সত্যতাবুদ্ধি রাগের সহায় ও বিষয়ে মিথ্যাবুদ্ধি বৈরাগ্যের সহায়। অ-জ্ঞানীর যদি বা বিষয়ে বৈরাগ্য হয় তো তা মিথ্যাবুদ্ধি-জনিত নয়, বিষয়ে দোষ-দর্শন জন্যই হয়ে থাকে। বিষয়ে সুখ পেলে এ বৈরাগ্য আবার নষ্ট হয়ে যেতে পারে। জ্ঞানীর বৈরাগ্য কখনও দূর হয় না, কারণ তা বিষয়ে মিথ্যা বুদ্ধি হ'তে জাত।

লক্ষণা তিন প্রকার: জহৎ, অজহৎ ও ও ভাগ-ত্যাগ বা জহদজহৎ। 'হা' ধাতুর অর্থ ত্যাগ করা, তদুত্তর 'শতৃ' প্রত্যয় ক'রে 'জহৎ' পদ হয়; স্ত্রীলিঙ্গে 'জহতী' পদ হয়। পণ্ডিতগণ ভাগ-ত্যাগ লক্ষণা দ্বারা নিজ স্বরূপকে ব্রহ্মস্বরূপ ব'লে দর্শন করেন। যে 'ঈশ্বর' ও ব্যষ্টি-কারণ-দেহ অভিমানী চৈতন্যকে

স্থানে বাচ্যার্থের এক অংশ ত্যাগ ক'রে অর্থ উপলব্ধি হয়, সেখানে ভাগ-ত্যাগ লক্ষণা হয়েছে বলা হয়। এর অপর নাম জহদজহতী লক্ষণা। 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যে জহতী ও অজহতী লক্ষণা হওয়া সম্ভব নয়। এজন্য এখানে ভাগ-ত্যাগ লক্ষণা দ্বারা বিচার করতে হবে। 'তৎ'-পদবাচ্য ঈশ্বর ও 'ত্বং'-পদবাচ্য জীব; এদের পরস্পর-বিরোধী ধর্মগুলি অর্থাৎ ঈশ্বরের সর্বজ্ঞত্ব ও জীবের অল্পজ্ঞত্বাদি ধর্মগুলি ত্যাগ ক'রে উভয়ের যে শুদ্ধ অসঙ্গ চৈতন্য-মাত্র থাকেন, তাঁকে লক্ষণা দ্বারা লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, এক চৈতন্য-মাত্রই আছেন। উভয়ের চৈতন্যভাগে একতায় কোন বাধা নেই। অতএব 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম', 'অহং ব্রহ্মাস্মি', 'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম' প্রভৃতি মহাবাক্যে ভাগ-ত্যাগ লক্ষণা দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের শুদ্ধ চৈতন্যসত্তার অভিন্নতা প্রতিপাদিত হয়ে থাকে। সুবৃহৎ ষষ্ঠ তরঙ্গের এই হ'ল সারসংক্ষেপ।

জ্ঞান, সমাধি ও উপাসনা

সপ্তম তরঙ্গে বলা হয়েছে, তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির লৌকিক ব্যবহারের কোন নিয়ম নেই। তিনি প্রারব্ধ মাত্র ভোগ করেন। তাঁর কোন কর্তব্য থাকে না। তিনি বিধি নিষেধের অতীত। শরীরধারী হয়েও পূর্ণপ্রজ্ঞের বন্ধ ভ্রমের অভাবকে জীবন্মুক্ত বলা হয়। প্রারব্ধের ভেদবশতঃ জীবন্মুক্তগণের ব্যবহার নানা প্রকার হয়। জ্ঞানীর শরীর-ত্যাগে কোন বিশেষ স্থান কাল বা দেশের অপেক্ষা নেই। তিনি সদামুক্ত। অধিকারী পুরুষগণের প্রারব্ধ এক কল্প পর্যন্ত থাকে ও তজ্জন্য তাঁদের অনেক জন্ম গ্রহণ করতে হয়। কল্পান্তে তাঁদের বিদেহ মোক্ষ হয়। তাঁরা জীবন্মুক্ত (নিত্যজীব)। সবিকল্প সমাধির ফলে নির্বিকল্প সমাধি হয়। এই সমাধি অবস্থায় অন্তঃকরণ-বৃত্তি ব্রহ্মাকার ধারণ করে। 'ব্রহ্মের অনুভব করছি' এরূপ বোধ থাকে না। নির্বিকল্প সমাধিতে যে আনন্দ, তা অনুভূত হয় না; তা আনন্দ-স্বরূপ বা অনুভূতি-স্বরূপ। সবিকল্প সমাধিকালে আনন্দের অনুভব হয়। এই রসাস্বাদও নির্বিকল্প সমাধির বিঘ্ন। বিঘ্ন চারটি: লয়, বিক্ষেপ, কষায় ও রসাস্বাদ।

যাঁরা জ্ঞানে অধিকারী নন, তাঁদের পক্ষে প্রয়োজন উপাসনা। পঞ্চদেবতায় সমান বুদ্ধি রেখে উপাসনাকে স্মার্ত উপাসনা বলে। পঞ্চদেবতার যে-কোন দেবতার উপাসনায় সিদ্ধ হ'লে ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তি হয় এবং ঐ লোকের ভোগান্তে বিদেহ মোক্ষ লাভ হয়। একই ব্রহ্মলোক বৈষ্ণবের নিকট বৈকুণ্ঠ, শৈবের পক্ষে শিবলোক ও শাক্তের কাছে দেবীলোক। পরমার্থতঃ পরমাত্মাতে কোন নাম ও রূপ নেই। মন্দবুদ্ধি উপাসক কর্তৃক নামরূপের কল্পনা করা হয়। এইজন্য এক পরমাত্মাতে মায়াদ্বারা কল্পিত নামরূপ নানা প্রকার হ'তে আর বাধা কি? উপাসক ও উপাস্যের মধ্যে ভেদজ্ঞান যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ দেখা যায়, অভেদ-জ্ঞানে উপাসনায় বিরোধ থাকতে পারে না। এই উপাসনায় উপাস্যকে নিজ অন্তরাত্মা ব'লে ভাবতে হয় এবং এক অন্তরাত্মাই সকলের ও সকল দেবতার অন্তরাত্মা। নানা দেবদেবীর উপাসনা এক সগুণ ব্রহ্মেরই উপাসনা। সমস্ত উপাস্যের মধ্যে এক সচ্চিদানন্দ অদ্বৈত ব্রহ্ম বর্তমান, অতএব তাঁর উপাসনাই নানা দেবদেবীর মধ্য দিয়ে হয়ে থাকে।

'বেদ' অনাদি, নিত্য ও অপৌরুষেয়, অতএব বেদে ভ্রমপ্রমাদ থাকতে পারে না। ঈশ্বর যেরূপ নিত্য, তাঁর জ্ঞানরাশি বেদও সেইরূপ নিত্য। বেদোক্ত অদ্বৈত সিদ্ধান্তই প্রচার করেছেন ব'লে শঙ্করাচার্যের প্রাধান্য। এ তাঁর নিজের কোন মত নয়। দর্শন-শাস্ত্রাদির কর্তা মানুষ, অতএব তাঁদের লেখায় ভ্রমাদি দোষের সম্ভাবনা। তাঁদের কথার প্রামাণ্য গৌণ।

বেদান্তের চরম সিদ্ধান্ত অজাতবাদ। এটি কিন্তু সর্বোত্তম অধিকারীর জন্য, সাধারণের উপযোগী নয়। এই হ'ল শেষ তরঙ্গের সার কথা।

সমালোচনা

বেদান্ত-দর্শন (৩য় ও ৪র্থ খণ্ড)—অনুবাদক ও ব্যাখ্যাতা : স্বামী বিশ্বরূপানন্দ। সংশোধক ও সম্পাদক : স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দপুরী এবং বেদান্তবাগীশ শ্রীআনন্দ ঝা, ন্যায়াচার্য। প্রকাশক : স্বামী গম্ভীরানন্দ। প্রাপ্তিস্থান : অদ্বৈত আশ্রম, ৫নং ডিহি এণ্টালি রোড, কলিকাতা ১৪। পৃষ্ঠা ৪৮৫ হইতে ৯৭৮। মূল্য—৩য় খণ্ড ৪৲, ৪র্থ খণ্ড ৩৲।

সকলেরই বেদান্তের চর্চা করা উচিত, তাহার প্রথম কারণ—জগতে যত শাস্ত্র আছে, তন্মধ্যে কেবল ইহারই উপদেশাবলীর সহিত বহিঃপ্রকৃতির বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে যে ফল লব্ধ হইয়াছে, তাহার সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে। দ্বিতীয় কারণ—ইহার অদ্ভুত যুক্তিসিদ্ধতা।

স্বামী বিশ্বরূপানন্দ-অনূদিত বেদান্ত-দর্শন ১ম ও ২য় খণ্ড ইতিপূর্বে প্রকাশিত হইয়া বিশেষভাবে সমাদৃত হইয়াছে। বর্তমান খণ্ড-দুইটিতে ১ম অধ্যায়ের ২য় পাদের ২০ সংখ্যক সূত্রের শেষাংশ হইতে ১ম অধ্যায়ের শেষ পর্যন্ত দেওয়া হইয়াছে। অধিকরণ-প্রতিপাদ্য, অধিকরণ-সঙ্গতি, সূত্রার্থ, শাঙ্কর ভাষ্য ও তাহার বঙ্গানুবাদ, বৈয়াসিক ন্যায়মালা ও তাহার বঙ্গানুবাদ এবং সর্বোপরি 'ভাবদীপিকা' ব্যাখ্যা দ্বারা এই গ্রন্থ অলঙ্কৃত।

দার্শনিক মূলতত্ত্বগুলি সম্বন্ধে যাঁহাদের মোটামুটি জ্ঞান আছে, সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ হইলেও তাঁহারা এই গ্রন্থ হইতে বেদান্তসূত্র ও শাঙ্কর ভাষ্য সম্বন্ধে জ্ঞান সঞ্চয় করিতে পারিবেন। 'ভাবদীপিকা'-ব্যাখ্যা-প্রণয়নে অনুবাদক যে পরিশ্রম করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ। বেদান্ত-শিক্ষার্থী এই ব্যাখ্যায় অনুশীলনের উপযোগী প্রয়োজনীয় অধিকাংশ বিষয় একত্র পাইবেন।

ব্রহ্মানন্দ-লীলাকথা : লেখক ও প্রকাশক : ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য, ২৮, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা ৯। প্রাপ্তিস্থান : নবভারত পাবলিশার্স, ৭২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৯। পৃষ্ঠা ২৫৬ ; মূল্য ৪৲।

শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর জীবনকাহিনী সমুদ্রোপম অতল গম্ভীর মহিমায় পরিপূর্ণ। শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানদের মধ্যে প্রত্যেকের জীবনেই কোন না কোন অসাধারণ বৈশিষ্ট্য তাঁদের লোকোত্তর মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের অধ্যাত্মপ্রেরণা যে বিপুল সঙ্ঘদেহের মধ্য দিয়ে সমগ্র পৃথিবীতে সঞ্চারিত হয়েছে, তার প্রথম কর্ণধার 'মহারাজে'র দিব্য ব্যক্তিত্ব এই অসাধারণদের মধ্যেও অসাধারণ। এর আগে ব্রহ্মানন্দজীর দুটি জীবনী এবং পৃথিবীর ধর্মপ্রসঙ্গ-মূলক গ্রন্থের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ' প্রকাশিত হয়েছে। উৎসুক ধর্ম-পিপাসুরা এ গ্রন্থত্রয়ের সংবাদ নিশ্চয় রাখেন। সেই সঙ্গে এই গ্রন্থ আর একটি সশ্রদ্ধ সংযোজন।

বাংলা জীবনীসাহিত্যে—বিশেষভাবে জননী সারদাদেবীর প্রথম জীবনীকাররূপে লেখক চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। 'ব্রহ্মানন্দ-লীলাকথা'য় তাঁর লেখনীর সরল অথচ গভীর বক্তব্য নিবেদনের ভঙ্গীটিও পাঠকচিত্তকে মুগ্ধ করবে। বিভিন্ন কাহিনী স্মৃতিকথা ও পত্রাবলীর সমন্বয়ে লেখক ব্রহ্মানন্দ মহারাজের শিশুসুলভ সরল অন্তর, সহজ কৌতুকপ্রবণতা,

দিব্য অন্তর্দৃষ্টি, সহজাত নেতৃত্বশক্তি এবং এ-সব কিছুর উর্ধ্বে তাঁর লোকপাবনী অধ্যাত্মশক্তির অমেয় মহিমার সার্থক পরিচয় ফুটিয়ে তুলেছেন।

এ গ্রন্থ পরিপূর্ণ জীবনী নয়। কিন্তু যাঁরা এই মহাজীবনের আস্বাদ লাভ করতে চান, তাঁরা এ গ্রন্থ-পাঠে তার কিছুটা পাবেন। বিশেষতঃ আগামী বৎসর স্বামী ব্রহ্মানন্দেরও শতবার্ষিকী—এ-কথা স্মরণ ক'রে ভক্ত পাঠকগণ এই গ্রন্থ-রচয়িতার কাছে কৃতজ্ঞতা অনুভব করবেন।

—প্রণবরঞ্জন ঘোষ

রবিতীর্থে: শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক: শ্রীসুধাংশুকুমার দাস, বাণী নিকেতন, ২১৭, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬। পৃষ্ঠা ১৮০ + ১২; মূল্য ৬৲।

অকৃত্রিম অনুরাগের সহিত রবীন্দ্র-সাহিত্য অনুশীলনের ফল এই গ্রন্থ। রচনাগুলি বিভিন্ন সময়ে দৈনিক সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। 'নমি নর দেবতারে', রবীন্দ্র-সাহিত্যে 'ইবসেনিজ্‌ম্', 'তাসের দেশ'-এর রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র-সাহিত্যের নায়ক-নায়িকা, 'জ্যাঠামশায়', 'চতুরঙ্গে'র রবীন্দ্রনাথ, 'ফাল্গুনী'র রবীন্দ্রনাথ, 'তারে যেন দণ্ড দিই দেবদ্রোহী ব'লে', বিপ্লব-মন্ত্রের উদ্গাতা রবীন্দ্রনাথ, স্বাধীনতা-সংগ্রামে রবীন্দ্রনাথ, জাতীয় সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতে, জীবন-পূজারী রবীন্দ্রনাথ, ব্রাউনিং ও রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র-সাহিত্যে জীবনবাদ, পলাতকা, 'ছিন্নপত্রে'র রবীন্দ্রনাথ, 'যুক্ত কর হে সবার সঙ্গে', ভক্তকবি রবীন্দ্রনাথ, 'বাইশে শ্রাবণ'—এই প্রবন্ধগুলি গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে।

প্রতিটি প্রবন্ধে অনুপম ভাষায় যুক্তিপূর্ণ আলোচনা। লেখককে লিখিত রবীন্দ্রনাথের ৫টি পত্রও মুদ্রিত হইয়াছে, এগুলিতে তাঁহার লেখার সমালোচনা রবীন্দ্রনাথ কিভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ আছে। একটি নিদর্শন: 'পলাতকা'র যে সমালোচনা করেছ, পড়ে খুশী হয়েছি। প্রশংসায় সকলেই খুশী হয়, কিন্তু নিপুণ প্রশংসায় খুশী হবার কারণ আরো ঘনীভূত হয়ে থাকে।'

রবীন্দ্র-সমালোচনা-সাহিত্যে একটি মূল্যবান্ সংযোজন এই গ্রন্থটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ। এ যেন রবীন্দ্র-সাহিত্য-গঙ্গার তীরে তীরে তীর্থস্নান!

পৌরাণিকী (দ্বিতীয় সংস্করণ)—স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। প্রকাশক: স্বামী মহেশ্বরানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, বাঁকুড়া। পৃষ্ঠা ১২৩; মূল্য টাকা ১.৫০।

শ্রদ্ধা ত্যাগ ভক্তি বীরত্ব প্রভৃতি গুণে ভূষিত পৌরাণিক চরিত্রগুলি ভারতীয় আদর্শের আলোক-বর্তিকা। আলোচ্য পুস্তকে বর্ণিত কয়েকটি কাহিনীতে ভারতের শাশ্বত আদর্শ পরিস্ফুট: নচিকেতার বরলাভ, বিদুষী গার্গী, সত্যকাম, সাগর ও গঙ্গা, গণেশ, নারদ, যযাতির শিক্ষা, আত্মত্যাগের শক্তি। সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর উপপাঠ্য হিসাবে লিখিত হইলেও বইটি বড়দেরও পড়িবার মতো।

রামচরিত-মানস (সুন্দরকাণ্ডের মূল ও পদ্যে বঙ্গানুবাদ): শ্রীমহেন্দ্রলাল রায়চৌধুরী, ৭৭, সাউথ মালাকা, এলাহাবাদ ১ পৃষ্ঠা ৫৬; মূল্য টাকা ১.২৫।

মহাত্মা তুলসীদাস-বিরচিত 'রামচরিত-মানস' হিন্দী ভাষার অমূল্য সম্পদ। ভক্ত কবির অপূর্ব ভাব ও ভক্তির স্বতঃ-উৎসারিত নির্ঝরিণী এই গ্রন্থে ছন্দোবদ্ধ।

'সুন্দরকাণ্ড' রামচরিত-মানস কাব্যের একটি ক্ষুদ্র অংশ। ইহাতে পরমভক্ত হনুমানের সাগরলঙ্ঘন, শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি জানকীর গভীর

প্রেম, বিভীষণের শরণাগতি, সীতা-অন্বেষণ, সমুদ্রবন্ধন প্রভৃতি বর্ণিত।

আলোচ্য গ্রন্থখানি বঙ্গভাষায় সুন্দরকাণ্ডের কবিতানুবাদ। মূল হিন্দীর পাশে পাশে অনুবাদ থাকায় পাঠকের তুলসী-রামায়ণের সহিত পরিচয় ঘটিবে। অনুবাদ প্রাঞ্জল ও মূলানুগ। এই গ্রন্থপাঠে রামচরিত-মানসের অপর অংশগুলি পড়িবার আগ্রহ হইবে।

নীলকণ্ঠ (সচিত্র প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)—ব্রহ্মচারী গঙ্গানন্দ প্রণীত। পৃষ্ঠা ৩১৬ এবং ৩৬৬ ; মূল্য প্রতি খণ্ড ৬৲।

আলোচ্য গ্রন্থ শ্রীমৎ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীর জীবনী। প্রথম খণ্ডে প্রধানতঃ সাধনার জীবন এবং দ্বিতীয় খণ্ডে কল্যাণব্রতী জীবন লিপিবদ্ধ। শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ তদীয় শিষ্য ব্রহ্মচারী কুলদানন্দকে নিজ হস্তে 'নীলকণ্ঠ' সাজাইয়াছিলেন, তাহাই স্মরণ করিয়া গ্রন্থের এই নামকরণ করা হইয়াছে। পুস্তকের রচনাশৈলী ও ভাষা সুন্দর। দ্বিতীয় খণ্ডের উপকরণ মূলতঃ দিনলিপি হইতে সংগৃহীত।

গীতার বাণী (গীতি-নাট্য)—শ্রীরমণীরঞ্জন কাব্যতীর্থ। প্রাপ্তিস্থান : ৬ নং শিবদাস ভাদুড়ী স্ট্রীট, কলিকাতা ৪। পৃষ্ঠা ২৪ ; মূল্য ৫০ ন.প.।

আলোচ্য পুস্তকে ভগবদ্‌গীতার গীতি-নাট্যরূপ দেওয়ার প্রচেষ্টা আছে। ১৫টি দৃশ্যে গীতার দার্শনিক চিন্তাধারা সহজ ভাষায় ছন্দে প্রকাশ করা হইয়াছে, গানগুলি শ্রুতিমধুর।

বৈকালী (গান ও স্বরলিপি) : কথা—শ্রীযুগলকিশোর দাশ ; সুর ও স্বরলিপি—শ্রীবিশ্বনাথ মৈত্র, সুরসাগর। প্রকাশক : অনির্বাণ গ্রন্থাগার, ৭৫, অশোক গড়, কলিকাতা ৩৫। পৃষ্ঠা ৩৪ ; মূল্য ২৲।

ভাব ভাষা ও সুরের সম্মিলনে গান জনসমাজে প্রসার লাভ করে। 'বৈকালী'তে মুদ্রিত গানগুলি সম্বন্ধে এ-কথা প্রযোজ্য। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও ভাব অবলম্বনে রচিত ১৪টি গানের স্বরলিপি-সহ সমাবেশ এই গ্রন্থে। 'হে রামকৃষ্ণ! রামকৃষ্ণ! প্রণাম লহ শ্রীচরণে' এবং 'হে মোর স্বামীজী বিবেকানন্দ' বহুশ্রুত গান-দুটির স্বরলিপি থাকায় শিখিবার পক্ষে সহজ হইবে।

বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ—স্বামী সোমেশ্বরানন্দ-সঙ্কলিত। পৃঃ ৯৮, মূল্য ১৲।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সম্বন্ধে স্বামীজীর যে-সব উক্তি আছে, তাহা বিভিন্ন পুস্তক হইতে সংগৃহীত, বিশেষতঃ 'মদীয় আচার্যদেব' পুস্তিকা হইতে।

আরুণি (প্রথম বর্ষ, ১৩৬৯) : প্রকাশক—স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, নরেন্দ্রপুর, ২৪ পরগনা। পৃষ্ঠা ৬৬।

সুন্দর প্রচ্ছদ, সুনির্বাচিত ১৫টি প্রবন্ধ, ৯টি কবিতা, ৫টি গল্প, ৩টি জীবনী ও ২টি ভ্রমণকাহিনী-সম্বলিত নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আবাসিক উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের পত্রিকা 'আরুণি'র প্রথম প্রকাশ। প্রার্থনা করি, তার যাত্রা শুভ হোক। লেখাগুলিতে ছোটদের ভাব ও ভাষা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র শ্রীনিমাই-অঙ্কিত 'বাউল' চিত্রটি অতি সুন্দর।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

স্বামী গোবিন্দানন্দের দেহত্যাগ

আমরা দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, স্বামী গোবিন্দানন্দ (বলাই মহারাজ) গত ২রা ডিসেম্বর কলিকাতায় ৭৭ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। রক্তচাপ-বৃদ্ধিতে তিনি ভুগিতেছিলেন, হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় হঠাৎ তাঁহার দেহত্যাগ হয়।

তিনি শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন, ১৯১২ খৃঃ রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে যোগদান করেন এবং '১৫ খৃঃ তাঁহার নিকট সন্ন্যাস-দীক্ষা লাভ করেন।

১৯৪০ হইতে '৫২ খৃঃ পর্যন্ত দীর্ঘকাল তিনি ভুবনেশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁহার সরল ও অমায়িক ব্যবহারে সকলে মুগ্ধ হইতেন। তাঁহার দেহত্যাগে সঙ্ঘের একজন প্রাচীন সন্ন্যাসীর অভাব হইল।

তাঁহার দেহমুক্ত আত্মা ভগবৎপদে শাশ্বত শান্তি লাভ করিয়াছে।

ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

কার্যবিবরণী

মালদহ : রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ১৯৬১-৬২ খৃঃ সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯২৪ খৃঃ মঠকেন্দ্র স্থাপিত হয় এবং '৪৩ খৃঃ মিশন-শাখা যুক্ত হয়। মঠশাখায় নিয়মিত ধর্মালোচনা, শাস্ত্রপাঠ, ভজন এবং প্রতি একাদশীতে রামনাম-সঙ্কীর্তন হইয়া থাকে। আলোচ্য বর্ষে আশ্রমে ও আশ্রমের বাহিরে ছায়াচিত্রযোগে ৬৭টি বক্তৃতা, নরনারায়ণসেবা, শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়।

মিশন-শাখা কর্তৃক অনেকগুলি শিক্ষা ও সেবাপ্রতিষ্ঠান পরিচালিত হইতেছে। আশ্রম-সংলগ্ন ভূমিতে বিবেকানন্দ-বিদ্যামন্দির উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ৪৮৮; আলোচ্য বর্ষে মালদহ জেলায় স্কুল ফাইনালে এই বিদ্যালয়ের দুইটি ছাত্র প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। আশ্রমের ছাত্রাবাসে ২৭টি বিদ্যার্থী ছিল। পাঠাগারের পুস্তক-সংখ্যা ১,৪২৬ এবং ব্যবহৃত পুস্তক-সংখ্যা ১,০৬২। নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়, উদ্বাস্তু বিদ্যালয়, বয়স্ক-শিক্ষাকেন্দ্র, শিশুসঙ্ঘ, মহিলা শিল্পশিক্ষাকেন্দ্র, নার্সারি বিদ্যালয় প্রভৃতি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতেছে।

আশ্রমে ও গ্রামে দাতব্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয়ে মোট চিকিৎসিত রোগীর সংখ্যা ৪৭,৪০৭ (নূতন ৯,৭২৮)।

আলোচ্য বর্ষে একটি শিশু-প্রদর্শনী এবং একটি শিক্ষা ও কুটিরশিল্প-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। বন্যার সময় তিনটি থানায় চাল এবং চিঁড়া গুড় বিতরণ করা হয়। বন্যার্তদিগকে জামা কাপড় ও কম্বল দেওয়া হয়।

আমেরিকায় বেদান্ত

হলিউড বেদান্ত-সোসাইটি : কেন্দ্রাধ্যক্ষ স্বামী প্রভবানন্দ। রবিবারের বক্তৃতা :

জুন : উপাসনা ও ধ্যান; আমাদের চিন্তা ও কথা; 'তত্ত্বমসি'; ধর্ম ও কর্ম।

অগস্ট : 'সেই আমি'; পুনর্জন্ম; শ্রীকৃষ্ণের শেষ বাণী; শরীর, মন ও আত্মা।

সেপ্টেম্বর : 'তাহারাই ঈশ্বর দর্শন করিবে'; ভগবৎপ্রেম ও অহং-ভাব; প্রভুর নিকট প্রার্থনা; সমাধি কি? পাপের সমস্যা।

মঙ্গলবারে শ্রীমদ্ভাগবত এবং বৃহস্পতিবারে নারদীয় ভক্তিসূত্র ও উপনিষদের ক্লাস হয়।

সান্টা বারবারা শাখাকেন্দ্রে রবিবারের বক্তৃতা :

জুন : ইচ্ছা ও ব্যক্তিত্ব; উপাসনা ও ধ্যান; নীতি ও ধর্ম; 'তত্ত্বমসি'।

অগস্ট : বেদান্ত ও পাশ্চাত্য; 'অহং'-বোধ; মনের শান্তি; শ্রীকৃষ্ণের শেষ বাণী।

সেপ্টেম্বর : দৈনন্দিন জীবনে যোগাভ্যাস; 'তাহারাই ঈশ্বর দর্শন করিবে'; আনুষ্ঠানিক ধর্মের অর্থ; প্রভুর নিকট প্রার্থনা; মানুষ কি লক্ষ্যে পৌঁছে?

সপ্তাহ-অন্তর মঙ্গলবারে 'ভক্তিসূত্রে'র ক্লাস হয়।

বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী-প্রস্তুতি

বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী কমিটির সাধারণ সম্পাদক সম্বুদ্ধানন্দ জানাইতেছেন :

(১) আগামী ২০শে জানুআরি, '৬৩ বেলা ৩-৩০ মিঃ সময়ে ভারতের রাষ্ট্রপতি ডক্টর সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণন রামকৃষ্ণ মিশন সংস্কৃতি-ভবনে (Institute of Culture) স্বামীজীর জন্ম-শতবার্ষিক উৎসবের উদ্বোধন করিবেন। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন সভাপতিত্ব করিবেন। এতদুপলক্ষে পরদিন ২১শে জানুআরি বেলা ৩-৩০ মিঃ সময়ে ঐ স্থানেই একটি সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হইবে; দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উপস্থিত থাকিবেন ও ভাষণ দিবেন।

(২) পশ্চিমবঙ্গ সরকার জানাইয়াছেন, আগামী ১৭ই জানুআরি—স্বামীজীর জন্মতিথি-দিবস সাধারণ ছুটির দিন হিসাবে নির্ধারিত হইয়াছে। এইদিন স্বামীজীর শতবার্ষিক উৎসব শুরু হইবে, রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে এবং সর্বত্র যথোপযুক্ত মর্যাদা সহকারে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) পশ্চিমবঙ্গের ৩৫,০০০ গ্রামে স্বামীজীর জন্ম-শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার যথোপযুক্ত আয়োজন করিতেছেন।

(৪) ভারতের ৫,৫০,০০০ গ্রামে স্বামীজীর জন্ম-শতবার্ষিকী যথোচিতভাবে পরিপালন করার ব্যবস্থা ভারত সরকার করিতেছেন।

আসানসোল : রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের উদ্যোগে বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠানের জন্য শক্তিশালী সাধারণ ও কার্যকরী কমিটি এবং আসানসোল, বর্ধমান, চিত্তরঞ্জন, ধানবাদ ও দুর্গাপুরে আঞ্চলিক (Zonal) কমিটি গঠিত হইয়াছে। ধর্মসভা, নারায়ণসেবা, শোভাযাত্রা, প্রদর্শনী, কথকতা, ভজন, ম্যাজিক লণ্ঠন সহযোগে বক্তৃতা, প্রামাণিক চলচ্চিত্র প্রদর্শন, ব্যায়াম ও ক্রীড়া, স্বামীজীর জীবনী ও বাণী-প্রকাশন, প্রবন্ধ ও বক্তৃতা-প্রতিযোগিতা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইবে।

প্রস্তাবিত কর্মসূচীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি : আসানসোলে বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী স্মৃতিভবন-নির্মাণ, চিত্তরঞ্জনে প্রাথমিক বিদ্যালয় উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নয়ন, বর্ধমানে ছাত্রাবাস ও দুর্গাপুরে বিবেকানন্দ ইনস্টিট্যুট স্থাপন।

বাঁকুড়া : শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের উদ্যোগে স্বামীজীর শতবার্ষিকী সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠানের জন্য গৃহীত বিস্তৃত কার্যসূচীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য :

'বিবেকানন্দ-হল' প্রতিষ্ঠা, ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রতি বৎসর স্বামীজী-সম্পর্কে শ্রেষ্ঠ রচনার জন্য বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা, সমাজসেবা-শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন, পূজা-হোম, শোভাযাত্রা, সমবেত প্রার্থনা, ধর্মসভা, মহিলা-সম্মেলন, ছাত্রসভা, বিবেকানন্দ-মেলা, স্মারকগ্রন্থ-প্রকাশন, সঙ্গীত-সম্মেলন, বিবেকানন্দ-লীলাকীর্তন, শারীরিক ব্যায়াম-কৌশল প্রদর্শন।

মনসাদ্বীপ (২৪ পরগনা): স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে স্বামীজীর শতবার্ষিক উৎসবের আয়োজন করা হইতেছে। এই উপলক্ষে সমগ্র সাগরদ্বীপের অধিবাসী ও বিদ্যালয়সমূহের ছাত্রদিগের মধ্যে বক্তৃতা, আবৃত্তি, প্রবন্ধ ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইবে এবং পুরস্কার বিতরণ করা হইবে।

দ্বারহাট্টা (হুগলি): রাজেশ্বরী বহুমুখী বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে স্বামীজীর জন্ম-শতবার্ষিক উৎসবের অঙ্গ-হিসাবে যে-সকল অনুষ্ঠান হইবে, তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য:

স্বামীজীর আবক্ষমূর্তি প্রতিষ্ঠা; কৃষি শিল্প ও শিক্ষা প্রদর্শনী; প্রবন্ধ আবৃত্তি ও বক্তৃতা প্রতিযোগিতা; দরিদ্রনারায়ণ-সেবা, খেলাধুলা, স্বামীজীর জীবন ও বাণী আলোচনা।

কালনা: বর্ধমান জেলায় কালনার নিকট দেরিয়াটোন গ্রামে স্বামী বিবেকানন্দের পূর্বপুরুষদের ভিটায় তাঁহার আসন্ন জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল হইতে সম্প্রতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ আগমন করিয়া এক সভায় স্বামীজীর উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। সভায় এই গ্রামে একটি মাধ্যমিক উচ্চ বিদ্যালয়, একটি পাঠাগার ও একটি ব্যায়ামাগার স্থাপনের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। গ্রামটি অম্বিকা কালনা রেল স্টেশন হইতে ২॥ মাইল দূরে।

বিবিধ সংবাদ

পরলোকে

কুমুদবন্ধু সেন: বিশিষ্ট ভক্ত কুমুদবন্ধু সেন দীর্ঘকাল রোগভোগের পর গত ১৪ই ডিসেম্বর রাত্রি ৯টায় ৮২ বৎসর বয়সে কলিকাতা কার্মাইকেল হাসপাতালে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি স্বামীজী ও শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিয়াছিলেন এবং আলমবাজার মঠের সময় হইতে শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী শিষ্যদের সান্নিধ্য লাভ করেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দের সহিত তাঁহার নিকটতম সম্বন্ধ ছিল। তাঁহার অনেক সুচিন্তিত লেখা বিশেষতঃ স্বামীজীর সম্বন্ধে তাঁহার স্মৃতিকথা উদ্বোধনে প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি অকৃতদার ছিলেন। তাঁহার দেহমুক্ত আত্মা ভগবৎপদে চিরশান্তি লাভ করুক।

হরেন্দ্রকুমার নাগ: ঢাকার বিশিষ্ট ভক্ত হরেন্দ্রকুমার নাগ মহাশয় গত ১০ই ডিসেম্বর তাঁহার কলিকাতা বিডন স্ট্রীটের বাসভবনে ৮৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী সন্তানদের অনেকের দর্শন ও সান্নিধ্যলাভের সৌভাগ্য তাঁহার হইয়াছিল।

পূর্ববঙ্গের ঢাকা জেলার বেঙ্গারা গ্রামে তাঁহার আদি নিবাস ছিল। ৪০ বৎসরেরও

অধিক কাল যাবৎ তিনি তাঁহার গৃহে প্রতি-বৎসর ১লা জানুআরি 'কল্পতরু' উৎসব উদ্‌যাপন করিয়া আসিতেছিলেন। মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দ এবং স্বামী সুবোধানন্দ তাঁহার গ্রামের বাড়িতে শুভ পদার্পণ করেন। তাঁহার দেহমুক্ত আত্মা চির শান্তি লাভ করুক।

সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী: আমরা দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের প্রাক্তন কর্মসচিব সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী গত ৮ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় আকস্মিক দুর্ঘটনার ফলে পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮৪ বৎসর হইয়াছিল। তিনি শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিয়াছিলেন। বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার যোগ ছিল। 'উদ্বোধনে' তাঁহার অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক।

সুবোধচন্দ্র মিত্র: গত ১৫ই ডিসেম্বর ভক্ত সুবোধচন্দ্র মিত্র (এটর্নি) অল্প কিছু দিন অসুস্থ থাকিয়া হঠাৎ পরলোক গমন করিয়াছেন। গত কয়েক বৎসর যাবৎ শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারার সহিত পরিচিত হইয়া তিনি শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দ মহারাজের নিকট মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন। কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটির সহিতও তাঁহার বিশেষ যোগাযোগ ছিল। তাঁহার সহৃদয় ও অমায়িক ব্যবহার সকলকে মুগ্ধ করিত। তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে শ্রীভগবান শান্তি দিন। তাঁহার আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক।

ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

নূতন ভবনের উদ্বোধন

দক্ষিণেশ্বর শ্রীসারদা মঠ: গত ৮ই ডিসেম্বর বেলা ১০-৩০ ঘটিকায় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী যতীশ্বরানন্দজী মহারাজ শ্রীসারদামঠে একটি নূতন ভবন ও গ্রন্থাগারের উদ্বোধন করেন। এই অনুষ্ঠানে মঠের অনেক প্রবীণ সন্ন্যাসী উপস্থিত ছিলেন। এতদুপলক্ষে পূজা পাঠ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়।

প্রেমানন্দ-জন্মোৎসব

আঁটপুর: পূর্ব পূর্ব বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজের জন্মোৎসব তাঁহার জন্মস্থান হুগলি জেলার অন্তঃপাতী আঁটপুর গ্রামে গত ৬ই ডিসেম্বর বিশেষ আনন্দ সহকারে অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে পূজা পাঠ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। কলিকাতা ও নিকটবর্তী অঞ্চল হইতে বহু সাধু ও ভক্ত উৎসবে যোগদান করেন। স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ ও স্বামী অচিন্ত্যানন্দ 'বাবুরাম' মহারাজের জীবন আলোচনা করেন। সন্ধ্যায় আরাত্রিকের পর ধর্মমূলক ছায়াচিত্র দেখানো হয়।

মানুষের মস্তিষ্ক

ভারতীয় 'পদার্থ বিজ্ঞান' সমিতির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত 'জগদীশচন্দ্র বসু স্মৃতি' বক্তৃতায় ডক্টর বি. মুখার্জি মস্তিষ্ক সম্বন্ধে বলেন :

মানুষের মস্তিষ্ক খুবই জটিল যন্ত্র, ১০ বিলিয়ন স্নায়ুকোষ নীরবে সেখানে কাজ করিতেছে। আধুনিক বিজ্ঞানের গবেষণা চেতনা-সম্বন্ধে (Consciousness) নূতন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছে। এই নূতন মতবাদ অনুসারে স্নায়ুকোষ (neuron)গুলি মস্তিষ্কের আবরণে (Cerebral Cortex) নয়—আরও ভিতরে (Reticular and Limbic System) 'উচ্চতম পর্যায়ের সংহতি' আনয়ন করিতেছে।

মস্তিষ্ক সর্বদা—এমন কি নিদ্রাকালেও ইন্দ্রিয়বৃত্তি দ্বারা মুহুর্মুহুঃ আহত হইতেছে। বিজ্ঞানের নিকট ইহাই এক চিরন্তন সমস্যা কি করিয়া মস্তিষ্ক অসংখ্য প্রতিযোগিতা-পরায়ণ আঘাত হইতে অর্থপূর্ণ প্রয়োজনীয় একটি আঘাত বাছিয়া লইয়া তদনুযায়ী কার্য করিবার সিদ্ধান্তে উপনীত হয়।

মানুষের মস্তিষ্কই পৃথিবীকে রূপান্তরিত করিতেছে, পৃথিবীকে ধ্বংস করিবার শক্তিও মস্তিষ্কের আছে, কিন্তু সে নিজেকে জানিতে বা বুঝিতে পারে না—ইহাই চূড়ান্ত সমস্যা। মস্তিষ্ক-আলোচনার ক্ষেত্রেই বিজ্ঞান এক প্রচণ্ড অনিশ্চয়তার সম্মুখীন।

'অভ্যাস' (habits) বা 'স্মৃতি' (memory) অপেক্ষা স্নায়ুতন্ত্রের প্রতিক্রিয়া আলোচনা সহজ। 'বুদ্ধি' সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না, আর জানি না—বুদ্ধির বিভিন্ন স্তরের কারণ মস্তিষ্কের নমনীয়তাই (plasticity) বা কি!

কলিকাতায় জন্মহার

কলিকাতায় জন্মহার বাড়িতেছে না কমিতেছে? গত কয়েক বৎসরের হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :

		(প্রতি হাজারে বৃদ্ধি)
১৯৫০-৫১	...	২৬.২৮
১৯৫১-৫২	...	১৫.৯৬
১৯৫২-৫৩	...	১৫.১১
১৯৫৩-৫৪	...	১৩.৫৫
১৯৫৪-৫৫	...	১১.৯৩
১৯৫৫-৫৬	...	১১.৯৪
১৯৫৬-৫৭	...	১৩.৬৪
১৯৫৭-৫৮	...	১৩.৮০
১৯৫৮-৫৯	...	১২.৩৩
১৯৫৯-৬০	...	১২.৭৪
১৯৬০-৬১	...	১২.২১

(সঙ্কলিত)

বিজ্ঞপ্তি

আগামী ৩রা মাঘ (১৭.১ ৬৩) বৃহস্পতিবার শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের শুভ ১০১তম জন্মতিথি বেলুড় মঠে ও অন্যত্র উদ্‌যাপিত হইবে। ঐদিন বর্ষব্যাপী বিবেকানন্দ জন্ম-শতবার্ষিকীর শুভারম্ভ হইবে।

উদ্বোধন

বর্ষসূচী

৬৪-তম বর্ষ

(১৩৬৮-মাঘ হইতে ১৩৬৯-পৌষ)

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত"

সম্পাদক

স্বামী নিরাময়ানন্দ

উদ্বোধন কার্যালয়

১, উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা ৩

বার্ষিক মূল্য পাঁচ টাকা প্রতি সংখ্যা ৫০ ন.প.

বর্ষসূচী—উদ্বোধন

(মাঘ, ১৩৬৮ হইতে পৌষ, ১৩৬৯)

লেখক-লেখিকাগণ ও তাঁহাদের রচনা